BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূচি

প্রথম প্রবাস ...	৯
পঞ্চম প্রবাস ...	১৫৫
ইলমোরাণ্‌দের দেশে ...	২৫৭

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রথম প্রবাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বোম্বে থেকে লুফত্‌হান্‌সার উড়ান কাল খুব সকালে। একটানা। না থেমে ফ্রাঙ্কফার্ট।

বোম্বেতে ইতিপূর্বে কাজে এসেছি অনেকবার। এবার অকাজে। কলকাতা থেকে বোম্বে—ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের উড়ান মাত্র ঘণ্টা তিনেক লেট ছিল। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করলাম। শহরে অনুপস্থিত এক বন্ধুর গাড়ি ও তার সেক্রেটারী—ছিপছিপে সুন্দরী একটি পার্শী মেয়ে, নাম জারীন, নিতে এসেছিলেন সান্টা-ক্রুজে। তখন শেষ বিকেল। সেপ্টেম্বর মাস। ভ্যাপসা গরম।

জারীন আমাকে তাজ হোটেলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কাল শেষ রাতে গাড়ি আসবে বলে গেলেন।

চান-টান করে হোটেলের ঘরের পর্দা সরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে বোম্বের রাতের আলো দেখছিলাম।

মনটা খারাপ লাগছিল। বেশ বেশী খারাপ। অথচ সে মুহূর্তে আনন্দিত হওয়ারও কথা ছিল। দুমাসের জন্য বিদেশ যাচ্ছি, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। কত দেশে পা রাখব, কত লোকের সঙ্গে মিশব, চোখ খুলে পৃথিবীর শরীর দেখব, কান খুলে হৃৎস্পন্দন শুনব—নিজের বুকের মধ্যে, চেতনার মধ্যে, অস্তিত্বের কোষে কোষে সমস্ত পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপকে রুপোলি নূপুরের মত ঝুমঝুমির মত বাজাব।

ভেবেছিলাম।

কিন্তু তবুও দুঃখ হচ্ছিল।

চিরকেলে মধ্যবিত্ত বাঙালী বোধহয় কখনও শক্ত হতে জানেনি। শক্ত করতে পারেনি নিজেকে। বাইরের মুখোশটা শক্ত করতে পারলেও ভিতরটা শামুকের অভ্যন্তরের মত চিরদিন তার তুলতুলই রয়ে যায়। বাঙালী বোধহয় চিরকালই বাঙালীই থেকে যায়। একটুতেই তার মন খারাপ হয়। যখন খুব আনন্দিত হবার কথা ঠিক তখনই কলকাতার ফেলে-আসা বাড়ি, বয়স্ক বাবা, ভগ্নস্বাস্থ্য মা, বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন ঘরে বসে-শুয়ে-দাঁড়িয়ে-থাকা অনেককে বারবার মনে পড়ে। যাদের ভালোবাসা, ভালো ব্যবহার পেয়েছি, পাই প্রতি-নিয়ত; যাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অনেক সময়ই খারাপ ব্যবহার করি এবং করেই পরমুহূর্তে নিজেই কষ্ট পাই এমন প্রত্যেককেই মনে পড়ে—বারবার। নিরুচ্চারে মন বলে—ভালো থেকো তোমরা সব। তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো।

এই মন খারাপটা আসলে অমূলক। কারণ, দূরত্ব মনে করলেই তা দূরত্ব। যাত্রার সময়ের হিসেবে কখনও কখনও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে বহরমপুর (একশ তিরিশ মাইল)

www.BanglaBook.org

যেতে যে সময় লাগে সেই সময়ে দমদম থেকে ফ্রাঙ্কফার্টে গিয়ে পৌঁছনো যায়। বহু হাজার মাইল দূর না ভেবে মাত্র বারো ঘণ্টা দূর ভাবলেই মন খারাপের আর হেতু থাকে না। তাছাড়া, এ কথাটা প্রায়ই সত্যি যে, বাংলার অন্য প্রান্তে বোনের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে যত-না দেখা হয়, যে বোনের বিয়ে হয়েছে সুদূর ন্যু-ইয়র্কে তার সঙ্গে দেখা হয় তার চেয়ে বেশী। কোনো বিপদ-আপদে বা দোল-দুর্গোৎসবে বাংলার বোন গরুর গাড়ি, সাইকেল রিক্সা, ট্রেন এবং ট্যাক্সির মাধ্যমে বাড়ি এসে পৌঁছুতে যে সময় নেয়, ন্যু-ইয়র্কের বা টোকিওর বোন তার চেয়ে আগে এসে পৌঁছে যায়। তবু, সব জানা সত্ত্বেও মন খারাপ লাগে দূরে যেতে—অল্প কিছুদিনের জন্যে হলেও।

অন্ধকার থাকতে তৈরী হয়ে নিয়ে শেষ রাতে হোটেলের লবীতে এসে দাঁড়ালাম। আমি যে লিফটে নাবলাম সে লিফটেই লুফত্‌হান্‌সা কোম্পানীর দুজন এয়ার-হোস্টেস—হলুদ আর নীল ইউনিফর্ম পরে নামল। তখন পর্যন্ত তাদের সুন্দর চেহারাই চোখে পড়েছে—গুণাবলী চোখে পড়ল অনেক পরে—প্লেনের মধ্যে।

ভোরের মিষ্টি সামুদ্রিক হাওয়া অন্ধকারের আড়াল থেকে ছুটে আসছিল চোখে-মুখে গাড়ির মধ্যে। সান্টা-ক্রুজে পৌঁছিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করলাম আগে। তারপর কাউন্টারে-বসা একজন মোটাসোটা হাসিখুশী পার্শী ভদ্রমহিলা আমাকে ছাপ্পান্নটি টাকার বিনিময়ে তেলচিটে আটটি ডলার দিলেন। এবং তিনি নিজে যতই হাসিখুশী থাকুন না কেন, আমাকে বিলক্ষণ অখুশী করলেন। এই আটটি ডলার সম্বল করে আমায় পাড়ি দিতে হবে ফ্রাঙ্কফার্ট—সেখানে থেকে লানডান।

যেহেতু আমি একজন সাধারণ নাগরিক, যেহেতু আমি পাট বা চা বা নরকঙ্কাল বা অন্যকিছু রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারি না, অথবা যেহেতু আমি সরকারী কেউ-কেটা নই কোনো, সেইহেতু আমার বরাদ্দ এই করুণ এবং হাস্যোদ্দীপক ছাপ্পান্ন টাকার সমতুল বিদেশী মুদ্রা।

ইমিগ্রেশনের পর কাস্টম্‌সের বেড়া ডিঙিয়ে ব্যক্তিগত হাতব্যাগ ইত্যাদি পরীক্ষা-টরীক্ষার পর এমবার্কমেণ্ট লবীতে গিয়ে বসলাম।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে! পুজোর আগের সোনালি রোদে ছেয়ে গেছে টারম্যাক্। তবে এখানের রোদকে কলকাতার রোদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না! বিশেষ করে এই সময়ের রোদ। 'বাংলায় এখন শরৎ আলোর কমলবর্ণে বাহির হয়ে বিরাজ করে, যে ছিল মোর মনে মনে।'

একটু পরই উড়ান ঘোষিত হল। টারম্যাকের উপর বাস গড়িয়ে চলল। তারপর ডি.সি-টেন প্লেনে উঠে পড়লাম।

ডাকোটা, অ্যাভ্রো, ফকার-ফ্রেন্ডসিপ, স্কাইমাস্টার, ক্যারাভিল, বোয়িং ৭০৭ ইত্যাদি সমস্ত প্লেনে চড়া এক; আর ডি-সি-টেন-এ আর এক। ঢুকতেই মনে হল, গান শুনতে বুঝি কোনো হলে এসে পৌঁছলাম।

এই ফাঁকে বলে নিই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে যে, পাঠক যদি খুব তালেবর হন তাহলে

www.BanglaBook.org

অধমকে ক্ষমা করবেন। কারণ লেখক একজন সামান্য লোক। বিদেশ যাত্রা তার এই প্রথম। এমনকি স্বদেশেও জাম্বো জেটে কখনোই চড়ার সৌভাগ্য হয়নি তার এর আগে।

এ কথাও উপক্রমণিকায় বলে রাখা ভালো যে, যাঁরা আকছার বিদেশ যান বা সেখানেই যাঁদের মৌরসীপাট্টা—এ লেখা তাঁদের জন্যে একেবারেই নয়। বরং যাঁরা কখনও যাননি এবং ভবিষ্যতে যাঁদের যাওয়ার আশা ক্ষীণ বা একটুও নেই—তাঁদের কথা মনে করেই এই পাতা ভরানো। যাঁরা বিদেশে যাননি এবং যাবেন না, তাঁরা যদি এ লেখা পড়েন তাহলেই নগণ্য লেখক বিশেষ পুরস্কৃত হবে। তালেবরদের জন্যে বা বিদেশ সম্বন্ধে পণ্ডিতম্মন্য পাঠকদের জন্যে অনেক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ লেখক আছেন। তাঁদের জন্যে এই মূর্খ লেখকের নামচা নয়।

প্রথমেই ফার্স্ট ক্লাসের ডেক। পিছনে ইকনমি ক্লাস। তাও পরপর তিনটি ভাগ আছে। যখন সিনেমা দেখানো হয় তখন একই সঙ্গে তিনটি জায়গায় দেখানো হয়। ষোলো মিলিমিটারের প্রজেক্টর বোধহয় ঐ বিরাট প্লেনের পুরো দৈর্ঘ্য সামলাতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা। তাছাড়া, কোট ইত্যাদি রাখবার ওয়াড্রোব তো আছেই। তাদেরই গায়ে পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো হয়।

সব প্যাসেঞ্জারের সীট দেখে বসতে বসতে, কোট খুলে রাখতে, আরো সব বড় বড় ও টুকিটাকি প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হতে হতে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট লাগল। অত লোক এক প্লেনে গেলে ঐ সময় লাগাই স্বাভাবিক। সবাই চেপে-চুপে, টায়-টায় বসে পড়ার পর রৌদ্রালোকিত টারম্যাকে ট্যাকসিইং করে জটায়ুর মত প্লেনটা প্রধান রানওয়ের দিকে এগিয়ে চলল। প্রধান রানওয়েতে পড়ে, গতি বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বোম্বের মাটি ছেড়ে একটা চক্কর মেরে আরব সাগরের নীল জলের উপরে উড়ে এল। তারপরই জেটপ্লেনসুলভ অবলীলায় সোজা মেঘ ফুঁড়ে নীচের পৃথিবীকে চোখ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টায় ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উপরে উঠে সমান্তরাল রেখায় চলতে লাগল। কিন্তু সেদিন পেঁজা কাপাস তুলোর মত কয়েক-খণ্ড নরম হালকা মেঘ ছাড়া আকাশ একেবারে পরিষ্কার ছিল। তাই কিছুক্ষণ পরই শুধু মাথার উপরের এবং পাশের চারদিকে মহাশূন্যতাজনিত নীল এবং আরব সাগরের গভীরতার জলজ-নীলে মিলে এক আদিগন্ত নীলিমা শুধু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমই নয়, ঈশান, নৈঋর্ত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মধ্যে একটি রুপোলি পাখির মত উড়ে চলতে লাগল ভি.সি-টেন প্লেনখানি।

BanglaBook.org

এতক্ষণ পর ভিতরে চাইবার অবকাশ হল। ভেবে বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সত্যি সত্যি 'আম্মো' যাচ্ছি। কিন্তু চারপাশের সহযাত্রীদের দেখে ও দ্রুত-সঞ্চারিণী নীলচক্ষু ব্লণ্ড ও ব্রুনেট কেশশালিনী এয়ার-হোস্টেসদের দেখে অবিশ্বাস করারও উপায় ছিল না।

আমার পাশেই এক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক বসেছিলেন। সিডনী থেকে আসছেন। তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। ভদ্রলোক পিস্তল-শুটিং-এ অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়ান। নানাবিধ পিস্তল, ব্যালিস্টিকস্ এবং শুটিং কম্পিটিশন সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দিলেন তিনি।

www.BanglaBook.org

ইতিমধ্যে খাওয়ানোর অত্যাচারও শুরু হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে এত এত খাবার দেওয়া হয় যে নেহাত হ্যাংলা বা রাক্ষস ছাড়া কারো পক্ষেই সে খাবারের যথার্থ সম্মান করা সম্ভব নয়। তবু চোখ চেয়ে দেখলাম সবাই-ই খেয়ে চলেছেন। কিছুই করবার নেই, তাই-ই বোধহয় সকলেই খাওয়াতে মনোনিবেশ করেছেন।

ব্রেকফাস্টের সঙ্গে অস্ট্রেলীয়ান মাখন, ড্যানীশ চীজ, জার্মান সসেজ, গরম গরম এবং মাখনের চেয়েও নরম ব্রেকফাস্ট রোলস। গরম ডিম ভাজা, ফিঙ্গার চিপস, নানা রকম ফল এবং চা অথবা কফি।

ব্রেকফাস্টের পর কফির পেয়ালা শূন্য করে অত্যন্ত পুলকিত হওয়া গেল একথা জেনে যে, এখানে পাইপ খাওয়া চলতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো উড়ানেই পাইপ খেতে দেওয়া হয় না। কেন দেওয়া হয় না জানি না। এখানে কেন দেওয়া হয় তাও জানি না। কিন্তু ভাগ্যিস হয়!

এই পাইপ-খাওয়া ব্যাপারটা স্বদেশে এখনও চালিয়াতি ও দম্ভ ও উচ্চম্মন্যতার শরিক বলে গণ্য হয়। পাইপ এখনও সমাজতন্ত্রে সামিল হয়নি। কেন যে হয়নি একথা ভেবে অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়ে বার বার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, এ জন্যে বাংলা ছায়াছবি দায়ী মুখ্যত। দ্বিতীয়ত দায়ী পাইপ খাওয়ার সর্বপ্রথম গুণাবলী সম্বন্ধে সাধারণের অপার অজ্ঞতা। ছায়াছবির কথা এই কারণে মনে পড়ে, কারণ সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার আমল থেকে জমিদারের কুঁড়ে, দুশ্চরিত্র, বাপের পয়সায় বসে বসে-খাওয়া হাঁদা ছেলেরাই, যাদের একমাত্র কাজ ছিল বিলিয়ার্ড খেলা, হুইস্কি খাওয়া এবং স্নানরতা গ্রামের মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করা; তারাই শুধু পাইপ খেয়ে এসেছে। এবং তাদের প্রত্যেককে পাইপ খেতে দেখে পাইপ-খেকোদের সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গবাসীদের মনে যে, তাদের মানুষ-খেকোদের চেয়েও বেশী ঘৃণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলি যে, পাইপ খাওয়া ব্যাপারটা যে, যে-কোনো ব্রান্ডের সিগারেট খাওয়ার চেয়েও অনেক সস্তা ও স্বাস্থ্যকর একথা অনেকেই জানেন না। তাছাড়া যাঁরা বিবাহিত লোক, তাঁদের পক্ষে পাইপ শান্তিরক্ষার জন্যে প্রায় অপরিহার্য বলেই মনে হয়। স্ত্রীর সঙ্গে মত-বিরোধটা দাঙ্গার পর্যায়ে যাতে না পৌঁছায় সে জন্যে মত-বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই পাইপ-খেকোরা পাইপ-খোঁচাখুঁচি ভরাভরি নিয়ে পড়তে পারেন। তাতে মানও বাঁচে, কুলও থাকে।

পরিশেষে এও বলি যে, পাইপ-খেকোদের মস্ত সুবিধে যে পাইপ কাউকে অফার করতে হয় না, অতএব ট্যাঁকের পয়সা ও অন্যের স্বাস্থ্যরক্ষাও হয় তাতে, নিজের হিতের সঙ্গে সঙ্গে।

গান্ডেপিন্ডে খাওয়ার পর জমিয়ে পাইপ ধরিয়ে বসেছি, এমন সময় ইয়ারফোন নিয়ে এল এয়ার-হোস্টেসরা। ভাড়া দু ডলার। ইয়ারফোনে কান লাগিয়ে ফোর-চ্যানেলড্ মিউজিক শোনা যাবে এবং সিনেমা যখন দেখানো হবে, তখন ইংরিজী, ফরাসী, জার্মান ও স্প্যানীশ ভাষায় সিনেমার কথা অনুদিত হয়ে কানে আসবে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু দু ডলার তো অনেক টাকা। তাছাড়া পকেটে মাত্র আটটি ডলার আছে। ডলার কটি সেণ্ট-মাখানো কাগজে মুড়িয়ে অতি যত্নে পার্সের ভিতরের ঘরে রেখেছি। কোনো সুন্দরীর চিঠিকেও এর আগে এত যত্নে রাখিনি আমি। কিন্তু নিরুপায়। এই দুর্মূল্য আট ডলারের একটি ডলারও খরচ করার সাহস এখন আমার নেই। এই যথাসর্বস্ব খরচ করে ফেললে যে মাসতুতো ভাই আমার লানডানে থাকে এবং যে আমাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছে, সে যদি দৈবাৎ হিথ্রো এয়ারপোর্টে না আসে তাহলে ট্যাক্সি করে যে তার বাড়ি পৌঁছবো সে সংস্থানও রইবে না।

পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে, সে না এলে ঐ টাকায় তার বাড়ি থেকে মাইল দশেক আগে গিয়ে ফুটপাথে স্যুটকেস হাতে নেমে পড়তে হত। তারপর কি করতে হত এখনকার মত সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করাই ভালো।

যাই হোক, ঠিক করলাম, আপাতত চলচ্চিত্রের বোবা-যুগেই বাস করা যাক। বিনিপয়সায় যতটুকু দেখা যায় তাই-ই দেখব; পয়সা ছাড়া শোনা যখন যাবেই না। অনেকে বিনিপয়সায় পেলে দাদের মলমও খান—তাঁদের কথা স্মরণ করে বোবা-যুগের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো না বলেই মনস্থ করলাম।

ব্রেকফাস্টের পরই, ট্রলিতে করে চলমান ডিউটি-ফ্রি শপ নিয়ে এয়ার-হোস্টেসরা পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। পাইপের টোব্যাকো, সিগারেট, হুইস্কি, পারফ্যুম ইত্যাদি ইত্যাদি। চোখ খুলে একবার দেখে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

দোকান বন্ধ হওয়ার পরই আরম্ভ হল ছবি দেখানো। পশ্চিম জার্মানীর একটি ছবি। কিশোর প্রেমের। তবে আমরা কিশোর প্রেম বলতে যা বুঝি এ তেমন নয়। আমাদের কিশোর প্রেম মানে বাছুরপ্রেম। কিশোরীর ফ্রকের কোণা উড়ে গেল হাওয়ায়—এক ঝলক ফর্সা হাঁটু চোখে পড়ল—কিশোরের বুকের মধ্যে দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস চলে গেল ধ্বকধ্বকিয়ে। বাড়ি গিয়ে ধপাস করে বালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়ল সে, নইলে নেহাত কবিপ্রকৃতির ছেলে হলে, খাতা-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসে গেল।

কিন্তু এ-ছবি সেরকম নয়।

একটি উর্দু শায়ের শুনেছিলাম, নাজিম মিঞার কাছে, কৈশোরের বর্ণনায়।

'আভি লড়কপন্ ভি হ্যায়,
শাবাব ভি হ্যায়,
হায়া কি পরদেমে ও সৌখ্‌বে
নকাব্ ভি হ্যায়।'

অর্থাৎ এখন মেয়েটির ছেলেমানুষী চপলতাও আছে, আবার যুবতীসুলভ লজ্জাও ছেয়ে এসেছে। শৈশব ও যৌবন যেন দুটি ঘর। দু ঘরের মধ্যে একটি পর্দা টাঙানো। হাওয়া এসে পর্দায় দোল দিচ্ছে। একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর। তারই নাম কৈশোর।

কিন্তু জার্মান ছবির কিশোর নায়কের বয়স তেরো কি চোদ্দ এবং কিশোরীরও তাই-ই। নিভৃতে তারা দুজনে দুজনকে চোখের নিমেষে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলে তারপর

www.BanglaBook.org

বাৎসায়নের বইতে যা যা করণীয় বলে লেখা আছে, তার সবকিছুই এমন পটুতার সঙ্গে করে ফেলল যে এ-ব্যাপারে এই বালখিল্যদের পাণ্ডিত্য রীতিমত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। বোঝাই গেল যে, সিনেমার কিশোর নায়কের দুগুণ বয়স হওয়া সত্ত্বেও এ-অধমের এ-বাবদে জ্ঞানগম্যি বড়ই কম। তড়িৎ-ঘড়িৎ পাইপ ভরলাম আবার। ছবি দেখে রীতিমত আপসেট।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই দাগ কাটল না এখানের অন্য কারো মনেই। প্লেনে কম করে পনের-কুড়িজন শিশু ছিল। শিশু বলতে যাদের বয়স দশ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। তারাও অম্লান বদনে কেউ মায়ের কোলে বসে আঙুল চুষতে চুষতে, কেউ লাল প্ল্যাস্টিকের বল কোলে নিয়ে অত্যন্ত তন্ময় হয়ে এ-ছবি দেখে গেল। যেন বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছে।

ছবি শেষ হতে না হতেই প্রি-লাঞ্চ ড্রিঙ্কস সার্ভ করার আয়োজন শুরু হল। বিনিপয়সায় নানারকম ফ্রুট-জুস, কোকো-কোলা, অ্যাপলসাইডার ইত্যাদি পাওয়া যায়। পয়সা দিলে নানারকম কন্টিনেন্টাল রেড ও হোয়াইট ওয়াইন, নানারকম বীয়ার ও এল্ জার্মানীর লাগার বায়ার—অরঞ্জাবুম। এবং অন্যান্য যেকোন পানীয়।

বিনিপয়সায় বলেই হয়তো টোম্যাটো-জুস ভালো লাগল।

ইতিমধ্যে এয়ার-হোস্টেসদের এবং আমাদের সেকশনে যে ফ্লাইট-পার্সার ছেলেটি ছিল তাদের কর্মক্ষমতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছিলাম। কী তড়িৎ গতিতে, হাসিমুখে ও কী সুষ্ঠুভাবে যে তারা তাদের কাজ করছিল, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় তিনশজন লোকের দেখা-শোনা, মাত্র চারজন মেয়ে ও দুজন ফ্লাইট-পার্সার যে আন্তরিকতার সঙ্গে ও যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করছিল, তাতে পুরো জার্মান জাতটার উপরে শ্রদ্ধা না জন্মিয়ে উপায় ছিল না। তাদের পটভূমিতে আমাদের ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের (এয়ার-ইন্ডিয়ার নয়), এয়ার-হোস্টেসদের কথা মনে আসছিল। এ নয় যে, তাঁরা কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁরা যেন কলের পুতুল অথবা বহুদিন ধরে কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভোগা রোগিণী। তাঁরা হাসেন অতীব কষ্ট করে। ঘাড় বেঁকিয়ে অন্যদিকে ফিরে হাতজোড় করে যেমন তাঁরা 'নমস্তে' বলেন তা দেখে, প্যাসেঞ্জারদেরই হাসি আসে। অথচ তাঁরা নিজেরা হাসতে জানেন না। এত টাকা মাইনে দিয়ে, এমন সুন্দর সাজপোশাক পরিয়ে এমন রাম-গড়ুরের ছানাদের কেন ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইনসে রাখা হয় তা সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। হয়তো অসাধারণ বুদ্ধিরও বাইরে।

মনে হয় এর একমাত্র প্রতিকার প্রতিযোগিতায়। একচেটিয়া উদ্যোগের কুফল সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সরকার সচেতন হতেন—যদিও আনন্দের কথা হত। কিন্তু মাঝে মাঝে সরকারের উচিত নিজের আঙিনায় চেয়ে দেখা। একচেটিয়া উদ্যোগের কুফলগুলি সরকারী উদ্যোগসমূহে প্রায়শই বড়ই নগ্ন ও প্রতিকারহীনভাবে প্রকট। যে-কেউই দেশকে ভালোবাসে, তার চোখে এটা খারাপ ঠেকে।

কিছুক্ষণ পর মাইক্রোফোনে ক্যাপ্টেন বললেন যে, আমরা এখুনি ইরান ও

www.BanglaBook.org

টার্কি পেরিয়ে এলাম।

ভাবতে ভালই লাগছিল যে, সত্যি সত্যিই এ ক'ঘণ্টায় এতদূরে চলে এসেছি। ক্যাপ্টেন আরও বললেন যে, কয়েক ঘণ্টা পরে ইউরোপের ভূখণ্ড দেখা যাবে—আলপ্স-এর বরফাবৃত চুড়োও দেখা যাবে।

এই আজ সকালেই বোম্বেতে ছিলাম। ব্রেকফাস্ট খেলাম, বোবা ছবি দেখলাম, লাঞ্চ খেতে না-খেতে কোথায় এসে পড়লাম। পৃথিবীটা সত্যিই বড় ছোট হয়ে গেছে। হাতের মুঠোয়। এই বিজ্ঞানের দিনে। এতে সুখী হওয়া উচিত কি দুঃখী হওয়া উচিত তা চট্ করে বলা মুশকিল।

প্লেনে উঠেই ঠিক করেছিলাম যে, যতবারই খেতে দিক না কেন, আমার নিজের ঘড়ি দেখে সেই সময়মতই খাবো। আমার ঘড়িতে খাবার সময় না হলে খাবোই না। তাই ডিনার দিলেও, ডিনার এলেও খেলাম না।

দেখতে দেখতে বারো-তেরো ঘণ্টা সময় কেটে গেল। প্লেন ক্রমশ নীচে নামতে লাগল। এয়ার-হোস্টেস আর ফ্লাইট-পার্সাররা নানা রঙা ছোট ছোট তোয়ালে বীজাণুমুক্ত করে সিদ্ধ করে গরম অবস্থায় প্রত্যেককে স্টেইনলেস স্টিলের সাঁড়াশী করে তুলে দিয়ে গেল। ঐ দিয়ে মুখ হাত, গলা-ঘাড়, সব মুছে নেওয়ায়, মনে হল, ক্লান্তি দূর হল। সত্যি সত্যিই হল কিনা জানি না। এই ন্যাপকিন দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্লান্তি দূর করানো—তাই-ই মনে হল যে ক্লান্তি দূর হল।

দেখতে দেখেতে প্লেন ফ্রাঙ্কফার্ট এয়ারপোর্টের উপরে উড়ে এল। দূরে দেখা গেল সারি সারি গাছের মধ্যে মধ্যে অটোবান দিয়ে সাঁই-সাঁই করে বিচিত্রবর্ণ সব গাড়ি ছুটে চলেছে।

ফ্রাঙ্কফার্টে ল্যাণ্ড করে প্লেন এসে লুফত্‌হান্‌সা এয়ারওয়েজের টার্মিনালের সামনে দাঁড়াল।

আমারই মত যাঁরা কখনও দেশের বাইরে যাননি, তাঁদের প্রথমে খুবই অবাক লাগে দেখে যে, বেশীরভাগ বিদেশী এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় না। প্লেন থামলে, ট্র্যাকটার বা ছোট অথচ শক্তিশালী কোনো গাড়ি প্লেনকে টেনে নিয়ে এমনভাবে দাঁড় করায় যে, প্লেনের দরজার সঙ্গে একটি সেন্ট্রালি হিটেড অথবা দেশভেদে এয়ার-কন্‌ডিশান্‌ড্ প্যাসেজওয়ের মুখে এসে একেবারে সেঁটে যায়।

প্লেন থেকে বেরিয়ে তাই একটুও ঠাণ্ডা লাগল না। সেই প্যাসেজওয়ে দিয়ে হেঁটে এসে টার্মিনালের ভিতরে পৌঁছলাম।

তখন ফ্রাঙ্কফার্টে দুপুর বারোটা। যদিও আমার ঘড়িতে প্রায় বিকেল চারটে বাজে।

লুফত্‌হান্‌সার টার্মিনাল থেকে একই সঙ্গে প্রায় তিরিশ-চল্লিশটা প্লেন ছাড়ার বন্দোবস্ত আছে। টার্মিনালের মধ্যেই এসকালেটর রয়েছে অনেক। উঠছে, নামছে। বিভিন্ন পথ। প্রত্যেকটি পথই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। এত পথ যে, মনে হয় পথ হারিয়ে যাবো। তাছাড়া এই প্রথম বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার অপরিচিতিজনিত

www.BanglaBook.org

ভয়মিশ্রিত অস্বস্তিও যে ছিলো না, তা নয়।

কাউন্টারে শুধোতেই জার্মান মেয়েটি ভালো ইংরিজীতে বলল, তুমি এ-১৫ নম্বর গেটে চলে যাও, সেখান থেকে তোমার লানডানের প্লেন ছাড়বে।

এ-১৫ খুঁজে বের করতে তো প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা—যেহেতু লানডানের প্লেনটা আর কুড়ি মিনিট পরেই ছেড়ে যাবে, তাই উৎকণ্ঠারও হেতু ছিল।

সবচেয়ে বড় হেতু পকেটের বিশল্যকরণী—আট ডলার।

জীবনে প্রথম এস্কালেটরে পা দিয়েই মনে হল এই পা পিছলে আলুর দম হলাম বুঝি। কেবলই মনে হচ্ছিল যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বুঝি এই বাঙালের দিকেই ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে। আমি যে নিতান্তই একজন আকাট তা বুঝি আমার গায়ের গন্ধেই টের পাচ্ছে সকলে। যাই-ই হোক, অনেকবার এস্কালেটরে উঠে নেমে, অনেক পথ স্যুটকেস হাতে হেঁটে-দৌড়ে শেষ পর্যন্ত এ-১৫ গেট খুঁজে পেলাম।

চেক-ইন করে গিয়ে প্লেনে উঠলাম—বোয়িং। কলকাতা-দিল্লী-মাড্রাস-বোম্বেতে যে প্লেন চলাচল করে। ডি. সি-টেন এর পরে এই প্লেনকে এত ছোট বলে মনে হচ্ছিল যে, সে বলার নয়।

প্লেনে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে লাঞ্চ দিল খেতে। আমার ঘড়িতে তখনও ডিনারের সময় হয়নি, তবুও প্রায় আটঘণ্টা আগে আগের প্লেনে লাঞ্চ খাওয়াতে এই প্লেনের লাঞ্চকে ডিনার মনে করে খেয়েই ফেললাম।

পশ্চিম জার্মানীর সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশের উপর দিয়ে প্লেনটা উড়তে লাগল। নীচে সবুজ ক্ষেত, কারখানা, বাড়ি-ঘর। অন্য রঙের, অন্য ধাঁচের। আমাদের দেশে প্লেনের জানলায় চোখে নীচের দৃশ্য একরকম লাগে আর এখানে অন্যরকম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনটা ইংলিশ চ্যানেলের উপরে উড়ে এল বিভিন্ন ইউরোপীয়ান দেশের উপর দিয়ে। নীচে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলের মধ্যে অগণ্য জাহাজ দেখা যাচ্ছিল।

নীচে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এই চ্যানেল পেরিয়েই জার্মানী আক্রমণ করেছিল অ্যালায়েড ফোর্সেস একদিন। তারও আগে ড্রেক, হকিন্স, আরো কতজনের দৌরাত্ম্যের স্থান ছিল এই জলভূমি। কতবার এখানে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্য নির্ণয় হয়েছে। ছবি দেখেছি 'দা লংগেস্ট ডে,' 'দা ব্যাটেল অব বৃটেন,' উইনস্টন চার্চিলের মেমোয়ার্স-এর 'দা ফাইনেস্ট আওয়ার!' সব একই সঙ্গে মাথার মধ্যে ঝিলিক মারছিল।

'Never in the history of mankind, so many had owed, so much, to so few—' রয়্যাল এয়ারফোর্সের পাইলটদের উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে চার্চিল তাঁর দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একথা বলেছিলেন।

ছোটবেলা থেকে বহু বই পড়েছি, বহু ছবি দেখেছি এ পর্যন্ত এই ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে, কিন্তু সশরীরে সেই ঐতিহাসিক নীল জলরাশির উপর দিয়ে চলেছি মনে করেই রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

ইংরেজরা যে নিয়মবদ্ধ ও নিয়মানুবর্তী জাত তা আকাশ থেকে দেখলেও বোঝা যায়। যেই ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে প্লেনটা ইংল্যাণ্ডের উপর এল, অমনি সমস্ত বাড়ি-ঘর কলকারখানা সবকিছুরই মধ্যে একটা দারুণ শৃঙ্খলা চোখে পড়ল। কোনো কিছুই অগোছালো দেখাচ্ছিল না উপর থেকেও।

হঠাৎ ঘোর ভাঙতেই দেখি, প্লেনটা নীচে নামছে।

মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যেই লানডানের হিথ্রো এয়ারপোর্টের উপর এক চক্কর লাগিয়েই বোয়িং প্লেনটা নেমে এল টারম্যাকে।

সত্যি-সত্যেই লানডানে এসে পৌঁছলাম। ঐতিহাসিক লানডান। কুইন মেরীর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের—উইনস্টন চার্চিলের—হিপিদের—হরেকৃষ্ণ-হরে-রামের লানডান।

একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছিল। হিথ্রো এয়ারপোর্টের টারম্যাকের পাশে রানওয়ের মাঝে-মাঝে সেপ্টেম্বর মাসের সবুজ সতেজ ঘাস গজিয়ে আছে। একঝাঁক নরম সী-গাল সেই সবুজ তৃণভূমি ও কালো টারম্যাকের সীমানায় বসে আছে। কেউ ডানা নাড়ছে, কেউ একদৃষ্টে দেখছে সামনে, কেউ ঠোঁট দিয়ে চিকণ ও মসৃণ, সাদা ভিজে ডানা পরিষ্কার করছে।

প্লেনটা গড়িয়ে গিয়ে ঠিক পাখিগুলোর পাশেই এসে থামল।

আজকের লানডানেও যতটুকু শৃঙ্খলা বর্তমান, তা অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। টার্মিনাল বিল্ডিং-এ ঢুকে পড়তেই দেখলাম, তাবৎ পৃথিবীর যাবৎ কোণ থেকে আসা শয়ে শয়ে সাদা-কালো-হলুদ-বাদামী-লাল মানুষে ভিতরটা গিজগিজ করছে। কত প্লেন যে উড়ছে নামছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রতি মিনিটেই নাকি ওঠা-নামা এখানে।

লম্বা লাইন পড়েছে। ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি নেই। আমাদের দেশে, লাইনে না-দাঁড়ানোকেই আমরা এখনও বাহাদুরী বলে মনে করি। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই মামা-কাকা, চেনা-শোনা খোঁজ করে যাতে সকলের সঙ্গে একীভূত না হতে হয় এই চেষ্টাতেই আমরা সচেষ্ট থাকি। আগেই বলেছি, আকাশ থেকেই হোক, কি মাটিতে নেমেই হোক প্রথমেই বৃটিশ যুক্তরাজ্যের যে-দিকটা চোখে পড়ে, তা হল নিয়মানুবর্তিতার দিক।

হলুদ অক্ষরে লেখা জ্বলছে—ব্রিটিশ পাসপোর্টস, কমনওয়েলথ পাসপোর্টস, আদার পাসপোর্টস। তিনটি ভিন্ন লাইনে।

কমনওয়েলথ পাসপোর্টসের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাকি সামিল হলাম বলব? সামিল হওয়া বলাটাই বোধহয় সপ্রতিভতার লক্ষণ।

কাস্টম্‌স অফিসারদের সুন্দর করে ব্রাশ করা নেভী-ব্লু ও কালো ব্লেজার। পিতলের বোতামে বোধহয় রোজই ব্রাসো লাগিয়ে পালিশ করেন এঁরা। একেবারে ঝকঝক করছে। কালো চামড়ার জুতো—তাতেও মুখ দেখা যায় এমন পালিশ।

এত লোক একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, এত অফিসার ডেস্কে ডেস্কে কাজ করছে কিন্তু কোনো চেঁচামেচি নেই। সকলেই ফিসফিস করে কথা বলছে। একমাত্র পশ্চিমী লোকেরাই ফিসফিস করে, মুখের অভিব্যক্তি একটুও না বদলে অন্যকে চরম গালাগালি বা অপমান

www.BanglaBook.org

করতে পারে। ওদের এই অভিব্যাক্তিহীনতা দেখে, মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের মধ্যে আন্তরিকতা কম। কেউ মরে গেলেও ওদের মুখে যেরকম অভিব্যক্তি, কেউ জন্মালেও সেরকম। আমরা পুবের লোকেরা গলার গ্রামের সঙ্গে আন্তরিকতার মাত্রা বুঝি বেঁধে রেখেছি। আন্তরিকতা যতই খাঁটি, গলার স্বর ততই উদারা মুদারা তারার প্রতি দ্রুতধাবমানা।

এ-ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না—তবে কোনো আমেরিকানের মগজে এই ভাবনাটা কোনোক্রমে ঢুকিয়ে দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে য়ুনিভার্সিটি বা ফোর্ড কাউণ্ডেশান থেকে গ্রান্ট নিয়ে তিনি একটি পোর্টেবল টাইপ-রাইটার, প্রচুর কাগজ ও বল-পয়েন্ট পেন সঙ্গী করে প্লেনে এবং বড় বড় হোটেলে হোটেলে ঘুরে ঘুরে প্রাচ্য দেশের সব জায়গা ঘুরে হয়তো গ্রাফ-সহযোগে আন্তরিকতা ও স্বরগ্রামের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত পেপার সাবমিট করে ডক্টরেট হবেন।

একজন ইয়া-ইয়া পাকোনো গোঁফওয়ালা ডাকসাইটে কাস্টম্‌স্ অফিসার কমনওয়েলথ পাসপোর্ট-এর লাইনের মাথায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে এক-একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের ডেস্কে পাঠাচ্ছিলেন—যেমন যেমন ডেস্ক খালি হচ্ছিল। ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই আমার মনে হল ইনি নিশ্চয়ই হাইল্যাণ্ডার্স দলে ফুটবল খেলতেন। বাবা যখন মোহনবাগানের গোলকীপার ছিলেন, আমার জন্মের আগে, তখন এরাই বোধহয় বুট-সমেত পদাঘাত করে বাবার হাঁটুর মালাইচাকি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন, যারপর তাঁর খেলাই ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ভদ্রলোকের জবরদস্ত চেহারা, লালমুখ ও পুরুষ্ট গোঁফের দিকে আমি কটমটিয়ে তাকিয়েছিলাম, এমন সময় উনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মিনমিনে গলায় আমাকে আঙুল দিয়ে একটি ফাঁকা কাউন্টারের দিকে যেতে নির্দেশ দিলেন।

বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে কাউন্টারে উপস্থিত হতেই দেখি, একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ইয়ংম্যান মেয়েদের মত লম্বা বাবরি চুল ও থুতনী সমান জুলপী নিয়ে টুলে বসে আছেন। মুখে ভাবান্তর নেই। হাতে বায়রো—বল-পয়েন্ট পেন।

আমার কাগজপত্র দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে হুমম্ হুমম্ করছিলেন। কোথায় থাকব? কতদিন থাকব? কেন মরতে এখানে এলাম? এখান থেকে কোন চুলোয় যাব ইত্যাদি তাবৎ বিরক্তিকর প্রশ্ন একের পর এক গুলতির পাথরের মত আমার দিকে ছুঁড়ছিলেন।

আলী সাহেবের ভাষায় যাকে বলে 'গাঁক্ গাঁক্ করে ইংরিজী বলা', তেমনি ইংরাজীতে আমি ক্রমান্বয়ে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম।

ইন্টারভ্যুতে বসতে হবে এই ডিস্টার্বিং ভাবনার ভয়ে জীবনে যখন কারো চাকরীই করলাম না, তখন এদের দেশ দেখতে এসে এত কৈফিয়ত দিতে বিরক্তি লাগছিল। স্পনসরশিপ্ সার্টিফিকেট দেখালাম, বললাম, ভায়ার আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে, মানে বহুদিন হল সে রয়েছে এ-পোড়া দেশে। সেই-ই নেমন্তন্ন করে আমাকে এনেছে। তাবৎ খরচ-খরচা সব তার।

এত কিছু সত্ত্বেও বুকের মধ্যে একটু যে দুর-দুর করছিল না, এমন নয়, কারণ কিছু-

www.BanglaBook.org

দিন আগেই আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ল্যানডানে বেড়াতে আসবার জন্যে দমদম থেকে এয়ার-ইন্ডিয়ার উড়ানে এসেছিলেন। দমদমে তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সকলে বিস্তর ফুলটুল এবং একগাদা টলটলে চোখের জল ফেলে বিদায় দিয়েছিলেন।

চোখের জল আকছার ফেলেন বলেই বোধহয় বাঙালী মেয়েদের চোখ এমন উজ্জ্বল।

যাই-ই হোক, সে ভদ্রলোক লানডানে নেমেই আবার পত্রপাঠ পরের প্লেনে কলকাতা ফিরেছিলেন কারণ তাঁকে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেণ্ট লানডানের মাটিতে পা দিতে দেয়নি।

বিপদটা সে জন্যে হয়নি।

বিপদটা হয়েছিল, ফিরে গিয়ে কি বলবেন সেই কারণে।

অতএব তিনি কাউকে কিছু না বলে দমদমে নেমেই সটান ট্যাক্সি নিয়ে মধ্যমগ্রামে তাঁর এক বন্ধুর বাগানবাড়িতে পনেরো দিন প্রচুর মশার কামড় ও বাগানের আম খেয়ে কাটিয়ে একদিন ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর শালী তাঁকে দেখা মাত্রই বলেছিল, জামাইবাবুকে একেবারে সাহেবের মত দেখাচ্ছে।

দেখাবেই।

কারণ বাগানের রোদে হাওয়ায় তাঁর ফ্যাকাশে কৃষ্ণবর্ণ এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বেগুনের গাঢ় বেগুনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আমিও কোনো ঝুঁকি নিইনি। আমার ফেরার টিকিট বোম্বাই-এর ছিল। জারীনকে বলে এসেছিলাম যে, আমি কোনো কারণে হঠাৎ ফিরে এলে বন্ধুর ফ্ল্যাটে বেশ ক'দিন থাকতে পারি বন্ধু থাকুক আর নাই থাকুক একথা যেন সে বন্ধুকে বলে রাখে।

যাই-ই হোক, অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর, উইশ উ্য আ নাইস টাইম ইন লানডান বলে ছেলেটি ভাবলেশহীন মুখে এক চিলতে ক্যাস্টর-অয়েল গেলা হাসি ফুটিয়ে আমাকে ছুটি দিলেন।।

এবার কাস্টম্‌স। তার আগে মাল নেওয়া। সমস্ত ইনকামিং ফ্লাইটের মাল একই সঙ্গে লুকোনো কনভেয়র বেলটে করে এসে একটা সদা-ঘূরন্ত চাকতির মধ্যে পড়ছে। যখন যে ফ্লাইটের মাল আসছে তখন সে ফ্লাইটের নম্বর ভেসে উঠছে টেলিভিশানে।

ইতিমধ্যে ইতি-উতি তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম যে, প্রত্যেকেই একটা করে ট্রলি টেনে নিয়ে আসছেন কোণা থেকে। দু-একজনকে দেখলাম ঐ ট্রলিতে মাল বোঝাই করে মাল নিয়ে কাস্টম্‌স ব্যারিয়ারের দিকে এগোলেন।। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আমিও একটা ট্রলি নিয়ে এলাম এবং এমনভাবে পাইপমুখে স্যুটকেস ভরা ট্রলি ঠেলতে কাস্টম্‌স ব্যারিয়ারে এলাম যে আমার নিজেরই মনে হতে লাগল যে বাল্যাবস্থা থেকেই আমি হিথ্রো এয়ারপোর্টে যাওয়া আসা করে থাকি।

কাস্টম্‌সের লোকেরা কিছুই দেখলেন না। ফ্রাঙ্কফার্ট থেকে ওড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ফর্ম দিয়েছিল ভর্তি করার জন্যে সেটা ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে জমা করতে হয়েছিল। কাস্টম্‌স-এ শুধু জিজ্ঞেস করল, কোনো পারফ্যুম বা হুইস্কি-টুইস্কি আছে?

নেই, শুনেই ছেড়ে দিল।

একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে এ বড় কম আশ্চর্যের কথা নয়। সরকারী কর্মচারীরা, সে কাস্টম্‌সেরই হোক, পুলিসেরই হোক বা ইনকামট্যাক্সেরই হোক,—সকলেই প্রত্যেক নাগরিককে ভদ্রলোক বলে মানে, তাদের সহজাত সততায় বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে ভদ্র ও ন্যায্য ব্যবহার করে, কথায় কথায় হাতে মাথা কাটে না একথা হঠাৎ দেশ ছেড়ে বাইরে এলে বিশ্বাস করতে আনন্দ হয়।

কাস্টম্‌সের ব্যারিয়ার পেরিয়ে বাইরে এসে দেখি লোকে লোকে লোকারণ্য। এ-ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করছে, কেউ বা কাউকে চুমু খাচ্ছে, অনেকদিন পরে দেখা-হওয়া বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের হাতে হাত রেখে, গায়ে গায়ে লেপ্টে শীতার্ত পৃথিবীতে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া উষ্ণতায় ভরে দিচ্ছে একে অন্যকে।

কিন্তু ভায়া কোথায়?

চতুর্দিকে চেয়েও আমার ভায়ার দর্শন মিলল না। তখন আমার প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। শেষে কি তীরে এসে তরী ডুববে? চিঠি লিখেছি—ট্রাঙ্ক-কল করেছি, তবুও ভায়া এলো না কেন? দিশী ভাইকে কি কাটাতে চায়?

আসবার আগে তিন মাস ধরে প্রচণ্ড পাঁয়তারা করতে হয়েছিল। অফিসের কাজকর্ম গোছানো, পুজো সংখ্যার লেখা শেষ করা। এমন কি দেশ-এর বিনোদন সংখ্যার জন্যে একটি উপন্যাসের কপি আসার আগের রাতে শেষ করে দমদম এয়ারপোর্টে হস্তান্তরিত করেছি। গত এক মাসে চার ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পারিনি—এত কাজ ছিল।

তারপরও কি এই হেনস্থা?

লবীর এক কোনায় স্যুটকেস ও বোঁচকা-বুঁচকি রেখে, নতুন করে পাইপটাতে তামাক ভরে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি, এমন সময় টাক-পড়া, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িওয়ালা চশমা নাকে স্যুটপরা একজিকিউটিভ ব্ল্যাক রঙের এক ভদ্রলোক আমার দিকে করমর্দনের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

চেনা সম্ভব ছিল না আমার মাসতুতো ভাইকে। এমন কি কিস-তুতো বা শীষ-তুতো ভাই হলেও চেনার কথা ছিল না। তার চেহারার যে এত পরিবর্তন হয়েছে এ ক'বছরে তা না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

টবী বলল, সরী রুদ্রদা, গাড়ি পার্ক করতে দেরি হয়ে গেল।

আমি তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। ঠিক লোকের সঙ্গে করমর্দন করছি কিনা সে-বিষয়ে তখনও সন্দেহ হচ্ছিল।

হঠাৎ ও বলল, কি খারবার? আমাকে চিনছ না নাকি?

আমি হেসে ফেলে বললাম, সন্দ সন্দ লাগছিল।

কি কারবার কথাটা টবী 'খী খারবার'-এর মত করে বলে।

শুনে খুব মজা লাগছিল।

টবী আমার হাত থেকে ট্রলিটা কেড়ে নিয়ে আমাকে নিয়ে চলল পাশের পার্কিং লটে।

ব্যাপার দেখে বুঝলাম যে গাড়ি পার্ক করতে দেরি হওয়াটা কিছুই বিচিত্র নয়। একটা

www.BanglaBook.org

চারতলা বিরাট বাড়ি—সারি সারি শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পার্কিং ফী আছে। কলকাতায় কুড়ি পয়সা পার্কিং ফী দিতেই আমাদের অবস্থা কাহিল হয়, এখানে পার্কিং ফী সাংঘাতিক। তবে এদের রোজগারও আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। এরা পাউণ্ডকে টাকা বলে এবং টাকার সমান মূল্য মনে করেই খরচ করে অথচ পাউণ্ডের মূল্য আমাদের টাকার চেয়ে ষোলগুণ বেশী।

চারতলায় পৌঁছে ট্রলি থেকে স্যুটকেস ইত্যাদি গাড়ির বুটে তুলে নিয়ে ট্রলিটা ওখানেই ফেলে রাখল টবী।

আমি শুধোলাম, এটা পৌঁছে দিতে হবে না?

ও বলল, না। এয়ারপোর্টের লোক এসে মাঝে মাঝেই নিয়ে গিয়ে আবার ভিতরে জড়ো করে রাখবে।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়েই এমন জোরে গাড়ি ছুটোল টবী যে, সে বলার নয়। আমার রীতিমত ভয় করতে লাগল। ওর গাড়িটা কালচে-নীল রঙা একটা ফোর্ড কার্টিনা। আজকালকার সব বিদেশী গাড়িরই পিক্-আপ এত ভাল যে, গাড়িতে বসামাত্রই সাঁ করে স্পীড তোলা যায়—আবার যে কোনো সময়ে পঞ্চাশ-ষাট মাইল স্পীডেও ভ্যাকুয়াম ব্রেক থাকাতে এক মুহূর্তে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। গাড়িগুলো আমাদের দিশী গাড়ির চেয়ে অনেক বেশী ভারীও বটে।

আমি বললাম, কি করছিস। আস্তে চালা, ভয় করছে।

টবী হাসল, বলল, খী খারবার। আস্তেই তো চালাচ্ছি। মোটে ষাট মাইলে যাচ্ছি। বেশী আস্তে চললে আবার পুলিস ধরবে।

ওকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে না পেরে বললাম, আসবার আগেই আমার বুকে একটা ব্যথা হয়েছিল, প্লিজ আস্তে চালা।

ও আবার বলল, সে কি! জানতাম না তো! খী খারবার, এই বয়সেই এসব কি? বলেই, গাড়ি আস্তে করল, মানে পঞ্চাশ মাইলে নামাল স্পীডোমিটারের কাঁটা।

গাড়িতে হীটার চলছে, কাঁচ বন্ধ। এত হাজার মাইল, এত সমুদ্র, এত পাহাড়, এত নদী, জঙ্গল পেরিয়ে এলাম কিন্তু এ পর্যন্ত স্বাভাবিক হাওয়া ও আবহাওয়ার একটুও স্বাদ পেলাম না। বাঁদিকের কাঁচটা নামাতেই হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল। হাওয়ায় কোনো আর্দ্রতা নেই, শুকনো মচমচে ঠাণ্ডা। বড় ভালো লাগল।

টবী বলল, এতখানি উড়ে এসেছ, তাই শরীর গরম হয়ে গেছে। তা বলে কাঁচটা খুলে রেখো না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে রুদ্রদা।

কাঁচটা তুলে দিতে দিতে বললাম, মহা ঝামেলায় পড়লাম দেখছি, উড়ে এসে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা এসে টবীর ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। স্মিতা এসে দরজা খুলল। ছোট্ট সাজানো-গুজোনো ফ্ল্যাট। ওদের বাড়তি ঘর নেই, তাই আমি খাওয়ার ঘরে শোব। খাওয়ার টেবিলের পাশে একটু নীচু ডিভান তার উপর সুন্দর প্যাস্টেল-রঙা কম্বল পাতা।

যদিও ওদের ঘড়িতে তখন বাজে পাঁচটা—আমার ঘড়িতে গভীর রাত।

www.BanglaBook.org

একটু পরেই সন্ধ্যে নেমে এল। সন্ধ্যে নামতেই পর্দা সরিয়ে দেখলাম, দিকে দিকে হলুদ হয়ে গেছে আকাশ যেন। সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্পগুলোর আলো ভারী নরম, স্বপ্নময়। কুয়াশার পক্ষে ভালো বলে এরা রাস্তার সব আলোই বদলে ফেলে সোডিয়াম-ভেপার ল্যাম্প লাগিয়েছে। তাই রাতের লানডানকে ফিস-ফিসে-কথা-বলা একটা মিষ্টি হলুদ বসন্ত পাখি বলে মনে হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

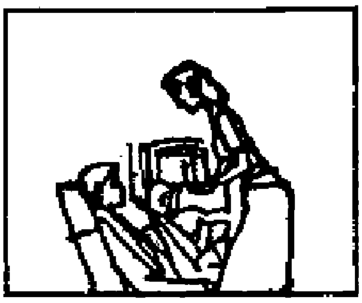

ভোরবেলা ধূমায়িত কফির পেয়ালা নিয়ে স্মিতা ঘরে এল। বলল, আর ঘুমোয় না, এবার উঠে পড় রুদ্রদা।

উঠতেই এক বিপত্তি।

ডিভানের পাশেই খাওয়ার টেবিলের উপরে নীচু করে ঝোলানো বাতির শেডটা একেবারে টং করে ব্রহ্মতালুতে লেগে গেল। বাল্যাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখস্থ করা সংস্কৃত ব্যাকরণের বয়ান বহুকাল পর মস্তিষ্কের কোষে কোষে নড়ে-চড়ে উঠল।

এর জন্যেই পণ্ডিতজন বলেন ম্লেচ্ছদের দেশে যেতে নেই।

কফির পেয়ালা হাতে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শাল জড়িয়ে খাবার ঘরে ঢুকতেই আর এক বিপত্তি।

দেখি টবী একটা চকরা-বকরা ড্রেসিং-গাউন পরে, কোলের উপর কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখা মাত্রই বলল, করেছ কি! এ তো রীতিমত কবি-কবি পোশাক। মায়ের চিঠিতে পড়ি তুমি নাকি ইদানীং প্রেমের গল্প-টল্প লিখছ? তা লেখো, কিন্তু এ পোশাক এখানে বেশীদিন চালাতে পারবে না।

তারপর বলল, যাই-ই হোক, আগে কাজের কথা বলি, তোমাকে কতগুলো প্রশ্ন করছি চটপট উত্তর দাও।

একে ঘুম রয়েছে চোখে তার উপর টনক তখনও টোকা খেয়ে টনটন করছে। থতমত খেয়ে শুধোলাম, কি প্রশ্ন?

টবী বলল, তোমার নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে দেখা করতে হবে?

কাদের সঙ্গে?

আরও অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

টবী বলল, তোমার মেজ পিসীমার সেজ ছেলের বড় শালা ; যে এখানে ডাক্তার। তোমার বড়দিদির সেজ ভাসুরের ছোট মেয়ে—যার এখানের এক এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তোমার প্রতিবেশীর ছোট বোনের বড় দেওর যে এখানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে এসে—পরীক্ষা না দিয়ে কোনো সুইশ ফার্মে অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাকরি করছে।

আমি বললাম, থাম থাম। ঠিক ঠিক না বললেও, প্রায় কাছাকাছি গেছিস। পার্সে একটা লিস্ট সত্যিই আছে। সবসুদ্ধ পনেরোজনের ঠিকানা ও ফোন নম্বর।

তারপর একটু চুপ করে থেকেই বললাম, কি করা যায় বল্ তো?

টবী উল্টে ধমক দিয়ে বলল, তোমার ইচ্ছেটা কি? ঝেড়ে কাশো?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, ইচ্ছেটা কারো সঙ্গেই দেখা না করা। আমি তো এখানে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসিনি—পায়ে হেঁটে, বাসে-টিউবে ঘুরে-ঘারে জায়গাটা কেমন, এদেশের লোকগুলো কেমন তাই একটু জানতে-শুনতে এসেছি। এদের সঙ্গে দেখা করতে হলে তো আমার অন্য কিছুই করা হবে না।

মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে টবী আমাকে বলল, বুঝেছি। আই লাইক য়্যু। আগেও করতাম। যাক তোমার বুদ্ধি যে ভোঁতা হয়নি এ ক'বছরে, তা জেনে ভালো লাগল। এবার কফি খেতে খেতে আরও কয়েটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেল তো তাড়াতাড়ি রুদ্রদা।

ততক্ষণে আমি রীতিমত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু টবী আমাকে মুখ খোলার সুযোগই দিল না।

বলল, বল ; বলে ফেল।

এক নম্বর প্রশ্ন—কলকাতায় কই মাছের কে-জি এখন কত করে?

দু নম্বর প্রশ্ন—দক্ষিণ কলকাতায় ভাল শাড়ির দোকান ও চুল-বাঁধার দোকান এখন কি কি?

তিনি নম্বর প্রশ্ন—নকশাল আন্দোলন এখনও চলছে কি?

চার নম্বর প্রশ্ন—ধনেপাতার চালান ঠিক আছে কি নেই? বড় পাবদা মাছ কি গড়িয়াহাট বাজারে উঠেছে?

পাঁচ নম্বর প্রশ্ন—এবার শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে কেমন ভিড় হয়েছিল?

ছ নম্বর প্রশ্ন—সত্যজিৎবাবুর নতুন ছবি কি?

সাত নম্বর প্রশ্ন—তোমার দিদিমার গলব্লাডারের ব্যথা কেমন আছে?

আট নম্বর প্রশ্ন—দেশে বর্তমানে মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনের, সপ্তাহে পাঁচদিন কাজের, সামান্য ট্যাক্স-কাটা চাকরি কি গড়াগড়ি যাচ্ছে?

ন নম্বর প্রশ্ন—কিশোরকুমারের নবতম বাংলা রেকর্ড কি? সত্যিই কি দেবব্রত বিশ্বাসের আর রেকর্ড হবে না?

এই অবধি বলে, টবী চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, দ্যাখ, একে বিদেশবিভুঁই জায়গা, এই প্রথম সকাল, তুই কি যে সব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করছিস, কিছু বুঝতে পারছি না।

টবী হাত নেড়ে বলল, সবই তোমার ভালর জন্যে। তুমি চটপট উত্তরগুলো দিয়ে দাও—আমি অফিস থেকে গোটা পঞ্চাশেক ফোটো-কপি করিয়ে আনব জেরোক্স মেশিনে। নাও, এখুনি তোমার পার্স থেকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের লিস্টটা দাও—তাদের সবাইকেই এক সন্ধ্যায় আমার এখানে একই সঙ্গে নেমন্তন্ন করে দেব—তুমি একই সঙ্গে মাত্র একটা সন্ধ্যা নষ্ট করে পাপ পুণ্য যা করার করে নেবে। তারা তোমাকে যা যা প্রশ্ন করবে তা আমার হুবহু জানা। যেই কেউ প্রশ্ন করবে—তুমি অমনি একটি করে ফোটো-কপি করা কাগজ ধরিয়ে দেবে তাদের হাতে। তোমার গলা-ব্যথাও হবে না, বিরক্তিও হবে না এবং সেই সঙ্গে তাদেরও উত্তর পাওয়া হবে। নাও, সময় নষ্ট না করে পটাপট

www.BanglaBook.org

উত্তরগুলো বলে ফেল।

আমাকে নিরুত্তর দেখে, টবী কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় স্মিতা ওকে বলল, তোমার স্যাণ্ডউইচ প্যাক করে দিয়েছি—এবার বেরিয়ে পড় জামা-কাপড় ছেড়ে, অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

টবী, উঠতে উঠতে বলল, কিছু মনে কোরো না রুদ্রদা, বাঙালী হয়েও বাঙালীদের এই অহেতুক বাঙালী-প্রীতি ও কলকাতা-সিক্‌নেস আমার আর সহ্য হয় না।

স্মিতা জোরে হেসে উঠল।

বলল, ব্যাসস্ আবার শুরু করলে?

টবী উত্তর না দিয়ে বসবার ঘর ছেড়ে শোবার ঘরে গেল।

স্মিতা বলল, জানেন রুদ্রদা, আমি তো একা থাকি—এই পাগলের সঙ্গে ঘর করি। আমার সঙ্গে একটু কিছু মতের অমিল হলেই দু হাতে মুঠি পাকিয়ে হাত মাথার উপর তুলে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে আমাকে বলবে, বাঙালীর কিছু হবে না ; এ জন্যেই বাঙালীর কিস্‌সু হল না।

তারপরই বলল, আপনার কি মত? এই যে বাঙালীরা যেখানেই যায়, যেখানেই থাকে, সেখানেই নিজেদের সমাজ তৈরি করে নিয়ে থাকে—লানডানে বসেও ধনেপাতা দিয়ে ডিপ ফ্রীজে রাখা দুবছরের পুরোনো কই মাছ রেঁধে খায়—কলকাতার জন্যে হায়-হায় করে, এটা কি ভালো না খারাপ?

আমাকে কিছু বলতে দেবার আগেই স্মিতা আবার বলল, অবশ্য একটা ব্যাপারে টবীর সঙ্গে আমি একমত যে, পাঁচজন বাঙালী এই দূরদেশে এসেও মিলে-মিশে থাকতে পারে না। পরনিন্দা, পরচর্চা, দলাদলি, ঈর্ষা, এইই-সব। এ-সব দেখে মনে হয় ও যা বলে তার অনেকখানিই হয়ত ঠিক। জানেন তো ওর এখানে কোনো বাঙালী বন্ধু নেই-ই বলতে গেলে। জার্মানীতেই বেশিদিন ছিল—তাই বেশীর ভাগ বন্ধুবান্ধব জার্মান—বাকিরা ইংলিশ। ভারতীয়দের মধ্যে কিছু মারাঠী ও পাঞ্জাবী বন্ধু আছে। কেন জানি না, বাঙালীদের উপর ওর এত রাগ—বাঙালী হয়েও।

আমি বললাম, জানি না। হয়ত ও বাঙালীদের অনেকের চেয়ে বেশী ভালোবাসে বলেই। হয়ত নিজ প্রদেশীয়দের দোষগুলো ওর চোখে বেশী করে লাগে—ও হয়ত মনে-প্রাণে চায় যে আমরা এ দোষগুলো কাটিয়ে উঠি— যেগুলোকে ও দোষ বলে মনে করে।

আমাদের আলোচনা আর বেশী দূর এগোবার আগেই টবী হাত তুলে বলল, চললাম রুদ্রদা। সাতটায় ফিরব। ফিরেই ডিনার খেয়ে তোমায় নিয়ে বেরোব।

বললাম, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে?

টবী হাসল, বলল, সে যাই-ই বল।

স্মিতা চাকরি করে। টবী চাকরি করে না। নিজের ডিজাইন এঞ্জিনীয়ার্সের ফার্ম আছে। আমার জন্যে স্মিতা দুদিন ছুটি নিয়েছে—আমাকে টিউব-বাস চিনিয়ে-চিনিয়ে চালাক করে দেবে—যাতে বড়বাজারী ষাঁড়ের মত আমি একাই লানডানের হাটে-বাজারে

www.BanglaBook.org

চরে খেতে পারি।

টবীর পক্ষে ছুটি নেওয়া সম্ভব হয়নি। ছুটি নেয়নি ভালোই করেছে। নিলে আমারই অপরাধী লাগত নিজেকে।

চান-টান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফ্ল্যাট বন্ধ করে, পাম্প বন্ধ করে স্মিতা আমাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল। এই ফ্ল্যাটে হীটিং সিস্টেম আলাদা আলাদা। প্রতি ফ্ল্যাটে একটি করে পাম্প আছে। গরম জল প্রতি ঘরের দেওয়ালের চারপাশে লাগানো পাইপের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়—তাতেই ঘর গরম হয়ে যায়। এই সিস্টেম এখন পুরানো ও তামাদি হয়ে গেছে।

বেশ লজ্জা লজ্জা লাগছিল। জলজ্যান্ত লম্বা চওড়া পুরুষমানুষ হয়ে শেষে কিনা একজন মহিলার হাত ধরে লালিপপ খেতে খেতে লানডানের পথে ঘুরে বেড়াব?

আপাতত নিরুপায়।

লানডানে তখন সামার সবে শেষ হয়েছে। তখনও লানডানারদের হিসেবে ঠাণ্ডা তেমন পড়েনি। কিন্তু আমার হিসেবে তখনই বিলক্ষণ ঠাণ্ডা।

আকাশে পরিষ্কার রোদ আছে ঃ রোদের সঙ্গে একটা হু-হু হাওয়াও আছে। স্মিতা আমাকে নিয়ে এসে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল—টিউব স্টেশানে যাবে বলে।

এ জায়গাটা লানডানের উপকণ্ঠে মিডলসেক্সে, ওরা ছেঁটে-কেটে বলে মিডেকস্।

বাস আসতে বেশ দেরি হচ্ছিল—দেরি নাকি হয় বিশেষ করে অফিস টাইমের পর। তবে বাস-স্টপেজে যে পঞ্চাশজন লোক হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়েছিলেন তখন এমন নয়। এমন কি অফিস-কাছারীর সময়েও কলকাতায় যেমন ভীড় তার পাঁচ শতাংশও হয় না। এই মুহূর্তে স্মিতা, আমি ; একটি ফুটফুটে বসরাই গোলাপের মত গোলাপী মেয়ে, একজন রিটায়ার্ড বৃদ্ধ—ব্যাস্‌স্ এই কজন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, চলো হাঁটা যাক। চমৎকার আবহাওয়া। তোমার নর্থওল্ট টিউব স্টেশান কতদূর?

স্মিতা বলল, তা মাইল খানেকের ওপর হবে।

আমি বললাম, তোমার কষ্ট হবে না তো?

ও বলল, না না। আমি হাঁটতে ভালোবাসি। চলুন।

ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোনারক বা ফতেপুর-সিক্রীর গাইডের মত স্মিতা আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে শহর চেনাতে চেনাতে এগোতে লাগল। এ রকম গেঁয়ো লোক পেলে সচরাচর শহরে মেয়েরা কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে তাদের ভেজাল পাণ্ডিত্য নির্ভেজাল-ভাবে জাহির করে।

কিন্তু স্মিতার বাকসংযম আছে।

একটা জায়গায় এসে রাস্তা পেরোতে হবে। সেখানে ট্রাফিক-লাইট ছিল না—কিন্তু পথে জেব্রা-ক্রসিং-এর দাগ ছিল। স্মিতা আর আমি ফুটপাথের প্রান্তে দাঁড়িয়েছি গিয়ে, এমন সময় আমাদের দেখে দু-পাশে প্রায় পর পর এক-একদিকে পাঁচ-ছটি করে দ্রুতধাবমানা গাড়ি মুহূর্তের মধ্যে ভ্যাকুয়াম্ ব্রেক দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা

www.BanglaBook.org

হাত তুলে ধন্যবাদ জানিয়ে রাস্তা পেরোতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার গাড়িগুলো চলতে শুরু করল।

দেখে ভারী অবাক লাগল। একজন মানুষের কত দাম এখানে—মানুষ হয়ে জন্মালে কত সম্মান। মনুষ্যজীবনের মুল্য এরা অনেক ধরেছে। আর আমার দেশে ফুটপাথে, হাইওয়েতে, মৃতদেহ পড়ে থাকে, যেখানে মানুষের মৃতদেহ খাবলে খাবলে কাক চিল, পথের কুকুরে কামড়াকামড়ি করে খায় এবং অন্য মানুষ তা দেখে নাকে রুমাল চেপে রুজির ধান্দায় চলে যায়—যেতেই হয়—কারণ না গেলে তার অবস্থাও তথৈবচ হয়। যে দেশে মানুষ গিনিপিগের মত জন্মায় এবং বিনা চিকিৎসা, বিনা-খবরদারীতে তেমন অবলীলায় মরে—সেই দেশের লোক হয়ে প্রথম প্রথম এসব দেখে মানুষ ও মানুষের জীবন নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি দেখলে আদিখ্যেতা বলেই মনে হয়। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে সবই চোখ সয়ে যায়। একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জন্মে যায় যে, মানুষ তো এইরকম সম্মানেরই যোগ্য।

যোগ্য নাকি?

দেখতে দেখতে নর্থওল্ট টিউব স্টেশানে এসে পৌঁছলাম আমরা। টিকিট কাউন্টারে দেখি, একজন ভারতীয় বসে আছেন।

আমি তাকে দেখে পুলকিত হতেই স্মিতা বলল, খবর্দার হিন্দী বা কোনো ভারতীয় ভাষায় কথা বলবে না—এ ব্রিটিশের চাকরি করে সুতরাং কাজের সময় ভুলেও একে দিশী ভাষন বলতে শুনবে না। আমি একবার বলতে গিয়ে লজ্জা পেয়েছিলাম।

শুনে অবাক হলাম। দেশে এ-রকম বি এন জি এস (বিলেত-না-গিয়ে সাহেব) অনেক আছেন যাঁরা এখনও দেশ স্বাধীন হবার এত বছর পরেও বাংলায় কথা বলেন না, কিন্তু বি-জি-এসদের (বিলেত গিয়ে সাহেব) কাছ থেকে অন্যরকম কিছু আশা করেছিলাম।

স্মিতাই ইংরিজীতে বলল, আমাকে একটা 'ট্রাভেল-এজ-ইউ-প্লিজ' টিকিট দিন।

টবী বলে রেখেছিল এই টিকিট কাটতে। সাতদিনের জন্যে টিউব এবং বাস-ট্রামে ভাড়া লাগবে না। তদুপরি একটা বিনিপয়সার সাইট-সীইং ট্যুরও আছে—। দাম নিল, তিন পাউণ্ড চল্লিশ সেন্ট—অর্থাৎ প্রায় সাতান্ন টাকার মতন।

টিউবের ভাড়া কম নয়। এখানে বাসের ভাড়াও কলকাতার তুলনায় বেশ বেশী।

টিউব স্টেশানটা মাটির উপরে। টিউব ট্রেন যে সব সময়েই পাতাল দিয়ে চলে তা নয়। অনেক জায়গায় মাটির উপর দিয়েও গেছে। এ স্টেশানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। বেশীর ভাগ স্টেশানেই এসকালেটর আছে। অনেক স্টেশান তো এত নীচুতে যে একাধিক এসকালেটরে অনেক নীচে নামতে হয়। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেই স্মিতা প্রথমেই আমাকে নিয়ে একটা রঙীন ম্যাপের সামনে দাঁড় করিয়ে টিউব চড়ার আদবকায়দা বোঝাতে লাগল।

ও ভাগলপুরের মেয়ে, ও কি করে জানবে যে বেনারসের গলি ও বড়বাজারের গলি যার দেখা আছে সে হারিয়ে যাবে এমন অলিগলি আকাশপাতাল কোথাওই নেই। যাই

www.BanglaBook.org

হোক, হাতে একটা কাগজের ম্যাপ নিয়ে দেওয়ালের ম্যাপের দিকে দেখে গুড়ি-গুড়ি ছাত্রর মত ব্যাপারটা বুঝে নিলাম।

দিদিমণি বললেন, আমি নাকি খুব বুদ্ধিমান। আসলে ব্যাপারটা এত সোজা যে, যে-কোনো খুব-নির্বুদ্ধি লোকেরও পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না বুঝতে।

প্ল্যাটফর্মের দুপাশেই অনেক স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন ষাটোর্দ্ধ ভদ্রলোক একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের সবে কুঁড়ি-ফোটা মেনি-মেনি মেয়েকে মাথার সিঁথি থেকে শুরু করে হাঁটুর মালাইচাকি অবধি সমানে এবং সবেগে চুমু খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ আশ্চর্য। আমি ছাড়া আর কেউই দেখলাম সেদিকে তাকাচ্ছে না। তাদের একেবারে গায়ে-লেগে দাঁড়িয়েই অনেকে মনোনিবেশ-সহকারে খবরের কাগজে হীথ ও উইলসনের প্রাক-নির্বাচন বাকযুদ্ধের খবর পড়ছে, কেউ বা লাইনের অন্য পারে ফুটে-থাকা জংলী ফুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভাবটা, পাচ্ছো, তাই খাচ্ছো, না থাকলে কোথায় পেতে? কি করেই বা খেতে?

আসলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটা এরা এমন পর্যায়ে এনে ফেলেছে যে, সে বলবার নয়। এরা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই কামনা করেনি, এ সমস্ত স্বাধীনতার যা শেষ এবং চরম গন্তব্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তারই শীর্ষে এসে পৌঁচেছে এরা। দেখে ভারী ভালো লাগল।

ছোটবেলা থেকে মাইণ্ড ইওর ওওন বিজনেস বা দিস ইজ নান অফ ইওর বিজনেস বাক্য দুটি শুনে আসছি। এতদিনে বাক্য দুটির তাৎপর্য বুঝলাম। এরা সত্যিই পরের চরকায় তেল দেয় না। দেয় না বললে মিথ্যে বলা হবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়ত দেয়; সামনাসামনি কখনোই দেয় না।

BanglaBook.org

উইমেনস লিব যে পর্যায়েই উপনীত হোক না কেন, মহিলারা হয়ত অনেক দেশের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন, কিন্তু অফুরান ফুসফুস গুজ-গুজ সর্বকালের সর্বদেশের মহিলাদের জারক রস। এ নইলে, এঁদের খাবার হজম হয় না, কখনও হবে না। কিন্তু লোকের সামনে এমনই 'কুডনট্ কেয়ারলেস' মুখভঙ্গী করে অনেকানেক মহিলারা এইক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন যে, মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ট্রেনটার আশু এবং নির্বিঘ্ন আগমন কামনা ছাড়া অন্য কোনো কামনাই তাঁদের মনে নেই। যেন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধকে তাঁরা দেখেনইনি।

ট্রেনটা এসে গেল। আসাতেই ইলেকট্রিকালি দরজাগুলো খুলে গেল। প্রথমে যাঁরা নামবার নেমে গেলে, তারপর যাঁরা ওঠার, উঠে পড়লেন। তিরিশ সেকেণ্ড মত থামে এক-এক স্টেশানে ট্রেনগুলো। ভিতরে উঠতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

অফিস-কাছারীর ভিড় এখন নেই। এখানে সাড়ে দশটার সময় কোনো অফিস যাত্রীই ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে রেলিশ করে ভাত খেয়ে, দুটি অ-খয়েরী গুণ্ডি মোহিনী পান মুখে দিয়ে দার্শনিকের মত ট্রামের জানলার পাশের সীটে বসে অফিস যান না। যাঁরা অফিস যাবার সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে প্রত্যেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। হাজিরা প্রায় সব জায়গায়ই সকাল নটায়। তাই এখন প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কিছু ছাত্র, ছাত্রী, আমার

www.BanglaBook.org

মত ট্যুরিস্ট ও অন্য নানাবিধ লোকেরা! বেশীর ভাগই মহিলা—বাজার-টাজার করতে বা অন্য কাজে বেরিয়েছেন।

সুন্দর গদি-আঁটা বসার সীট—বসার সীট ভরে গেলে লোকে রডের সঙ্গে ঝোলানো নরম হাতল ধরে দাঁড়ান। মেয়েদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন নেই। ট্রেনগুলি হীটেড। ঠাণ্ডা লাগে না। চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে চারদিক ভরা। টিউবের গার্ডের চাকরি, টেলিফোনের চাকরি, অন্যান্য নানারকম চাকরি।

এখানের অনেক মেয়েরা তো প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহে চাকরি ছাড়ে আর নতুন চাকরি নেয় সুযোগ-সুবিধা মত। বেকার বীমা, অসুখ-বিসুখের খরচ, পেনসন বা অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে। মাইনের উপর ইনকাম ট্যাক্সও দেয় এরা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম হারে। ট্যাক্সের বদলে ওরা অনেকই পায়। এ দেশে যে বেশী ট্যাক্স দেয় তাকে লোকে ন্যায্য কারণে সম্মান-এর চোখে দেখে।

আশ্চর্য নয় যে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশীয় লোকেরা এখানে মাছি-পড়ার মত ভীড় করে আসছে বহু বছর ধরে। সেই জন্যেই ইদানীং ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি এরা করেছে। না করে উপায়ই বা কি? চাচা আপন প্রাণ বাঁচায় বিশ্বাস করা দূষণীয় নয়। তাছাড়া বর্তমানে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে যা লক্ষ্মী তার একটা ভাগ চলে গেছে অ্যামেরিকান ও তৈলাক্ত দেশগুলোর হাতে। আবুদাবী আর দুবাইয়ের শেখরা রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে এই দেশে জাপানী ও অ্যামেরিকানদের সঙ্গে। এঁদের অর্থনীতিতে ভারী একটা শঙ্কার ছায়া পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন যে পুরো দেশটাই কিনে ফেলবে শেখরা অ্যামেরিকানরা আর জাপানীরা মিলে। এদের ভয়টা সম্পূর্ণ অমূলকও নয়।

টিউব স্টেশানের নামগুলো বেশ। কিছু কিছু নাম আছে বিখ্যাত সব ব্যবসা কেন্দ্র বা কেনাকাটা কেন্দ্রের নামে। স্টেশানগুলো একেবারে সেই সব জায়গার পায়ের নীচে। যেমন পিকাডিলী সার্কাস। একটা স্টেশানের নাম শেফার্ডস বুশ। নামটায় এমন একটা পুরোনো দিনের গুঁফো-রাখাল আর ঝোপ-ঝাড়ের গন্ধ আছে যে, এই নাম ভর করেই একটা গায়ে-কাঁটা দেওয়া শার্লক-হোমস-মার্কা গোয়েন্দা-গল্প লেখা যায়।

পিকাডিলী সার্কাসে গিয়ে নামলাম আমরা।

পাতাল থেকে মাটিতে পৌঁছেই তাজ্জব বনে গেলাম। হিথ্রো এয়ারপোর্টে নামা ইস্তক, মিডেকসের অপেক্ষাকৃত জনবিরল এলাকায় হেঁটে আসার পর, এই প্রথম ঐতিহাসিক লানডানের গায়ের গন্ধ নাকে এসে পৌঁছল। মেঘলা দুপুরের সী-গাল-ওড়া সমুদ্রের স্বগতোক্তির মত জবরদস্ত জলরাশির এক চাপা গুম্-গুমানি কানে এল।

হাজার হাজার ট্যুরিস্ট চলেছে পথ বেয়ে। সমস্ত পৃথিবীর লোক যেন জমা হয়েছে এসে এই তারুণ্যের তীর্থসঙ্গমে। বৃদ্ধরাও এখানে বৃদ্ধ নন, বৃদ্ধারা তরুণী। কত রকম তাঁদের চেহারা, কত রকম তাঁদের বেশবাস। অবশ্য বেশবাসের বৈচিত্র্য অজকাল কমে এসেছে জিন্‌সের দৌলতে। অ্যামেরিকানদের পররাষ্ট্রনীতি দুনিয়ার সর্বত্র মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ

www.BanglaBook.org

হলেও, ভারতে যেমন মাদ্রাজী দোসার, পৃথিবীতে তেমন অ্যামেরিকান জিন্‌সের আধিপত্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে।

প্যারিসের পটভূমিতে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে—'দা মুভেবল্ ফীসট্'। চোখের সামনের এই সাবলীল স্বচ্ছতোয়া, ঘনসন্নিবিষ্ট ও যৌবনমদে উচ্ছল সৌন্দর্য দেখে ঐ নামটি মনে পড়ে গেল। সামনের চলমান বিপুল উৎফুল্ল, উৎসুক, উদ্বেল জনরাশির দিকে তাকিয়ে প্রথমেই যা আমাকে নিবিড়ভাবে বিস্মিত করেছিল তা এদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা এবং সাচ্ছল্য।

হাজার হাজার পাউণ্ডের শপিং করছে এক-একজন, এক-একদিনে। হি-হি-হা-হা করে হাসছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে ; হুল্লোড় করছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বুঝি এক অনিঃশেষ মজায় মেতেছে, মনে হচ্ছে, এরা সকলেই ইউলিসীসের মত মনস্থির করেছে যে, I will drink Life to the Lees.

এখানের এই হরজাই চোখ-ঝলসানো বাজারে আমার জেঠিমা, কি মিনা, কি রিনি বৌদি এবং আমার অনেক চেনা ও অল্প-চেনা ভদ্রলোক-ভদ্রমহোদয়রা এসে পড়লে যে কী আদিখ্যেতা করতেন তাই ভাবছি।

আশ্চর্য! এখনও ফোরেন জিনিস দেখলে অনেক ভারতীয়রই মাথার ঠিক থাকে না। মনে হয় এ বহু বছরের বিদেশী শাসন ও স্বদেশী উদাসীনতাজনিত অবচেতনের গভীরে শিকড়-গেড়ে-বসা এক হিলহিলে হীনস্মন্যতার ফল। এর মূল অনেক গভীরে। ভাবলে অবাক লাগে যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এত বছর কেটে গেল অথচ আমরা এই হীনস্মন্যতা কাটিয়ে ওঠা তো দূরের কথা, তাকে যেন আরো অনেক প্রবলই করলাম।

ভোগ্যপণ্য ও বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি, এমন কি দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ জিনিসপত্র দেখেও অবাক হতে হয় না যে, তা বলব না। যাদের রুচি সুন্দর, যাদের সখ আছে, তাদের অনেক জিনিসই বিদেশে চোখে পড়ে ভালো লাগার মত ; কিন্তু যা-কিছু ফোরেন তার সব কিছুই স্বদেশীয় থেকে ভালো যে, একথা বিশ্বাস করা লজ্জার।

যাই হোক, বাঙাল লেখক একটি জুতোর দোকানে ভ্রাতৃবধূর হাত ধরে গিয়ে ঢুকল। সেকালে অন্দরমহলে আসতে গেলে ভাসুরঠাকুরকে বিস্তর খড়মবাজি গলাবাজি করে তাঁর আগমন বার্তা দিকে দিকে প্রচার করে ভ্রাতৃবধূকে ঘোমটা টানার সম্পূর্ণ অবকাশ দিয়ে তারপর অন্দরে আসতে হত। আর আজ ভাদ্রবৌ ট্যাং-ট্যাং করে ভাসুরঠাকুরকে নিয়ে জুতো কিনতে চলেছে ম্লেচ্ছদের পাড়ায়—যখন-তখন বরাহ খাচ্ছে—গোমাংস ভক্ষণ করছে—। আমার ঠাকুমা জানতে পেলে বলতেন, কী খিটক্যাল্; কী খিটক্যাল্।

সারা পৃথিবীকে জুতো-মেরে যারা চামড়া ও জুতো এক্সপোর্ট করছে সে দেশের লোক হয়েও লানডানে জুতো কিনতে ঢোকাটা আমার পছন্দ হল না। কিন্তু এখন আমার মতামতের দাম কি? সঙ্গে বিলিতী ভাদ্রবৌ—দিশী দাদার আপত্তি শুনছে কে?

লানডানে যে জুতোর দাম বিস্তর হবে একথা জানা ছিল, কিন্তু স্মিতা বলল সারা পৃথিবী ঘুরবে, মোটে একজোড়া চামড়ার জুতো এনেছ! অসুবিধে হবে—। চল তোমাকে একটা

www.BanglaBook.org

হাঁটাহাঁটি করার জন্যে জুতসই জুতো কিনে দিই।

সব জুতোই হাঁটাহাঁটি করার জন্যেই বানানো হয় বলেই ধারণা ছিল—কিন্তু ইদানীং বসা-বসি শোওয়া-শুয়ির জন্যেই বোধহয় জুতো বেশী ব্যবহার হয়। বিজ্ঞাপনের ছবিতে আকছার দেখছি—সম্পূর্ণা নগ্না রমণী পায়ে কালো কুচকুচে হাঁটু সমান রাইডিং বুট পরে মেনিবেড়ালের মত সাদা বিছানায় আধো-শুয়ে গাঢ় লাল রঙা উলের লাছি নিয়ে সোয়েটার বুনছে। উলের বিজ্ঞাপন।

বিরাট দোকান। থাক থাক সারি সারি জুতো সাজানো র‍্যাকে র‍্যাকে। মেঝেতে কার্পেট পাতা। নীচু গ্রামে স্টিরিও সিস্টেমে বাজনা বাজছে। কিন্তু বিক্রেতা কোথাওই দেখা গেল না।

ব্যবসাটা ভুতুড়ে বলে মনে হল।

স্মিতা বলল, তোমার পা কত বড়?

আমি পা দেখিয়ে বললাম, যত বড় দেখছ তত বড়।

ও বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে কর রুদ্রদা, সাইজ কত? কত নম্বর?

আমি বললাম, তা জানি না, আমার মালকিন বলতে পারবেন। জুতো জামা সব উনিই কেনেন।

স্মিতা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল আট হবে বোধহয়।

সাইজ জেনেই বা কি করবে? দু-দুজন জলজ্যান্ত খরিদ্দার এসে দোকানে দাঁড়িয়েছি—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমরা, তবু কারোরই পাত্তা নেই। আমাদের কলকাতা হলে এতক্ষণ চারজন সুন্দর সুবেশ যুবক একটা তেকোনা চিপ্টিরের উপর আমার ছি-চরণ ফেলে পা বুকের উপর নিয়ে পা ধরে কত টানাটানি সাধাসাধি করত আর এদের কিনা এমনই হিমশীতল ব্যবহার।

যাই-ই হোক বাইরে দুটি বিরাট বিরাট গামলায় বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন মাপের জুতোর একপাটি করে রাখা আছে। পছন্দ করতে বিস্তর সময় ব্যয় হল। পছন্দসই জুতো পাচ্ছিলাম না বলে নয় ; দামগুলো বড়ই অপছন্দসই হচ্ছিল। কলকাতার ফুটপাথে যে অকৃত্রিম স্বদেশীয় টায়ার-সোলের পেরেকমারা চমৎকার ট্যাকসই জুতো জলের দামে বিক্রী হয় সেই পদের জুতোর দামও দেখি বিস্তর।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, দ্যাখো স্মিতা, আমার একজোড়া জুতোতেই চলে যাবে—আমি লিভিংস্টোন নই বা জন হান্টার নই যে হেঁটে হেঁটে দেশ আবিষ্কার করব বা গুচ্ছের হাতি মারব—তুমি জুতোটুতো কিনো না আমার জন্যে।

স্মিতা নিজের গালে নিজের তর্জনী দিয়ে একটি টুস্‌কি মেরে বলল, ওমা! ন'টাকা তো দাম মোটে।

বললাম, বল কি? ন'টাকা?

ও বলল বিশ্বাস হচ্ছে না, দ্যাখো, বলেই লেবেলটা দেখাল। আমি দেখলাম ন' পাউণ্ড দশ সেন্ট—সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর হয়ে গিয়ে কুড়ি দিয়ে গুণ করেই আঁৎকে উঠলাম। বললাম, তোমাদের টাকা আমাদের টাকায় তফাত আছে। এসব জুতো আমার

www.BanglaBook.org

ছি-চরণের যুগ্যি নয়।

স্মিতা কিছুতেই শুনল না। একটা মোটা রাবার সোলের সোয়েডের-গা ভিতরে ফ্ল্যানেলের লাইনিং-দেওয়া ফিকে খয়েরী জুতোকে ফিতে সরী, লেজ ধরে মরা ধেড়ে ইঁদুরের মত দোলাতে দোলাতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের গভীরে ঢুকল।

অনেকখানি গিয়ে দেখি একটি বেলডাঙার কুমড়োর মত গোলাকৃতি মেয়ে মিনি স্কার্ট পরে বসে চকোলেট খাচ্ছে আর কাউন্টারের রোগা টিং-টিং ঝুলো গুঁফো ভেঙে-যাওয়া-ডান-হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেলেটির সঙ্গে বসে নেকু-নেকু গল্প করছে।

আমাদের দেখেই ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস স্যার।

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

বলেন কি গো!

সাক্ষাৎ লাল টকটকে সায়েব এমন আমার মত লোককে স্যার বলে? বন্ধু-বান্ধবদের বাবা-ঠাকুরদাকে দেখেছি ধুতির উপর জিনের কোট পরে, ট্যাঁকঘড়ি গুঁজে পানের ডিবে হাতে নিয়ে বিদেশী কোম্পানীর বড়বাবুর চাকরি করেছেন আর সারাদিন স্যার স্যার করেছেন। বাড়ি এসে গিন্নীদের কাছে রাতের বেলা 'সায়েবের' গল্প করেছেন। সায়েবরা তো 'ভগবান'। সায়েবরাও আবার কাউকে স্যার বলে নাকি?

যাক্ গে, লানডানের বুকে সেই প্রথম শ্বেতাঙ্গ আমার প্রবাসের প্রথম দিনে আমাকে 'স্যার' সম্মান দিয়ে এমনই পুলকিত ও চমকিত করে দিলে যে আমার মনে হল এই স্যারে ও নাইটহুডে কোনোই ফাঁক নেই।

স্মিতার হাত থেকে সেই এক পাটি জুতোটা বাঁ হাতে নিয়ে কাউন্টারের পাশেই একটা ছোট চারকোনো পিতলের বাক্সে ফেলেই ছেলেটা একটা স্যুইচ্ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটা সাঁ করে উপরে উঠে গেল। বুঝলাম, এটি একটি লিফট। তার পরক্ষণেই বাক্সটি আবার উপর থেকে সাঁ করে নেমে এল। দেখলাম, সেই এক পাটি জুতো, সঙ্গে একটি পলিথিনের ব্যাগে মোড়া সেই রকমই একজোড়া নতুন জুতো।

ছেলেটি সেই এক পাটি স্যাম্পল জুতোটি নিয়ে কাউন্টারের পাশে একটি কনভেয়র বেল্টে ফেলে দিল। বেল্টে করে জুতোটি সেই গামলায় গিয়ে পড়ল, যেখান থেকে স্মিতা সেটাকে তুলে এনেছিল।

জুতো এসে পৌঁছলে ছেলেটি বাঁ হাতে স্মিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ক্যাশ রেজিস্টারের চাবি টেপাটেপি করে চেঞ্জ ফেরত দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক উ্য স্যার, থ্যাঙ্ক উ্য ম্যাম।

জুতোর প্যাকেট বগলে নিয়ে আমি গট্‌গট্ করে স্মিতার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। জীবনে প্রথমবার সায়েবের মুখে স্যার শোনার যে কী উন্মাদনা যাঁরা না শুনেছেন তাঁরা কখনোই বুঝবেন না।

সেই মুহূর্তে, মনে মনে ব্যাটাদের নীল চাযের অপরাধ, শোষণের অপরাধ, ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়ার অপরাধ, স্বাধীনোত্তর ব্যবসাদারীর আণ্ডার-ইনভয়েসিং-এর সমস্ত অপরাধ

www.BanglaBook.org

ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হল।

স্মিতা বলল, এরপর তোমার একটা ওভারকোট কিনতে হবে।

ওভারকোট যে আমার ছিল না, তা নয়। মানে, আমার নয়, বাবার ছিল। কালো কম্বলের ওভারকোট। ওজন মণ দেড়েক হবে। বাবার সাড়ে ছ'ফুট চেহারার অপাদমস্তক যাতে ঢাকা পড়ে সেই মত করে এবং ডিসেম্বরের জঙ্গলের শীত যেন কোনোমতেই ঢুকে পড়তে না পারে তার সমস্ত বন্দোবস্তই তাতে ছিল। সেই ওভারকোটের সাইজ এমনই ছিল যে, তার বাঁ পকেটে আমাদের ফক্স-টেরীয়ার কুকুর ম্যাডাকে আকণ্ঠ ঢুকিয়ে ডান পকেটে টিফিনক্যারিয়ার ভর্তি লুচি, কষা মাংস এবং কাঁচাগোল্লা নিয়ে কাঁধে বত্রিশ ইঞ্চি ডাবল ব্যারেল গ্রীনার বন্দুক ফেলে বাবা শীতকালের ভোরে শুয়োর শিকারে বেরোতেন। একবার ক্যারাম বোর্ডের গুটি হারিয়ে যাওয়ায় সেই আপাদমস্তক ওভারকোটের এক ডজন বোতাম কেটে ফেলে আমরা কাজ চালিয়েছিলাম। পরে অবশ্য সেই গুটি ফুটে উঠেছিল পিঠে।

অনেক কারণে সে ওভারকোট নিয়ে এতখানি পথ আসা যেত না। বিশ কেজি ওজনের প্রায় সবটাই ওভারকোটই খেত। সবচেয়ে বড় কথা, ইমিগ্রেশনেই আটকে যেতাম। ওরা আমাকে নিঃসন্দেহে হিমালয়ের ভালুক বলে ভাবত। মানুষ বলে মানত না।

স্মিতা কোনো ওজর-আপত্তি না শুনে আমাকে নিয়ে একটি বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বলতে ছোটবেলায় কলকাতার হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন, কমলালয় স্টোর্স এবং ইদানীংকার নতুন দিল্লির সুপার মার্কেটকেই জানতাম।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর মানে যে একজন আঙ্গা-পাঙ্গা মানুষকে এ পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য পাশ দিয়ে তাকে পৃথিবীর তাবৎ স্থাবর সম্পত্তির মালিক করে বের করে দেওয়া যায় এ ধারণা ছিল না।

এক এক তলায় এক এক রকম জিনিস। কত রকমের কত বিচিত্র যে জিনিস তা বলার নয়। সাইজ লেখা, দাম লেখা, যার যেটা খুশি তুলে নিচ্ছে, নিয়ে গিয়ে কাউণ্টারে দাম দিচ্ছে।

ক্রমেই এ সব দেখে যা মনে হয় তা হচ্ছে আমাদের দেশ হলে তো দিনে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস চুরি যেত। এত জিনিস অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। কোনো লোক নেই, দারোয়ান নেই—আশ্চর্য।

স্মিতা বলল, উপরের কোনো এক ঘরে অনেকগুলো টেলিভিসনের সামনে একজন লোক বসে আছে। প্রতি তালার ছবি ফুটে উঠছে তার সামনে। এ দেশে অভাবের জন্যে লোকে চুরি কমই করে। কিন্তু ক্লীপটোম্যানিয়াক্ লোক আছে। কোনো সন্দেহজনক লোককে কোনো তালায় দেখা গেলেই ইন্টারকমে সেই তালার কাউন্টারে বা কোনো বিশেষ লোককে সেই আগন্তুকের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিয়ে দেয় টেলিভিসনের সামনে বসা মনিটার।

তবুও বলব যে, এসব দেশে যে চুরি হয় না, বাইরে দুধের বোতল পড়ে থাকে, কাগজের

www.BanglaBook.org

স্টলে কাগজ পড়ে থাকে দাম লেখা—এসবে এরা যে জাত হিসেবে আমাদের চেয়ে বিশেষ ভালো একথা মোটেই প্রমাণিত হয় না। আসলে অর্থনৈতিক দিকটা এদের এতই ভালো যে খুব গরীব লোকও তেমন গরীব নয়—আমরা গরীব বলতে যা বুঝি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কারণও আছে। লোকসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক কম বলে এদের প্রশাসনটা চালানোও অনেক সোজা ও সহজ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের যে অবস্থা তা এদের দেশের লোকদের হলে চুরি হত কি হত না সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

স্মিতা আমাকে নিয়ে ওভারকোটের ডিপার্টমেন্টে ঢুকল। কত রকম যে ওভারকোট—চামড়ার, ফারের, শীপস্কিনের, ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের—লংকোট, হাফকোট, গলাবন্ধ, গলা-খোলা, তার ইয়ত্তা নেই। দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করা গেল। অনেক খুঁজে খুঁজে একটা হালকা নীলচে-ছাই রঙ, গলায় ফারদেওয়া ওভারকোট পছন্দ করা গেল—দামও পছন্দসই। ভাদ্রবৌ বড়লোক হলেও তাকে লজ্জাকরভাবে খরচ করানোতে আমার আপত্তি ছিল।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি সবই সেন্ট্রালী-হিটেড। বাইরে বেরিয়ে টাটকা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক লাগে মুখে। ঝকঝকে রোদ ছিল আকাশে। ঝকঝকে বলব না—লক্ষ লক্ষ গাড়ি ও বাসের পেট্রল ডিজেলের ধুঁয়োর লানডানের আকাশ কখনও ঝকঝকে বলতে যা বোঝায় তা থাকে না। তবু রোদটা মিষ্টি লাগছিল।

স্মিতা বলল, সকাল থেকে তোমাকে অনেক দৌড় করিয়েছি, লাঞ্চের সময়ও হয়ে গেছে, চল কোথাও খেয়ে নেওয়া যাক।

পিকাডিলীতেই একটা দোকানের সামনে ফুটপাথে চেয়ার টেবিল পাতা ছিল—রোদে বসে খাওয়ার জন্যে। সেখানেই গিয়ে বসলাম। শুধু রোদে বসার জন্যই নয়— সামনের যে অবিশ্রান্ত কাকলিমুখর জনস্রোত তা চোখ চেয়ে দেখার মত। এখনই যদি এই ভীড়, ত বসন্তে (মানে ওদের গ্রীষ্মে) না জানি কি ভীড় ছিল।

স্মিতা বলল, লানডানের ভীড়ের কখনই কমতি নেই।

স্কচ্ বীফ্-রোস্টেড স্যান্ডউইচ্ আর কফি খেলাম। স্যান্ডউইচের মধ্যে মাখন সর্ষে লেটুস আর সেলারী পাতা ভরা।

কত রকম ভাষা যে এই জনস্রোতের! টুকরো-টুকরো ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশ্যান, স্প্যানীশ, ইতালীয়ান, জাপানীজ সব ঝরাপাতার মত হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। হাওয়াটারও যেন নেশা লেগেছে—এই নেশা-রঙিন পরিবেশে।

ইচ্ছে করছিল সারাদিনই এখানে বসে থাকি, আর চোখের মণির লেন্সে ছায়া-ফেলা এই মুখগুলি চিরদিনের মত মস্তিষ্কের কোষে-কোষে ডেভলাপ করে রেখে দি। যেন এই সাতসাগরের পারের ছেলে-মেয়েরা, তাদের হাসি, তাদের গান, তাদের মুখের অভিব্যক্তি সমেত চিরদিনই মনের মধ্যে থেকে যায়!

www.BanglaBook.org

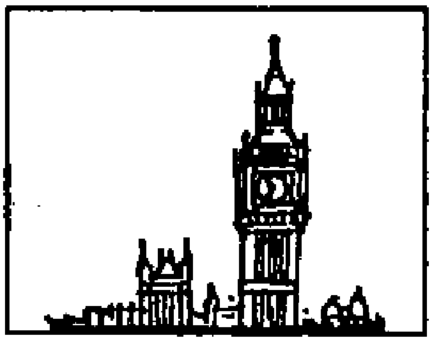

ফ্ল্যাটের বসবার ঘরের প্রকাণ্ড কাঁচমোড়া জানলা দিয়ে চোখে পড়ে একটা বিরাট গাছ। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এই পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টের লোকাল গার্জেনের মত ঝুঁকে পড়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ করছে যেন।

বড় গাছ মাত্রই প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এই কুয়াশা-ভেজা দূর দেশের গাছে আর আমাদের দেশের গাছের চেহারায় অমিল থাকলেও চরিত্রে কোনোই অমিল নেই। সেই কোটর, পাখি, লতিয়ে-ওঠা পরনির্ভর লতা, পাতা-ওঠা, পাতা-মরা, সেই তারুণ্য ও বার্ধক্যর আশ্চর্য অভিব্যক্তি এই গাছেও।

সেদিন খুব ভোরে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে তার পাশে বসে বাইরে চেয়ে অনেকদিন পর এক প্রভাতী পরজ মানসিকতার মধ্যে অনেকানেক কথা মনে আসছিল। ঐ গাছে-বসা ও উড়ে-যাওয়া পাখিদের মত আমার ভাবনাগুলোও আসা-যাওয়া করছিল।

মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে এখনও অনেক আশা আছে। দূরত্ব, কোনো দূরত্বই প্রকৃতিকে তেমন করে পৃথক করতে পারেনি। পারেনি মানুষকেও। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভাষা ভিন্ন হয়েছে, এই পাখিদের ডাকেরই মত, পোষাক বিভিন্ন হয়েছে এই পাখিদেরই পালকের মত কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, মননের অধিকারে এবং মনুষ্যত্বের মূল পরিচয়ে এই বিপুলা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত গাঁথা হয়েছে এক মালায়। যে-মালা মানুষ-সত্যর মালা। সে-সত্যর উপর আর কোনো সত্য নেই। আর প্রকৃতি, তার গাছ-পালা, পাহাড়-নদী আকাশ-বাতাস সমেত এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর অসীম অনন্ত অশেষ সত্তার প্রসন্ন ও বিরূপ প্রকাশে প্রকাশিত হয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন বারে বারে যে, একই অখণ্ড অনন্তের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা নিঃশ্বাস-ফেলা ও প্রশ্বাস-নেওয়া অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন দাম্ভিক কীট আমরা। আমরা পথ, রথ ও মূর্তিকে দামী ভেবে নিয়ে আমাদের বুকের ভিতরের ন্যক্কারজনক, নুব্জ আত্মমগ্নতায় নিমজ্জিত থেকে অন্যক্ষেত্রে নিজেদেরই দেব বলে মনে করছি।

কুয়াশা-ভেজা আলতো-সবুজ আদুর-নরম ঘাসে ঘাসে ভরা এই প্রান্তর, তার উপরে চরে বেড়ানো নানা-রঙা টাট্টু-ঘোড়া, পাখির ডাকের সঙ্গে মিশে যাওয়া তাদের হ্রেষা রব, প্রথম প্রবাসের ভোরের কুয়াশার গন্ধ, সব মিলিয়ে এই নিরিবিলি সকালে বড় একটা নিষ্পাপ দাবী-দাওয়াহীন আনন্দে আমার মনটা ভরে দিয়েছে। এমন আনন্দ হঠাৎ-হঠাৎ কিন্তু ক্বচিৎ অনুভব করা যায়। এ ভারী একটা গভীর আনন্দ, নিছক বেঁচে থাকার আনন্দ, চোখে দেখতে পাওয়ার আনন্দ, নাকের ঘ্রাণের আনন্দ ও সবচেয়ে বড় এক গা-শিরশির করা কৃতজ্ঞতার আনন্দ।

www.BanglaBook.org

এই কৃতজ্ঞতা কার কাছে জানি না। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা বোধটা যে সত্যি সে কথা জানি। এই ক্ষণিক কৃতজ্ঞতার বোধের মধ্যে দিয়ে আমার মত কত-শত পাপী-তাপী মানুষ যে উত্তরণের সোনার দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে তা কে জানে? একজন নিশ্চয়ই জানেন। আর কেউ জানুন আর নাই-ই জানুন।

স্মিতা ঘরে এসে বলল, কি ব্যাপার? এত সকাল সকাল রবিবার ভোরে?

আমি বললাম, কটা দিনই বা আছি এখানে? যে-কটা দিন আছি, ভাল করে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। বেশী ঘুমিয়ে কি হবে?

চা খেয়েছ?

না।

দাঁড়াও, করে আনছি।

ঘর থেকে চলে যাবার সময় স্মিতার ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

বুঝলাম ঠোঁট বলছে, ভাসুর আমার বড় কুঁড়ে।

আসলে, এখানে আসা-ইস্তক স্মিতা আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সব ট্রেনিং-ফ্রেনিং দিয়ে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, দেশ থেকে বিদেশের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাচ্ছে বলে আমাদের যে একটা ধারণা বরাবরই থাকে সেটা পুরোপুরি ভুল। এখানে রান্না করাটা আর রান্নাঘরে সময় কাটানো একটা আনন্দ বৈ নয়। এত সুন্দর সব বন্দোবস্ত, এত চমৎকার সব বহুবর্ণ বাসনপত্র, এবং কিচেন এবং প্যান্ট্রীর সাজ-সরঞ্জাম যে রান্না করতে সকলেরই ইচ্ছে করে।

একথা এই ভরসায় বলছি যে, এই অপদার্থ যে নিজে কুল্লে শুধু চা, ওমলেট এবং তেঁতুলের মধ্যে লেবুপাতা কাঁচা-লঙ্কা ফেলে ডলে-টলে নিয়ে বানানো দারুণ একটা সরবৎ ছাড়া কিছুই বানানো জানে না সেই তারও যখন রাঁধবার শখ হয়, তখন অন্য অনেকেরই বিলক্ষণ হবে।

এখানে চা বানানো একটা ব্যাপারই নয়। হীটারের উপর সুন্দর কেটলীতে প্যান্ট্রীর বেসিনের কল থেকে জল ভরে নিয়ে চাপিয়ে দিলেই হল। 'হাই' করে দিলে, কিচেন থেকে বেরিয়ে একবার বসার ঘরে দাঁড়ালেই শোনা যাবে কেটলীর জল ডাকতে শুরু করেছে। তখন ফিরে গিয়ে একটা করে টী-ব্যাগ সুতো ধরে কাপের মধ্যে ফেলে জল ঢাললেই চা। তারপর দুধ চিনি মিশিয়ে নিলেই হল।

কিন্তু আমার ভাদ্রবৌ বড় ভালো। লানডানে থেকেও সে আমাকে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক বাঙালী যৌথ-পরিবারের ভাসুরের মত যত্ন-আত্তি করছে। পান থেকে চুনটি খসবার জো-টি নেই। ওদের সময় ও অবকাশ এতই অল্প এবং সেই অবকাশে এত কিছু করবার থাকে যে, তার মধ্যে অতিথি সেবা করা সত্যিই মুশকিল।

আমার পক্ষে উচিত ছিল যে ওদের বাসন-টাসন ধুয়ে অথবা অন্যান্য নানা ব্যাপারে ওদের একটু সাহায্য করা। সাহায্য যে করিনি এ নিয়ে আমার ভায়া শোবার ঘরের বন্ধ দরজার আড়ালে ভ্রাতৃবধূকে এই ইনকনসিডারেট দাদা সম্বন্ধে কিছু বলেছে কি বলেনি

www.BanglaBook.org

তা ভায়াই জানে।

কিন্তু বলে থাকলেও, দাদার চরিত্রের যে কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধিত হত, তা দাদার মনে হয় না। আমার মত কুঁড়ে ও আরামী লোক বাংলাদেশেও পাওয়া মুশকিল। হালের বাংলাদেশ নয়। পুরনো পুরো বাংলার কথা বলছি। এই ব্যাপারে ছোটবেলায় আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন আমার এক বন্ধুর দাদামশায়। তিনি লাইব্রেরী ঘরে বই পড়তে পড়তে গড়গড়া খেতেন। কখনও যদি গড়গড়ার নল অন্যমনস্কতার কারণে হস্তচ্যুত হত, তাহলে তিনি তা কখনও নিজে হাতে তুলতেন না। পুরো নাম ধরে কোনো খিদমদ্‌গারকে ডাকতেও তাঁর অত্যন্ত পরিশ্রম বোধ হত। এমনকি 'কে আছিসরে'—এত বড় একটা বাক্য বলার নিষ্প্রয়োজনীয় মেহনতও তাঁকে কখনও করতে দেখিনি।

অন্যমনস্কতা ও কুঁড়েমিরও একটা দারুণ নেশা আছে। রইসীও আছে। সেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি যেন কোন্ দুর জগৎ থেকে ডাক দিতেন—'রে'। শুধু 'রে' 'কে রে' পর্যন্ত নয়।

ডাকা মাত্র কেউ-না কেউ দৌড়ে এসে তাড়াতাড়ি গড়গড়ার নলটা তুলে দিত তাঁর হাতে। নলটা আঙুলের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করার ঘটনাটাও তাঁর স্বর্গীয় আলস্য ও উদাসীনতাকে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যাহত করত না। কিছুক্ষণ পরে শব্দ শোনা যেত আবার ভুড়ুক্-ভুড়ুক্। খোলা দরজা দিয়ে এসে সারা বারান্দা ভরে দিত অম্বুরী তামাকের গন্ধ।

আমি তো দীনাতিদীন। বাঘা বাঘা লোকেরাও এই আলস্যর জয়-জয়কার করেছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'ইন প্রেইজ অফ আয়ডলনেস' বইয়ে কেমন যুক্তি-তক্কো দিয়ে ব্যাপারটার গুণাবলী বুঝিয়েছেন।

স্মিতা চা এনে দিয়েছিল।

আমি সবুজ মাঠে সম্পূর্ণ বিনাকারণে লম্ফমান ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে আলসেমির চূড়ান্ত করছিলাম।

এখানে সবুজের সঙ্গে আমাদের দেশী মাঠঘাটের সবুজের তফাত আছে। ভালো করে কালি দিয়ে পালিশ-করা কালো চামড়ার জুতো আর কালো ক্যাম্বিসের জুতোর রঙে যে তফাত এই সবুজ ঔজ্জ্বল্যের তফাত অনেকটা সেরকম। তবে ম্যাটমেটে নয় ঠিক রঙটা। ইংরেজী 'লাশ গ্রীন' শব্দটাই এই সবুজত্বের একমাত্র অভিব্যক্তি। এ সবুজটা কেমন যেন নরম সবুজ, অনেকটা জাপানী চিত্রকরের ওয়াশের কাজের ছবির মত ব্যাপারটা।

এই সবুজের বুকে লাফিয়ে-বেড়ানো টাট্টুঘোড়াগুলোকে দেখে মনে হয় ইংরিজী নার্সারী-রাইমের ছবিওয়ালা বই থেকে সটান উঠে এসেছে ওরা। যে সব বইয়ে—

'রিঙ্গা রিঙ্গা রোজেস,
পকেটফুল ও পোজেস'

ইত্যাদি কবিতা ছাপা থাকে।

নার্সারী রাইমের কথা মনে হওয়ায় আমিও প্রায় ছোটবেলায় ফিরে গেছিলাম, এমন সময় টবী উঠে এল এ ঘরে।

www.BanglaBook.org

বলল, গুড মর্ণিং রুদ্রদা। জানলার সামনে কি করছ?

আমি বললাম, এটা কি গাছ রে?

টবী বলল, এটা একটা গাছ।

কি গাছ?

টবী বলল, খী খারবার! আমি কি কবরেজ নাকি? গাছ পাতা এসব চিনি না। গাছ ; ব্যস্ গাছ। পারোও বাবা তুমি।

তারপরই টবী বলল, প্রেমের গল্পে গাছের কোনো ভূমিকা আছে?

আমি চমকে উঠলাম। প্রথমে ভয় পেলাম, তারপর সপ্রতিভ গলায় বললাম, নিশ্চয়ই আছে।

টবী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে পুরু লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকল। একটা হাই তুলল মস্ত বড়। রাতে বোধহয় আমার ভাদ্রবৌকে খুব আদর-টাদর করেছে।

তারপর একেবারে হঠাৎই বলল, তোমার গল্পের নায়করা গাছে ঝোলে গলায় দড়ি দিয়ে?

আমি অত্যন্ত বিপন্ন মুখে টবীর দিকে চেয়ে রইলাম।

ম্যাদামারা বাংলা সাহিত্যের প্রতীক এক ম্যাদামারা প্রেমের গল্প-নিকিয়ের কপালে যে এমন বিপদও লেখা ছিল তা কি আমি জানতাম?

আসলে শুধু টবী নয়, গাছ-গাছালি সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই আগ্রহ থাকে। জীবনের অন্যান্য অনেকানেক ক্ষেত্রে অসম্ভব কৃতী লোকদেরও এ বিষয়ে উদাসীনতা আমাকে প্রায়শঃই মর্মাহত করে। কিন্তু জীবনে মর্মাহত হবার এতরকম কারণ থাকে যে, গাছ-গাছালির কারণে বেশীক্ষণ মর্মাহত হয়ে থাকা যায় না।

লানডানের টিউব ট্রেন যেখানে মাটির উপর দিয়ে গেছে সেখানেই অনেক জায়গায় চোখে পড়ে ম্যালাস্কিগঞ্জে শীতকালে ফুটে-থাকা হলুদ ফুলের মত ফুলের ঝোপ। অসংখ্য ফুল ফুটে আছে এখানে ওখানে। এখানে এ ফুলগুলোকে কি বলে, তা জানি না। টবীর বাড়ির পাশের বড় গাছটার নামও জানি না। জানতে পেলে খুশী হতাম। অবশ্য পৃথিবীর তাবৎ গাছের নাম যাঁরা জানেন, তাঁরা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। যাঁরা নাম-না-জেনেও তাবৎ গাছপালা ফুল-লতাকে ভালোবাসেন তাঁরা কবি। তফাত হয়ত এইখানেই ; এইটুকুই।

পথের পাশে খয়েরী ও গাঢ় লাল ওয়াইল্ড-বেরির ঝোপে ঝোপে ডালগুলো ভরে আছে। আমাদের কুঁমায়ু পাহাড়ের কাউফলের মত। পাশে পাশে নুয়ে আছে উইপিং-উইলো। উইলো গাছেদের দাঁড়িয়ে থাকা আর নুয়ে-পড়ার হালকা আলতো ভঙ্গীর মধ্যে বড় একটা নারীসুলভ কমনীয়তা আছে। গা ঘেঁষে দাঁড়াতে ইচ্ছে যায়। ভালো লাগে।

ততক্ষণে দু কাপ কফি খেয়ে ভায়া আমার মুডে এসেছিল।

বলল, এসব লেখক-ফেখক লোকদের বেশীক্ষণ একা থাকতে দিও না স্মিতা। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, চলো বেরিয়ে পড়া যাক্।

শুধোলাম, কোথায়?

www.BanglaBook.org

যেখানে দু চোখ যায়।

তারপর একটু ভেবে বলল, কোথায় যাবে বলো। চলো স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ ঘুরিয়ে আনি।

বললাম, তা মন্দ হয় না, শেক্সপীয়রের জন্মস্থান। না গেলে জংলীপনা হয়।

টবী বলল, শেক্সপীয়র? সেডা আবার কেডা?

বললাম, তা জানি না, ছোটবেলায়, কট্টর বাংলা ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে পড়েছিলাম, শেক্সপীয়র এবং মোক্ষমুলার।

স্মিতা হেসে উঠে বলল, মোক্ষমুলার কি?

আমি উত্তর দেবার আগেই টবী বলল, বুঝেছি, ম্যাক্সমুলার।

তারপর বলল, জ্বালালে দেখছি।

স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন মিডেক্স থেকে ঠিক কত দূর এখন আমার মনে নেই। তবে গাড়িতে বেশ কিছুটা পথ।

পরিজ, জোড়া-ডিম, তামাটে কড়কড়ে-চুরমুরে করে বেকন ভাজা, একেবারে ক্রিসপ্ টোস্ট। তার উপর সদয় হাতে মাখম মার্গারীন ও মধু মাখিয়ে জমজমাট খেয়ে উঠলাম। পুরোপুরি ইংরিজী কায়দায়।

স্মিতা বলল, কটেজ-চীজ আছে। খাবে রুদ্রদা?

আমি বললাম, না। ভালো লাগে না।

টবী বলল, সে কি? কটেজ-চিজ ভালো লাগে না কি রকম? আমরা তো প্রতিবার দেশে ফেরার সময় সকলেই এই অনুরোধ করে যে, একটু কটেজ-চিজ নিয়ে এসো।

স্মিতা বলল, কেন? ভালো লাগে না কেন?

বললাম, গন্ধ লাগে। আমার মনে হয় বেশী চিজ খেয়ে খেয়েই সাহেবদের গায়ে বোকা-পাঁঠার মত গন্ধ হয়।

স্মিতা হাসল। বলল, মোটেই নয়।

টবী বলল, অবজেক্‌শান। তুমি সাহেবদের গায়ের গন্ধ শুঁকলে কবে? আমার গায়ে তো শুনি লেবুপাতারই গন্ধ।

স্মিতা রাগের হাসি হেসে বলল, তোমায় কে বলেছে?

তুমিই বলেছ। আবার কে বলবে?

এত অসভ্য না!

বলেই ধরা-পড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্মিতা, তৈরী হয়ে নিতে।

রবিবারের বাজার। ডাঁই-করা খবরের কাগজ ঘরের মধ্যে। রবিবাসরীয় সংখ্যা যে কি জিনিস নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আগে যখন এখনকার থেকেও আমার বুদ্ধি কম ছিল তখন ভাবতাম যে, সায়েবরা কত পড়ে। যে জাত এক রবিবারেই হাজার পাতা কাগজ পড়ে শেষ করে দেয়, সে জাত পৃথিবীময় প্রতাপ খাটাবে না তো কারা খাটাবে?

www.BanglaBook.org

এখানে এসে এদের কায়দাটা জানা গেল। একটা কাগজের রবিবাসরীয় সংখ্যায় তো থাকবে না এমন জিনিস নেই। ধরা যাক বিশেষ সংখ্যাটি পঞ্চাশ পাতার। তার মধ্যে সাহিত্য, গান-বাজনা, মার-ধোর, গোয়েন্দা-গল্প, রোমাঞ্চ গল্প, শ্লীলতাহানির বিবরণ, বিজ্ঞাপন, সিনেমা, ফুটবল, জাজ-মিউজিক, হিপিদের হিক্কাধ্বনি, এ-হেন বিষয় নেই যে নেই। সায়েবরা জমিয়ে ব্রেক-ফাস্ট ট্রেক-ফাস্ট খেয়ে কাগজের পাতায় পাতায় চোখ দুটোকে ফড়িং-এর মত নাচানাচি করিয়ে কিছুক্ষণ পরেই নামিয়ে রেখে দেবেন। কেউ কেউ নিশ্চয়ই বেশীক্ষণও পড়বেন, কিন্তু শুধুই নিজের ভালো-লাগার বিষয়টুকুই। স্বাভাবিক। কেউ দেখবেন সিনেমার পাতা, কেউ খেলা।

টবী টেলিভিসন খুলল। এখানে প্রায় সকলেরই রঙীন টেলিভিসন। শীতের দেশে টেলিভিসনের গুণের তুলনা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে টেলিভিসন লোকের ভালো যেমন করবে খারাপও করবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর বিঘ্ন ঘটবে, এবং অনেকেরই মেদবুদ্ধি, গেঁটে বাত এবং আর্থারাইটিস হবে ঘরে বসে।

এই সব দেশে সন্ধ্যের পর এত ঠাণ্ডা লাগে যে, বাইরে বেরিয়ে পায়জামা আর ফিনফিনে পাঞ্জাবির সঙ্গে চটি ফটাস ফটাস করতে করতে দুখিলি অখয়েরী গুণ্ডিমোহিনী পান মুখে ফেলে যে অফিস থেকে ফিরে পথে ঘাটে একটু সুন্দর মুখটুখ দেখে বেড়াবেন কেউ, সে উপায়টি নেই। বেঁচে থাকুক আমার দেশ। এ দেশে ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে-বসে টেলিভিসন দেখা ছাড়া আর কী করার আছে?

সামনেই ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন।

টেলিভিসনে মিঃ হ্যারল্ড উইলসন, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের বক্তব্য রাখলেন, তারপরই মিঃ এডওয়ার্ড হীথ তাঁর দলের বক্তব্য রাখলেন।

হ্যারল্ড উইলসন ভদ্রলোকের বহু দিনের অ্যাডমায়ারার আমি। ভালো লাগে, তাঁর বাগ্মিতা, বুদ্ধিমত্তা, রসবোধ। তাঁর বুদ্ধিমাজা পাইপ-খেকো চেহারারও ভক্ত আমি খুব।

কিন্তু টবী বলল, সাধারণ ইংরেজের ধারণা এই-ই যে, এবার মিঃ উইলসনের দল জিতলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কারণ মিঃ উইলসন সাহেবের দয়ামায়ায় দেশের সমূহ ক্ষতি হতে যাচ্ছে। উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে, চাকরি-বাকরির অভাব ; প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি। সাধারণ ইংরেজ নাকি আর পারছে না। এবারে মিঃ উইলসনের দলের জারি-জুরি নাকি আর চলবে না।

টবীর কথা যে ভুল তা প্রমাণ করে মিঃ উইলসনই পুনর্বহাল হয়েছিলেন আমি কানাডায় থাকাকালীন, কিছুদিন পরই। তাঁর দলই জিতল।

মিঃ উইলসন সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম একজন ভারতীয়র কাছে, ভিক্টোরিয়া স্টেশানে ; ডোভারের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে। মিঃ উইলসনের গাড়ি ট্রাফিক পুলিশের আলো অমান্য করেছিল বলে পুলিশ 'টিকিট' দিয়েছিল তাঁকে। পরদিন কোর্টে গিয়ে জরিমানা দিয়েছিলেন তিনি। গণতন্ত্রে এবং প্রকৃত গণতন্ত্রে নাকি এমনই হওয়ার কথা!—সেই ভারতীয় বলছিলেন ওখানে নাকি অমনই হয়। সেটাই নাকি নিয়ম। এই আমি

www.BanglaBook.org

সেই গল্প শুনে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম,

আমাদের দেশে তো প্রধানমন্ত্রী বড় কথা, রাজ্যের ছোটখাটো মন্ত্রীদেরই আইন অমান্য করার বহর দেখলে আমাদের লজ্জা হয়। আমাদের হয়, কিন্তু ওঁদের হয় না। স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে, লজ্জা থাকলে নেতা হওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এলে বাস ট্রাম প্রাইভেট গাড়ির যাত্রীদের কপালে বহু দুর্ভোগ লেখা থাকে। আমার দেশে আইনের যাঁরা প্রকাশক তাঁরাই সবচেয়ে বেশী আইন ভাঙেন। পুলিশের গাড়ি যেখানে সবচেয়ে বেশী ট্রাফিক রুলস্ লঙ্ঘন করে, সরকারের সঙ্গে কোনোমতে যুক্ত থাকলেই যে দেশে আইন-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো যায়—সেই আশ্চর্য স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশের স্তব্ধ ও মূঢ় নাগরিক হয়ে, ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্রের রকম দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। কবে যে আমাদের দেশেও ভোটের চেয়ে দেশসেবা বড় হবে, গদীর চেয়ে আন্তরিকতা ও সততা উচ্চতার আসনে বসবে কে জানে? যাঁরা ভোট পান তাঁরা কবে ভোটদাতাদের সেবক বলে ভাবতে শিখবেন? কবে? আমাদের জীবদ্দশায় তা কী দেখতে পারব? নাকি এ জীবন এই হাস্যোদ্দীপক, ন্যক্কারজনক, দুঃখময় ভোটরঙ্গ দেখেই কেটে যাবে?

স্মিতা সেজেগুজে বেরিয়ে বলল, চল। আমার হয়ে গেছে। ফ্ল্যাট বন্ধ করার আগে, ব্যাগের মধ্যে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে ভরে নিল। আপেল নিল কটা। বলল, অ্যাভন নদীর পাশে বসে গাছতলায় রাজহাঁসের সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে লাঞ্চ খাব আমরা এই দিয়ে।

টবী বলল, সর্বনাশ করেছে! তুমিও দেখি কবির মত কথা বলতে আরম্ভ করলে?

স্বাভাবিক। আমি বললাম।

লিফটে ঢুকতে ঢুকতে টবী বলল, কেন? স্বাভাবিক কেন?

বললাম, উদ্ভিদবিজ্ঞানে একটা কথা আছে শুনেছি, 'একুয়ার্ড ক্যারেকট্যারিস্টিকস।'—মানে তুই যদি একটা কলাগাছকে আনারসের বনের মধ্যে পুঁতে দিস তাহলে দেখবি বছর কয়েক বাদে কলাগাছের পাতাগুলো প্রায় আনারসের পাতার মত চেরা-চেরা হয়ে যাচ্ছে।

টবী হো হো করে হাসল।

বলল, খী-খারবার।

তারপরই বলল, কি বুঝলে স্মিতা? বুঝলে কিছু?

স্মিতা বলল, হুঁ।

টবী বলল, ঘোড়ার ডিম বুঝলে। গল্প-নিকিয়ে দাদার কায়দা বোঝোনি—ঘুরিয়ে তোমাকে কলাগাছ বলল।

কি খারাপ? বলে স্মিতা খুব গরম কফিতে আচমকা চুমুক দিয়ে ফেলার আওয়াজের মত একটা আওয়াজ করল।

আমি বললাম, যদি বলেই থাকি, তাহলেই বা আপত্তি কিসের? মাঙ্গলিক ব্যাপার রীতিমত। কালিদাসের বর্ণনায় তো কদলীকাণ্ডবৎ উরু-টুরুর কথা লেখাই আছে। কলাগাছ কি খারাপ?

www.BanglaBook.org

টবী গাড়ির দরজার লক খুলতে খুলতে বলল, খী-খারবার।

এ কি রকম ভাসুরঠাকুর? তুমি কি ভাদ্রবৌ-এর উরু-টুরু এরই মধ্যে দেখে ফেলেছ নাকি?

এবার আমি আর স্মিতা একই সঙ্গে বললাম, অ্যাই টবী। কি হচ্ছে কি?

টবী নির্বিকার।

বলল, আজ সকাল থেকে হাওয়াটা বড় কনকনে। গাড়ি অবধি এসে পৌঁছতে পৌঁছতে ঠাণ্ডা মেরে গেছি। সোয়েটারটাও ভীষণ পাতলা। তাই একটু উরুটুরুর আলোচনা করে গা-গরম করছি এই-ই-যা।

গাড়ির মধ্যে হীটার চালিয়ে দিল টবী।

হু-হু করে ছুটে চলল গাড়ি। সামনে মিঞা-বিবি। বিবির গায়ের সুন্দর পারফ্যুমের গন্ধে গাড়িটা ভরে আছে আর মিঞার গায়ের নেবুপাতা গন্ধ।

পথের এপাশে অনেকগুলো লেন ওপাশে অনেকগুলো লেন। মুখোমুখি ধাক্কা লাগার কোনোই সম্ভাবনা নেই। যে-গাড়ি অপেক্ষাকৃত বেশী জোরে চলছে সেগাড়ি সবচেয়ে বাঁ দিকের লেন দিয়ে যাবে। ইংলণ্ডের পথের নিয়ম আমাদের দেশের মত। রাইট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ গাড়ি এবং কীপ টু্য দ্যা লেফট নিয়ম। অ্যাসফাল্টের একটি লেন। বাঁদিকেও ওরকম আছে। একেবারে ডানদিকে পার্কিং-এর জন্যে বা থেমে থাকার জন্যে। এখানে বলে সফ্‌ট শোল্ডার। লেনগুলো সব কংক্রীটের। এক লেন থেকে আরেক লেন পৃথক করা হয়েছে আগাগোড়া মাইলের পর মাইল রাস্তায় সাদা দাগ দিয়ে। তার উপরে উপরে ক্যাটস্-আই। রাতের বেলায় হেডলাইটের আলোয় জ্বলে।

হু-হু করে গাড়ি ছুটছে। গাড়ির কাঁচ তোলা বলে বাইরের দৃশ্য ছাড়া গন্ধ স্পর্শ কিছুই পাবার জো নেই। এদিক দিয়ে আমাদের দেশ বড় ভালো। কেমন কাঁচ নামিয়ে দিব্যি হাওয়া-বৃষ্টি খেতে খেতে যাওয়া যায়।

একটা কালো রোলস্-রয়েস গাড়ি টবীর গাড়ির সামনে সামনে যাচ্ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—লেন চেঞ্জ করে বাঁ-পাশের লেন থেকে টবীর গাড়ি যে লেনে ছিল সেই লেনে এল।

হঠাৎ টবী হর্ন বাজাল, পিঁক্। কিন্তু মাত্র একবারই বাজাল।

হর্ন বাজাতেই প্রথম খেয়াল হল যে, এতাবৎ এই ম্লেচ্ছদের দেশে আসা ইস্তক একেবারেই গাড়ির হর্ন শুনিনি। ঠাণ্ডা দেশে এসে কানের কোনো গোলমাল হল কিনা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। তারপর লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাঙাল দাদা তালেবর ভাইকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, আচ্ছা, হর্নটা বাজালি কেন? তোর গাড়ির হর্নই শুনলাম। এতদিন খেয়াল করিনি একেবারেই যে, এখানের কোনো ড্রাইভার হর্ন বাজায় না।

টবী বলল, তুমি লক্ষ্য করেছ দেখছি। আসলে এখানে কোনো গাড়ি অন্য কোনো গাড়িকে উদ্দেশ্য করে হর্ন বাজানো মানে, তাকে বকে দেওয়া।

আমি বললাম, [illegible] কি? বকে দেওয়া মানে?

www.BanglaBook.org

মানে আর কি! অ্যাই চোপ, বেয়াদপ—গাড়ি চালাবার নিয়ম-কানুন না মেনে অসভ্যর মত ইন্‌কন্‌সিডারেটের মত গাড়ি চালাচ্ছ কেন?

এতক্ষণে মানে বুঝলাম।

এখানে আসার পর কন্‌সিডারেশন কথাটারও মানে বুঝছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইংরিজী অভিধানে যেসব কথা লেখা আছে সেগুলোর অনেকগুলোই ইংরেজদের কাছে শুধু কথা মাত্র নয়—তার চেয়েও বেশী। এক একটা কথার পিছনে ঐতিহ্যময় এক একটা ইতিহাস আছে। সে ঐতিহ্য অবহেলা করার নয়। যে-জাত এত শ' বছর তামাম দুনিয়ার উপর ছড়ি ঘোরাল—সেই জাত আজকে গরীব এবং কোণঠাসা হয়ে যেতে পারে হয়ত কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে এখনও তাদের থেকে।

আমার বাবা বলতেন, পৃথিবীতে কোনো লোকই খারাপ নয়। খারাপ বলে কিছুই নেই দুনিয়ায়। যা খারাপতম, অন্ধকারতম যা ; তারও একটা ভালো অথবা আলোকিত দিক থাকে। বলতেন, সব সময় সেই আলোকিত দিকটার দিকে তাকিয়ে থেকো—অন্ধকার দিকটাকে উপেক্ষা কোরো, তবেই বুঝতে পারবে এ পৃথিবীতে খারাপ মানুষ কেউই নেই। খারাপ ব্যাপারও বেশী কিছু নেই।

বাবার এই দশ লাখ টাকা দামী উপদেশ জীবনে কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছি জানি না, কিন্তু উপদেশটা মনে হয় একেবারে ফেলা যায়নি। নইলে যে জাত আমাদের এত বছর শুষে গেল, নেটিভ নিগার বলে গাল পাড়ল গাণ্ডে-পিণ্ডে, সে জাতের ভালোটাই কেন চোখে পড়ে আগে? আগে আগে বইপত্রে যা পড়েছি তা পড়েছি ; কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারছি প্রতিমুহূর্তে যে গণতন্ত্র বলে যদি এখনও কিছু থেকে থাকে তবে তা সবচেয়ে বেশী আছে এই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই। জানি যে, 'আছে' কথাটা আপেক্ষিক। কানা-মামা নাই-মামার চেয়ে ভালো বলেই জেনে এসেছি চিরদিন। তাই বলতে হয়, আছেই। না থাকলে এত বছর অলিখিত সংবিধান নিয়ে এরা কেমন করে দিব্যি হেসেখেলে চালিয়ে গেল! ভদ্রতাও আছে, যা আমাদের এখনও শেখার!

আমরা স্বীকার করি আর নাই-ই করি এই ঠাণ্ডা দেশের লোকগুলোর গণতান্ত্রিক বিশ্বাস, আদালতের প্রতি সম্মানবোধ এবং আদালত ও প্রশাসনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবধানকে মেনে চলার দৃষ্টান্ত অনেক দেশের সংবিধান রচয়িতাদেরই অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই যখন দেখি যে অনেক দেশেই সংবিধানটা যেন বারোয়ারী হরিসভার চালাঘরের চাল হয়ে উঠেছে, যে পাচ্ছে, সেই-ই এক খাব্‌লা খড় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে উনোন ধরাচ্ছে, তখন ভারী আশ্চর্য ঠেকে।

স্মিতা হঠাৎ চিন্তার-জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চকোলেট খাবে রুদ্রদা?

আমি হাত বাড়িয়ে চকোলেট নিয়ে মুখে পুরে আবার ভাবতে লাগলাম—বাইরে তাকিয়ে।

স্মিতা মুখ ফিরিয়ে, যোগিনীর মত শ্যাম্পু-করা চুল দুলিয়ে বলল, কি ভাবছ বল না রুদ্রদা?

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি।

স্মিতা আবার বলল, বল না বাবা!

বাপীর সঙ্গে অনেকানেক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমার দেশের সঙ্গে এ দেশের তুলনামূলক আলোচনা। মনটা খারাপ লাগে দেশের কথা ভাবলে। তখন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবুও স্মিতার পীড়াপীড়িতে বললাম, অনেকদিন আগে 'আয়নার সামনে' বলে একটা গল্প লিখেছিলাম আমি। সেই গল্পের যে নায়ক, তার বাবা ছিল জমিদার। আমাদের দেশের দশজন জমিদার যেমন হয়ে থাকে। বাবার মৃত্যুর পর সে সমবায়িক ভিত্তিতে তার সমস্ত জমি প্রজাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে একসঙ্গে চাষ করে ফসল ভাগ করে নিত সমান করে। তার ইচ্ছে ছিল, দেশের জন্যে অনেক কিছু করে, ভালোবাসত যে তার দেশকে ; দেশের লোককে।

আমার গল্পের নায়ক, উত্তরপ্রদেশের ছেলে রাজিন্দর অনেক ভাবত টাবত। তার বাবা যে জলসাঘরে বাইজী নাচাত সেই জলসাঘরে সে চারটে কালো অ্যালসেসিয়ান কুকুর পুষেছিল। একজনের নাম দিয়েছিল মালিক ; অন্যজনের নোকর। আর দুজনের নাম দিয়েছিল আমীর আর গরীব। এই চারটে কুকুরকে রাজিন্দর খাইয়ে রেখে, না-খাইয়ে রেখে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কুকুরের বাচ্চাদের মধ্যে থেকে বাঘের বাচ্চার মত নেতা জন্মায় কিনা তাই দেখবার চেষ্টা করছিল।

স্মিতা আর টবী একসঙ্গে বলে উঠল, বলো না, তারপর কি হল তোমার গল্পের। নেতা জন্মাল?

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, গল্পটা অনেক বড়। পুরোটা বলা যাবে না। বলে লাভও নেই।

স্মিতা বলল, তবুও বলো। শেষে কী হল, বলো।

আমি বললাম, শেষটা বলার মত নয়।

তারপর বললাম, দেশকে ভালো-টালো বেসে দেশের লোককে ভাই-বিরাদর ভেবে শেষকালে রাজিন্দর বুঝতে পারল—ধীরে ধীরে বুঝল যে তা নয়, হঠাৎ ধাক্কা খেয়েই বুঝল যে, দেশকে ভালোবাসার মত বোকামি আর নেই। বুঝল যে, কুকুরের বাচ্চাদের নেতা কখনোই বাঘের বাচ্চার মত হয় না। একথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বুঝে রাজিন্দর সেই আমীর গরীব, নোকর ও মালিক চার কুকুরকেই গুলি করে মেরে ফেলে নিজেও আত্মহত্যা করে মরল। মরে যাবার আগে অত্যাচারী, প্রজার-ঘামে ফুর্তি ঝরানো, পায়রা-ওড়ানো জমিদার বাবার জলসাঘরের কাঁচের দেওয়ালে হতাশার আলকাতরা দিয়ে লিখে গেল রাজিন্দর যে, কুকুরের বাচ্চাদের নেতা কখনোই বাঘের বাচ্চা হয় না।

স্মিতা বলল, ঈ-স-স-স্!

টবী বলল, খাসা গল্পো তো! এমন গল্পো বানাও কি করে? যাকগে, ছাড়ো তো দেখি! এই সামনেই একটা ভিলেজ-পাব আছে—চলো একটু বীয়ার খাওয়া যাক। তোমার গল্পো শুনে তালু শুকিয়ে গেছে—অন্যসব দিশী লেখকদেরও কী তোমার মত ভীমরতি ধরেছে

www.BanglaBook.org

নাকি? প্রেমের গপ্পো ছেড়ে এসব কি কুকুর-মেকুর নিয়ে লেখা? ছ্যা ছ্যাঃ!

আমি লজ্জা পেলাম।

হঠাৎ টবী বলল, এই যাঃ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম আমাদের এ পথে আসার সময়ে ইটনের রাস্তা দেখলে না? ইটন ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে নামকরা পাবলিক স্কুল—জানো?

বললাম, তাই তো শুনেছি।

স্মিতা বলল, কেন? হ্যারোও সেরকমই ভালো। লর্ড ফ্যামিলির ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় ঘরের বড় বড় লোকের ছেলেরা এসব স্কুলে পড়ে। চিরদিন পড়েছে।

টবী শুধোল, আমাদের পণ্ডিতজী যেন কোন্‌টাতে লেখাপড়া করেছিলেন?

স্মিতা বলল, দুটোর মধ্যে একটাতে। কোন্‌টাতে ঠিক মনে নেই।

স্মিতা বলল, ছাড়ো, সে কি আজকের কথা?

টবী গাড়িটা পথের উপরের ছোটখাটো পাব্‌টার পাশে রাখল। লতানো জংলী গোলাপে ছেয়ে আছে দেওয়াল। কুঁড়ি ধরেছে লাজুক-লাজুক। আরো নানারকম লতাতে সমস্ত সামনের দিকটা ছেয়ে আছে ছোট সরাইখানার।

গাড়ি লক করে আমরা পাবের ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে কুসুমগরম। আজ ছুটির দিন। এখানে ওখানে কিছু অল্পবয়সী ছেলে জোট পাকিয়ে বসে, বীয়ার খাচ্ছে। মাঝ-বয়সী একদল নারী-পুরুষ গোল-টেবিলে জমিয়ে বসে পরনিন্দা-পরচর্চা করছে।

টবী বলল, জানো তো ; ছোঁড়াগুলো মহাপাজী। বাড়িতে বৌকে বলে আসবে ফুটবল খেলতে যাচ্ছি। ফুটবল খেলাটা ছুতো। বলের পেটে গোটাকয় এলোপাতাড়ি লাথি মেরে গুচ্ছের বীয়ার গিলে দেরী করে বাড়ি ফিরে বৌকে বলবে, বড় ক্লান্ত। খেলে এলাম।

স্মিতা বলল, আহা! যেন দেশের লোকে বৌকে গুল না মারে?

টবী সঙ্গে সঙ্গে বলল, কেন? আমি মারি না।

স্মিতা হো-হো করে হেসে উঠল, তুমি আবার মারো না।

টবী কি যেন একটা পানীয় নিল।

আমাকে বলল, কি খাবে তুমি?

আমি বললাম, তুই ত্রিফলা-ভেজানো জলের মত দেখতে ওটা কি খাচ্ছিস?

টবী বলল, খী খারবার! ত্রিফলার জল কেন হবে, এটা এল্‌!

সমারসেট মমের উপন্যাস 'কেকস্‌ অ্যাণ্ড এল্‌'-এ প্রথম এল্‌-এর কথা পড়ি।

ভাবলাম, এই অভাগার কপালে যখন এল্‌ চাখবার সুযোগ এসেছে তখন চেখেই দেখা যাক।

আমি বললাম, আম্মো খাবো।

তারপর বললাম, স্মিতা তুমি?

স্মিতা বলল, এ্যাপল জুস্‌।

বললাম, তুমি এল্‌ খাও না? টবী তো মনে হচ্ছে ভালোবাসে।

www.BanglaBook.org

স্মিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, শুধু 'এল্' কেন? ও তো 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত সবকিছুই ভালোবাসে।

আমি হাসলাম।

মুখের হাসি শুকোতে না শুকোতেই স্মিতা বলল, এতক্ষণ তো হ্যারো আর ইটনের গল্প খুব হল। তুমি কোন স্কুলে পড়তে রুদ্রদা?

আমি হ্যারো এবং ইটনের সঙ্গে একটুও পার্থক্য না রেখে এক নিঃশ্বাসে বললাম, তীর্থপতি ইনস্টিট্যুশান।

টবী ফিক্ করে হাসল। ওর মুখ চলকে এল্ গড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে চট করে বিলিতি কায়দায় বলল, এক্সকিউজ মি!

আমি সোজা ওর চোখে তাকিয়ে বললাম, তোর হাসি দেখে মনে হচ্ছে তুইও বোধহয় ইটনে বা হ্যারোতে পড়তিস? পড়তিস তো তুই চেতলা বয়েজ স্কুলে—সে কি আমার স্কুলের চেয়ে অনেক বেশী ভালো?

টবী তখনও হাসছিল।

বলল, তা নয় ; তখন আমরা বলতাম ঃ

'যার নেই কোনো গতি
সে যায় তীর্থপতি।'

আমি বললাম, খবর্দার স্কুল তুলে কথা বলবি না।

স্মিতা খিলখিল করে হাসছিল।

আমার 'খবরর্দার' শুনে চারদিক থেকে অনেক মোটা-রোগা সাহেব- মেম ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকাল আমার দিকে

আমি ও উল্টে তাকালাম। মনে মনে বিড়বিড় করে বললাম, তোমাদের নিয়ম তোমাদের নিয়ম, আমাদেরটা আমাদের। তোমরা পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে আসার পর আমরা যে কী জব্বর সায়েব হয়েছি তা যদি তোমরা একটিবার আমাদের দেশে গিয়ে দেখতে বাবুসায়েব তবে তোমাদের আত্মশ্লাঘার আর শেষ থাকতো না। কিন্তু আমি তো বাঙাল। বাঙালই আছি। তোমরা ভুরুই কুঁচকোও আর যাই-ই করো।

আসলে সাহেব-মেমগুলো ভীতু হয়। চোখে চোখে কটমট করে তাকালে ভয় পেয়ে যায়, আফটার অল আমরা কাপালিকের দেশের লোক—চোখে চোখে চেয়ে ভস্ম করে দেওয়াই বা আশ্চর্যি কি?

ওরা একটু তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

হঠাৎ আমি টবীকে শুধোলাম, আচ্ছা কাপালিকের ইংরিজী কি রে? টবী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর উত্তর জানে না বলে বলল, একটু পরই তো শেক্সপীয়রের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, তাঁকেই জিজ্ঞেস কোরো না বাবা!

স্মিতাকে বললাম, আচ্ছা সাহেবদের গাত্রবর্ণের সঙ্গে সাঁতরাগাছির ওলের তুলনা কোথায় আছে বলতে পারো?

www.BanglaBook.org

স্মিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান; ভেবে নিই একটু।

পরমুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে বলল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর মহাস্থবির জাতক বইয়েতে পড়েছি।

আমি বললাম, সাব্বাস্! জিতা রহো ভাদ্দরবৌ!

সেই গাঁয়ের পাব্‌টা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আসার পরই অ্যাভন নদী পেরিয়ে এলাম আমরা। পেরিয়ে এসেই গাড়ি দাঁড় করাল টবী।

গাড়ি দাঁড় করাতে কম ঝামেলা পোয়াতে হল না। গাড়িতে গাড়িতে অর্থাৎ কারে কারে কারাক্কার। তিল ধারণের স্থান নেই।

ওঃ, বলতে ভুলে গেছিলাম, এখানে এসে পৌঁছবার আগে টবী বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবার মত পথিপার্শ্বে অক্সফোর্ডে নিয়ে গেছিল।

আমার, অন্যান্য অনেকানেক বাঙালের মতই ধারণা ছিল অক্সফোর্ডও শান্তিনিকেতন কি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি সমৃদ্ধ ও একীভূত ব্যাপার। কিন্তু টবী যা বলল ও দেখাল তাতে দেখলাম বহু ছড়ানো-ছিটানো কলেজ। মানে একটি প্রকাণ্ড কলেজ পাড়া। বহু পুরানো সব স্যাঁতসেঁতে হিম-কন্‌কনে ইমারত। সঙ্গে হোস্টেল-টোস্টেল বা গীর্জা-টির্জাও আছে। এই সব বিভিন্ন কলেজ-ছাত্রাবাস ইত্যাদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

সত্যি কথা বলতে কি দেখে রীতিমত হতাশ হলাম। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতরে যেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভয় ভয় ভাব—এখানেও তেমন। পাণ্ডাদের অত্যাচার আছে কি নেই অত অল্প সময়ে বোঝা গেল না। তবে আমার যে পিসীর মেজ জামাই অক্সফোর্ডের এম.এ. বলে আমাদের সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা বলে এসেছেন চিরটাকাল, এবং আমাদের মুনিষ্যি বলেই গণ্য করেননি, তাঁর প্রতি এক হঠাৎ ধিক্কারে মনটা ছাতারে পাখির মত ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে উঠল।

অ্যাভন নদীটি বেশ। নদী বলা ঠিক নয়। আমাদের কলকাতা তার কেওড়াতলার গঙ্গার চেয়ে সামান্য চওড়া। তবে রূপটি ভারী শান্ত; স্নিগ্ধ।

টবী বলল, কেমন বুঝছ?

আমি বললাম, দারুণ।

কি দারুণ?

জায়গাটা।

লোকটাও দারুণ। স্মিতা বলল।

এমন জায়গায় না জন্মালে শেক্ষপীয়র যক্ষপীয়রও হতে পারতেন।

দুম করে টবী বলল।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, মুনি-ঋষিদের সম্বন্ধে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলতে নেই।

www.BanglaBook.org

টবী চটে গিয়ে বলল, কেন? নেই কেন? রবিঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে না জন্মে যদি কাকদ্বীপের কাঁকড়া-ধরা জেলের বাড়ি জন্মাতেন তাহলে কি এই রবিঠাকুর হতেন।

স্মিতা কথা কেড়ে বলল, এই রবিঠাকুর না হলেও কাকদ্বীপের সেরা কবিয়াল যে হতেন সে বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ আছে?

আমি চটে উঠে বললাম, তোরা থামবি? শেক্সপীয়রের বাড়ি কোনটা তা দেখাবি?

টবী দার্শনিকের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় থুতনী নাচিয়ে বলল, "As you like it."

স্মিতা হেসে উঠল। বলল, বাঃ বাঃ স্ট্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে এসে একেবারে শেক্সপীয়রী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলে যে!

টবী অনাবিল ও সারল্যময় অজ্ঞানতার সঙ্গে বলল, মানে বুঝলাম না।

স্মিতা আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে বলল, কাণ্ডটা দেখলে রুদ্রদা। বুঝতে পারছ কি অকালকুষ্মাণ্ডকে বিয়ে করেছি?

টবী সেই নিষ্পাপ মুখেই বলল, খী-খারবার! এ কি হেঁয়ালি রে বাবা।

স্মিতা কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের দিদিমণির মত গলায় বলল, 'As you like it,' শেক্সপীয়রের একটি বইয়ের নাম।

টবী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, অঃ! তুমি পড়েছ বুঝি? তা পড়ে থাকবে। সাহিত্যের ছাত্রী ছিলে তুমি। কিন্তু BREAK-EVEN POINT? মানে, না তুমি বলতে পারো, না তুমি পড়েছ। না কি তোমার শেক্সপীয়রই পড়েছিলেন?

বলেই বলল, অমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে লোককে হেয় কোরো না। সবাই সব জানে না।

আমি বললাম, এবারে কিন্তু সত্যিই তোরা ঝামেলা করছিস।

টবী কথা ঘুরিয়ে বলল, এসো, আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে বাড়ি দেখাই।

কিন্তু সেই সরু রাস্তার ছোটখাটো দোতলা কাঠের বাড়িতে ঢোকে কার সাধ্যি!

ট্যুরিস্ট বাসের পর ট্যুরিস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা লাইন পড়েছে দর্শনার্থীদের।

টবী বলল, দাঁড়িয়ে পড়ো লাইনে। এখানে ইট পাতার সিসটেম চালু হয়নি এখনও।

আমি বললাম, নাঃ।

টবী বলল, এই জন্যেই তোমাকে ভাল লাগে রুদ্রদা। এ কী আদিখ্যেতা বল দেখি! তিনি কোথায় শুতেন, কোথায় বসতেন, কোন বাথরুমে যেতেন এসব দেখবার জন্যে এই যে গুচ্ছের সব মোটা মেমসায়েব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখছ তাদের বেশীর ভাগের বিদ্যেই আমার মত। তবু, শেক্সপীয়রের শোওয়ার ঘর না দেখলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো এদের। এও যেন নীলের ব্রত। না মানলে শাশুড়ী চটে যাবে। খী-খারবার!

টবীর কথায় পুরোপুরি সায় না দিতে পারলেও একেবারে যে ওর কথা উড়িয়ে দেওয়ার তাও নয়। আমি অন্তত কখনও অমন বাথরুমে উঁকি দেওয়া ঔৎসুক্য বা ভক্তিতে বিশ্বাস করিনি। তার চেয়ে বরং চারপাশটা ঘুরে দেখা ভালো।

www.BanglaBook.org

অ্যাভন নদীতে রাজহাঁস চরছিল। ছোট ছোট নৌকো ছিল চড়ার জন্যে। আজ থেকে বহুদিন আগের, শেক্সপীয়রের ছোটবেলায় এই নদী, নদীর পারের উইলো গাছ এখন না-দেখতে পাওয়া উইন্ডমিল সব কেমন ছিল তা কল্পনায় অনুমান করতে ভালো লাগে। এই ভালোলাগাটুকুই, পুরনো অতীতের বেলজিয়ান কাঁচের আয়নার ভেঙে-যাওয়া টুকরো টুকরো কল্পনার আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তাকে দেখতে যত সুন্দর লাগে, আজকের সস্তা কাঁচের বর্তমানে তাকাতে ততখানি সুন্দর আমার কখনোই লাগে না। হয়ত নগ্ন বর্তমানের চেয়ে অস্পষ্টতার কুয়াশা-ঘেরা অপ্রতীয়মান অতীতই আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয় বলে।

তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, যদিও ভয়ে ভয়েই বলছি, শেক্সপীয়রকে আমি কখনোই রবিঠাকুর বা টলস্টয়ের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারিনি। তিনি প্রকাণ্ড প্রতিভা ছিলেন সন্দেহ নেই। বহুমুখীন—তাতেও তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। কিন্তু যেহেতু আমরা ইংরেজশাসিত ছিলাম, সেইহেতু, ব্রিটিশ সার্জেন্ট-মেজর, স্কচ-হুইস্কি, কটেজ পিয়ানো গ্র্যান্ডফাদার ক্লক শেক্সপীয়রের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সম্বন্ধে কারো কোনো দ্বিমত থাকতে পারে যে, একথা মনে করার মত দুঃসাহস হয়ত আমাদের রক্ত-কণিকাতে কখনও সঞ্চারিত হয়নি।

আমার এই ধৃষ্টতায় যদি কোনো জ্ঞানীগুণী পাঠক ক্রুদ্ধ হন তাহলে পূর্বাহ্ণেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। নিজগুণে তাঁরা মার্জনা করবেন আশা করি। যেটা বললাম, সেটা আমারই একান্ত মত। অর্বাচীন মূর্খের মতামতে পণ্ডিত জনের উষ্মার কারণ ঘটা উচিত নয়।

পথের দু-পাশে দোকান-পাট। ইংরেজ বেনেরা যেখানে পাচ্ছে বোকা ট্যুরিস্টদের পকেট-কাটছে। এদের পকেট-কাটার নমুনা দেখে ইঁদুরের বালিশ ও কাগজ কাটার কথা মনে পাড় যায়। ইঁদুরদের একটা দাঁত থাকে আত্মঘাতী দাঁত। প্রতিনিয়ত কাটাকুটি করে—সেই দাঁতকে তাদের ক্ষুইয়ে ফেলতে হয়। নইলে সেই দাঁত তাদের মগজ ফুটো করে তাদের মরার পথ বাঁধিয়ে দেয়। অতএব প্রয়োজন থাকুক কি নাই-ই থাকুক নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের অবিরাম লেপ, তোষক, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ইত্যাদি তাবৎ কাটিতব্য বস্তুকে কেটে যেতে হয়। ইংরেজদেরও বোধহয় এমন কোনো গুপ্ত দাঁত-টাঁত আছে। অন্যের পকেট অবিরাম না কাটলে তাদের মরার সময় যে ত্বরান্বিত হবে একথা তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে জেনে এসেছে। অতএব ঘরে-বাইরে কুটুর কুটুর কেটে যাচ্ছে ইংরেজ। খিদে থাক আর নাই-ই থাক।

হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে একজন সায়েব কার্জন-পার্কের কান পরিষ্কার করনেওয়ালা বাহাদুরদের মত একটা থলে মত নিয়ে, কক্‌নী ভাষায় কি যেন কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলতে বলতে চলে গেল।

আমি থমকে পড়ে টবীকে শুধোলাম, কি ও ? কিসের ফেরিওয়ালা? হজমীগুলির? টবী হাসল।

বলল, ওরা কি সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশ খায়। না বিরিয়ানী পোলাউ? খায় তো আলুসেদ্ধ, কফিসেদ্ধ। তারই গাল-ভরা নাম ডিনার। বদ-হজমের ব্যারাম এদের নেই। এ পোকা-

www.BanglaBook.org

মাবড় তেলাপোকা মারা কোনো ওষুধ-টষুধ হবে।

আমি বললাম, আসার আগে আমার খেয়াল হয়নি একবারও নইলে পেটেন্ট এন্ড ট্রেডমার্কের পৃথিবীখ্যাত স্পেশ্যালিস্টস্ ডি.পেনিং এন্ড ডি. পেনিং-এর পার্টনার রবার্ট ডিপেনিংকে বলে সুর্নিমল বসুর ছারপোকা মারার ওষুধটা এখানে পেটেন্ট করে নিতাম।

স্মিতা বলল, ওষুধটা কি রকম?

বললাম, ওষুধটা হোমিওপ্যাথীর শিশিতে বিক্রী হত। লাল-নীল-ওষুধ। সঙ্গে ব্যবহার বিধিও লেখা থাকত। নাম ছিল, ছারপোকা বিধ্বংসী পাচন। সঙ্গে ব্যবহার বিধিও থাকত। তাতে লেখা থাকত, 'সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া মুখ হাঁ করাইয়া এক ফোঁটা গিলাইয়া দিবেন। মৃত্যু অনিবার্য।'

ভাদ্র বৌ-এর ছুটি শেষ হয়ে গেছে।

টবী তাকে যে কর্তব্য দিয়েছিল তা সে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে। বাঙাল ভাসুরঠাকুরকে পথঘাট চিনিয়ে দিয়েছে, লানডানারদের রাহানসাহান খাল-খরিয়াৎ সমঝিয়ে দিয়েছে। এবার সে তার কমপুটারের কাজে ফিরে গেছে।

অফিস যাওয়ার আগে সেদিন সে শুদ্ধ ও পরিমার্জিত বাংলায় যা বলল তা খারাপ ভাষায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে টা-টা-বাই-বাই, খোদার ষাঁড় এবার চরে-টরে খাও।

ফ্ল্যাটের একটা চাবি আমার কাছে আর একটা স্মিতা নিয়ে গেছে। টবী দেরীতে ফেরে। টবী ফেরার আগেই হয় আমি নয় স্মিতা ফিরে আসব বা আসবে।

টবী অফিস বেরোবার আগে ফিসফিস করে বলল, বেডরুমটা বন্ধ থাকবে তবে তোমার ঘর এবং ড্রইংরুম খোলা। ড্রইংরুমের মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা আছে—নরম সাদাটে সোনালি-রঙা বড় বড় রেশমী লোমওয়ালা ছাগলের চামড়াও পাতা আছে—তোমার শুধু কাউকে ধরে আনতে হবে। তারপর কোনোই কষ্ট হবে না। হাঁটু ছড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফার্স্ট ক্লাস বন্দোবস্ত।

আমি বোকার মত হাসলাম।

আমার ভায়া তো জানে না যে আমার এলেম কতদুর। আমার সব গল্পের নায়কই একেবারে ওয়ার্থলেস। গল্পের নায়ক যখন নায়িকার বাড়ি যায় তখন নায়িকার স্বামী প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। তবুও আমার নায়ক এমনই মরালিস্ট যে নায়িকার সুন্দর হাতে হাত রেখে নায়িকার বানানো চা সিঙাড়া সহযোগে খেয়ে দুপুরবেলায় উদোম টাঁড়ে চড়ে বেড়ানো গরুর মত প্রচণ্ড শব্দ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পেলে সে নায়িকার বাড়ি থেকে চলে আসে। আমরা গল্পের নায়কদেরই যখন এতটুকু সাহস নেই তখন গল্পকারের সাহস যে কতটুকু তা তো গল্পকারই জানে।

ওরা চলে গেলে ধীরে সুস্থে চা করলাম। চা বানালাম বার দুই। একার জন্যে আর ব্রেকফাস্টের ঝামেলা করলাম না।

নর্থওল্ট টিউব স্টেশান থেকে পিকাডিলি সার্কাসে পৌঁছেই একটা কাণ্ড হলো। এক বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ দম্পতি হঠাৎই নার্ভাস আমাকে ধরে কেয়ারিনক্রসে কি করে যাবেন তা

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রাবস্থায় কেয়ারিন্‌ক্রসের ইকনমিক্সের বই পড়েছিলাম। সেই লেখকের সঙ্গে এ জায়গার সম্পর্ক আছে কিনা বুঝলাম না?

অত্যন্ত বিজ্ঞের মত তাদের সব সম্‌ঝিয়ে-টম্‌ঝিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক বিস্তর থ্যাঙ্ক-উ ট্যাঙ্ক-উ বলার পর খোলা চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে শুধোলেন, 'হোয়ার উ ফ্রম।'

পরবর্তী দিনগুলোতে এ প্রশ্ন বহুব্যার শুনতে হয়েছে।

কিন্তু প্রথমবার অবাক লাগল।

বললাম, ইন্ডিয়া।

ভদ্রলোক বললেন, আমি তাই অনুমান করেছিলাম।

আমি বললাম, মশায়ের নিবাস?

ভদ্রলোক বললেন, আয়ারল্যাণ্ড। আমার বয়স বাহাত্তর। সারা জীবন কাজ-কর্ম করে সস্ত্রীক এই প্রথম লানডানে এলাম। শহরে দেখতে।

সেকথা শুনে বহরমপুরের লোকের মত আমার আবারও বলতে ইচ্ছে হল, বলেন কি গো আপনি?

কিন্তু বলা হল না।

নিজেকে খুব খুশী খুশী লাগল। আমি এই বয়সেই যদি কলকাতা থেকে লানডান দেখতে এসে থাকতে পারি তাহলে এই বাহাত্তুরে আইরিশ বুড়ো-বুড়ির চেয়ে আমি যে বেশী ভাগ্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

লানডানে ট্যুরিস্টরা এসেই যা-কিছুকে প্রধান করণীয় কর্তব্য বলে মনে করে আমি তার কিছুই করলাম না। কারণ, আমার ভালো লাগে না। সবাই যা করে তা করতে আমার কখনোই ভালো লাগেনি।

রানীর বাড়ির গার্ড বদল দেখতে গেলাম না, মাদাম টুসোর মোমের গ্যালারী দেখতে গেলাম না, বাকিংহাম প্যালেস, দশ নম্বর ডাউনীং স্ট্রীট এমন কি শার্লক হোমসের বাড়ি পর্যন্ত না। কিছুই না করে পিকাডিলি সার্কাসের পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এক ফিরিওয়ালার, যে একটা বন্ধ দোকানের শো-কেসের রকে বসে জাম্পিং-বীনস্ বিক্রী করছিল, পাশে থেবড়ে বসে পড়ে তার সঙ্গে গল্প জমালাম।

মানুষ, সে যে-দেশের মানুষই হোক না কেন আমাকে যত আকৃষ্ট করে, তাদের সঙ্গে যত সহজে একাত্মতা বোধ করি; তেমন কোনো বাড়ি ঘর স্মৃতিসৌধ কিছুর সঙ্গেই কখনও করিনি। ইতিহাসের প্রতি আমার অবজ্ঞা নেই—কিন্তু অতীত ইতিহাসের চেয়ে বর্তমানের একজন্য সাধারণ অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ আমাকে অনেক বেশী আকর্ষণ করে। মানুষের চেয়ে বেশী ইন্টারেস্টিং মনুমেন্ট অথবা জীব-জন্তু আমার আজও চোখে পড়েনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারি আমি অচেনা অজানা মানুষদের মধ্যে। তারা যত সহজে আমাকে আপন করে নিতে পারে অথবা আমি তাদের; সেটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

www.BanglaBook.org

সকলে বলেন যে, ইংরেজ জাতটা খুব রিজার্ভড। কেউ পরিচয় না করিয়ে দিলে তারা কারো সঙ্গেই পরিচিত হতে চায় না। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে যে কথাটা সর্বৈব ভুল। ওদের দম্ভ ও গাম্ভীর্যটা পুরোপুরি বাইরের মুখোস। আমার মতটা নির্ভুল না-ও হতে পারে।

এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে-টেবে এই সিদ্ধান্তেই শেষ পর্যন্ত উপনীত হওয়া গেল যে পৃথিবীর তাবৎ স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই রকম। রঙের কিছু হের-ফের আছে। সে নিছকই প্রাকৃতিক কারণে। যে-কারণে সুন্দরবনের বাঘের গায়ের রঙ আর হাজারীবাগের বাঘের গায়ের রঙের তারতম্য ঘটে সেই একই কারণে মানুষদের গায়ের রঙে তারতম্য ঘটে। তাছাড়া মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে ধূসর রঙা যে পদার্থটি ব্রহ্মাসাহেব মগজে ইনজেকশান দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান তাতে সাহেব ও বাঙালীর মধ্যে কোনোরকম তারতম্য রাখেন না। পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের 'বেসিক ইমোশান' একই রকম। সে কারণে আফ্রিকান ওকাপীর পক্ষে সাউথ আমেরিকার বাঁদরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমানো যতখানি কঠিন তার তুলনায় আমার পক্ষে একজন অপরিচিত ইংরেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমানো ঢের সহজ।

তবে সায়েবগুলো ছোটবেলা থেকে যাত্রাটা ভালো করতে শেখে। ওদের বুদ্ধি-সুদ্ধি সব বোগাস। ওরা বেনের জাত বটে কিন্তু কলকাতার বড়বাজারের যে-কোনো মারোয়াড়ী ব্যবসাদার বা নদীয়া জেলার পলাশীতে শিকড় গেড়ে বসা পূর্ববঙ্গের যে-কোন সাহাবাবু এদের কানে ধরে বেনে-বুদ্ধি শিখিয়ে দিতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি এদের খুব কাছে থেকে দেখার পর আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে কি করে এরা আমাদের উপর এতদিন প্রভুত্ব করে গেল!

মনে হয় প্রভুত্ব করাতে এদের যতটুকু বাহাদুরী ছিল, দাসত্ব স্বীকারে আমাদের বাহাদুরী তার চেয়ে প্রবলতর ছিল। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছে যাঁর ধমনীতে মাতৃকুল-পিতৃকূলের জমিদারী নীল রক্ত বাহিত হচ্ছে বলে সকলে জানে। একদিন আমারই সামনে তার বুড়ো আঙুলে পিন ফুটে যাওয়ার রক্তপাত ঘটে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার পরও তাঁর রক্তের সঙ্গে কচ্ছপের রক্তের রঙের কোনো পার্থক্য আমার নজরে আসেনি।

তিনি এক সাহেবী কোম্পানীতে কাজ করেন। সাহেবরা পান খাওয়া অপছন্দ করেন বলেই তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও পান খান না সেই কারণেই তাঁর অফিসে আমায় যখনই যেতে হয় আমি ধর্মীয়ভাবে চার খিলি পান মুখে পুরে তাঁর কাছে যাই। তাঁর বাড়ির বারান্দায় এখনও ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জের গুঁফো ছবি টাঙানো আছে এবং তাঁর অন্নপ্রাশনের সময় বাংলার লাটসাহেব এসে যখন তাঁর উর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করেছিলেন তখনকার সেই অনুষ্ঠানের ছবিও জ্বলজ্বল করছে। লাটসাহেব সেদিন না এলে সেই চৌদ্দপুরুষের যে কি গতি হত তা ভাবলে মাঝে মাঝে শিহরিত হয়ে উঠি আমি।

এই সব দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু নিদর্শন কলকাতার নামকরা ক্লাবে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। ভারতীয় গণ্ডার দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে এ যেমন দুঃখের খবর, এই সব ক্ষণজন্মা পুরুষও

www.BanglaBook.org

যে শনৈঃ শনৈঃ এ দেশে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছেন এটা একটা সুখের খবর যে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, বাংলাদেশে নেতাজী, বিপান রায়, বিনয়-বাদল-দীনেশ-ক্ষুদিরাম, বীণা দাস যেমন ছিলেন তেমন এরকম পা-চাটা লোকেরও কখনো অভাব ঘটেনি। তাঁদের চরিত্রের প্রধান গুণ পদলেহন। এখন শ্বেতাঙ্গদের পা চাটতে পাচ্ছেন না সেই দুঃখ অন্যান্য অনেক পা চেটে পুষিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা। যেদিন এই সব পদলেহনকারীদের মুখে জুতোসুদ্ধ লাথি মারার লোক জন্মাবে সেদিন এ দেশের বড়ই সুদিন আসবে।

অস্ট্রিয়ান এমব্যাসী খুঁজে বের করে ভিসা নেব এই অভিপ্রায়ে বেরিয়ে বাঁই বাঁই করে চক্কর খাচ্ছিলাম। এদেশে আমাদের দেশের মত ভ্যাগাবন্ড ভলান্টিয়ার নেই যে আকছার বিনি পয়সায় পথ-বাতলানোর লোক পাবেন।

একজন মহিলাকে সামনে পেয়ে পথে শুধোলাম। মহিলা সুন্দরী। আমারই সমবয়সী। আমার প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়ালেন। হাসলেন একটু। তারপর বললেন, এক সেকেন্ড দাঁড়ান। বলেই হাতব্যাগের মধ্যে থেকে লানডানের রোড ম্যাপ বের করে আমাকে পথ বাৎলে দিলেন।

আমি ধন্যবাদ দেওয়ার আগেই উনি আবারো মিষ্টি হাসলেন। তারপর মেয়েলি লজ্জানম্র গলায় বললেন, আমিও ট্যুরিস্ট। আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছি কাল।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

আসলে আমরা ছোটখাটো ব্যাপারেও বড় অলস, পরনির্ভর। এটা আমাদের ভারতীয় চরিত্রের একটা বড় দোষ। যখন ওরা কোনো ব্যাপারেই কারো উপরে নির্ভরশীল হওয়াকে লজ্জাকর বলে মনে করে আমরা আমাদের সব দায়িত্ব এমনকি পথচলার ও পথ-খোঁজার দায়িত্বটুকুও অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে শুধু নিশ্চিন্ত নই; আশ্বস্ত বোধ করি।

দূর থেকে দেখলাম একজন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। লানডানের পুলিসের নাম শুনেছি অনেক। এগিয়ে গিয়ে দেখি সাড়ে ছ ফিট চেহারার মলাটে একটি বালখিল্য। ভালো করে দাঁড়ি-গোঁফ ওঠেনি। মাকুন্দও হতে পারে।

সাহেবরাও কি মাকুন্দ হয়? কে বলতে পারবে? জানি না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দেখলে হয়।

ছেলেটিকে গিয়ে পথ শুধোতেই সে তার সাড়ে ছ ফিট জিরাপের মত ঘাড় আমার পাঁচ সাড়ে-দশ মুখের কাছে নামিয়ে এনে মোলায়েম গলায় বলল, ইয়েস স্যার? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ড্যু স্যার?

শুনে সুড়সুড়িতে মরে গেলাম। সায়েবরা স্যার স্যার করলে কি যে সুড়সুড়ি লাগে, কি বলব!

তাকে বললাম, আমার জিজ্ঞাসার কথা।

সে অত্যন্ত সপ্রতিভতার সঙ্গে বলল, সার্টেনলি স্যার। আই উইল শো ড্যু দ্যা ওয়ে স্যার।

www.BanglaBook.org

বলেই আমার কেনা গোলামের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে এক ফার্লং হেঁটে গিয়ে অস্ট্রিয়ান এমব্যাসী দেখিয়ে দিল। দিয়ে বলল, হিয়ার উ্য আর স্যার!

আমি বললাম, দ্যাখো বাপু তোমাদের কথা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। আজ দেখে চক্ষু কর্ণ সার্থক হল। তোমার সোনার বেটন হোক, লাল টুকটুকে বউ হোক।

মনে মনে আরো অনেক কিছু বললাম, ছেলেটি শুনতে পেল না। কিন্তু সত্যিই বড় ভালো লাগল। পাবলিক সার্ভেন্ট এদেরই বলে; পাবলিক এদের সার্ভেন্ট নয়, এরা সত্যিই পাবলিকের সার্ভেন্ট।

পৃথিবীতে একমাত্র লানডানেই পুলিসের কাছে কোনো অস্ত্র থাকে না। অস্ত্রের মধ্যে একটা ছোট বেটন আর বাঁশী। অন্যান্য সব দেশের পুলিসের কাছে রিভলবার বা পিস্তল থাকে। কখনো একাধিকও।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি দেশের প্রতিটি লোকের কতখানি সম্মান থাকলে খালি হাতে লানডানের পুলিস ঘুরে বেড়াতে পারে রাত্রি-দিন তা সহজেই অনুমেয়।

ইংল্যান্ডে আসার আগে টবী বহুদিন পশ্চিম জার্মানীতে ছিল। ওর সেই প্রথম দিককার কষ্টের দিনগুলোর কথা শুনলে সত্যিই চোখে জল আসে।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করে কি করবে মনস্থির করতে না পেরে ওর কয়েকজন অদূরবর্তী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুদের সঙ্গে ও পশ্চিম জার্মানীতে পাড়ি দিয়েছিল।

বাঙালীর স্কুলে পড়েছে, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন দূরে থাক, ইংরাজীটা পর্যন্ত তেমন বলতে পারে না তখন। লিখতে পারে মোটামুটি।

তখনকাল দিনে কলকাতার হগবাজারে একরকম বাঙালী দোকানী দেখতে পাওয়া যেত। এখন সিন্ধী দোকানদারদের ভীড়ে তারা প্রায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তাদের খদ্দেররাও। তাদের প্রত্যেকেই প্রায় কাজ-চালানো ইংরিজী বলতেন—'টেক তো টেক, নো টেকতো নো টেক, একবার তো সী' গোছের।

টবীর এবং শুধু টবীর কেন, অনেক বাঙালী পন্ডিত ইংরিজীর অধ্যাপকদের কথ্য ইংরিজীও তখন তদনুরূপ ছিল। আজকের ভারতবর্ষে, তথা বাংলাদেশে কথ্য ইংরিজীর মান অনেক উঁচু হয়েছে! এর কারণ ইংরেজ প্রীতি যতটা নয়, ততটা স্বাধীনতোত্তর যুগে এক প্রদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা অন্য প্রদেশীয় লোকেদের অনেক কাছাকাছি আসতে ইংরেজী ভাষাটার অনেক বেশী চল হয়েছে কথ্য ভাষা হিসেবে।

যাই-ই হোক, এইরকম ইংরিজীর এবং কোনোরকম জার্মান ভাষার জ্ঞান ব্যতিরেকেই টবী এক শীতের দিনে জাহাজ থেকে নেমেছিল পশ্চিম জার্মানীতে।

ভাবলেও, দুটো হাত ওভারকোটের পকেটে ঢোকাতে ইচ্ছে করে আমার।

প্রথম চাকরি টেলিগ্রাফের তারে জমে থাকা বরফের স্তূপে সাত-সকালে মইয়ে চড়ে উঠে নুন ছিটানো। বরফ গলাবার চাকরি। জার্মানীর শীতের সম্বল চাঁদনীতে কেনা একটি কম্বলের গরম কোট।

সেইসব দিনের কথা বলতেও টবীর চোখ জ্বলজ্বল করে—আমার শুনতে চোখ

www.BanglaBook.org

ছলছল করে।

যাই-ই হোক, সেই টবী, জীবন আরম্ভের টবী। আজকের টবীকে দেখে সেই টবীর কথা ভাবা যায় না।

পাশ্চাত্যের এই জিনিসটা আমাকে বড় মুগ্ধ করে। আমাদের দেশে রাজার ছেলে প্রায়শই রাজা হয়, মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী, মসৃণভাবে না হলে এই ঘটনা অমসৃণভাবে ঘটানো হয়। এবং চাষার ছেলে চাষা। পাশ্চাত্যের মত উত্থানপতন, ডিগবাজি-অভ্যুত্থান আমাদের দেশে এখনও তেমন আকছার নয়। তাই-ই হয়ত ওদের জীবন এত ইন্টারেস্টিং, ওরা জীবনকে এত ভালোবাসে; এত সম্মান করে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেই টবী বলল, রুদ্রদা, আজ আমরা একটা অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁয় খেতে যাব অস্ট্রিয়ান ভিসা যখন হলোই।

আমি বললাম, যথা আজ্ঞা।

স্মিতা সাজুগুজু করতে করতে টবী বসার ঘরের বুকশেল্‌ফের মধ্যবর্তী ছোট্ট সেলার খুলে টকাটক্ দুটো নীট লালরঙা স্কটল্যান্ডের জল মেরে দিল।

দাদাকেও প্রণামী দিল।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দাদা বিশেষ গাঁই-গুঁই না করে ছোটবেলায় মায়ের হাত থেকে নিয়ে যেমন বিনা প্রতিবাদে ক্যাস্টর অয়েল খেতো, তেমনি বিনা আপত্তিতে হুইস্কী খেল। একটু খুশীও হল খেয়ে।

স্মিতার হয়ে গেলে সকলে মিলে নীচে এসে, গাড়িতে ওঠা গেল।

লানডানের বেজওয়াটার পাড়াটা খুব রমরমে পাড়া। একেই বলে, এক কথায় বেড-সিটার পাড়া। অর্থাৎ, এক কামরার সব ঘর ভাড়া পাওয়া যায় এখানে। বেডরুম-কাম-সিটিং-রুম—এক কথায় : বেড-সিটার।

এ পাড়ার বাসিন্দা বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্র-ছাত্রী, বকা-বাউন্ডুলে, হিপী-হিপীনি। সারা রাত এ পাড়ায় দোকানপাট খোলা। সোহোর মত, ন্যু-ইয়র্কের ব্রডওয়ের মত, প্যারিসের মত; এখানে রাতে দিনে বিশেষ তফাত নেই। এইসব বেড-সিটার ঘরে থেকেই বহু ছেলেমেয়ে থীসিস সাবমিট করে ডক্টরেট হচ্ছে, অনেকে বেবাক বকে যাচ্ছে, কেউ বা হাসিস, মারিজুয়ানা, এল এস ডি খেয়ে বুঁদ হয়ে রয়েছে, কেউ বা গর্ভবতী হচ্ছে, কেউ গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। মোট কথা, এমন তালেবর স্বাধীন স্বর্গ-নরক জায়গা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুব কমই আছে।

টবীর গাড়িটা এসে ওয়েস্টবোর্ন রোডে দাঁড়াল।

গাড়ি পার্ক করে আমাদের নিয়ে টবী রেস্তোরাঁ নামক যে অতি সন্দেহজনক গর্তটার সামনে দাঁড় করাল, তাতে প্রথমে মনে হল যে ভাই আমার গরীব দাদাকে কলকাতার কোনো ক্লাস থ্রী, গ্রেড থ্রী স্ট্যান্ডার্ডের রেস্তোরাঁয় এনে ডিমের ডেভিল বা ভেজিটেবিল চপটপ কিছু খাইয়ে সস্তায় সারবে বলে মনস্থ করেছে।

সেই সুড়ঙ্গ বেয়ে গর্তে ঢোকা পর্যন্ত খারাপ লাগলেও ভিতরে পৌঁছে একেবারে

www.BanglaBook.org

জমে গেলাম।

জমে গেলাম না বলে, সেঁটে গেলাম বলা ভালো।

ভাই সব, যদি ও তল্লাটে যাওয়া-টাওয়া হয়ে ওঠে কখনও, তাহলে এই গর্তে একবার ঢুকতে ভুলবেন না। এই ছোট অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁর নাম Tyroller Hut ঃ ২৭ নম্বর ওয়েস্টবোর্ন রোড, বেজওয়াটার, ডবল্যু ঃ ২, লানডান। সোমবার বন্ধ থাকে। মঙ্গলবার থেকে রবিবার অবধি খোলা।

আমি কমিশন পাই না।

অস্ট্রিয়ার মত জায়গা এবং অস্ট্রিয়ান লোকেদের মত লোক হয় না। Tyrol-অস্ট্রিয়ার ছবিসদৃশ ইনসব্রুক প্রভিন্স-এর একটি জায়গা। Tyrol-এ যাবার সুযোগ ঘটেছিল এই লেখকের। সে কথা পরে কোনোসময় বলা যাবে।

সেই গর্তে ঢুকতেই দেখি গুচ্ছের জার্মান ও অস্ট্রিয়ান নারী-পুরুষ ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে বসে খানাপিনা করছে।

জার্মান ভাষায় ইংরেজী Hut (উচ্চারণ হাট)-কে হুট্ বলে। আমাদের বাংলায় হুট্ করে বলল বা হুট্ করে চলে এলোর সঙ্গে সঙ্গে এই 'হুটের' কেমন একটা প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পেলাম।

কাঠের তৈরী লগ্‌কেবিন যেমন হয় রেস্তোরাঁর ভিতরটাও তেমনি । অ্যাকোর্ডিয়ান ও গরুর গলার ঘণ্টা বাজিয়ে টীরলের লোকেরা নানারকম গান গায়। একজন লোক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কাউবেল বাজিয়ে ও অ্যাকোর্ডিয়ান ঝাঁকিয়ে জব্বর গান ধরেছেন। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন প্রায় সব খদ্দেররা। বেশীর ভাগই প্রৌঢ়। বিপুল-বিপুলা।

এদের এত প্রাণ, এত ফুর্তি, এত আনন্দের ফোয়ারা, এত হাসি কোত্থেকে আসে তা ভাবলেও অবাক লাগে।

আমার বারেবারেই মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ শুধুমাত্র আর্থিক সচ্ছলতা থেকেই আসতে পারে না। ওদের মধ্যে আরো যেন কী আছে। হয়ত চিন্তা-ভাবনাহীনতা, হয়ত দেশ ও সমাজ ওদের বেশীর ভাগ দায়িত্ব থেকেই মুক্ত করেছে, এবং ওরাও দেশকে মুক্ত করেছে বলে। দেশ থেকে সাধারণ মানুষ বিযুক্ত নয় বলেই বুঝি ওরা এমন করে হাসতে পারে, গাইতে পারে; বাঁচতে পারে।

অন্যভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, ওরা ওদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যা-কিছুই পেয়েছে তার জন্যে বুঝি অনেক মূল্য দিয়েছে। একদিন অনেক চোখের জল, বুকের রক্ত ঝরিয়েছে; তাই আজকের হাসি ওদের এমন দ্বিধাহীন সাবলীল।

ভালো করে জমিয়ে বসে, টবী প্রথমে Lager Beer-এর অর্ডার করল।

বলল, এটা স্টার্টার।

আমি বললাম, এটা কি ফোর-ফর্টি রেস নাকি? কি সব স্টার্টার-ফার্টার বলছিস, মানে বুঝছি না।

www.BanglaBook.org

টবী বলল, দেখোই না তুমি।

ইউনিয়ন জার্মান Lager Beer-এর সঙ্গে কি যেন খাদ্যও একটা অর্ডার দিল। বলল, সেটাও নাকি স্টার্টার।

আমি ভাবলাম, এবার পিস্তলের আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাবো।

কিন্তু কিছুই না হয়ে, একটি সুন্দরী অস্ট্রিয়ান মেয়ে পেঁপের মত দেখতে কিন্তু দারুণ স্বাদ ও পেঁপের চেয়ে শক্ত মধ্যিখান দিয়ে চেরা একটি ফলের মধ্যে Prawn Coctail দিয়ে গেল। তার বাইরে বাঁধাকপির পাতা।

টবীকে ভয়ে ভয়ে শুধালাম, এটারে কি কয়?

স্মিতা হেসে উঠল।

বলল, এই শুরু করলে রুদ্রদা।

টবী গম্ভীর মুখে জার্মান উচ্চারণে বলল, Avacadomit Garmeen।

প্রথমে ভাবলাম, জার্মান ভাষায় আমাকে গালাগালি করল বুঝি।

কিন্তু না, পরক্ষণেই রীতিমত মেনু কার্ড খুলে দেখাল নামটা।

যে ছেলেটি অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাচ্ছিল তার কাছাকাছিই ভীড় বেশী। যাঁরাই খেতে এসেছিলেন তাঁরাই প্রায় এই গানে গলা দিচ্ছিলেন।

জার্মান ভাষা ও রাশান লোকদের চেহারা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। কিন্তু এই প্রথম জার্মান ভাষার গান বাজনা শুনে প্রত্যয় হলো যে গান গাইলে মিষ্টিই লাগে।

টবী জার্মানদের মতই জার্মান বলে। এখানে এসে পড়ে ও ওর মন্ত্রমুগ্ধা স্ত্রী ও ক্যাবলা দাদাকে ওর জার্মান ভাষায় স্তম্ভিত করে রাখল। যে দুজন ওর টেবিলে বসে ছিল (অর্থাৎ আমরা দুজন) তাদের কেউই জার্মানের 'জও' জানি না, অতএব ও আদৌ জার্মান ভাষায় কথা বলছিল কি না তাও ধরবার উপায় ছিল না।

ইতিমধ্যে Steinhager Schnapps দুঢোক খেয়ে অবস্থা কাহিল। এই সাদাটে তরলিমা কবে আবিষ্কৃত হয়েছে জানি না, তবে সময় মত এর গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হলে হিটলার সাহেব ফ্লাই-বম্বস্ না পাঠিয়ে এই দিয়েই ইংল্যাণ্ড ধ্বংস করতে পারতেন।

টবী বলল, এ একরকমের লিকুওর ব্রাণ্ডি। টীপিক্যালী অস্ট্রিয়ান।

কথাবার্তা বলতে বলতে খেতে খেতে হঠাৎ এক বিপত্তির সৃষ্টি হল। আমার পাশের টেবিলে-বসা এক বর্ষীয়সী, স্থূলাঙ্গী কিন্তু ভারী হাসিখুশী মিষ্টি জার্মান মহিলা আমার এক হাত সজোরে আকর্ষণ করলেন।

বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি গানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছোট রেস্তোরাঁর প্রত্যেকে হাতে হাত রেখে গান গাইছেন এবং একবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আর একবার বসছেন। অ্যাপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ বলতে বলতে।

ভর-সন্ধ্যেবেলায় খেতে খেতে এমন ডন-বৈঠকী মারার তাৎপর্য না বুঝলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ও জাতটার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য বড় বেশী। এদের যা-ইচ্ছে-তাই না করতে দিলে এরা আবার কবে কার সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।

www.BanglaBook.org

জার্মানদের মত এমন দিল-খোলা হাসিও বুঝি ইউরোপের আর কোনো দেশের লোক জানে না। ওদের হৃদয়ের কাছে যত সহজে পৌঁছানো যায় তত সহজে বোধহয় খুব কম দেশের লোকের কাছেই।

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হলেও হাত ধরাধরি করে ওদের সঙ্গে, ভারী ভালো লাগল ওদের এই সপ্রাণ গান-বাজনা, এই হাসি, অপরিচিত বিদেশীকে বিনাদ্বিধায় মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের একজন করে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে।

হঠাৎ চোখ পড়ল, আমাদের সামনেই এক টেবিলে একটি মেয়ের দিকে। তার বয়স বেশী না। আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিয়ে হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ভাবও হতে পারত। কিন্তু তাও হয়নি।

তাহলে কেন হয়নি বলি।

মেয়েটি একটা কালো কার্ডিগান পরেছিল। ভারী সুন্দর চাঁপারঙা ডান হাতে সোনালি রিস্টওয়াচ। বাঁ হাতে একটা বালা। এমন সুন্দর ও বুদ্ধিভরা মুখ বড় একটা দেখা যায় না। তার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় কোনো অভ্রখনির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি, আর কখনও উঠতে পারব না বুঝি।

তার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতেই টবী বলল, কি গো রুদ্রদা, ভালো লেগেছে তো গিয়ে আলাপ কর। তোমার দিকেও বার-বার চাইছে মেয়েটি। আজ শুক্রবারের সন্ধ্যেবেলা—আজকেই তো বন্ধুত্ব করার সময়।

আমি চুপ করে রইলাম।

Schnapps ও মেয়েটির চোখে, আমার নেশা ধরে গেছিল।

আমি আবারও ওদিকে চাইতে টবী বলল, খী-খারবার।

তার পরেই বলল, একি আমাদের দেশ পেয়েছ না কি? 'চোখে চোখে কথা কও মুখে কেন কও না?' ওসব আমাদের দেশের জিনিস। এই স্পীডের দুনিয়ায় কারো চোখের ভাষা শোনার মত সময় ও সময় থাকলেও নির্ভুলভাবে বোঝার এলেম নেই। মুখে না বললে এখানে কোনো কিছুই ঘটবে না। এবং নিজ মুখেই বলতে হবে। বন্ধুবান্ধব, বোন, বৌদি এখানে সব বেকার। বাঙালীরা প্রেম করার ব্যাপারেও পরের সাহায্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকে—বাঙালীর কি কিস্যু হবে? তুমিই বল?

আমি বললাম, এই মুহূর্তে আমি রামমোহন রায় বা বিবেকানন্দ হতে চেয়ে তাবৎ বাঙালীর ভাগ্য-নির্ধারণ করতে চাই না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার যে কিছুই হবে না যা মর্মে বুঝতে পারছি।

স্মিতা বলল, অত নিরাশ হবার কি আছে? তোমার প্রতি ভীষণ ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে মেয়েটি। বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু চেয়ে আছে তোমার দিকে।

বুঝলাম। আমি বললাম।

তারপর বললাম, ঢাকাই কুট্টিদের একটা গল্প চালু ছিল ছোটবেলায়।

কি গল্প?

www.BanglaBook.org

ঢাকাই কুট্টি দাঁড়িয়ে আছে অন্যাদের সঙ্গে ঘোড়ার-গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে—এমন সময় অতীব সুন্দরী হিন্দুর মেয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে।

কুট্টি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল।

কিছু করল না বা বলল না? অবাক হয়ে স্মিতা শুধোল।

না। আমি বললাম।

তখন কিছুই বলল না। কিন্তু সম্পূর্ণ চোখের আড়াল হলে বলল, 'এহনে গ্যালা, হাঁইটা গ্যালা গিয়া হুন্দরী; যাও। কিন্তু হপ্নে'?

মানে? স্মিতা ও টবী একই সঙ্গে শুধোল।

মানে, এখন তো চলে গেলে সুন্দরী, হেঁটে হেঁটে চলে গেলে।

—এখন গেলে, তো যাও। কিন্তু স্বপ্নে? স্বপ্নে যাবে কোথায়?

খী-খারবার, বলে টবী চেঁচিয়ে উঠল।

স্মিতা শীতের সকালের হাসির মত শীঁ-শীঁ করতে লাগল।

চারপাশের জার্মানরা গান থামিয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

কিন্তু আমি চোখ তুলে দেখলাম। সেই সুন্দরীর বয়-ফ্রেন্ড এসে গেছে।

স্বপ্নই সার। বাঙালীর স্বপ্নই সার।

ইতিমধ্যে টবী যা খাওয়ার অর্ডার দিয়েছিল, তা এসে হাজির। মেইন-ডিশ।

তিনজনে তিন রকম খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম—অস্ট্রিয়ান মেনুকার্ড দেখে। বলা বাহুল্য আমি অচেনা ঘোড়ার নাম দেখে তাদের চেহারা না দেখেই রেসের টিকিট কাটার মত মেনুকার্ডে তর্জনী ছুঁইয়েছিলাম। খাবার না এসে স্বচ্ছন্দে ফিঙ্গার-রোল অথবা টুথপিকও আসতে পারত।

কিন্তু খাবার যখন এল, তখন রীতিমত উত্তেজনার কারণ ঘটল।

আমাকে দিয়েছিল, Eisbeinmit Saurkaraut.

নাম শুনে বাঙাল আমি ঘাবড়েছিলাম বলে, পাঠকের ঘাবড়াবার কোনোই কারণ দেখি না। ব্যাপারটা হচ্ছে শুয়োরের নরম পা—টক্ টক্ বাঁধাকপির সঙ্গে সার্ভ করেছে। খেতে জব্বর।

স্মিতা নিয়েছিল Paprikahuhn Nact Ungarisher Art Mit Rice.

ব্যাপারটাকে পাঁপড় অথবা পাঁপড়ি ইত্যাদি বলে ভুল করবেন না। জার্মান নামের ওরকমই ছিরি! অর্থাৎ, হাঙ্গারীয়ান প্রথায় রান্না চিলী-চিকেন ভাতের সঙ্গে সার্ভ করেছে।

আর টবী নিয়েছিল Rinds Roulade Mit Nudlen-অর্থাৎ স্টাফড বীফ, সঙ্গে ব্যাকন; শশা আর শর্ষে।

এতো গেল খাদ্য। মেইন ডিশের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে পানীয়ও এল। রেডওয়াইন। নাম তার ষাঁড়ের রক্ত। বুলস্ ব্লাড। তা পান করে শরীরে ষাঁড়ের বল বোধ করতে লাগলাম প্রায়। তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই জার্মান স্ন্যাপস।

স্ন্যাপস জিনিসটা সত্যিই অতি সাংঘাতিক। এমনি গ্লাসে ঢেলে রাখলে দেখে মনে হবে

www.BanglaBook.org

রিফাইনড ক্যাস্টর অয়েল, কিন্তু খেলে মস্তিষ্কের কোষে কোষে কেরে-কেরে রব উঠবে।

যাই-ই হোক, ভায়ার ঘাড়ে ভালো করে খাদ্য পানীয় সব কিছু রীতিমত রেলিশ করে খাওয়া গেল।

যখন 'টিয়োলার হুট' থেকে বেরুলাম তখন অনেক রাত। কিন্তু বেজওয়াটারে রাত চিরদিনই সব প্রহরেই সন্ধ্যে থাকে। সায়েবরা বলে, 'নাইট ইজ ভেরী ইয়াং।' কথাটা এখানে সর্ব সময়েই খাটে।

কত রকম স্পোর্টস-কার যে দাঁড়িয়ে আছে পথের দুপাশে তা বলার নয়। যেমন গাড়ির চেহারা, তেমনই সুন্দর যাত্রীদের চেহারা। অর্থ, বিত্ত, স্বাধীনতা এবং নিজ-নিজ জীবনকে প্রতি মুহূর্ত নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করার অসীম আগ্রহ এদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, চোখ মেলে দেখলে ঈর্ষা হয়।

ভাবতে ভালো লাগে যে, একদিন আমাদের এমন সুন্দর ভারতবর্ষের লোকেরাও এমনি করে ভালোবাসতে শিখবে জীবনকে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। চিনে নেবে নিজের দেশকে। অন্তরের গভীরে জেনে গর্বিত হবে যে, এমন দেশ পৃথিবীতে আর দুটি নেই—শুধু নিজেদের প্রত্যেককে যোগ্য করে তুলতে হবে, এই দেশ নিয়ে দেশের ও দেশের লোকেদের সত্যিকারের ভালোর জন্যে কি করণীয় এবং অকরণীয়, তা একদিন প্রাঞ্জলভাবে সকলেই বুঝবে।

বুঝবে কি?

দেখতে দেখতে আমরা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়লাম। জোরে গাড়ি চলেছে মিডেক্সের দিকে। হলদে স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে পথ-ঘাট মার্কারী ভেপার ল্যাম্পের আলোয়।

BanglaBook.org

স্ন্যাপস্-এর নেশা কেটে গিয়ে হঠাৎই আমাকে এক হীনম্মন্যতা, অপারগতার বোধ রাতের কুয়াশার মত ঘিরে ফেলল। আমার মনে হল, ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝায় সেই কোটি কোটি সরল, সাদা স্বল্পবিত্ত, গ্রাম ও বন-পর্বতবাসীদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি, বুঝি বা বোঝবার চেষ্টা করি? আমরা এ ভারতবর্ষের কজন? তারাই তো সব। কিন্তু তাদের কি আমরা ভালোবেসেছি, জেনেছি যেমন করে জানার তেমন করে? কিছু কিছু লেখক তাঁদের নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে এমন কজন বলিষ্ঠ দরদী সাহিত্যিক আছেন যাঁরা নিজের চোখের দৃষ্টি এবং কল্পনা মিলিয়ে দেশের সাধারণ লোকদের কথা লিখেছেন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কষ্টের স্বরূপকে উদঘাটিত করেছেন কব্জীর সমস্ত জোর ও হৃদয়ের সমবেদনা দিয়ে? হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন কজন?

এই ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষ সংযোগটাই বোধহয় বড় কথা। কল্পনার বোধহয় তেমন দাম নেই। যে, যে-জীবন নিজের চোখে না দেখেছেন অথবা যাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ও মননে সে দরদ ও অন্তর্দৃষ্টি দূরদৃষ্টির সঙ্গে বিশেষভাবে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে যায়নি তাঁর পক্ষে তিনি যে-সমাজের লোক নন সেই অন্য সমাজের কথা তেমন

www.BanglaBook.org

করে লেখা বা তুলে ধরা বড়ই কঠিন কাজ।

তা যদি না হত তাহলে রবীন্দ্রনাথের মত কালজয়ী বহুমুখ প্রতিভাও এমন খেদোক্তি কেন করবেন? যদি কল্পনা দিয়েই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনের কথা জানা যেত, শুধুমাত্র স্বার্থপ্রণোদিত নিজ নিজ উদ্দেশ্যসাধনের বক্তৃতা করেই তাদের হৃদয় ছোঁওয়া যেত, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হল কেন? কেন তাঁর মত লোকও লিখতে বাধ্য হলেন :

'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারই খোঁজে
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি।
ভালো নয়,ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা, মাটির কাছাকাছি থাক এবং শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ না ভোলানোর কথা আজকে ভাবতেও কষ্ট হয়। শুধু সাহিত্য কেন, অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেও আমাদের এমন সুন্দর সোনা-ছড়ানো দেশটাতে কর্ম ও কথার মধ্যে কোনোরকম সাযুজ্যই আজ আর দেখি না, দেখি না কথা অথবা কর্মের মধ্যে মাটির গন্ধ। শুধু ভঙ্গীই আজকে সব। ভান ও ভণ্ডামির তীব্র লজ্জাকর প্রতিযোগিতা দেখে দেখে যারা অসহায় নিরুপায় দর্শক হয়ে তা দেখেন তাঁরা নিজেরাই অন্যদের নির্লজ্জতায় লজ্জা পান। অথচ নির্লজ্জতার বর্ম কী কঠিন। কিছুতেই, কোনো কিছুতেই তাতে ফাটল ধরে না।

রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' কিন্তু নিজেদের এমনই এক তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করেছি আমরা নিজেদের এবং একমাত্র নিজেদেরই স্বার্থপরতায়, নিজ নিজ চাকরি ও ব্যবসায়ের কারণে যে, ঘৃণাবোধ বুঝি আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। যদি তা থাকত, তাহলে নিজেদের প্রতি নিজেদেরই ঘৃণা আমাদের জ্বালিয়ে এতদিনে অঙ্গার করে দিত।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গাড়ি হঠাৎ পথে একটা ছোট গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। ইংরিজীতে যেরকম গর্তকে পট-হোল বলে।

সঙ্গে সঙ্গে টবী বলল, এখুনি গিয়ে কাউন্সিলরকে ফোন করতে হবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

রাস্তায় গর্ত হয়েছে কেন? আমরা রোড-ট্যাক্স দিই না?

আমি বললাম, তাহলেও এত রাতে ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙানোর কি দরকার?

www.BanglaBook.org

টবী বলল, ঠিক আছে। না হয় কাল সকালেই করব।

করলে কি হবে? আমি শুধোলাম।

টবী বলল, দুঘণ্টার মধ্যে গর্ত মেরামত হয়ে যাবে।

তারপর কি ভেবে বলল, না কাল মনে থাকবে না, এখুনি করব। পাবলিক সার্ভেন্ট ওঁরা। কিছু মনে করবেন না।

আমি ও স্মিতা ওকে অনেক করে নিবৃত্ত করলাম।

পরদিন সকালে যখন প্রাতরাশ খেয়ে আমরা চরাবরায় বেরোলাম, তখন দেখি সত্যি সত্যিই গর্তটা মেরামত হয়ে গেছে।

আসলে ইংরেজরা বেনের জাত বলে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের বড়ই টনটনে। যা দিল তা দিল, তা রোড ট্যাক্সই হোক কি ইনকাম-ট্যাক্সই হোক কিন্তু বদলে যা পেল তাও তারা বাজিয়ে নিতে ভোলে না। এ্যাকাউন্ট্যান্সীতে যে ডাবল-এন্ট্রী বলে কথাটা আছে তা ইংরেজদেরই সৃষ্টি। 'এ ডেবিট মাস্ট হ্যাভ আ ক্রেডিট'। সিংগল এন্ট্রীতে ইংরেজ বিশ্বাস করে না। তাই পাবলিক সার্ভেন্ট কাউন্সিলরকে দিয়ে দু ঘন্টার মধ্যে তারা পথের একটা সামান্য গর্ত সারিয়ে নিতেও ছাড়ে না। নিজের নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেমন এরা সচেতন, নিজের নিজের পাওনা সম্বন্ধেও তেমনি।

BanglaBook.org

টবী সেদিন অফিস থেকে ফিরেই বলল, রুদ্রদা, তোমার কন্টিনেন্ট বেড়াবার সব বন্দোবস্ত করে এলাম আজ।

কি রকম?

টবী বলল, কস্‌মস্ ট্যুরস্-এর টিকিট কেটে এনেছি। তবে এটা কমোনারদের ট্যুর। তোমার বেশ কষ্ট হবে। কলকাতার যাদুঘরের সামনে সার দেওয়া গাড়ি থেকে নেমে রঙিন-শাড়ি পরা দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের দেখেছ নিশ্চয়ই—এ ট্যুর অনেকটা সেরকম। ড্রাইভার-কামার-ছুতোর-সব্জীওয়ালা মায় সবাই এই ট্যুরে বেরিয়ে পড়ে কন্টিনেন্ট দেখে আসে। আমি আর স্মিতা তোমাকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে তুলে দিয়ে আসব। সেখান থেকে ট্রেনে যাবে ডোভার। ডোভার থেকে জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে বেলজিয়ামের অস্টেন্ড। অস্টেন্ড থেকে কস্‌মসের কোচ বারো দিন সারা ইয়োরোপ প্রায় চরকী-বাজীর মত ঘুরবে।

আমি বললাম, ক্যানাডায় যাবার টিকিট কাটা আছে যে আমার!

আহা! ক্যানাডায় তো যাচ্ছোই। আমি সে-সব বুঝে শুনেই কেটেছি। ঐ ট্যুর সেরে ফিরে এসে আরো দিন কয় এখানে থেকে গা-গতরের ব্যথা কমিয়ে নিয়ে তারপর টরোন্টো যেও এখন। মাসতুতো ভাই কি পিসতুতো ভাই-এর শত্রু হতে পারে? তোমাকে আমি তার কাছে বিলক্ষণ পাঠাব।

তাহলে আমি আর কদিন আছি এখানে?

আরো সাতদিন আছো। টবী বলল।

www.BanglaBook.org

তারপর বলল, তোমাকে আরো যা-যা দেখাবার তা দেখিয়ে দেবো। তুমি তো আবার কারো হাত ধরে কিছুই দেখতে চাও না। নিজেই চরে-বরে যতটা পারো দেখে নাও সারাদিন। আমি সন্ধ্যের পর তোমাকে রোজ কম্পানী দেব। আর ছুটির দিনে।

তথাস্তু। বললাম আমি।

আজ সন্ধ্যেয় কি প্রোগ্রাম?

আজ তোমাকে "Oh Calcutta" দেখাতে নিয়ে যাব।

স্মিতা বলল, আমিও যাব।

টবী বলল, তুমি একবার দেখেছ। বার বার এসব দেখে না।

স্মিতা বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য হয়েছে। শুধু এই সবই বোঝো। নিজের মগজে স্ক্রু ঢোকালেও তো আর্ট-কালচার গলবে না। যার মন যেরকম।

টবী বলল, তুমি যাই-ই বলো—তোমাকে ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গে ঐ শো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি না।

স্মিতা বলল, তুমি ভীষণ গোঁড়া ও সেকেলে। এত বছর বাইরে থেকেও এত ওডোনাইজার মেখে এত সুগন্ধি সুগন্ধি সাবান ঘষেও তোমার গায়ের চেতলার গন্ধ মুছল না।

টবী দুহাত উপরে তুলে বলল, খবরদার ডার্লিং আর যাই করো চেতলা তুলে কথা বলবে না। চেতলা আমার কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের উপবন ...।

তারপর কি বলবে ভেবে না পেয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, কিছু বলো না রুদ্রদা! বিপদ থেকে ভাইকে একটু সাহিত্যিক বুকনী ছেড়ে উদ্ধার করো!

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াতে কখনও মাথা গলাতে নেই। আমাকে আমার এক অভিজ্ঞ বন্ধু বলে দিয়েছিল যে, ইচ্ছে করলে পথের দুই বিবদমান কুকুরের ঝগড়া মেটালেও মেটাতে পারো কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া—নৈব নৈব চ। ওর মধ্যে গিয়ে পড়লেই দেখবে কিছুক্ষণ পর মিঞা-বিবি দুজনের ঝগড়া মিটে গেছে—দুজনের মধ্যে গলাগলি—আর তোমার জন্যে যুগপৎ গলাধাক্কা!

অতএব চুপ করে থাকলাম।

Oh Calcutta সম্বন্ধে দেশে থাকতেও অনেক পড়েছিলাম ও শুনেছিলাম। তাই উৎসাহ নিয়েই দেখতে গেছিলাম, কিন্তু অগণ্য সম্পূর্ণ নগ্ন মানব-মানবী ছাড়া এর মধ্যে চমকপ্রদ আর কিছুই দেখলাম না।

আরম্ভটায় চমক আছে নিঃসন্দেহে। সেন্স অফ হিউমার আছে। টিপীক্যালী ব্রিটিশ সেন্স অফ হিউমার। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল যে সাদামাটা কুদৃশ্য যৌন-বিকারকে একটা ইন্টেলেকচুয়াল পোশাক পরিয়ে দুর্বোধ্যতার গোঁফ লাগিয়ে যেন বাইরে আনা হয়েছে।

আজকালকার এই নব্য দুনিয়ায় যা-কিছু সরল সত্য ও সুন্দর এবং শাশ্বত তার সব কিছুই ফ্লাট— সাদামাটা। তার মধ্যে যেহেতু সস্তা নতুনত্বের ভঙ্গুর চমক নেই সুতরাং এসব

www.BanglaBook.org

একেবারেই গ্রাহ্য নয়। পুরনো যা-কিছু তা খারাপ, নতুন সব কিছুই যেন ভালো। যা-কিছু সহজে বোঝা যায়, হৃদয় দিয়ে ছোঁওয়া যায়, যা-কিছু বুকের মধ্যে আলোড়ন তোলে আমাদের মূল ভাবাবেগের কেন্দ্রে ঢেউ জাগায় তার সব কিছুই মূর্খামী, ছেলেমানুষী; সেন্টিমেন্টাল। এর বিপরীতটাই আজকালকার ফ্যাশান। ভোরের সূর্যের রং লাল বলেই তাকে নীল করে দেখানোটার নাম আধুনিকতা। যা-কিছুই সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও বোঝা যায় না সেইটে না বুঝেও বোঝার ভান করাটাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

একসঙ্গে অসংখ্য নগ্ন নারীপুরুষ দেখতে এবং তাদের মিলনের দৃশ্য দেখতে সকলের ভালো লাগে না। আমার তো নয়ই। হয়ত কারো কারো ভালো লাগে। যাদের লাগত তাদের চিরদিনই লাগত। পৃথিবীর সব দেশেই যারা তা দেখতে চাইত এবং যাদের তা দেখার ইচ্ছা ও সামর্থ্য ছিল তা দেখে এসেছে কিন্তু গোপনে, লজ্জার সঙ্গে; হয়ত অপরাধবোধের সঙ্গেও। সেটায় কোনো আধুনিকতা নেই। কখনও ছিল না। কিন্তু আজকে সেই লজ্জাবোধ ও শালীনতাবোধকে নষ্ট করাটাই, যা ছিল মুষ্টিমেয়র রুচি তাকে অপ্রত্যক্ষভাবে সার্বজনীন রুচিতে পরিণত করার এ চেষ্টাই সপ্রতিভতা। আর এর বিরুদ্ধাচরণ করাটা প্রাগৈতিহাসিকতা, জড়ত্ব; স্থবিরতা।

Oh Calcutta ব্যাপারটা পুরোপুরি ন্যক্কারজনক মনে হল। তবে এদের উদ্দেশ্যটাই খারাপ ছিল না। আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে যে পুরাতন সমাজের ও সমাজপতিদের ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু মুখোশটার প্রকৃতি যদি যথেষ্ট দৃঢ় হয় তাহলে তা ছিঁড়তে হলে দৃঢ় কব্জীর প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, মুখোশ ছেঁড়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাটা ফুরিয়ে গেলে পুরো প্রচেষ্টাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য যদি না সেই মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মুখকে প্রকাশ করা যায়। মুখোশের আড়ালে যদি কঙ্কালের মুখ দৃশ্যমান হয় বা যাদুঘরের যবনিকা রঙের মত ঘন কৃষ্ণবর্ণ রংই চোখে পড়ে তাহলে মুখোশ ছেঁড়ার প্রয়োজনীয়তা কি তা বুঝি না। পূর্বসূরীদের ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে যদি নব্যদিনের ইন্টেলেকচুয়ালদের ভণ্ডামির নতুন মুখোশই নতুন করে পরানো হয় তাহলে মুখোশ ছেঁড়ার কোনো সার্থকতাই দেখতে পাই না।

তবুও বলব এদের উদ্দেশ্যর গভীরে মহৎ কিছু একটা ছিল। কিন্তু গভীরে কিছু উৎখাত করতে হলে যে বা যাঁরা উৎখাতের চেষ্টা করেন তাঁদেরও মূলত গভীর হতে হয়। গভীরে যেতে হয়। বিদ্যা-বুদ্ধির অস্পষ্ট নখ দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে করে পুরাতন সংস্কার এবং ভণ্ডামির মহীরূহকে রাতারাতি উৎপাটন করা যায় না—তার জন্যে সেই মহীরূহর শিকড় যতদূর অবধি পৌঁছেচে ততদূর অবধি পৌঁছানোর মত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ প্রত্যয়ের নখরের প্রয়োজন।

এ ছাড়া উদ্যোক্তরা এই অনুষ্ঠানের নাম যে কেন Oh Calcutta দিলেন তা ভেবে পেলাম না। অসংলগ্নতাই অপ্রয়োজনীয় নিয়মবদ্ধতার একমাত্র প্রতিষেধক নয়। অসংলগ্ন নব্যতার মধ্যেও একটা নিয়মানুবর্তিতা থাকা দরকার। কারণ, চরম নব্যতাও অচিরে পুরাতন হয় যদি না সেই নব্যতার প্রয়োজনীয়তা ও অবিসংবাদিতা বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার

www.BanglaBook.org

মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়।

Oh Calcutta-অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম গিয়ে পিকাডিলি সার্কাসে। এখানে রাত দিনের তফাৎ নেই। বরং দিনের চেয়ে রাত যেন বেশী উজ্জ্বল। এরই পাশে পাশে Soho। লানডানের তরল আনন্দের উৎসস্থান। এখানে এমন এমন সব দোকান আছে যে একজন সাধারণ ভারতীয়র চোখে তা আশ্চর্য ঠেকে। এসব জিনিস একটু রেখে-ঢেকেও করা চলতে পারত। কিন্তু সমস্ত পশ্চিমী পৃথিবী এখন তাবৎ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। মনে হয় এরা এখনও সম্যক বুঝতে পারেনি যে বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ালে প্রথম প্রথম মজা যে লাগে না তা নয়; কিন্তু তার শেষ পরিণাম সুখপ্রদ নয়।

দোকানে লেখা আছে 'Sex-Shop'.

টবীর সঙ্গে ঢুকে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল।

দোকানের জিনিসপত্র দেখে আমাদের থ হয়ে যেতে হয়। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট হবার পর এমন সুন্দর ও পবিত্র ব্যাপারটাতে এমন কদর্যতার রং লাগানোর তাৎপর্য আমাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। আনন্দ যখন সৌন্দর্য, গোপনীয়তা ও শালীনতার মধ্যে দিয়েও পাওয়া যেতে পারে তখন সেই আনন্দর এমন বটতলা সংস্করণের কি প্রয়োজন তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

এই সব সেক্স-শপএ নানাবিধ রাবার বা ঐ জাতীয় জিনিসে তৈরী স্ত্রীঅঙ্গ বা পুরুষাঙ্গ বিক্রী হচ্ছে। নানা মাপের। রতি ক্রিয়ার বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম সার দিয়ে সাজানো আছে। স্ত্রী ও পুরুষের আত্মরতির যন্ত্রপাতিও আছে। যেন নারী ও পুরুষের মিলনে এবং একটি লেদ বা ড্রিলিং মেসিনের চলার প্রক্রিয়ায় কোনো তফাত নেই। মানুষের যেন শরীরটাই সব, সমস্ত কিছু; মন বলে যে পদার্থটি মানুষকে এত হাজার বছর পৃথিবীর অন্যান্য জীবদের থেকে মহত্তর করেছে সেই মনটির কোনো দামই ধরে না আজ মানুষ।

কালের ইতিহাসে একদিন আমরা এই পশ্চিমীদের থেকে অনেক বিষয়ে এগিয়ে ছিলাম। মাঝে এরা যান্ত্রিক সভ্যতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা এবং অন্যান্য অপর অনুন্নত দেশের লোকেরা তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি দেখেই বোধহয় তারা এমন এমন ব্যাপারে আমাদের চমকে দিতে চাইছে যে, সে চমক থেকে চোখ ফেরানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা এদের চেয়ে অনেক গরীব। ছেঁড়া কাপড় পরি আমরা, ভালো খেতে পাই না, কিন্তু অনেক ব্যাপারে যে আমরা এদের চেয়ে অনেক বেশী ধনী এটা ওদের আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা খোঁজ রাখে না। দুঃখ তাতেও ছিল না। বড় দুঃখ হয় যখন দেখি যে, আমাদের নিজের দেশের ছেলেমেয়েরাও একথা ভুলে গিয়ে ওদের এই সস্তা চটকের অনুকরণে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে রাখে। বর্তমানে আমাদের দেশের বিত্তবান শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পোশাক-আশাক মানসিকতা ইত্যাদি দেশের ছেলেমেয়েদের পোশাক-

www.BanglaBook.org

আশাক মানসিকতার বিশেষ তফাৎ দেখি না। দেশের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ এটা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনো দুর্যোগই এই নৈতিক দুর্যোগের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান একবার পি-ই-এন কংগ্রেসের বক্তৃতায় লেখকদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

"It is a familiar conception of Indian thought that the human heart is the scene between good and evil. It is assailed by weakness and imperfection but is capable also of high, endeavour and creative effort. Man is a composite of life giving and death-dealing impulses. As the Wrig Veda puts it.

'যস্য ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃতম্'।

The Mahavarata says : "Immortality and Death are both lodged in the nature of man. By the pursuit of 'Moha' or delusion he reaches death, by the pursuit of truth he attains immortality. We are all familiar with the verse in 'Hitopodesa' that hunger, sleep, fear and sex are common to men and animals. What distinguishes man from animals is the sense of right and wrong, life and death, love and violence, are warring in every struggling man."

হিতোপদেশের সেই শ্লোকটি উনি উদ্ধৃত করেছিলেন ঃ

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্,
চ সামান্যমে তাৎ পশুভিরনরানাম্
ধর্ম হি তেষাম অধিকো বিশেষো,
ধর্মেনা হীনা পশুভি সমানাঃ।'

এই ধর্মই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। পশুর ধর্ম নয়।

পিকাডিলি সার্কাসের পিছনে অনেক গলিঘুঁজি। কেমন একটা থমথমে ভাব। বেসমেন্টে ও উপরে নানারকম খোঁৎ-খোঁৎ। বেটন হাতে লানডানের পুলিসরা কোটের কলার তুলে ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নানারকম রংয়ে রং-করা চুল নিয়ে সেজে-গুজে উগ্র সুগন্ধি মেখে সুন্দরী-অসুন্দরী মেমসাহেব বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পুরুষ বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে নানারকম লোভনীয় সব অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করছে।

টবী বলল, বুঝলে রুদ্রদা, এই-ই হল গিয়ে Soho পাড়া।

বুঝলাম, বললাম আমি।

হঠাৎ টবী একটা বড় দামী কথা বলল। লাখ কথার এক কথা। এ কথাটা আমার মনেও ছিল ছোটবেলা থেকে কিন্তু মনের অভ্যন্তরেও কখনো এমন করে এ কথাটার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয়নি।

টবী বলল, এসব জায়গায় কারা আসে জানো রুদ্রদা?

www.BanglaBook.org

কারা? আমি শুধোলাম।

যারা, সোস্যালী কনডেম্‌ড।

কথাটা বড় যুৎসই মনে হল। সত্যিই তো। সমাজ থেকে যাদের কিছুমাত্র পাওয়ার আছে, আশা করার আছে, তারা নিজেদের এমনভাবে ছোট করবে কেন? যা তারা এমনিতে পেল না, নিজের রূপে পেল না, গুণে পেল না, মানে সম্মানে কিছুতেই পেল না তারা পয়সার বিনিময়ে এমন ঘৃণার সঙ্গে ঘৃণার মধ্যে তা পেতে যাবে কেন? যা নরম গোপন সহজ আনন্দর দান তা আবরণহীন নির্লজ্জতার দেনা পাওনার মধ্যে আশা করবে কেন?

টবীকে বললাম, জব্বর বলেছিস টবী।

টবী বলল, কি জানি? আমার চিরদিনই এমন মনে হয়েছে। বিশেষ করে যত বছর ইউরোপে আছি। এখানে এসব ব্যাপারে এতখানি স্বাধীনতা—প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ এতখানি স্বাধীন যে সুস্থতার মধ্যেই তারা সব কিছু সহজে পেতে পারে, চুরি করে অসুস্থতার মাধ্যমে কিছু পাওয়ার তাদের দরকার কি? তবুও, সব দেশেই বোধহয় এক ধরনের লোক থাকেই—অসুস্থতা ও বিকারগ্রস্ততাই বোধহয় তাদের ধর্ম। যা মাথা উঁচু করে পাওয়া যেতে পারত, তা মাথা হেঁট করে পেতেই বোধহয় তারা ভালোবাসে।

টবীর গাড়িটা পার্ক করানো ছিল দূরে। আমরা সেখানে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ঠাণ্ডাটা বেশ ভালো পড়েছে। আমার পক্ষে তো বটেই।

টবী বলল, চলো তোমাকে প্লে-বয় ক্লাবে নিয়ে যাই।

আমি বললাম, সেটা কি ক্লাব?

ও অবাক হল। বলল হিউ-হেফনারের নাম শোনোনি?

নাঃ। আমি বোকার মত বললাম।

প্লে-বয় ম্যাগাজিন দেখেছো কখনও?

আমি বললাম, হ্যাঁ। তা দেখেছি। নানারকম গা-গরম করা ছবি-টবি থাকে।

টবী বলল, তাহলে তো দেখেছ। হিউ-হেফ্‌নার অ্যামেরিকান। প্লে-বয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। পৃথিবীর বহু জায়গায় এই ক্লাব আছে। খুব একসক্লুসিভ ক্লাব। মেম্বারশিপ বেশ লিমিটেড। চলো তোমাকে দেখিয়ে আনি।

দেখতে দেখতে আমরা লানডানের অভিজাত পাড়া মে- ফেয়ারে এসে পড়লাম। মে-ফেয়ারের পার্ক লেনে প্লে-বয় ক্লাব।

ক্লাবটা যে খুব বড় তেমন নয়। ছোট্ট এনট্রান্স—বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না যে ক্লাব।

ভিতরে ঢুকতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। দেখি অতি সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েরা প্যান্টির উপর স্যুইম স্যুটের চেয়েও অনেক হ্রস্ব গরম পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেম্বারদের খাদ্য পানীয় সরবরাহ করছে। তাদের প্রত্যেকের পশ্চাৎদেশে একটি সাদা ফারের বল—মাথায় খরগোশের কানের মতো ভেলভেটের কান। তাদের নাম Bunny.

Bunny Girl-রা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত।

www.BanglaBook.org

টবী উপরে নিয়ে গেল আমাকে। দেখি সেখানে সিগারেট আর পাইপের ধুঁয়োয় অন্ধকার হয়ে আছে। আর নানারকম টেবিলের চারপাশে নারী-পুরুষ ভীড় করে ঝুঁকে রয়েছে। বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন প্রকৃতির জুয়াখেলার বোর্ড।

এ ব্যাপারটা আমি কখনো ভালো বুঝি না। ভালো মানে, একেবারেই বুঝি না। ঘরের মধ্যে বসে যে-সব খেলা যায় সে সব খেলা ছোটবেলা থেকেই বাবার কড়া শাসনে শেখা হয়নি। শেখা যে হয়নি তার জন্য নিজের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই বরং স্বস্তি আছে। পাঠক হয়ত শুনলে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন যে তাস পর্যন্ত চিনি না আমি—খেলা জানা তো দূরের কথা। জুয়া তো আরো দূর।

সে-কারণেই এখানে বসে বিশেষ বুঝতে পারলাম না চতুর্দিকে কি ঘটছে না ঘটছে। তবে সমবেত জনমণ্ডলীর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল তাঁদের উৎসাহের অন্ত নেই।

এক জায়গায় দেখি কয়েকজন আমাদেরই মত কালো-কালো লোক গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে বসে দানের পর দান দিয়ে যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখি যে-চাকাটা ঘুরছে তার উপর লেখা আছে—মিনিমাম স্টেক—দুশো পাউন্ড।

দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল। বুঝলাম না এরা কারা? কোন গ্রহের লোক? শুনেছি অ্যামেরিকানরা ও জাপানীরা খুব বড়লোক। কিন্তু এদের চেহারা প্রায় আমারই মত দিশী-দিশী—কিন্তু এক এক দানে চার হাজার টাকা নষ্ট করছে এরা কারা? শুধু তাই-ই নয়, দেখি, Bunny গার্লরা তাদের ক্রমাগত রয়াল-স্যালুট স্কচ হুইস্কী পরিবেশন করে যাচ্ছে। যে হুইস্কীর এক বোতল দাম স্কটল্যাণ্ডেও কম করে হাজার টাকা। আমার মুখ-চোখ লক্ষ্য করে, পাছে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই—তাই তাড়াতাড়ি টবী বলল, এরা সব তেল-দেওয়া লোক।

আমি বুঝলাম না। বললাম, মানে?

টবী বলল, আবু-দাবী, দুবাই এসব জায়গার অয়েল-ম্যাগনেট এরা—লানডানে স্ফূর্তি করে যাচ্ছে।

আমি উত্তেজিত গলায় বললাম, তেল-বেচা টাকা দিয়ে। কোনো মানে হয়? আর তেলের খরচের জন্যে আমি টেনিস খেলা বন্ধ করে দিয়েছি তেলের দাম বাড়ার পর থেকে।

টবী বলল, এখন তো এদেরই দিন।

সে রাতে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

টবীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে স্কটল্যাণ্ড দেখা হলো না।

টবী বলল, তুমি দু-মাসে তামাম পৃথিবী দেখবে বলে বেরিয়েছো তার আমি কি করব? পরের বছর আবার চলে এসো। শুধু টিকিটের খরচ তোমার। শুধু এক মাসের জন্যে এসো। আমি যতদিন পারি আগে থেকে ছুটি ম্যানেজ করব। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তোমাকে স্কটল্যাণ্ড আর জার্মানী ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাব। বহু বন্ধু-বান্ধব আছে। তোমার তো কোনোই খরচ নেই—শুধু ছুটি নিয়ে আসা।

আমি হাসলাম। বললাম, এবারই বা কি খরচ? দেশে দেশে এমন সব রেস্তদার ভাই-

www.BanglaBook.org

বিরাদর থাকতে আমার আর ভাবনাটা কি?

টবী বলল, স্কটল্যাণ্ড তোমার খুব ভালো লাগবে। স্কটিশ মুর্স, লেকস্ আর পাহাড়গুলো। ভেজা ভেজা মেঘ-মেঘ।

আমি বললাম, আমার কলকাতায় এক স্কচ বন্ধু ছিল, সে ব্রিটিশ এমব্যাসীতে ছিল—বরাবর আমায় নেমন্তন্ন করত 'হ্যাগেস্' দেখতে। পুরোপুরি স্কটল্যাণ্ডের পোশাক পরে ওরা ওদের বাড়িতে যে হুল্লোড় করত তা বলার নয়। স্কচ লোকেরা কিন্তু ভারি দিলখোলা হয়। তাই না?

টবী বলল, যা বলেছ কিন্তু কিপ্‌টে হয়।

স্মিতা বলল, রুদ্রদা, তোমার দিন তো ফুরিয়ে এল। এবার তুমি মাদাম তুসোর গ্যালারী আর ব্রিটিশ মিউজিয়মটা ভালো করে দেখে নাও।

বললাম, হ্যাঁ। লাইব্রেরীতেও যেতে হবে। তারপর বললাম, আসলে কি জানো লাইব্রেরী, মিউজিয়ম এমন করে দেখা যায় না। দেখলে ভালো করেই দেখতে হয়। নইলে কলকাতা ফিরে 'আম্মো দেখেছি' বলা ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। আমি বিদেশে এসেছি অন্য কাউকে বিন্দুমাত্র ইমপ্রেস করার জন্য নয়—নিজে ইমপ্রেসড্ হতে। নিজে যা ভালো করে না দেখতে পেলাম তা দেখে লাভ কি? কলকাতার ককটেল পার্টিতে হুইস্কীর গ্লাস হাতে করে দাঁড়িয়ে অনেকে যেমন দেশ বেড়ানোর গল্প করেন আমি সেই রকম দেশ বেড়ানোকে বিশ্বেস করি না। তাই-ই তো এই স্বল্প সময়ে যতটুকু পারছি লোকজনের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করছি। দুচোখ দুকান জুড়ে ওদের কাছে কি শেখার আছে তাই-ই শেখার চেষ্টা করছি এই সময়ের মধ্যে। এ সময়ে কিছুই হবে না জানি, তবুও যতটুকু হয়। নাই মামার চেয়ে কানামামা ভালো।

আমরা বসে ড্রইংরুমে গল্প করছি। খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। টেলিভিসনে একটা ফিচার-ফিল্ম দেখাচ্ছে। স্মিতাই দেখছে একা। এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

টবী ফোন ধরেই বলল, রুদ্রদা, সানুর ফোন, টোরোন্টো থেকে।

সানু বলল, মুশকিল হল। আমার ছুটির দরখাস্তটা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু আগে থেকে। তারপর আমাদের ইয়ার ক্লোজিং। ছুটি পাব না। তোমার প্রোগ্রামটা একটু অ্যাডভান্স করে চলে এসো।

আমি বললাম, টবী যে কস্‌মস্-এর টিকিট কেটে ফেলেছে।

সানু বলল, লানডানে বসে বোরড্ হচ্ছ কেন? এক্ষুনি চলে যাও কন্টিনেন্টাল ট্যুরে। যে তারিখে বলছি সে তারিখে চলে এসো। ফ্লাইট-নম্বরটা টবীকে বোলো ফোন করে জানিয়ে দেবে। আমি এয়ার-পোর্টে থাকব।

আমি বললাম, আছিস কেমন?

ও বলল, ফাইন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তাড়াতাড়ি এসো—নইলে কানাডাতে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে—ঘোরাঘুরির অসুবিধা।

বললাম, ঠিক আছে।

www.BanglaBook.org

টবী বলল, নো প্রবলেম! তাই-ই করো।

স্মিতা বলল, সে হলে তো রুদ্রদাকে এর মধ্যে একদিন সাফারী পার্কে নিয়ে যেতে হয়। শিকারী মানুষ। ভালো লাগবে।

আমি হাসলাম। বললাম, দ্যাখো স্মিতা, টবীর মত শহরের শিকারে আনসাকসেসফুল বলেই জঙ্গলের শিকারী আখ্যা পেয়ে এলাম চিরদিন। তা বলে কি তুমিও শিকারী বলে হেলা করবে? স্মিতা বলল, ও যা শিকারী, জানা আছে। শিকার একটাই করেছে জীবনে— এই আমি। তাও আমি প্রায় আত্মহত্যা করলাম বলেই পারল, বাঁচতে চাইলে পারত না।

টবী উত্তর দিলো না, সঙ্গে সঙ্গে কস্‌মসের অফিসে ফোন করার জন্যে ডায়াল ঘোরালো।

সেদিন শনিবার ছিল। ছুটি। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সাফারি পার্ক-এর উদ্দেশ্যে।

ইটনের পথে কিছুদূর গিয়ে আমরা ঘুরে গেলাম। আধ ঘণ্টা-টাক লাগল পৌঁছতে। বিরাট এলাকা জুড়ে একজন সার্কাসের মালিক এই ওপেন-এয়ার চিড়িয়াখানা বানিয়েছে। বেবুন, বাঘ ও সিংহ আছে। সব খোলা। তাদের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে দেখতে হয়। বাইরে নোটিশ দেওয়া আছে যে, যার যার নিজের দায়িত্বে আগন্তুকরা ভিতরে ঢুকছেন—'মাল-জানের' দায়িত্ব যার-যার তার-তার। কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না কিছু অঘটন ঘটে গেলে।

বেবুনগুলো বেশ বড় বড়। পশ্চাৎদেশ রক্তিমবর্ণ—সম্মুখভাগে দাঁত-খিঁচানো ভঙ্গি। গাড়ি দেখলেই গাড়ির মাথায় ফ্রি-রাইডের জন্য চড়ে বসে।

বেবুনদের এলাকা পেরিয়ে বাঘেদের এলাকায় এলাম। ছোটবেলা থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন-জঙ্গলে ঘুরেও কখনও এমন এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। কখনও দেখা যেত বলে মনেও হয় না। কারণ, বাঘ স্বাধীনচেতা ও রাজ-রাজড়া জানোয়ার। তারা যুথবদ্ধতায় কখনোই বিশ্বাসী নয়। তাই একসঙ্গে পনেরো-কুড়িটা বাঘকে একটি ছোট এলাকার মধ্যে দেখে অবাকই হতে হয়।

জঙ্গলে একসঙ্গে কেন এত বাঘ দেখা যায় না তা একটু প্রাঞ্জল করে বলি। প্রথমত আগেই বলেছি বাঘ যুথবদ্ধ জানোয়ার নয়। দ্বিতীয়ত বাঘ ও বাঘিনী বছরের পুরো সময় কখনোই একসঙ্গে থাকে না। বছরে তাদের দুবার মিলনকাল। সেই সময় সঙ্গী জুটিয়ে নেয়। খুব একটা বাছবিচারের সুযোগ পায় বলে মনে হয় না। যে বছর যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সে-ই সঙ্গী বা সঙ্গিনী হয়। সেই সময়ও প্রায়শঃই দেখা যায় যে, বাঘ ও বাঘিনী সন্ধ্যে হতে না হতেই শৃঙ্গার শুরু করে রাত্রিশেষ অবধি মিলিত হয়। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আলাদা-আলাদা হয়ে ঘুমোয়। কেউ গুহায়, কেউবা নালার নরম বালিতে। গরমের দিনে ছায়াচ্ছন্ন জায়গায়, শীতের দিনে রোদে, কিন্তু আড়ালে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে হয় না এমন নয়।

বাঘেদের দাম্পত্যজীবন ভালোভাবে লক্ষ্য করলে অনেক কিছু শিখতে পারে মানুষ।

www.BanglaBook.org

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেরই পাখা জোরে চালানো অথবা আস্তে চালানো, অথবা মশারি টাঙানো কিংবা না-টাঙানো নিয়ে বিস্তর মনকষাকষি হয় স্বামী অথবা স্ত্রী সঙ্গে। বাঘেরা বুদ্ধিমানের মত এসব ঝামেলা এড়িয়ে চলে।

হঠাৎ একটি বাঘিনী চটে উঠে ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্ডেনের গাড়ি এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। খোলা ছোট ভ্যান। তাতে জনচারেক ওয়ার্ডেন—দুকোমরে হেবীবোরের দুই পিস্তল গুঁজে রয়েছেন প্রত্যেকে। হাতে লম্বা চাবুক।

কিন্তু তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হল প্রত্যেক বাঘকেই তাঁরা চেনেন এবং নাম ধরে ডাকেন। তাঁরা এসে বাঘেদের বোধ্য ও আমাদের কাছে সবিশেষ দুর্বোধ্য কি ভাষায় বিস্তর অনুরোধ-টনুরোধ করায় বাঘিনী সরে গেল।

স্মিতা অস্ফুটে বলল, ঈস, তোমার কি সাহস, রুদ্রদা! এইরকম বাঘ তুমি পায়ে দাঁড়িয়ে মারতে পারো?

টবী বলল, রুদ্রদা আর কি সাহসী? আমি এর চেয়েও হিংস্র বাঘিনী নিয়ে দিনরাত ঘর করছি।

খবরদার! বলে স্মিতা ফোঁস করে উঠল।

আমি মাঝে পড়ে বললাম, বাঘ-বাঘিনী থাক, এবার সিংহের কাছে যাওয়া যাক।

এই সাফারি পার্কেও গত ইংরিজী বাহাত্তর সাল থেকে চুয়াত্তর সালের মধ্যে বাবট্টিটি সিংহের বাচ্চার জন্ম হয়েছে। ষাট, ষাট। মা-ষষ্ঠীর এমন দয়া! অনেক বাচ্চা নিশ্চয়ই বিক্রী হয়ে গেছে। অনেক বাচ্চা সার্কাসে ভর্তি হয়ে এখন টুলের উপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বর্তমানে পার্কে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি সিংহ-সিংহী আছে।

BanglaBook.org

টবী বলছিল, সিংহগুলো মাঝে মাঝে গাড়ির ছাদে চড়ে পড়ে।

বলিস কি, বলতে বলতেই, একটা প্রকাণ্ড বড় ঘাড়ের-গর্দানে কেশর-ঝোলানো সিংহ আমাদের সামনে সামনেই যে একটা বাদামী রঙা ফরাসী দেশীয় সিমকা গাড়ি যাচ্ছিল, তার বনেটের উপর লাফিয়ে উঠল। যে ভদ্রলোক চালাচ্ছিলেন, তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন, পাশে সুন্দরী সঙ্গিনী—গাড়িটাও নতুন। সিংহ বোধহয় বেছে বেছে সে-কারণেই তার উপর চড়ল। কিছুক্ষণ বনেটের উপর দাঁড়িয়ে ভার সয় কিনা দেখে নিয়ে বনেট থেকে আস্তে আস্তে গাড়ির ছাদে সামনের দুপা বাড়িয়ে সাবধানে উঠল। যাতে পা না পিছলোয় সেই জন্যে। তারপর চাইনীজ ফিলসফারের মত মুখভঙ্গী করে নট-নড়নচড়ন নট-কিছু হয়ে বসেই থাকল।

আমরা দেখলাম, আস্তে আস্তে চকচকে সিমকা গাড়িটার ছাদ বসে যাচ্ছে। একটা প্রমাণ সাইজের হৃষ্টপুষ্ট সিংহের ওজন কম নয়।

চতুর্দিক থেকে পটাপট ছবি উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পোজ দিয়ে বসে থেকে তিনি এক লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। তখন আমরা আস্তে আস্তে সিংহের এলাকা ছেড়ে গেটের দিকে যেতে লাগলাম।

www.BanglaBook.org

এদিকে-ওদিকে অনেক শকুন দেখলাম, এই বাঘ-সিংহদের যে খাবার দেওয়া হয়, সেই হাড়-গোড় ও তৎসংলগ্ন মাংসের সদ্ব্যবহার করে তারা।

সাফারি পার্কের ক্যান্টিনে এক কাপ করে কফি খেয়ে আমরা বাড়ির দিকে ফিরলাম।

দুপুরটা সেদিন ভালো আড্ডা মেরে কাটল। স্মিতা পাবদা মাছের ঝোল রেঁধেছিল ধনেপাতা দিয়ে। রান্না ফার্স্ট ক্লাস হয়েছিল কিন্তু টাটকা পাবদা মাছে আর ডিপ-ফ্রিজে রাখা পাবদা মাছের স্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া বোধহয়, ইংল্যাণ্ডে বসে পাবদা মাছ ঠিক জমে না। যেখানকার যা; যখনকার তা।

বিকেল হতে-না-হতে স্মিতা বলল, আমার এক বান্ধবী আসবে আজ সন্ধ্যের সময়। তোমরা থেকো কিন্তু।

টবী শুধালো, কে বান্ধবী?

সুসান। স্মিতা বলল।

টবী বলল, আমি মোটেই থাকছি না। তাছাড়া মেয়েটার সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠতা ভালো নয়।

কেন? স্মিতা রাগত স্বরে শুধালো।

টবী বলল মেয়েটা সুবিধের নয়।

তোমাকে বলেছে। স্মিতা বলল।

তারপর বলল, এরকম মেয়ে আমি আমার পুরো অফিসে একজনও দেখিনি—কি ছেলেমানুষ আর কী যে ভালো!

টবী কথা ঘুরিয়ে বলল, থাক বাবা, আই উইথড্র। তবে, তোমার বন্ধু আসবে ভালো কথা, তুমি entertain করো। সুসান আসলে বোলো, আমি আমার কাজিনকে নিয়ে ডেন্টিস্ট-এর কাছে গেছি। দাঁতে রুদ্রদার খুব ব্যথা।

স্মিতা খুব মনমরা হয়ে বলল, সে কি? সুসান যে রুদ্রদার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই আসছে। লেখক শুনে ও খুব আলাপ করতে উৎসুক। ও মাঝে মধ্যে ছোট গল্প-টল্প লেখে।

টবী বলল, তাহলে লেখক বলে কি দাঁতে ব্যথা হতে পারে না?

তারপর একটু থেমে বলল, সুসানকে ফোন করে বলো যে, লেখকের দাঁতে ব্যথা; যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে কাটা-কইয়ের মত!

রিসিভারটা তুলে স্মিতা বলল, 'কাটা-কই-এর মত'র ইংরিজী কি?

টবী স্মিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে বলল, কাটা-কই-এর মত বলার দরকার নেই।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

কিন্তু সুসান তবুও আসবে বলল। আজ সন্ধ্যেতে ও আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেনি। স্মিতার সঙ্গে গল্প করবে আর খাবে—লেখকের সঙ্গে নাই-ই বা দেখা হলো।

বলা-বাহুল্য, এ কথাতে অধম লেখক মোটেই খুশী হলো না। উত্তম লেখক হলেও সুসান আসার অনেক আগেই টবী আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

লিফট থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে উঠতে টবীকে বললাম যে, যতদূর মনে পড়ে তোর সঙ্গে কখনো কোনো শত্রুতা করিনি। কিন্তু একজন সুন্দরী সাহিত্যরসিকা উৎসুক তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপে তোমার এহেন আপত্তি কেন?

টবী বলল, আই অ্যাম সরী। কিন্তু না-পালিয়ে উপায় ছিল না। আমি বাড়ি থাকলে কেস গড়বড় হয়ে যেত।

ব্যাপারটা কি? আমি শুধোলাম।

আরে ওর বড় বোন আমার গার্ল-ফ্রেন্ড ছিল। আমি সুসানের নাম শুনে এবং ওর বাবা মা কোথায় থাকে তা শুনেই বুঝেছি প্রথম দিন থেকে। ও আমাকে ভালো চেনে।

আমি বললাম, তুই নিশ্চয়ই কিছু অপ্রীতিকর কাজ করেছিলি।

টবী বলল, বিশ্বাস করো, আমি কোনো কিছুই করিনি। কিন্তু সুসানের দিদি আইলীন যে এমন এমোশনাল, এত বেশী সেনসিটিভ তা বুঝতে পারিনি। ওদের পরিবারটি খুব ভালো। যেমন মা, তেমন বাবা। বাবা ইংরিজীর অধ্যাপক ছিলেন এক মফস্বল কলেজে। মেয়েরা সকলেই একটু কবি-প্রকৃতির। কি বিপদে যে পড়েছিলাম, কি বলব। আমি তাকে বিয়ে করব না, করা সম্ভব নয় বলাতে তার মাথার গোলমাল হয়ে গেছিল। এখন অবশ্য সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে।

আমি বললাম, বিয়ে করলি না কেন? খুবই অন্যায় করেছিস।

টবী বলল, তুমি তো আজব লোক; বাবা খড়ম-পেটা করতেন না? মা কি মেমসাহেব ঘরে তুলতেন? তাছাড়া বিয়ে করলে দিশী মেয়েই ভালো। এদের নিয়ে হিমসিম খেতে হয়।

এতই যদি জানিস তাহলে ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে তেমনভাবে মিশলি কেন? প্রেম করলি কেন?

গাড়িটা সোয়ান-ট্যাভার্ন বলে একটা পাব-এর সামনে দাঁড় করাল টবী। গাড়ি পার্ক করে আমরা নামলাম।

টবী বলল, জানো এ পাবটা দুশো বছরের পুরনো পাব। বিখ্যাত পাব এটা।

আমি বললাম, রাস্তাটা চেনা চেনা লাগছে যেন!

টবী বলল, লাগবেই তো। এটাই তো বেজওয়াটার স্ট্রীট। খুব লম্বা রাস্তা। বীয়ার মাগে গীনেস। কালো বীয়ার নিয়ে আমরা বাইরের খোলা আকাশের নীচের কাঠের তৈরী বসার জায়গায় এসে বসলাম।

চারপাশে ফুটফুটে সব ছেলেমেয়ে। হল্লোড় করছে, জোড়ায়-জোড়ায় ফিরে যাচ্ছে— মনে হচ্ছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে 'এই বুঝি ফুরিয়ে গেল' ভেবে প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করে নিচ্ছে। আঁজলা গড়িয়ে যেন ছিটেফোঁটাও না পড়ে যায় জীবন। সবসময় সেদিকে নজর।

এ দেশে এসে অবধি বারবারই মনে হয়েছে বয়সটা কেন পঁচিশের নীচে হল না, কেন এদেশে পড়াশুনা করলাম না।

www.BanglaBook.org

এসব 'কেন' সকলের মনেই ওঠে—কিন্তু এসব কেনর কোনো উত্তর হয় না। হবে না। জানি তবুও মনটা হঠাৎ খারাপ লাগে। ভীষণ খারাপ।

কিন্তু জীবনে আর সবই হয়, কিন্তু জীবনের গাড়ির কোনো ব্যাক-গীয়ার নেই। এ গাড়ি শুধু সামনেই চলে। শুধুই সামনে।

ব্ল্যাক-বীয়ারের মাগ-এ একটা বড় চুমুক লাগিয়ে টবী হঠাৎ পথের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল।

পথ দিয়ে বেশী গাড়ি যাচ্ছে না। শনিবারের রাত। এখন ভীড় বেশী হয় শুক্রবার রাতে। ফাইভ-ডেজ উইক হয়ে গিয়ে জীবনযাত্রার পুরনো প্যাটার্ন বদলে গেছে।

আমিও পথের দিকে চেয়েছিলাম। ভাবছিলাম, বেশ কটা দিন কেটে গেল লানডানে টবীদের আতিথেয়তায়। ছোটবেলায় কখনো ভাবিনি যে বেড়াতে আসব এখানে। ভেবেছিলাম কিনা মনে পড়ে না। কিন্তু আমি বড় কৃতজ্ঞ লাক। এ জীবনে যা-কিছু পেয়েছি, যতটুকু পেয়েছি, অর্থ, যশ, ভালোবাসা, প্রীতি সব কিছুর জন্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকি। যখনই একটু একা বসে ভাবার অবকাশ ঘটে, তখনই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলি, ঈশ্বর! তুমি সত্যিই করুণাময়। যা পেয়েছি তার জন্যে আনন্দিত থাকি। যা পাইনি সেই সব অপ্রাপ্তিজনিত নিখাদ দুঃখ দেওয়ার জন্যেও তার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকি। শুধু আমার একার কেন, সকলের সব খাদ তো দুঃখের আগুনেই ঝরে। যে দুঃখ পেল না, দুঃখকে আপন অন্তরের অন্তরতম করে জানল না, তার কাছে তো সুখের স্বরূপও অজানা। যে দুঃখকে জেনেছে, সেই-ই তো সুখকে জানতে পারে।

ভাবছিলাম দুএকদিনের মধ্যেই চলে যাব। আবার আসতে পারব কিনা কে জানে? এসে যে ভারত উদ্ধার অথবা নিজেকে উদ্ধার করলাম এমন নয়। তবে, কত কি দেখলাম দুচোখ ভরে, মানুষ দেখলাম, তাদের সমস্ত মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম, কথা শুনলাম। এটা একটা বড় শিক্ষা হল। পৃথিবীটা এতদিন যেন ম্যাপের মধ্যেই, গ্লোব-এর গোল বলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হঠাৎ নীল রঙে আঁকা সমুদ্র, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন শহরগুলোর নাম আমার মত এই সামান্য জনের জীবনেও সত্যি হয়ে উঠল। পৃথিবীটা এতদিনে ম্যাপ থেকে, গ্লোব থেকে ছাড়া পেয়ে আমার চেতনার মধ্যে, দৃষ্টির মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠল জীবন্ত হয়ে। স্মৃতির মধ্যে এল।

হঠাৎ টবী বলল, রুদ্রদা, তুমি বলছ তাহলে আমি আইলীনের প্রতি অন্যায় করেছি?

পরক্ষণে নিজেই বলল, আসলে জানো, এখানে ভারতীয় সাধারণ ছাত্র যারা পড়তে আসে, বা চাকরি নিয়ে আসে, তাদের সঙ্গে যত মেয়েরই দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাদের সঙ্গে প্রেম বলতে আমরা দেশে যা বুঝি তেমন সম্পর্ক হয় না। তোমাকে কি বলব—বুঝিয়ে বলতে পারছি না—সম্পর্কের বেশীটাই শরীর নির্ভর—অর্থ-নির্ভর।

তারপর বলল, সত্যিকারের প্রেম বলতে যা বোঝায় তা কি আজকাল আছে? দেশেও কি আছে? মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই বদলে গেছে অনেক।

আমি বললাম, তুই কিন্তু যা বললি, তাতে আইলীন তোকে সত্যি সত্যি ভালো-

www.BanglaBook.org

বেসেছিল। তোর কাছে তো তার প্রত্যাশার কিছু ছিল না।

কিছু না। কিছু না। টবী বলল।

তারপর বড় আরেক ঢোক বীয়ার গিলে বলল, আজ না হয় দুপয়সার মুখ দেখেছি—নিজের ফ্ল্যাট কিনেছি—গাড়ি চড়ছি—ভালো ভালো ক্লাবের মেম্বার হয়েছি, কিন্তু সেদিন? সেদিন আইলীন শুধু ভালোই বাসেনি আমাকে—অনেক রকম সাহায্যও করেছিল।

আমি বললাম, তুই পালিয়ে না এসে সুসানকে মিট করলে পারতিস। আইলীনের সব খবরাখবর পেতিস।

ও চোখ বড় করে বলল, স্মিতা জানে না যে।

জানলেই বা কি? আমি বললাম।

টবী আশ্চর্য চোখে আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল, আমার সন্দেহ হয় তুমি আদৌ লেখক কি না। মেয়েদের তুমি কিছুই বোঝনি! তোমার ধারনা স্মিতা বুঝত কিছু? কিছুই সে বুঝত না। মেয়েরা, সে যে-দেশের মেয়েই হোক না কেন, কতগুলো ব্যাপার কখনও বোঝেনি। বুঝবেও না। যতই তুমি বোঝাতে যাও। বোঝাতে চাওয়াও মূর্খামী।

তারপর টবী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আইলীনের ব্যাপারটাকে আমি কখনও আমল দিইনি। নিজেকে নিজে চিরদিন জাস্টিফাই করে এসেছি। ভেবেছি, আই ওজ অলওয়েজ রাইট। এন্ড শী ওজ অলওয়েজ রং। তোমার কথায় এখন দেখছি ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য করার কীই বা আছে এখন। ভাবনাই সার। কিন্তু দাদা—প্রেম-টেম এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার সকলের জন্যে নয়। তোমরা লেখক-টেখক তোমাদের এসব মানায়—মানে তোমরা এ সবের ফাইনারিজগুলো বোঝ—আমি ডাহা মিস্ত্রী—এঞ্জিনীয়র বল আর যাই বল—আমি এসব ঠিক বুঝিনি কখনও। ভুলটা আইলীনেরই। ও ভুল করে ভুল লোককে ভালোবেসেছিল। ওসব ভালোবাসাটাসা আমার আসেনি। হিন্দু মতে বাবা-মায়ের দেখে দেওয়া বিয়ে করে নিয়ে এসেছি—বৌ আমার বেঁচে থাক—সব সাদা চামড়ার মেয়ের মুখে ছাই।

টবীর কথার ভাষা ও রকম দেখে মনে হয় টবী একটু 'হাই' হয়ে গেছে। অথচ ও এত সহজে 'হাই' হওয়ার ছেলেই নয়। মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। মনই বোধহয় শরীরকে চালায়। মন বেসামাল হলে শরীরের বেসামাল হতে দেরী সয় না।

আমি চুপ করে পথের দিকে চেয়েছিলাম। ওর পুরনো দিনের ভুলে যাওয়া ও ভুলে-থাকা ভাবনাকে ফিরিয়ে আনার পিছনে আমার অপরাধ হয়ত কম নয়। কিন্তু মুখে ও আজ যাই বলুক, টবীর ভেতরেও যে একটা আশ্চর্য নরম মানুষ ছিল, যার খোঁজ দেশে কি বিদেশে কেউই রাখেনি। এই মানুষটাকে জানতে পারলাম আমি—এই-ই মস্ত লাভ।

ঐখানে বসে, চতুর্দিকের হৈ হৈ, গাড়ির আওয়াজের মধ্যে আমার হঠাৎই মনে হল যে, সারাজীবন বড় কাছাকাছি থেকেও আমরা একে অন্যের বহিরঙ্গ দিকটাকেই জানি—জানতে পাই—অন্তরঙ্গ রূপ তো সহজে প্রকাশিত হয় না—প্রকাশিত হলেও সেই

www.BanglaBook.org

রূপের দেখা পেতে দেবদুর্লভ ভাগ্যের দরকার হয়। তাই বহিরঙ্গকেই অন্তরঙ্গ বলে ভুল করতে করতে সেইটাই একমাত্র ও অমোঘ রূপ বলে বিশ্বাস জন্মে যায়। তখন ভেতরের গভীর জলের বাসিন্দা আসল মানুষটা কখনও বাইরে রোদ পোয়াতে এলে—তাকে রোদ-পোয়ানো জল-ঢোঁড়া সাপের মত আমরা ইট-পাটকেল মেরে উত্যক্ত করি। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার ঝুপ করে জলে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কতক্ষণ যে আমরা ওখানে বসেছিলাম, কতবার বীয়ার মাগ ভর্তি করে এনেছিলাম মনে নেই। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল বাইরে হিমে বসে থেকে।

বললাম, টবী, এবার চল ওঠা যাক।

টবী আমার দিকে তাকাল। কথা বলল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চলো রুদ্রদা! তোমাকে আইলীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। উ্য উইল লাইক হার। ভেরী নাইস গার্ল ইনডিড। ও কাছেই থাকে।

আমি বললাম, টবী, বাড়ি চল।

টবা বলল, নো। নট ন্যাউ।

তারপর বলল, তুমি একটা ক্যাব নিয়ে চলে যাও রুদ্রদা। আইলীনের সঙ্গে অনেক কথা জমে আছে। ও যদি বাড়ি থাকে, তাহলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইব ওর কাছে।

টবী কোনো কথা না শুনে আমাকে বলল, তুমি এগোও। আমি আইলীনের বাড়ি ঘুরে যাচ্ছি।

কোটের কলার তুলে বেজওয়াটার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিলাম। ঝুরঝুর করে হাওয়া দিয়েছে একটা। আর দিন কয়েক পরই 'ফল' শুরু হবে। প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে একটা ক্যাব পেলাম।

বাড়ি পৌঁছেছি দেখি টবীও ওর গাড়ি পার্ক করছে।

গাড়ি লক করে টবী এগিয়ে এল।

আমি কথা না বলে ওর দিকে তাকালাম।

টবী বলল, আইলীন ও ঠিকানায় নেই। বহুদিন হল চলে গেছে।

মনে মনে আমি খুশী হলুম। খুশী হলাম আইলীনের জন্যে এবং টবীর জন্যেও। মুখে কিছুই বললাম না।

লিফটের দরজা খুলে ধরলাম টবীর জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

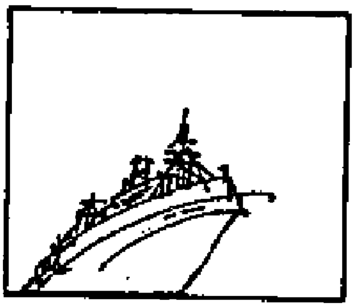

আমরা টবীর খাওয়ার ঘরে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম। প্রাতরাশ খাওয়ার পরই টবী ও স্মিতা দুজনেই আমাকে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ছাড়তে যাবে। সেখান থেকে কস্‌মস্‌ ট্যুরস-এর ট্যুর নিয়ে আমি কন্টিনেন্টে যাব। বারো দিনের জন্যে।

বেশ রোদ উঠেছে আজ। টবীদের বাড়ির নীচে যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করানো থাকে সেখানে ও বাগানে বাচ্চারা খেলছে দৌড়াদৌড়ি করে। তাদের গলার চিকন স্বর কাঁচের বন্ধ জানালা পেরিয়েও উপরে আসছে। টবীর প্রতিবেশী মিস রবসন জিনের বেল-বটস্‌-এর উপরে রং-চটা চামড়ার জার্কিন চাপিয়ে পাইপ ও ব্রাশ দিয়ে গাড়ি ধুচ্ছেন।

আজ শনিবার। অফিস ছুটি। সকলের কিন্তু বড় কাজের দিন আজ। স্মিতার আজ ওয়াশিং ডে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে এসে কাপড় কাচবে—যদিও ওয়াসিং মেশিনে—তারপর চুল শ্যাম্পু করবে—আমাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় সপ্তাহের বাজার করে আসবে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস থেকে।

কফির পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে স্মিতা বলল, ভাসুরঠাকুর, তুমি চলে গেলে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে কয়েকদিন।

আমি হেসে বললাম, কয়েকদিন মাত্র। পৃথিবী ছেড়ে কেউ গেলেও কয়েকদিনই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। তারপর বললাম, তোমাকে থ্যাঙ্ক উ্য জানাই। তুমিই আমাকে লানডানে সাবালক করেছ, টিউবে চড়তে শিখিয়েছ ; কক্‌নী ইংরিজী শিখিয়েছ।

টবী বলল, শেখাবার চেষ্টা করেছে বল।

যাই-ই হোক, আমি বললাম।

আমার স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে টবী এগোল। পিছনে পিছনে আমি আমার নতুন কেনা ওভারকোট-টুপী ইত্যাদি নিয়ে। স্মিতা সবচেয়ে শেষে ঘর বন্ধ করে লিফটে এসে ঢুকল।

কেউই আমরা কোনো কথা বললাম না। এই কয়েকদিনের কারণ-অকারণের হাসি গল্প খুনসুটির সমস্ত উচ্ছ্বাস লিফটের মধ্যে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বুকের মধ্যে এক স্তব্ধ নীরবতায় জমে গেল।

একতলায় নেমে লিফটের দরজা খুলে টবী বলল, কি হলো স্মিতা—এত চুপচাপ কেন? রুদ্রদা তো বারো দিন পরই আবার আসছে ক্যানাডা যাবার পথে।

স্মিতা হাসল। বলল, তুমিও তো চুপচাপ।

ভিক্টোরিয়া ট্রেন টার্মিনাসে যখন এসে পৌঁছলাম তখন দেখি স্টেশনের একটা বিশেষ জায়গা ভীড়ে-ভীড়াক্কার। বাহুতে ব্যাচ লাগানো কস্‌মস্‌-ট্যুরস-এর কর্মচারীরা ঘুরে

www.BanglaBook.org

বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। যত যাত্রী বিভিন্ন ট্যুরে যাচ্ছে, আজ আমাদের দেশ হলে কর্মচারীর সংখ্যা অসংখ্য হত। যাই-ই হোক, খুঁজে-পেতে আমার যে ট্যুর সেই ট্যুরের কর্মচারীটিকে পাওয়া যেতেই তাকে দেখে আমি যেমন পুলকিত হলাম সেও আমাকে দেখে তেমনই পুলকিত হল। কারণ ট্রেন ছাড়ার আর বেশী দেরী ছিল না। যা বোঝা গেল তা হচ্ছে কস্‌মস্‌ কোম্পানীর বিভিন্ন ট্যুরের জন্যে লানডান থেকে ডোভারের এই বিশেষ ট্রেনটির বন্দোবস্ত হয়েছে। ট্রেনের প্রায় সব যাত্রীই বিভিন্ন ট্যুরের যাত্রী

টবী আমার সময়াভাবের জন্যে যে বারোদিনের ট্যুরের টিকিট কেটেছিল—তাতে লেখা ছিল 'আটটি দেশ এবং প্যারিস'। অর্থাৎ যেন প্যারিসের আকর্ষণ অন্য একটি পুরো দেশেরই মত। এই ট্যুর একেবারেই জনতা ট্যুর। যাদের অবস্থা ভালো তারা কোন দুঃখে এই অধমের সঙ্গে যাবে। কস্‌মস্‌ কোম্পানী অবশ্য দামী ও বিলাস-বহুল ট্যুরের ব্যবস্থাও করেন।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে গেল। সকলের সীটই রিজার্ভ করা আছে। যে-যার জায়গায় গিয়ে বসলাম।

টবী ও স্মিতাকে ট্রেন-ছাড়া অবধি অপেক্ষা করতে বারণ করলাম। ওদের অনেক কাজ ছিল। এই উটকো দাদা এসে পড়ে তো এদের সময়ের এবং টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করিনি।

ওরা চলে গেলে আমি ওভারকোট ও টুপী সামলেসুমলে রেখে নিজের সীটে বসলাম। শীতের দেশের লোকরা যে কী সপ্রতিভ অবলীলায় ওভারকোট টুপী ছাতা ছড়ি সব সামলায় তা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

বসে পড়ে মনে হল এইই প্রথম আমার একা একা বিদেশ যাত্রা শুরু হল। বোম্বে থেকে প্লেনে ফ্রাঙ্কফার্ট হয়ে লানডানে আসা ইস্তক তো টবী ও স্মিতাই খবরদারী করেছে। এবার থেকে রীতিমত স্বাবলম্বী। আট-আটটা দেশ ঘুরতে হবে—কতবার যে পাসপোর্ট বের করতে হবে—বিভিন্ন দেশের ভিসা দেখাতে হবে—কতবার যে কত জায়গায় নিজের নাম জন্ম তারিখ পাসপোর্টের নম্বর লিখতে হবে তা জানা ছিল না। ডোভারে গিয়ে আমরা জাহাজে করে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ডে গিয়ে নামব। অস্টেণ্ডে কস্‌মস্‌ কোম্পানীর বাস দাঁড়িয়ে থাকবে। ঐ বাসে করেই আমাদের বারোদিনের ট্যুর। রাতে শুধু বিভিন্ন জায়গায় হোটেলে রাত্রিবাস। আর সারাদিন চলা।

আমার পাশে একজন অত্যন্ত লম্বা প্রৌঢ়া মহিলা—উটপাখির মত খোলা জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে গলা বার করে একটি যুবক এবং এক কিশোরীর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, ইংরেজ পুরুষরা কথা কম বললেও মহিলারা অত্যন্ত বেশী কথা বলেন। এবং সব দেশেই এক ধরনের বেশী বয়সী অথচ নেকুপুষুমুনু মহিলারা প্রচুর জ্বালান অন্যদের।

কথাবার্তায় বোঝা গেল যে ভদ্রমহিলা অবিবাহিতা। যুবকটি তাঁর ভাইপো এবং কিশোরী নাতনী।

www.BanglaBook.org

ট্রেন ছেড়ে দিলে ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম যে কত বড় ভুল। ভাইপো ও নাতনী চলে গেল তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন।

এদিকে ট্রেন চলেছে ইংলিশ গ্রামের মধ্যে দিয়ে। দেখতে দেখতে আমরা ক্যান্টারবেরী এসে পৌঁছলাম। রবিনহুড কি এই জায়গায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন? শার্লক হোমস্-এর কত কাণ্ড-কারখানা আছে এসব অঞ্চল নিয়ে। ক্যান্টারবেরীর গল্প পড়েনি এমন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত কোথায়?

সাধারণত মেয়েদের মধ্যে ন্যাকামি আমার অপছন্দ নয়। ন্যাকামিটা মেয়েদের চেহারা ও চরিত্রের সঙ্গে যেমন ওতপ্রোতভাবে মানায় তাতে নারীত্বের একটা বিশেষ নরম দিক প্রকাশিত হয় বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই বিগতযৌবনা মহিলার বসার ধরন, কথা বলার কায়দা, চোখ ঘোরাবার ধরন-ধারণ দেখে ইচ্ছে হলো যে ডোভারে নেমেই ওঁকে একটা বড় আয়না কিনে প্রেজেন্ট করি।

চারপাশে যারা বসেছিল সকলকে দেখা যাচ্ছিল না। যাদের দেখা যাচ্ছিল তাদের কারো সঙ্গেই আলাপ ছিল না। পরে এদের সকলের সঙ্গেই কত ঘনিষ্ঠতা হবে—একসঙ্গে খাওয়া-বসা-হাঁটা-চলা। কন্ডাকটেড ট্যুরে এইটেই মস্ত লাভ যে বহু দেশের বহু লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পাওয়া যায়।

দেখতে দেখতে ডোভারে এসে দাঁড়াল ট্রেন। একটি সুন্দরী অল্পবয়সী বেলজিয়ান মেয়ে—কস্‌মসের গাইড আমাদের বলে গেল যে তোমাদের স্যুটকেস নিয়ে কাস্টম্‌স-এর হাত পেরিয়ে এক জায়গায় রেখে দিও। আমরা বোটে নিয়ে যাব এবং বার্থে পাঠিয়ে দেব।

যেহেতু বোট বেলজিয়ামে যাচ্ছে এবং আমরা বোটের যাত্রী—ডোভার স্টেশনেই ব্রিটিশ কাস্টম্‌স আমাদের পাসপোর্ট-টাসপোর্ট দেখে—এনিথিং টু ডিক্লেয়ার? বলে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল।

আমরা বোট মানে নৌকো বুঝি। নৌকোর চেয়ে বড় মোটর লঞ্চ তারপর স্টীমার তারপরে জাহাজ—শিপ্। কিন্তু এখন সারা পৃথিবীতে বোট মানে জাহাজ। ভাষা নিয়ে অনেক রম্‌দা-রম্‌দি হয়েছে ইদানীং। ভাষাতত্ত্ববিদদের হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে বসে বসে পিঠের ঘামাচি মারতে হয় দেখে পুরনো ভাষা ও উচ্চারণ পাল্টে দিয়ে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করছেন। ধরা যাক ইংরিজী SCHEDULE কথাটা। আমরা জানি শিডিউল। কেউ কেউ বলেন শেডুল। কিন্তু আমেরিকানদের দৌলতে ইংরিজী ভাষাটাই গায়েব হতে বসেছে। SCHEDULE-এর বর্তমান উচ্চারণ পুরো পশ্চিমজগতে এখন কেজুল্। পুরনো ইংরিজী কথাটাকে এমন ডাক্তারী বানানোর কায়দায় উচ্চারণ করে কি উপকার হলো জানি না—কিন্তু এখন ওখানে শিডিউল বললে কেউ বুঝবে না।

ব্রিটিশ কাস্টম্‌স-এর কালো ব্লেজার-পরা গুঁফো অফিসারদের চকচকে জুতোর চাকচিক্যের দিকে শেষবার চেয়ে প্রকাণ্ড জাহাজের হাঁ-করা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম। সমস্ত পশ্চিমী দেশে যা সত্যিই আশ্চর্য করে তা সকলের সৌজন্য। যে লোক টিকিট কেটে

www.BanglaBook.org

ট্রেনে চড়েছে, যে দোকানে এসেছে, যে-আয়কর দিচ্ছে তারা সকলেই ভি.আই.পি.। সৌজন্য কিছুমাত্র খরচ হয় না কিন্তু বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তার তুলনা নেই। সবচেয়ে বড় কথা যে সৌজন্যে বিশ্বাস করে সে অন্যের প্রতি তা দেখিয়ে নিজেকেই এক উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করে। সৌজন্যে যা পাওয়া যায় এ জীবনে তা অন্য কোনো কিছুতেই পাওয়া যায় না।

বোটে উঠে একটা বসার জায়গা ঠিক করে মালপত্র তাতে রেখে সামনের ডেকে এলাম। হু-হু করে কনকনে হাওয়া আসছে ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে। ওভারকোট ও টুপী পরেও জমে যাচ্ছি। অথচ ওদেশে তখনও সামার। ঝকঝক করছে রোদ কিন্তু মনে হচ্ছে সোনালী বরফ' পড়ছে আকাশ থেকে।

পাশেই ডোভারের বিখ্যাত হোয়াইট রকস্। দেখা যাচ্ছে। ডোভারকে বলে ডোভার অফ দা হোয়াইট রকস্। সাদা সী-গালের ঝাঁক উড়ছে নীল জলের উপর। সাদা পাহাড়গুলোর উপরে পাখিগুলো উড়ে বসছে। পাহাড়ের খাড়া গায়ের ফাঁক-ফোকরে সী-গালেদের বাসা।

নীচে ডিউটি-ফ্রি শপ খুলে দিয়েছে। হুইস্কী, চকোলেট আর পারফ্যুম কেনার ধুম পড়ে গেছে। রথযাত্রার মেলায় তালপাতার বাঁশী কেনা গরীব ছেলের মত আমি গিয়ে গুটি গুটি এক টিন পাইপের তামাক কিনে ফিরে এলাম।

এবার বোট ছাড়ল। আজ সমুদ্র বড় অশান্ত। টবী ও স্মিতা বলে দিয়েছিল যে জাহাজ উঠে কিছু খেয়ে নিও নইলে সী-সিক্ হয়ে পড়বে। ডাইনিং রুম দুটো। একটাতে ওয়েটার খাওয়ার সার্ভ করে। সেখানে দাম বেশী। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যটাতে সেলফ-সার্ভিস। এক কাপ কফি ও দুটো স্যাণ্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ পর্ব সমাধা করলাম।

আমার সীটের পাশে একটি অল্পবয়সী ইংলিশ ছেলে বসেছিল। ও ব্রাসেলস্-এর কলেজে পড়ে—ইংরিজী এবং তুলনামূলক সাহিত্য। ও বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়কে চেনে না কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে চেনে। সারা পৃথিবীতে রসিক সকলে অপু-ট্রিলজী দেখেছে কিন্তু পথের পাঁচালীর লেখক যে সম্মানের লোক তা জানে না। একথা জেনে দুঃখ হল। ছেলেটির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে কাটানো গেল। আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই পড়াশোনা একটা ভালো চাকরির সিঁড়ি। পড়াশোনা করার আনন্দে খুব কম ছেলেমেয়েই পড়াশোনা করে আজকাল। কেন জানি না!

বোট বড় ঝাঁকাচ্ছে। একদল মেয়ে বমি-টমি করে অস্থির। লেডিজরুমের সামনে যেন কাঙালি-ভোজন লেগে গেছে। কেউ মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কেউ দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে অসহায় আধশোয়া ভঙ্গীতে বসে আছে।

মেমসাহেব মানে মার্কেন্টাইল ফার্মের বড় সাহেবের দারুণ দারুণ গাউন পরা সুগন্ধি পারফ্যুম মাখা মেয়েছেলে বলেই জানতাম। মেমসায়েবদেরও এমন হেনস্থা হয় তা নিজে চোখে দেখে মনে মনে একটু খুশী হলাম। আসলে ব্যাটা-ছাওয়া; ব্যাটা-ছ্যাওয়া; বিটি-ছাওয়া; বিটি ছাওয়া। পোশাক যার যাই-ই হোক না কেন—আর গায়ের রং যাই-ই হোক।

www.BanglaBook.org

বিকেল হয়ে এসেছে। রোদে মাতাল হয়ে ওঠা উথাল-পাতাল করা চ্যানেলের ঢেউ-এর মাথায় ফেনা চিকমিক করে উঠছে। দূ—রে ড্যাঙা দেখা যাচ্ছে। আমরা বেলজিয়ামের তীরে এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে। অস্টেণ্ডের জেটীর দিকে মুখ করল বোট। ধীরে ধীরে দূরত্ব কমে আসছে। আবছা তীর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা আরো অনেক জাহাজের মাস্তুল-টাস্তুল দেখা যাচ্ছে।

কথা আছে জাহাজ থেকে নেমে বেলজিয়াম কাস্টমস্ ক্লিয়ার করে আমরা আমাদের বাসে উঠব। তারপর বাসে করে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্-এ পৌঁছব। এ রাতটা ব্রাসেলস্-এই কাটাব। তার পরদিন ভোরে আবার বেরোব।

বোটে বমি না হলেও ঐ রকম দোলানীতে শরীর খারাপ লাগছিল। একটা গা-গুলানো ভাব। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই বোটের পেটের দরজা খুলে গেল। বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল ভিতরে। হাওয়াতে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। এতক্ষণ হীটেড বোট থেকে বাইরের ঠাণ্ডা সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যায়নি। বন্দরে নেমে মনে হল ঠাণ্ডা তো নয় যেন হাঙর—জুতোর মধ্যে ঢুকে পড়ে গোড়ালি কামড়ে ধরেছে।

মালপত্র হাতে নিয়ে সকলের সঙ্গে গুটি-গুটি পা-পা করে বাইরে বেরোলাম। এত লোক ঘেঁষাঘেষি ঠেসাঠেসি কিন্তু হুড়োহুড়ি নেই, চেঁচামেচি নেই—আমাদের মত এত বেশী অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না পশ্চিমীরা—কথা বললেও ফিসফিস করে যাকে বলছে তাকে শোনাবার জন্যেই বলে—চারদিকের লোককে শোনাবার জন্যে বলে না।

হাতের মালপত্র নিয়ে জেটী থেকে নেমে এগিয়ে যেতেই দেখি সার সার বাস দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক বাসের সামনের উইণ্ডস্ক্রীনের উপরে হলুদ কাগজে লেখা আছে কস্‌মস্ কোম্পানীর বিভিন্ন ট্যুরের নম্বর। আমাদের ট্যুরের নম্বর দুশো কুড়ি।

একটা মেয়ে হলুদ ব্যাচ বাহুতে লাগিয়ে প্রত্যেককে ট্যুর নম্বর জিজ্ঞেস করে করে যার যার বাসের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ইংলিশ ছেলে—পরনে একটা কাল্‌চে কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, গায়ে কালচে গরম কোট—ঘাড়-অবধি নেমে আসা লালচে চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখে দেখে কার কোথায় বসার জায়গা বলে দিচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম, জানলার পাশের সীট আমার। লক্ষ্য করে দেখলাম ট্যুরের বেশীর ভাগ লোকই বয়স্ক। অল্পবয়সী কিছু ছেলে-মেয়েও ছিল। কার কি জাত, কে কোন লোক জানি না। আমার পাশে কার সীট তাও জানি না। এক-একজন করে বাসের পাদানীতে উঠে আসছে আর তার দিকে তাকাচ্ছি। শেষে আমার যেমন বরাত তেমনই ঘটল। একজন গোলাকৃতি ফিলিপিনো মহিলা আমার পাশে এসে বসলেন। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ল অজানিতে। ইনি না হয়ে যে-কোনো একজন অস্ট্রেলিয়ান বা ইজরায়েলী তরুণীও তো আমার বারোদিনের গা ঘেঁষা সঙ্গিনী হতে পারত!

যাই-ই হোক তৎক্ষণাৎ আলাপ করে ফেললাম। জানা গেল তিনি একজন গায়নাকলোজিস্ট—ফিলিপিনস্ থেকে বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসেছেন উচ্চতর শিক্ষার

www.BanglaBook.org

জন্যে। এই ট্যুর নিয়েছেন দেশ দেখবার জন্যে—বৃত্তির টাকা জমিয়ে। বৃত্তি ছাড়াও ভালো চাকরি করেন তিনি। এবং একটু কথা বলেই বোঝা গেল ভদ্রমহিলা অত্যন্ত যোগ্যা। আপাতত যোগ্যতা ও তাঁর বিশেষ শিক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন এমন কোনো সম্ভাবনা এই বিরাট বাসের প্রায় জনা চল্লিশেক যাত্রীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখেও মনে হল না। গায়নাকলোজিস্ট না থেকে আমাদের বাসে কোনো জেনারেল ফীজিসিয়ান বা হার্ট স্পেশ্যালিস্ট থাকলে বোধহয় ভালো হতো।

বাসের দুপাশে পেটের তলায় হোল্ড আছে। সেখানে আমরা আমাদের মালপত্র সনাক্ত করার পরেই ইংলিশ ছেলেটি এবং বেঁটে-খাটো শক্ত সমর্থ চেহারার বয়স্ক একজন শ্বেতাঙ্গ লোক সেগুলোকে হোল্ডে তুলে দিলেন। সেই-ই প্রথমবার। তারপর সমস্ত পুরুষদের নিজের নিজের মাল ছাড়াও সমস্ত মহিলাদের মাল চাঁদা করে বইতে হয়েছে এবং বার বার তুলতে-ওঠাতে হয়েছে। এটা একটা বড় শিক্ষা। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বেড়াচ্ছি বলেই যে মহারাজা হয়ে গেছে কেউ একথা বিশ্বাস করা ইংরেজদের স্বভাবে নেই। মেয়েদের ওরা যা সম্মান করে ও মেয়েদের যেমন তুলো-তুলো করে রাখে তা বলার নয়। যে-কোনো দেশের সমাজে মেয়েদের আসন কোথায় তা দেখে সেই জাতের সাংস্কৃতিক উচ্চতা বা নীচতা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

দেখতে দেখতে সব প্যাসেঞ্জার এসে গেলেন। বাসের প্রতিটি সীট ভরে গেল। তখন সেই ইংলিশ ছেলেটি বাসের সামনে তার ছোট্ট আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাসের ভিতরের যোগাযোগের এমপ্লিফায়ারের মাউথপীস তুলে নিয়ে বলল, আমার নাম অ্যালাস্টার। আমি তোমাদের গাইড। পরের বারো দিন আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তারপর স্টীয়ারি-এ বসে থাকা সেই বেঁটে-খাটো শক্তসমর্থ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে, যিনি মাল তুলতে অ্যালাস্টারকে সাহায্য করছিলেন—বলল, এঁর নাম জ্যাক। ইনি এই বাস চালাবেন। কস্‌মস্‌ ট্যুরস লিমিটেডের পক্ষ থেকে এবং আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি পরের বারো দিন আপনাদের ভালোই কাটবে।

বাসটা ছেড়ে ছিল। আমরা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্‌-এর দিকে এগিয়ে চললাম।

অ্যালাস্টার বলল, আমরা ডিনার-টাইমে অর্থাৎ সাতটার সময় ব্রাসেলস্‌-এর হোটেলে পৌঁছে যাব।

আমাদের প্রকাণ্ড বাসটা ভারী চমৎকার। অতখানি চওড়া বাসটার সমস্ত সামনেটা জুড়ে কাঁচ—অর্থাৎ বাসের যেখানে খুশি বসে সামনে পরিষ্কার দেখা যায় ড্রাইভার ও গাইডের সীট নীচুতে। প্যাসেঞ্জাররা যেখানে বসেন সে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। দুপাশে দুসারি সীট। পাশাপাশি দুজন করে বসার। বাসটা ওয়েস্ট জার্মানীর তৈরী। নাম SENTRA—২৪০ সি.সি.। এক লিটার ডিজেলে চার কিলোমিটার করে যায়। প্যাসেঞ্জারদের সীটগুলো এরোপ্লেনের সীটের মত আরামের। বাসের পেছনে ব্লোয়ার আছে। গরম হাওয়া পায়ের

www.BanglaBook.org

পাশ দিয়ে নলে করে বইয়ে দেওয়া হয়—যাতে ভিতরটা গরম থাকে।

দেখতে দেখতে আমরা হাইওয়েতে এসে পৌঁছুলাম। তারপর হু-হু করে ছুটল বাস। অ্যালাস্টার মাইক্রোফোনে বিবরণী দিয়ে আমাদের ডানদিকে বাঁদিকের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাতে দেখাতে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠল। আমরা এসে ব্রাসেলস্-এ পৌঁছলাম। বাস থেকে বার বার স্যুটকেস ও মাল নামিয়ে বয়ে নিয়ে আসতে হল হোটেলের রিসেপস্যানে। অ্যালাস্টার ও রিসেপসনিস্ট নাম ডেকে ডেকে যার যার ঘরের চাবি তাকে তাকে দিয়ে দিল। ঐ হোটেলে লিফট ছিল। মাল সিঁড়ি দিয়ে বইতে হলো না সে যাত্রা। পরে অনেকানেক হোটেলে পাঁচ-ছ তলা অবধি নিজের স্যুটকেস বয়ে উঠতে হয়েছিল।

ঘরে বসে হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে আসতে হল ডিনার সারার জন্যে। স্যুপ, বীফ স্টেক্ ও পুডিং। তারপর নাইট-ট্যুরে বেরোনো গেল। নাইট-ট্যুরে অ্যালাস্টারের ছুটি। অন্য একটা বাসে করে আমরা গেলাম। ড্রাইভারই গাইড। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে কম্যুনিকেশ্যান সিস্টেমের মাউথপীস ধরে রাতের ব্রাসেলস্ দেখাতে দেখাতে চলেছে।

ব্রাসেলস্-এর দ্রষ্টব্যর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে ATOMIEUM, এখানে ওয়ার্লড ফেয়ারের সময় এটা তৈরী হয়েছিল। স্ট্রাকচারাল এঞ্জিনীয়ারীং-এর দক্ষতার পরাকাষ্ঠা। অনেকগুলো বিভিন্নাকৃতি বড় ছোট অতিকায় বল যেন সাজানো আছে। উচ্চতাতে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। লিফট আছে ওপরে উঠবার। নীচের দিকের বলগুলোতে নানারকম রেস্তোরাঁ। সবচেয়ে উপরের বলটার মধ্যে যে রেস্তোরাঁ সেটা খুব এক্সপেনসিভ। আমাদের মত কস্‌মস্ ট্যুরের প্যাসেঞ্জারের সাধ্যের একেবারেই বাইরে। তবু দেখেই চক্ষু সার্থক করলাম দূর থেকে।

একটা ম্যাল মত জায়গায় বাস দাঁড়ালো। ড্রাইভার-কাম-গাইড বলল—সকলে ডানদিকে দেখুন। তাকিয়ে দেখি একটা ব্রোঞ্জের তৈরী বাচ্চা ছেলের মূর্তি। ছেলেটি বাঁ হাতে প্রত্যঙ্গ বিশেষ ধরে হিসি করছে। গাইড বলল, লক্ষ্য করুন ওর ডান হাত ফ্রী আছে যাতে সুন্দরী মহিলা দেখলেই স্যালুট করতে পারে।

আমাদের দেশ হলে 'এমা! কী অসভ্য ইত্যাদি' অনেক রব উঠত। কিন্তু দেখলাম ব্যাপারটার রসিকতা সকলেই পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে দারুণ উপভোগ করল। পরে দেখেছিলাম শুধু বেলজিয়ামেরই সর্বত্রই নয়—পৃথিবীর অন্যান্য অনেকানেক জায়গায় এই পিসিং বয়ের মূর্তি একটা খুব ফেভারিট স্যুভেনির। এই ছেলেটি নানা জনের কাছ থেকে নানা রকম জমকালো পোশাক পায়। সে সব পোশাক সে নাকি তার জন্মদিনে পরে। তার সঠিক জন্মদিন নিয়ে নাকি বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু পোশাকের কোনো অভাব নেই বলে সে সব-দিনেই ভালো ভালো পোশাক পরে। স্যার মরিস শিভলিয়র নাকি তাকে জব্বর একটি পোশাক দিয়েছিলেন।

এরপর বাস এসে দাঁড়াল বেলজিয়ামের রাজার রাজবাড়ির সামনে। এই রাজবাড়িতে বসে নেপোলিয়ান তাঁর রাশিয়া আক্রমণের প্ল্যান করেছিলেন।

www.BanglaBook.org

তারপর আরো অনেক কিছু দেখা-টেখার পর গাইড বলল, এবার আপনাদের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব। মহিলাদের বলল, স্বামীদের সাবধানে রাখবেন যাতে পরে এইখানে আবার ফিরে না আসেন। অবাক কাণ্ডই বটে। একটা সরু গলিতে বাস ঢুকল। দেখি দুপাশের বাড়িগুলোর একতলা এবং দোতলাতে কাঁচের শো-উইণ্ডো। অনেকটা শো-কেশের মত। সেই এক একটা চৌকো কাঁচের বাক্সের মধ্যে এক-একজন করে নগ্ন রমণী বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। এ রসে যারা রসিক তারা যার যার পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেবে।

বেলজিয়ামের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই। এখানকার ভাষা ডাচ অথবা স্প্যানীশ। দুটো ভাষাই চলে কিন্তু ডাচ ভাষায় কথা বলে একান্ন শতাংশ লোক আর স্প্যানীশ ভাষায় উনপঞ্চাশ শতাংশ লোক।

বাসটা হোটেলের দিকে ঘুরল। ব্রাসেলস্ থেকে ANTWERP বিখ্যাত বন্দর মাত্র পঁচিশ মাইল। তারপর রাত প্রায় এগারোটার সময় আমাদের ছোট কিন্তু সুন্দর হোটেলে আমরা ফিরে এলাম। হোটেলের নাম A.B.C. Hotel.

দেশ ছেড়ে এসে—লানডানের ভায়ার বাড়ির আতিথ্যের পর এই প্রথম রাত বাইরে কাটানো। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। পালকের গদী, পালকের লেপ, পালকের বালিশ। ভারী আরাম। শরীরে খুব ক্লান্তি কিন্তু বিদেশ বেড়ানোর আনন্দ ও উত্তেজনা মিশে থাকায় ঘুম আসছিল না। তার উপর অ্যালাস্টার বলে দিয়েছিল যে, ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় ব্রেকফাস্ট খেতে হবে নিজের নিজের মাল নিয়ে এসে। ঠিক ছ'টায় বাস ছেড়ে দেবে। এই ঠাণ্ডাতে অত সকালে উঠতে হবে শুনেই ভয়ে ঘুম আসছিল না। বিছানা ছেড়ে এসে একবার কাঁচের জানালার সামনে দাঁড়ালাম। রাতের ব্রাসেলস্-এর আলো ঝলমল করছে। আমার ঘরের মধ্যে অন্ধকার। ভারী ভালো লাগছিল। কাল ভোরে আমরা ব্রাসেলস্ ছেড়ে লাক্সেমবার্গ, গসবাগ হয়ে পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে DENZLINGEN-এ গিয়ে রাত কাটাব।

অনেকক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পর এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ ছেয়ে এল।

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে গেল।

ঘুম তার আগেই ভেঙে গেছিল। অত ভোরে উঠতে হবে এবং যদি ঘুম না ভাঙে এই আতঙ্কেই সারা রাত ঘুম হল না। যতটুকু হল তা ছেঁড়া-ছেঁড়া পাতলা ঘুম।

ঘরের মধ্যেই একটা বেসিন ছিল। মুখে-চোখে জলটলও দেওয়া গেল। কিন্তু বাথরুমে যাওয়া এক সমস্যা। এক-এক তলায় দুটি করে বাথরুম। সেই তলায় যতজন লোক সকলের সেই বাথরুম দুটি ব্যবহার করতে হবে। অন্য লোকের প্রতি কন্‌সিডারেশন ও পাছে দেরী হয়ে যায় এই ভয়ে বাথরুমে যাওয়া আর না-যাওয়া সমান।

স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে, দাড়িটাড়ি কামিয়ে নীচে ব্রেকফাস্ট করতে নামা গেল।

ইংরেজরা আমাদের প্রভু ছিল বলে ব্রেকফাস্ট ব্যাপারটা আমাদের শেখা তাদের কাছ থেকে। ফ্রুটজুস, পরিজ বা কর্ণফ্লেকস, তারপর টোস্ট ডিম ইত্যাদি ইত্যাদি, সঙ্গে হয়তো

www.BanglaBook.org

চিকেন লিভার বেকন্ অথবা অন্য কিছু। কিন্তু কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট বলতে যা বোঝায় তা হল গরম গরম ব্রেডরোলস—সঙ্গে টেবিলে-রাখা মাখম ও মার্মালেড—তারপর চা অথবা কফি—ব্যস্।

যেমন ঠিক ছিল তেমনই সকলে সময়মতো তৈরী হয়ে বাসের কাছে আসা হল। বাস দাঁড়িয়ে ছিল একতলায় ডাইনিং রুমের একেবারে সামনে। তারপরই যতটুকু ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছিল তা হজম হয়ে গেল মহিলাদের স্যুটকেস হোল্ডে তোলার শিভালরাস প্রচেষ্টায়।

সকলে যে যার সীটে গ্যাঁট হয়ে বসলাম। জ্যাক ও অ্যালাস্টার সকলকে গুড়-মর্নিং করল। জ্যাক এঞ্জিনের চাবি ঘোরাল, বাসের ব্লোয়ার খুলে দিল—এমন সময় অ্যালাস্টার বলল, 'জাস্ট আ সেকেন্ড জ্যাক।'

দুটি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে পাশাপাশি সীটে বসে অস্টেণ্ড থেকে ব্রাসেলস্-এ এসেছিল, তাদের সীটটি শূন্য।

হৈ হৈ পড়ে গেল। কোথায় গেল সুন্দরী মেয়ে দুটি? কিডন্যাপড্ হয়ে গেল না তো?

অ্যালাস্টার সকলকে জিজ্ঞেস করল, কেউ কি তোমরা দেখেছ তাদের?

সকলেই সমস্বরে বলল, না। কেউই দেখেনি। ওদের যে তলায় ঘর ছিল সে তলার অন্যান্যরা ওদের বাথরুমে দেখেনি। লিফট দিয়ে নামতে দেখেনি কেউ—ডাইনিং রুমে খেতেও দেখেনি।

তবে?

ইংরেজ লোকরা ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল।

অ্যালাস্টার নিরুত্তাপে ক্যাজুয়ালী বলল, 'দে ম্যাস্ট বী অন দেয়ার ওয়ে।' দশ মিনিট কাটল। তবুও তাদের পথ ফুরোলো না।

ট্যুরের প্রথম দিনের সকালে এমন বিপত্তিতে অ্যালাস্টার বেচারা ঘেমে-নেয়ে উঠল। দেরী হলে সমস্ত দিনের প্রোগ্রামেরই দেরী হয়ে যাবে।

এমন সময় জ্যাক বল, একবার নেমে দেখে এসো তো অ্যালাস্টার ব্যাপারটা কি?

অ্যালাস্টার লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে গেল।

ইংরেজ প্যাসেঞ্জাররা ঘড়ি দেখে বাঁ হাতের বগলে ব্যথা করে ফেলল, তবু অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটির পাত্তা নেই।

আমার বাঁ পাশে একজন বুড়ো ইংরেজ—বুড়ো মানে বছর ষাটেক বয়স হবে কিন্তু দেখতে একেবারে জোয়ানের মত। তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী। আমার ঠিক পিছনে তাঁর শালা ও শালা-বৌ। আমার পাশের ভদ্রলোকের নাম জন ও তাঁর শালার নাম বব। শালা-ভগ্নীপতিতে গতকাল বেশ গল্প-গুজব করতে করতে এসেছেন। জনের মুখেই শুনেছি যে জন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিল।

জন এবার কাঁধ ফিরিয়ে ববকে বলল, আই নো দ্য অসীস্—হোয়েন আই ফট উইথ দেম সাইড বাই সাইড। বিলিভ মী—দিজ ফেলাস আর অ-ফুলি স্লো।

www.BanglaBook.org

যে সময় বেরুনোর কথা ছিল সে সময় থেকে পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল।

এমন সময় যাত্রাপার্টির ছোকরার মত বাবরি চুল ঝাঁকিয়ে অ্যালাস্টার হোটেলের অফিস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল।

এসে বাসে উঠল দরজা খুলে।

হোয়টস দ্যা ম্যাটার?

সমস্বরে অনেকে শুধোলে অ্যালাস্টারকে।

জন বলল, এনি নিউজ?

অ্যালাস্টার গোবেচারার মত মাথা নাড়িয়ে জানাল, হ্যাঁ। তালাস মিলেছে।

কোথায়? সকলে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল।

অ্যালাস্টার বলল, ওঁরা ঘুমিয়ে আছেন। হোটেলের মালকিন ওদের তুলতে গেলেন এইমাত্র।

আরে যাবে কোথায়?

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যে প্যাণ্ডেমনিয়ম। সাত জাতের লোকে ভর্তি বাস। তাদের বিভিন্ন নোট অফ এক্সক্লামেশানে বাস ভরে উঠল। মহিলারা সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। আমার ভাবগতিক দেখে মনে হল মেয়ে দুটো যখন বাসে উঠবে তখন এঁরা হয়তো আস্ত চিবিয়ে খাবেন ওদের।

না—চিবিয়ে খাওয়া ক্যালিবানদের ধর্ম। একটা ভদ্রগোছের রফা হল। বব প্রস্তাব তুলল যে ওরা যখন বাসে উঠবে তখন সকলে হাততালি দিয়ে ওদের অপমান করবে। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

হঠাৎ দেখি আমার পিঠে কে টোকা মারছে।

তাকিয়ে দেখি, বব—ওর প্রোড-ব্লক পাইপের তামাকের কৌটোটা খুলে ধরে আমাকে বলছে, 'হ্যাভ আ ফীল।'

আমিও খুশী হয়ে ঐ তামাকে পাইপটা ভালো করে ভরলাম।

এই ট্যুর নাম্বার টু-টোয়েন্টির প্রথম সংকটে আমরা ববকে দলের নেতা নির্বাচন করলাম। এর পরেও বহু সংকটে বব নেতাজনোচিত অনেকানেক কাজ করেছিল। নেতার মত নেতা। ঠাণ্ডা মাথা, স্বার্থপরতা নেই, বিপদের মুখে সবচেয়ে আগে দৌড়ে যায়, সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট করে। ববকে নেতা মানতে অন্তত আমার কোনো দ্বিধা ছিল না।

আমরা সকলেই আজ যে বাস ছাড়বে, সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ছিল পালকের নরম বালিস আর লেপটার কথা। আরো আধ ঘণ্টা জমিয়ে ঘুমনো যেত। এই অ্যালাস্টারটার যত পাকামি।

এমন সময় দেখা গেল তাঁরা আসছেন।

গতকাল থেকে এতজনের ভীড়ের মধ্যে ওরা কারো চোখ পড়েনি। আজ বাস ভর্তি লোক—ওদের দুজনকে শ্যেনদৃষ্টিতে দেখতে লাগল,।

একজন বেশ লম্বা। দারুণ ফিগার। ভারী মিষ্টি দেখতে। অন্যজন অত লম্বা নয় কিন্তু

www.BanglaBook.org

দুষ্টু দুষ্টু নীল চোখ; একটু মোটার দিকে। দুজনেরই পরনে খাকী রঙা কর্ডুরয়ের ট্রাউজার ও ফুলহাতা সোয়েটার। লম্বাজনের সোয়েটারের রং হালকা খাকী, বেঁটেজনের গাঢ় খয়েরী।

ওরা বাসে উঠতেই একসঙ্গে সকলে হাততালি দিতে লাগলেন।

যে মেয়েটি লম্বা সে ভারী লজ্জা পেল। লজ্জানত মুখ নামিয়ে সে নিজের সীটে গিয়ে বসল—'আই অ্যাম অ-ফুলী সরী' বলতে বলতে। কিন্তু তার সঙ্গিনীর চোখে আগুন ছিল। ভাবটা, দেরী করেছি, —আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়নি। কেন?

যাই-ই হোক, অবশেষে বাস ছেড়ে দিল। একটু পরই জঙ্গলে এসে পড়লাম। SOIGNES-এর জঙ্গল পেরিয়ে দেখতে দেখতে আমরা OVERIJSE হয়ে WAVRE হয়ে GEMBLOUX হয়ে নামুর-এ এসে পৌঁছলাম।

নামুর-এ পৌঁছে চা বা কফি খাওয়ার জন্যে দশ মিনিট বাস দাঁড়াল। সকলে নেমে চা বা কফি খেল।

নামুর থেকে রওয়ানা হয়ে ARLON-এ আসা গেল। তারপর বেলজিয়ামের সীমানা পেরিয়ে গ্রাণ্ড ডাচী অফ লাক্সেমবার্গ-এ এসে পৌঁছলাম। গ্রাণ্ড ডাচীর রাজবাড়িটি পথের বাঁ পাশে পড়ল। অ্যালাস্টার কম্যুনিকেশান সীস্টেমে বলতে বলতে চলেছে—বাসও চলেছে পথের পর পথ—জেলার পর জেলা পেরিয়ে।

সেখানেই লাঞ্চ খাওয়া হল। এখানে এখনও ফিউডাল প্রথা চালু আছে। লাক্সেমবার্গের মত ছিম্‌ছাম্ ছোট একটা রাজ্যের রাজা হওয়া গেলে মন্দ হতো না।

যেভাবে দেশের পর দেশ পার হয়ে আসছি যে,। আমার মনে হল বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া কী বহরমপুর থেকে শিলিগুড়ি আসতে বুঝি কতই না দেশ পার হতে হতো।

লাঞ্চ বলতে একটা স্যুপ, একটুকরো চশমা পরে কাটা বীফ্‌স্টেক—রীতিমত আন্ডার-ডান অর্থাৎ আধ-সেদ্ধ। সায়েবরা নাকি আন্ডার-ডান বীফস্টেকই পছন্দ করে বেশী। হবে হয়তো। আমার তো মোটে ভালো লাগে না। তবে, পরে বুঝেছিলাম পেটে থাকে অনেকক্ষণ এবং খেলে শীতটাও বুঝি একটু কম-কম মনে হয়।

ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে ফ্রান্সের লোরেন ও আলসাক ব্রডিঙ্গ দিয়ে বাস চলতে লাগল।

অ্যালাস্টার বলল, বিকেলে আমরা স্ট্রস্‌বার্গ হয়ে রাইন নদী পেরিয়ে জার্মানীতে ঢুকব। রাইন এখানে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে।

কখন রাইন নদী দেখব, কখন দেখব করে হা-পিত্যেশ করে বসেছিলাম। কিন্তু যখন অ্যালাস্টার বলল, 'ঐ যে দেখা যায়' তখন আমার বরিশালের মাধবপাশা গ্রামের দীঘির পারে শোনা এক কীর্তনীয়ার কীর্তনের কথা মনে পড়ল।

রাইনের সাঁকোর উপর যখন বাসটা এল তখন এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের চূড়ান্ত। এ যে দেখি আমাদের কালীঘাটের গঙ্গার চেয়ে একটু বড় এক ঘোলাজলের নদী।

হঠাৎই সেই মুহূর্তে আমার বড় গর্ব হল আমার সুন্দর দেশটার জন্যে। কী সুন্দর

www.BanglaBook.org

আমাদের দেশটা—কত ভালো আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা—শুধু আমরা যদি, আমরা যদি, এদের মত দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের ভালোকে ভালোবাসতাম, যদি শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ না ভোলাবার চেষ্টা করতাম! কী না করতে পারি আমরা এখনও আমাদের দেশটাকে নিয়ে। যদি সময় থাকতে বুঝতে পারতাম যে দেশটা সকলের—প্রত্যেকের—দেশটা কোনো গোষ্ঠী বা পরিবারের বা একাধিক রাজনৈতিক দলের নয়—তাহলে কী ভালোই না হতো।

রাজা লিওপোল্ড-এর রাজত্ব ছেড়ে আসার পর চা খাওয়ার জন্যে যে প্রকাণ্ড অথচ জনবিরল একতলা রেস্তোরাঁতে আমাদের বাস পনেরো মিনিটের জন্যে থামানো হয়েছিল, তার বিরাটত্ব রীতিমত চমৎকৃত করেছিল।

রেস্তোরাঁ না হয়ে খুব সহজেই জায়গাটা পাবলিক হল হতে পারত। ডায়াসের উপর একটা অটোমেটিক—বিদ্যুৎচালিত অর্কেস্ট্রা বাজছে। ডায়াস ও বসার বন্দোবস্ত দেখে মনে হল এখানে নিশ্চয়ই গান বাজনা ইত্যাদি হয়ে থাকে।

সকালে অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটি আমাদের দেরী করিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে-সকালেই আরো একটা কাণ্ড ঘটেছিল।

পরশু রাতে ব্রাসলস্ শহরে ঘুরে বেড়াবার সময় আমাদের একটা লেসের দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুন্দর সব লেসের কারুকাজ। টেবল ক্লথ, পর্দা, টেবল ম্যাটস আরো কত কি। কিন্তু আমাদের দলের একজন আমেরিকান মহিলা—মিস ফার্স্ট তাঁর পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছিলেন। লেস কেনার জন্যে টাকা বের করায় সময় বোধহয় পাসপোর্ট পার্স থেকে দোকানেই পড়ে গেছিল। তাই সকালে রওয়ানা হয়েই প্রথমে আমরা সেই দোকানের সামনে এলাম সবচেয়ে আগে। কিন্তু শোনা গেল যে দোকান খুলবে সাড়ে আটটায়। জ্যাক আর অ্যালাস্টার বিনা বাক্যব্যয়ে সেই মহিলাকে মালপত্র সমেত ঐ দোকানের সামনে নামিয়ে দিল। বলে গেল, যে, যদি পাসপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে নিজ-খরচায় ট্রেনে করে যেন DENZLINGEN-এ চলে আসেন, সেখানে আমরা রাতে থাকব। DENZLINGEN জার্মানীতে—বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসলস্ থেকে ঐ জায়গায় পৌঁছতে হলে বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্স হয়ে তারপর জার্মানীতে ঢুকতে হবে।

ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে কিন্তু চেহারা ও সাজগোজের ঘটায় বয়সটাকে রঙ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আমেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবিতে ব্যাং ব্যাং করে দুহাতে পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘোড়ায়-চড়ে আসা, সেলুনে ঠ্যাং ছড়িয়ে চুল কাটতে কাটতে বীয়ার খাওয়া নায়কদের সঙ্গে যে চেহারা ও সাজপোশাকের নায়িকাদের লটর্-পটর্ করতে দেখা যায় এই ভদ্রমহিলার হাবভাব, সাজগোজ, চেহারা-ছবি হুবহু সেই রকম।

বাসটা যখন সেই দোকানের সামনে থেকে চলে এল। বাসের বেশীর ভাগ প্যাসেঞ্জারই তাঁর দিকে ফিরেও তাকালো না। ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, বয়স্ক ও রক্ষণশীল ইংরেজ প্যাসেঞ্জাররা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে ওঁকে নিয়ে প্রথমদিন থেকেই গুজ-গুজ ফুসফুস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইংরেজরা, বোধহয় একমাত্র ইংরেজরাই, এত আস্তে ফিস্ ফিস্

www.BanglaBook.org

করে কথা বলতে পারে যে, পাশের লোকও সে কথা শুনতে পায় না। এদের দেশের ফুলশয্যা ব্যাপারটা যদি থাকতও তবে মহিলাদের এ বাসর জাগার তাবৎ উৎসাহ-ই মাঠে মারা যেত।

আমার মনে হলো ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের সকলেরই চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটল, তাই স্বাভাবিক দয়া ও ভদ্রতার খাতিরে কাঁচের মধ্যে দিয়ে হাত তুললাম।

কিছু কিছু সহযাত্রীও হাত তুলে বাই-বাই করল।

মেজোল পেরিয়ে এসে বিকেলে চা খেতে দাঁড়িয়েছিলাম ফ্রান্সের ALSOP জেলার ছোট শহর METZ-এ। ওয়েট্রেসরা ট্রে হাতে করে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়তে দৌড়তে 'পাঁর্দো' পাঁর্দো' আওয়াজ করছে মুখে। জঙ্গলে হাঁকোয়াওয়ালার তাড়া খেয়ে পালানোর সময় অনেক সময় শজারু ঐ রকম অদ্ভুত আওয়াজ করে।

অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, ইংরিজী বেগ ইওর পার্ডন-এর ফরাসী প্রতিশব্দ পাঁর্দো মঁসিয়ে। তাড়াতাড়িতে আর মঁসিয়ে মাদাম, মাদমোয়াজেল, কিছুই বলার সময় না পেয়ে গাঁক্ গাঁক্ করে পাঁর্দো, পাঁর্দো বলতে বলতে বেচারারা দৌড়াদৌড়ি করছে।

কি ইংল্যাণ্ডে, কি পৃথিবীর পশ্চিম-দেশীয় অন্যান্য যে-কোনো প্রান্তে, যা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা ওদের কর্মব্যস্ততা। সব কাজই কত তাড়াতাড়ি করে ওরা। দৌড়াদৌড়ি করে মাত্র দুজন ওয়েট্রেস পঞ্চাশজন লোককে দেখাশুনা করে চা-পেস্ট্রি খাইয়ে দেবে পনেরো মিনিটে। চেঁচামেচি নেই, হৈ-হল্লা নেই, খরিদ্দারদের মধ্যেও কারোই এমন মনোভাব নেই যে, দোকানে চা খাচ্ছি তো মাথা কিনে নিয়েছি মালিক ও ওয়েটার-ওয়েট্রেসদের। এক মিনিট সময়ও যে নষ্ট করার নয়—কাজের সময় কাজ তাড়াতাড়ি না শেষ করলে যে খেলার সময় পাওয়া যায় না, তা ওরা বড় ভালো করে বুঝেছে। ওরা সময়ের আগে আগে দৌড়তে চায় যেন। তাই-ই ওরা এত কাজও করে এত মজাও করে।

স্ট্রসবার্গ বেশ বড় শহর। রাইনের উপরেই বড় বন্দর। বছরে দশ মিলিয়ন টন কার্গো ওঠা-নামা করে এ বন্দরে। অসবর্ন ছাড়িয়ে এসে আমরা জার্মানীতে যখন পড়লাম ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অটো-বান ধরে মাইল পঁয়তাল্লিশ এসে আমরা DENZLINGEN -এ পৌঁছলাম। এটা ছোট একটি গ্রাম। ছোট গ্রাম হলে কি হয় এমন গ্রামেও এমন সব হোটেল আছে যে, পঞ্চাশজন লোকের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত অচিরে করে ফেলে এরা।

স্যুটকেশ নামিয়ে নিয়ে ঘরে গেলাম হাত-মুখ ধুয়ে একটু পা ছড়িয়ে নিতে। অ্যালাস্টারের হুকুম হলো পনেরো মিনিট পর সকলকে ডাইনিং-রুমে নেমে আসতে হবে একতলায় ডিনার খেতে।

রোজ সাতটায় ডিনার খেয়ে রীতিমত সাহেব হয়ে উঠছি দেখলাম। কিন্তু সাহেবরা শেষ রাতে যখন পেট চুঁ চুঁ করে তখন কি খায় তা জানতে ইচ্ছে করে। আমাদের দেশের মত, চিঁড়ে আর পাটালি গুড় পাওয়া যায় না ওদের দেশে।

কিছুক্ষণ পর ডাইনিং-রুমে নেমে আসতেই দেখি ঘর আলো করে মিস ফাস্ট বসে আছেন; মুখের মেক-আপ একটুও ওঠেনি—হালকা সবুজ গোড়ালি পর্যন্ত পোশাক, গাঢ়

www.BanglaBook.org

সবুজ আই-ল্যাশ, বাঁ গালের কৃত্রিম বিউটি স্পটসমেত ডান পায়ের উপর বাঁ পা তুলে তিনি দিব্যি খোশমেজাজে বসে আছেন।

পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা বিদেশে ভাবা যায় না। তাই এই পঞ্চাশোর্ধ তরুণী মহিলার সম্পূর্ণ অবিচলিত ও উত্তেজনাহীন মনোভাব সকালে আমাকে চমৎকৃত করেছিল। আমার নিজের পাসপোর্ট ট্যুর-রে মধ্যে হারিয়ে ফেললে কি করতাম ভাবতেও আতঙ্কিত হচ্ছিলাম। সে কারণে অবাকই হলাম যে, পাসপোর্ট শুধু উদ্ধার করেছেন তাই-ই নয়; আমরা বাসে এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্স, সেখান থেকে জার্মানীর এই গ্রামে দিব্যি পৌঁছিয়ে গিয়ে হাসি হাসি মুখে দেদীপ্যমানা রয়েছেন।

ক্যারল ও জেনী, সেই অস্ট্রেলীয়ান মেয়ে দুটি সকালের লজ্জা বেমালুম ভুলে গিয়ে দুটি সুদর্শন, লম্বা জার্মান ছেলের সঙ্গে এক টেবিলে বসে দিব্যি হাসিমুখে গল্প করছে। ওদের দুজনকেই খুব উচ্ছল দেখলাম। কারণটা পরে জানলাম। ওরা আজ ডিনার খেয়ে নিয়ে হোটেলের ঘরে থাকবে না। ছেলে দুটি একটি ভোকসওয়াগেন ট্যুরার গাড়ি নিয়ে এসেছে—সেই গাড়িতেই ওদের সঙ্গে ওরা রাত কাটিয়ে ভোরে চলে যাবে ওদের সঙ্গে ম্যুনিকে। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত বীয়ার ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এখন। বীয়ারের প্রস্রবণ ওঠে সেখানে। STEIFEL-এ করে ওরা সেই প্রস্রবণ থেকে সারা রাত বীয়ার খাবে—হৈ হৈ করবে, মেলা দেখবে। তিন দিন তিন রাত হৈ-হুল্লোড় করে আবার আমাদের সঙ্গে মিলবে এসে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে। STEIFEL গামবুটের মত দেখতে কাঁচের বুট—তাতে করে জার্মানরা বীয়ার খায়। এক বুট বীয়ার দুহাতে ধরে তুলে চোঁ চোঁ করে গিলে ফেলে।

ধন্যি রাজার ধন্যি দেশ!

ডিনার সার্ভ করতে লাগল দুটি জার্মান মেয়ে। স্যুপ প্রথমে। তারপর মাছ ভাজা সঙ্গে সালাড ও টার্টারি সস। তার সঙ্গে টক বাঁধাকপি, গাজর শশা ও বীট দিয়ে তৈরী স্যালাড। পরিশেষে আনারসের পাই। খাওয়ার আগে DENZLINGEN-এর স্থানীয় ব্র্যুয়ারীর লাগার বীয়ার ও ওয়াইন পান করা গেল কিঞ্চিৎ।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই ম্যানেজার এসে বলল, তোমার টেলিফোন এসেছে লানডান থেকে। ফোন ধরতেই দেখি টবী!

ওপাশ থেকে বলল, খী খারবার—আমাদের ভুলে গেলে দেখছি। আছ কেমন? কি খেলে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

একসঙ্গে এত প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না বলে উত্তরগুলো খিচুড়ি পাকিয়ে এক কথায় বললাম, খাসা আছি।

ও বলল, ক্লান্ত লাগছে?

না তো! অবাক হয়ে বললাম।

ও বলল, লাগবে।

তারপর বলল, ভয় নেই। তোমার জন্যে বিছানা রেডি করে রাখব। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে

www.BanglaBook.org

তোমাকে নিয়ে যাব আমরা। এখানে দুদিন রেস্ট করে ঘুমিয়ে তারপর টোরোণ্টা যেও। এই ট্যুরগুলো রীতিমত টায়ারিং।

এখনও বুঝতে পারছি না। আমি বললাম।

টবী কস্‌মস্‌-এর লানডান অফিসে ফোন করে ইটিনিরারী জেনে নিয়েছিল। আমরা কবে কখন কোন হেটেলে পৌঁছব, রাত কাটাব সব ও জানে। আর পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ফোন করা তো কোনো ব্যাপারই নয়। সমস্ত জায়গার একটা করে এরিয়া-কোড আছে। সমস্ত জায়গা থেকে সমস্ত জায়গাতেই প্রায় ডাইরেক্ট ডায়ালিং-এর প্রথা আছে। শুধু এরিয়া কোড ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই মুহূর্তের মধ্যে অন্য প্রান্তে কথা বলা যায়। ট্রাঙ্ক অপারেটরের মুখ-ঝামটা নেই। টিকিট নম্বর মুখস্ত করে রাখার ঝামেলা নেই। কলকাতা থেকে আশী মাইল দূরে ট্রাঙ্ককল করতে গিয়ে কল বুক করে বসে থেকে ভগবান ও অপারেটরদের কাছে করজোড়ে ভিক্ষা চাওয়া নেই।

আমাদের দেশের, বিশেষ করে কলকাতার টেলিফোন বিভাগের লজ্জাকর অপদার্থতা মনে পড়ছিল। আমাদের সবই সহ্য হয়, বাঙালীদের মত সহ্যশক্তি ক্রীতদাসদেরও ছিল না বোধহয়। আমাদের দেশের সরকার ভগবান। সব সমালোচনার উর্ধ্বে তাঁরা। সরকারের কানে তুলো, পিঠে কুলো। লাজ-লজ্জা সব কিছুই ধুয়ে মুছে তারপরই রাজনীতি করেন আমাদের সরকার পক্ষের এবং সরকার বিরোধী রাজনীতিকরা। যাঁরা বলেন আমাদের দেশের সবই খারাপ, আমি তাঁদের দলে কখনও ছিলাম না। আবার যাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশের সবই ভালো, আমাদের সব কিছুই সমালোচনার উর্ধ্বে—আমাদের গণতন্ত্র ও নেতারা সবই দেবদুর্লভ ও দেবসুলভ, আমি তাদেরও দলে নেই। ভালোটা ভালোই, খারাপটাও খারাপ। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি বলেই দেশের ভালোত্বে যেমন গর্বিত হই খারাপত্বে তেমনিই দুঃখিত হই। দেশটা আমার যতখানি, নেতাদের বা কোনো রাজনৈতিক দলেরও ততখানিই। একথা বলতে যদি কোনো বিশেষ স্বাধীনতার দরকার হয় তবে বাঁচা-মরায় তফাৎ দেখি না কোনো। যে স্বাধীনতা নিয়ে আমি জন্মেছি বলে আমি বিশ্বাস করি—সেই স্বাধীনতা কারোই কৃপণ ও ভণ্ড হাতের দয়ার দান হিসেবে আমি গ্রহণ করতে রাজী নই।

যে সব দেশ উন্নত হয়েছে তাদের দেশের সাধারণ মানুষদের জন্যেই উন্নত হয়েছে। সাধারণ মানুষেরা আত্মসচেতন, কর্মঠ, আত্মসম্মানজ্ঞানী না হলে, নিজের নিজের স্বাধীনতার বিশ্বাস না করলে, নিজের নিজের স্বাধীনতার ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত না থাকলে তারা এত উন্নত হত না। তাদের অগ্রগতি—এত ঝড়-ঝাপটা যুদ্ধ-বিগ্রহর পরও তাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর কারণ তারা নিজেরাই। কোন দল বা নেতা তাদের কোলে করে বিশল্যকরণী গিলিয়ে দেয়নি। তেমন নেতাগিরিতে তারা বিশ্বাসও করেনি কখনও।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বাইরের নির্জন পথে, ওভারকোটের কলার তুলে দিয়ে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার হঠাৎই বহুদিন আগে পড়া, ওয়াল্ট হুইটম্যানের লিভস অফ গ্রাস-এর কটি লাইন মনে পড়ে গেল ঃ

"All doctrines, all politics and civiliazation exurge from you. All sculpture and monuments and anything inscribed anywhere are tallied in you.

www.BanglaBook.org

The gist of historics and statistics as far back as the records reach is in you this hour—and myths and tales the same.

If you were not breathing and walking here where would they all be?"

আমি, তুমি, আপনি, আমরা প্রত্যেকে প্রচণ্ডভাবে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকা উচিত, আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের নিজের জন্যে; আমাদের গর্বিত, দুঃখিত, অপমানিত বোধ করা উচিত। আমরা, এই খণ্ড খণ্ড আমরাই একটা পুরো দেশকে বড় করতে পারি, জাগিয়ে তুলতে পারি—সত্যিকারের গর্বিত বোধ করতে পারি নিজেদের উদ্দেশ্যের সততা ও আন্তরিকতার জন্যে—এবং আমরাই নিজেদের মিথ্যা দম্ভ, উদ্দেশ্যসাধনের ভণ্ড ও মিথ্যা ও পণ্ডিতম্মন্য প্রচেষ্টার গ্লানিতে নিজেদের থুথুতে নিজেদের সিক্ত করতে পারি। আমারটা আমার ভাবার, আমারই করার। আমার একার। তোমারটাও চাই। আপনারটাও।

হঠাৎ, হঠাৎই, বহুদিন পর আরো কটি লাইন মনে পড়ে গেল, এই একলা রাতে, শীতার্ত কিন্তু স্বাধীন, উন্নত ও গর্বিত এক দেশের মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে। মনে হলো, লাইনগুলো হঠাৎ যেন আমাকে বিদ্ধ করল।

"Long enough have you dreamed contemptible dreams.

Now I wash the gum for your eyes.

You must habit yourself to the dazzle of the light and of every moment of your life.

Long have you timidly worded, holding a plank by the shore.

Now I will you to be a bold swimmer.

To jump off in the midst the sea, and rise again and nod to me and shout, and laughly dash with your hair."

BanglaBook.org

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতরাশ সেরে নিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। দেখতে দেখতে আমরা জার্মানীর বিখ্যাত Black Forest এলাকায় চলে এলাম। এই জঙ্গল নিয়ে শুধু এদেরই কেন পুরো ইয়োরোপের খুব গর্ব। হায়! ওরা আমাদের দেশের জঙ্গল দেখেনি। দেখেনি ডুয়ার্সের জঙ্গল, দেখেনি উড়িষ্যার মহানদীর অববাহিকার জঙ্গল—ওরা কি বুঝবে জঙ্গল কাকে বলে? সেটা কোনো কথা নয়, আসলে যেটা জানতে ভালো লাগে যে ওরা জঙ্গল খুব ভালোবাসে। যান্ত্রিক সভ্যতার শেষ ধাপে এসে মঙ্গলগ্রহে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতেই দিনের পর দিন ওদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, প্রকৃতিই শেষ অবলম্বন। যতই সে উন্নত, সভ্য, শিক্ষিত বোধ করুক না কেন তাকে শেষে প্রকৃতির কাছে ভালো লাগার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে ফিরে আসতেই হবে।

ব্ল্যাক ফরেস্ট ফার-এর জঙ্গল। গাছগুলোর গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। কিছু কিছু অর্কিড। ঘন সবুজ রং বলে গাছগুলোকে কালো মনে হয়—তাই এই নাম। ব্ল্যাক ফরেস্টের মাঝামাঝি এসে বৃষ্টি নামল। ওদের দেশের বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বর্ষার কোনো তুলনা চলে না। বৃষ্টিও যেন বড় বেশী নিয়মানুবর্তী—আমাদের বর্ষার মেজাজ ওদের দেশের বর্ষার নেই। রবীন্দ্রনাথ ওদেশে জন্মালে আমরা এত বিভিন্ন গান পেতাম না, আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এত বর্ষার রাগ-রাগিণী বর্ষাবরণের আনন্দে অধীর হয়ে জন্মাতো না।

www.BanglaBook.org

জঙ্গলের মধ্যে ছবির মত সব গ্রাম।

এই ছবি-ছবি ব্যাপারটাও আমার মোটে পছন্দ নয়। আমার গরীব দেশের গ্রাম অগোছালো এলোমেলো। অনেক কষ্ট সেখানে, কিন্তু গরুর গায়ের গন্ধ, জাবনার গন্ধ, ব্যাঙের ডাক, বাঁশবনে জোনাকি জ্বলা, মেঠো পথ, হলুদ বসন্ত পাখির উড়ে যাওয়া ওদের নেই। ওরা সুখ খুঁজতে গিয়ে সুখকে একেবারে মাটি করে বসে আছে। সুখ কাকে বলে ভুলে গেছে ওরা আরামের কবরে।

অ্যালাস্টার একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল—দেখুন এই গ্রাম থেকে ড্যানিউব নদী বেরিয়েছে।

নর্দমার মত ড্যানিউব দেখলাম। ব্লু-ড্যানিউব বলে এক বিখ্যাত রেকর্ড শুনেছি। বহুবার সেই রেকর্ড শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে নদীর ছবি ফুটে উঠেছে বার বার কল্পনায়, তার সঙ্গে এ নদীর চেহারা একেবারেই মেলে না। আমাদের দেশের হোগলা-বাদার পাশে পাশে এমন নর্দমা আকছার দেখতে পাওয়া যায়। নদীমাতৃক দেশের লোককে ইয়োরোপের নদীগুলো বড় হতাশ করে।

দূর থেকে লেক কনস্ট্যান্স দেখা যাচ্ছিল। এই হ্রদের একপাশে জার্মানী অন্যদিকে অস্ট্রিয়া আর সুইট্জারল্যাণ্ড। লেক কনস্ট্যান্টলি রাস্তার ডানদিকে থাকল। লেকের ওপারে সুইট্জারল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো—আল্পস-এর রেঞ্জ দেখা যাচ্ছিল। লেকের পাশে পাশে কত যে ছবির মত গ্রাম, হোটেল, কফি-হাউস তার লেখাজোখা নেই। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ বোধহয় ইয়োরোপেও নেই।

লেক কনস্ট্যান্স বাঁদিকে রেখে আমরা জার্মানীর বর্ডার পার হয়ে অস্ট্রিয়াতে এসে পড়লাম। তারপর BRENER PASS (৭০০০ ফিট উঁচু)-এর দিকে এগোতে লাগলাম। ব্রেনার পাস পেরিয়ে ইটালীতে ঢুকবো বলে।

ইতিমধ্যে ইজরায়েলের উনিশ বছরের মেয়ে সারার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। নীল চোখ—যেন কত কি স্বপ্ন, প্রত্যাশা; প্রতিজ্ঞা সব লেখা রয়েছে চোখের তারায়। কথা কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন ভারী বুদ্ধিমতী ও রসিকা। এ ক'দিন আমার সঙ্গে কথা হয়নি একটাও। গায়ের রং বাদামী দেখে দুশমন গেরিলা-টেরিলা ভেবে থাকবে হয়ত। কিন্তু গত রাতে খাওয়ার টেবিলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভালো করে। রাজনৈতিক কারণে দেশে দেশে অনেক বিভেদ ও মনোমালিন্য হতে পারে, হয়; কিন্তু কোনো দেশের ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মানুষ হিসেবে খোলাখুলি মেলামেশায় কোনো বৈরিতা বা আড়ষ্টতা হওয়া বা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় না। আমরা সকলেই তো একই মানবজাতির অংশ। যে হারে গ্রহ-গ্রহান্তরে পৃথিবীর মানুষ নাক গলাতে শুরু করেছে এইচ.জি. ওয়েলস-এর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখা 'ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস' সত্যি হয়েও উঠতে পারে যে-কোনোদিন। মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া-আমেরিকা ও আরব-ইজরায়েল পাশাপাশি লড়াই করে কি করে না দেখা যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন একটা গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি লেগে যাওয়া দরকার অন্তত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে—তাতে এই পৃথিবীর সাদা কালো হলদে বাদামী মানুষগুলো নিশ্চয়ই আরো কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি আসবে একে অন্যের—তারা বুঝবে যে আমরা সকলেই মানুষ-এর চেয়ে বড় বা এ ছাড়া অন্য পরিচয় আমাদের কিছুই নেই।

হঠাৎ কাঁধে টোকা পড়ল। আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিনা ভোটে নির্বাচিত ইংরেজ টেকো-লিডার কাঁধ ট্যাপ করছেন।

www.BanglaBook.org

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই বললেন—হাউ বাউট অ্যা ফীল?

আমি হাত বাড়িয়ে ওঁর গোল্ড-ব্লক টোবাকোর টিনটা নিলাম। পাইপ ভরব বলে।

আমাদের নেতার চেয় নেতার স্ত্রী আমার বেশী ভক্ত হয়ে উঠেছিল।

আগেই বলেছি, নেতা আমাদের পেশায় ছুতোর। আমি গরীব লোক, গরীব দেশের লোক, তাই টবী-ভাইয়ের দাক্ষিণ্যে যে ট্যুরে ইয়োরোপ দেখতে এসেছি সেটা সবচেয়ে গরীবদের ট্যুর। আমার বাসের কম্‌রেডরা ছুতোর কামার বাস-ড্রাইভার গরীব ট্যুরিস্ট ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি।

এই টেকো সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের পঞ্চান্ন বছর কঠোর পরিশ্রম করে তবে এতদিনে ইংল্যাণ্ড থেকে কণ্টিনেণ্টে আসার মত পাথেয় যোগাড় করতে পেরেছেন। সব দেশেই গরীব বড়লোক আছে। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কিন্তু ওদের দেশের যা অর্থনৈতিক মান তাতে যে দম্পতি পঞ্চান্ন বছরের আগে ইংল্যাণ্ড থেকে কণ্টিনেণ্টে আসার মত পাথেয় যোগাড় করে উঠতে না পারেন তাঁদের অবস্থা ভালো নয়ই বলতে হবে। সে কারণেই এতদিনে আসতে পেরে ওঁদের আনন্দের আর অন্ত নেই। নিজের মেহনতের পয়সায় এসেছেন, কালোবাজারী বা ফাটকাবাজীর রোজগারের পয়সা নয়—এটাই বা কি কম আনন্দের?

মেমসাহেব প্রায়ই গুনগুনিয়ে গান গাইতেন। গলাটা ভারী মিষ্টি। এমন এমন সব হিট গান, বেশীর ভাগই ফিল্মের গান যে ছোটবেলায় আমরাও এদেশে তার কিছু কিছু গান শুনেছি।

আমি একবার মুখ ঘুরিয়ে ওঁকে বলেছিলাম—প্লিজ আস্তে গেয়ে আমাকে কষ্ট দেবেন না—একটু জোরে গান—এত ভালো গলা আপনার লুকিয়ে রাখার জন্যে নয়।

পরক্ষণেই দেখলাম মেমসাহেব গান থামিয়ে ভ্যানিটিব্যাগ থেকে পাউডারের কৌটো বের করে গালে লাগাচ্ছেন।

এতদিনে ইংরিজী প্রবচনের মানে বুঝলাম—"To powder one's nose."

দেশ বা জাতি নির্বিশেষে মহিলারা চিরদিন এ বাবদে মহিলাই থাকেন। কমপ্লিমেণ্ট পেলে খুশী হন। যে সব পুরুষ জানেন ঠিক কি করে কমপ্লিমেণ্ট দিতে হয় তাঁরা চিরদিনই সব-বয়সী সব-দেশী মহিলার কাছে সমান প্রিয়।

আমি কিন্তু জানি না। জানলে খুশী হতাম।

কি করে যে সময় উড়ে যায় বগারীর ঝাঁকের মত তার হিসেব রাখা দায়। লাঞ্চের জন্যে বাস থামল। মাঝে, পথে কফি ব্রেকও হয়েছিল। জায়গাটার নাম মনে নেই। DORNBIN নামের একটা ছোট গ্রামের একটা ছোট রেস্তোরাঁতে লাঞ্চ খাওয়া হলো। চমৎকার চিকেনের স্যুপ, বীফ-স্টেক। শেষকালে পাইন-অ্যাপল্‌ পাই। সঙ্গে একটু করে জার্মান schnapps—সেই যে schnapps-এর কথা লিখেছিলাম আগে—টবীর সঙ্গে TYROLER HUT-এ সেই খেয়েছিলাম ল্যানডানের বেজওয়াটার স্ট্রীটে!

এই DORNBIN-এর হোটেলে যে ছিপছিপে মেয়েটি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার

www.BanglaBook.org

দেখাশোনা করছিল সে ভারী সুন্দরী। অস্ট্রিয়ান গাউন পরেছিল একটি। দেখতে অনেকটা—ম্যাকসির মত—বুকের কাছে লেস্ বসানো, লাল-কালো কাজের। আমাদের বাসের ড্রাইভার জ্যাক তার সঙ্গে খুব ইয়ার্কি করছিল।

অ্যালাস্টার লাজুক শিক্ষিত ছেলে। মিষ্টভাষী। ও-ও গল্প করছিল মেয়েটির সঙ্গে। জানলাম, এই মেয়েটি এক সময়ে এই কস্‌মস্ ট্যুরের অ্যালাস্টারের মতই গাইডের কাজ করত। ট্যুর নিয়ে কয়েকবার এই হোটেলে এসেছিল। তখনই এই হোটেলের ইয়াং ও হ্যাণ্ডসাম অস্ট্রিয়ান মালিকের সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর তাকে বিয়ে করে কস্‌মস্ কোম্পানীর আমাদের মত সৌন্দর্যরসিক অনেক যাত্রীর সর্বনাশ করে অস্ট্রিয়ার এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে যায়। ঘন নীল চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ব্যারনের রক্তসম্পন্ন তার স্বামীকে দেখে খুব হিংসা হচ্ছিল। এরকম স্ত্রী পাওয়া অনেক পুণ্য-কর্মের ফল। শুধু চেহারাই নয়, তার কথাবার্তা হাঁটাচলা সব মিলিয়ে তাকে তার সেই লাল-কালো গাউনে যেন একটি প্রজাপতি বলে মনে হচ্ছিল।

জ্যাক আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওর গালে একটা চুমু খেল জোর করে ধরে। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়েই জ্যাকের পিঠে দুম দুম করে কিল বসিয়ে দিল হাসতে হাসতে, গালাগালি করতে করতে।

ওদের দেশে কোনো মেয়েকে চুমু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় না এবং চুমু খেলেই ভালোবাসাও হয়ে যায় না।

এ ক'দিন চোখ কান খুলে দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে তাতে এই ধারণাই জন্মাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ওদের দেশের চেয়ে আমাদের দেশেই বিবাহবিচ্ছেদ বেশী হবে। ওরা শরীরটাকে কখনও মনের চেয়ে বড় করে দেখে না। শরীর যাকে তাকে I Thank you—বলার মত ইচ্ছে করলেই দেওয়া যেতে পারে ; দেয়ও ওরা। কিন্তু শরীরের মোহ কাটিয়ে উঠে যখন ওরা কাউকে ভালোবাসে তখন মন, রুচি, ব্যক্তিগত আরো অনেক ব্যাপারে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ে করে। আমরা যেহেতু এ ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড রকম ট্রানজিটরী সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—এই ভাঙচুর আমাদের মেনে না-নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের সদ্য-প্রাপ্ত আর্থিক স্বাধীনতা এ ব্যাপারে খুব নগণ্য অংশ নেবে না বলেই মনে হয়। আমাদের ওখানেও স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আরো অনেক সহজ হয়ে গেলে আমরাও 'To put the cart before the horse'-এর মত ভুল বোধহয় করব না। সেদিন ভালোবাসা বলতে ভালোবাসাকেই বোঝাব, মোহ নয়, কাম নয় ; রোম্যান্টিক কল্পনামাত্র নয়—তার চেয়েও হয়ত গভীরতর এবং স্থায়ী কিছু।

লাঞ্চ সেরে বেরোতেই এক অবাক কাণ্ড দেখলাম।

দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল—

BRENER PASS-এর দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই দূরের পাহাড়চুড়োগুলোতে বরফ দেখা যেতে লাগল। এই সময় লক্ষ্য করলাম যে রাস্তায় কম করে দেড়শ-দুশো গাড়ি, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, ভলভো, সিঁত্রয়, ওপেল, ফোর্ড ; নানারকম ভোকসওয়াগেন, রোভার,

www.BanglaBook.org

রোলস-রয়েজ বনেটের উপর একটা করে ফুলের তোড়া বসিয়ে প্রসেশান করে চলেছে।

ব্যাপারটা শবযাত্রা না বিয়ে এই নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা করছি এমন সময় অ্যালাস্টার বলল যে আজ এখানে এক বিশেষ উৎসব।

কিসের উৎসব?

আমরা সমস্বরে শুধোলাম।

ও বলল—DORFFEST.

সেটা আবার কি?

ও বলল, 'এল যে শীতের বেলা বরষ পরে'। তাই এবোর আল্পস পাহাড়ে যে সব গরুদের গরমের সময় চরতে পাঠানো হয়েছিল, তাদের নেমে আসার পালা সমতল ভূমিতে। আজ সেই গরুদের নেমে আসার উৎসব—অস্ট্রিয়ার এ এক ফেস্টিভ্যাল। গরুরা হাত-পা না ভেঙে হাম্বা হাম্বা করতে করতে ফিরে আসুক—পেছন পেছন অ্যালসেসিয়ান কুকুরগুলোও ঘাউ ঘাউ করতে করতে—আজ সবাই তাই প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে, গরুদের ভালো হোক, ওরা বেশী করে দুধ দিক।

মনে মনে বললাম, তবে রে, ব্যাটা ইস্টুপিড ; ইংরেজ! তোরা সারাজীবন আমাদের গরু পুজোর খোঁটা দিয়ে এলি আর তোদের সব বাঘা বাঘা ভাই-বিরাদররাও যে গরু পুজো করে তার বেলা?

না কি স্যুট-পরা সাদা সাহেব, মার্সিডিজ গাড়ির বনেটে ফুলের তোড়া সাজালে পুজো হয় না, গরুর পায়ে ভুঁড়িওয়ালা কালো পাণ্ডা গাঁদাফুল আর গঙ্গাজল দিলেই পুজো হয়!

সাহেবরাও যে গো-পুজো করে এটা জেনে রীতিমত আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম। পিছনে বসা নেতা সাহেবকে একথা বলে একের ক্ষীণকণ্ঠে যতটুকু ইংরেজের চরিত্র-হনন করা যায় তাই-ই করতে সচেষ্ট হলাম।

বাস ততক্ষণে ব্রেনার পাসের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু ওপাশ থেকে যত গাড়ি আসছে তাদের ছাদে বনেটে উইণ্ডস্ক্রীনে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি এবার যেসব গাড়ি আসছে তাদের উপর গুঁড়ো গুঁড়ো নয় প্রায় তাল তাল বরফ।

তারপর ব্রেনার পাসের দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে আর দেখাই যাচ্ছিল না। শুধু সাদা বরফে ঢাকা। ওয়াইপার কোনো রকমে অতি কষ্টে বরফ সরাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা বরফের রাজত্বে এসে পড়লাম। দু পাশের মাঠঘাট ঘরবাড়ি সব বরফে ঢাকা। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

আমি বাঙাল তাই আমার কাছে বরফ পড়া দেখার অভিজ্ঞতা দারুণ। কিন্তু সাহেবদের কাছে এ তো রোজকার ঘটনা। আমার এই পরদেশে আসার উত্তেজনাকর পরদেশী এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বদেশী কোনো সমতুল অভিজ্ঞতার তুলনা করি এমন তুলনা মনে এল না।

পরক্ষণেই মনে পড়ল আমাদের কালবৈশাখী!

কলকাতার লোকের কাছে কালবৈশাখী কিছু নয় কিন্তু একজন অস্ট্রিয়ানের কাছে এ

www.BanglaBook.org

নিশ্চয়ই এক অভিজ্ঞতার মত অভিজ্ঞতা। ধুলোর ঝড়, নারকোল গাছগুলোর মাথা নাড়ানো, মেঘের গুরু গুরু, আকাশের কালো কুটিল রূপ, বিদ্যুতের ঝিলিক ; বাজের শব্দ।

কিছুদূর গিয়ে বাস আর যেতে পারল না। সামনে গাড়ির লাইন। দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেনার পাসের দিকে আর কোনো গাড়ি যাচ্ছে না, মানে যেতে পারছে না। ওপাশ থেকে যেসব গাড়ি পাস পেরিয়ে ফেলেছে কোনোক্রমে, সেগুলোই তিরতির করে আস্তে আস্তে আসছে।

যে হারে বরফ পড়ছে তাতে মনে হলো এখানেই এই বড় বাসটারই বুঝি বরফ-সমাধি হবে।

সামনের দাঁড়িয়ে থাকা মোটরগাড়িগুলোর রং চেনার উপায় নেই। সব সাদা। আশেপাশের বাড়ি দোকান গাছ-পাতা সব সাদা। পুলিসম্যানের ওভারকোটের নীলচে রং সাদার মধ্যে থেকে একটু-একটু উঁকি মারার চেষ্টা করছে। টুপি সাদা।

বাস দাঁড়াল তো দাঁড়ালই।

অ্যালাস্টার ও জ্যাককে খুব চিন্তান্বিত হয়ে কি সব আলোচনা করতে দেখা গেল ফিসফিস করে।

ইতিমধ্যে আমাদের পিছনেও শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। জ্যাক থেমে পুলিসের সঙ্গে অনেকক্ষণ বুড়ো আঙুল কড়ে আঙুল, ডান হাঁটু নাড়িয়ে কথা বলল—তারপর বরফে ঢেকে গাড়িতে ফিরে এসে অ্যালাস্টারকে কি সব বলল বিজাতীয় ভাষায়।

অ্যালেস্টার মাইক্রোফোনে বলল, ওয়েল!

তারপর টিপিক্যাল ইংরেজের মত ট্যাক্টফুলি একটু হাসল।

পরক্ষণেই বলল—

Well, ladies and gentlemen, there's a minor problem!

হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট ইজ ইট? রব উঠল।

আমার তিন সারি সামনে কানে-খাটো এক ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম জানিনি। চেঁচিয়ে কথা বলার ভয়েই আলাপ করা হয়ে ওঠেনি। তবে মুখের ভাবটি সব সময়ই ভারী প্রশান্ত। তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হিয়ারিং-এইড বের করে কানে লাগালেন।

সব গলা ছাপিয়ে একটি বাঙালী গলা শোনা গেল ; সেরেছে।

এই বাঙালী দম্পতি গ্রেটার লানডানে সেটল্‌ড। স্বামী এঞ্জিনিয়ার, স্ত্রী ডাক্তার। কিন্তু আমি বাঙালী পরিচয় দিইনি। আসা-ইস্তক একটি বাংলা শব্দও বলিনি। লোকে আমাকে যে যাই ভাবুক—পাকিস্তানী, আফ্রিকান, আরব, ইরানী, মেকসিকান, মাফিয়া আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না—কিন্তু কদিনের জন্যে বিদেশ দেখতে এসে গড়িয়াহাটে কই মাছের দর অথবা অপর্ণা সেনের লেটেস্ট বাংলা ছবি নিয়ে আলোচনা করার একটুও ইচ্ছা আমার ছিল না। যদিও কই মাছ (বিশেষ করে ধনেপাতা ও সর্ষে-বাটা দিয়ে রান্না করা কই মাছ) এবং ঐ বুদ্ধিমতী উজ্জ্বল চোখসম্পন্ন মহিলা—এই দুয়েরই আমি সবিশেষ ভক্ত।

অ্যালাস্টার আবার হাসল, যাকে চাক্‌ল করা বলে তেমন। তারপর মাইক্রোফোনে ফুঁ দিল। সম্মিলিত অভিব্যক্তি ধুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

www.BanglaBook.org

অ্যালাস্টারের চেহারা চুল কথাবার্তা সমস্তই অতি রোম্যান্টিক। বড় সুন্দর ছেলে। সে কারণেই ও প্রবলেমের খবর দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের অতটা হতাশ হওয়ার কারণ আছে বলে মনে হলো না।

অ্যালাস্টার বলল—আমাদের ইটালী যাওয়া বোধহয় হচ্ছে না।

আর যায় কোথায়? যেই না একথা বলা!

আমার মনে হলো দীঘা বা বিষ্ণুপুরের কনডাকটেড টুরে বেচারী ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের যাত্রীদের কাছ থেকে যে অভদ্র অবুঝ ও অশালীন ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় তারই স্যাম্পেল দেখতে পাবে আজ অ্যালাস্টার।

হৈ হৈ রৈ রৈ রব উঠল। নেহাত সাহেব মেম ইংরিজীতেই কথা বলছিল—কিন্তু যা বলছিল তার অর্থ করলে অত্যন্ত সরল অর্থ দাঁড়ায়। 'দাও টাকা ফেরত, চালাকি পেয়েছো? বাপের নাম খগেন করে দেব। ভাঁওতা মারার জায়গা পাও না? কেস ঠুকে দেব বলে দিচ্ছি, দেখে নেব ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আবারো মনে হল সারা পৃথিবীর মানুষই এক। সেই মুহূর্তে মনে হল সাহেবরা দুশো বছর আমাদের পরাধীন করে রেখে তাদের সম্বন্ধে যা আমাদের বুঝতে দেয়নি তা এই এক মুহূর্তেই বোঝা গেল।

তার পা মাড়িয়ে দিলে, তার স্বার্থে, আরামে বা মানিব্যাগে হাত পড়লে পৃথিবীর সব মানুষই সমান।

আমি একবার চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালাম।

এই তিনদিনের ভদ্রতা, সভ্যতা, থ্যাঙ্ক-উ্য, একসকিউজ মী ইত্যাদি যে কত বড় মুখোস, কত বড় বাহ্য এবং মিথ্যা ব্যাপার তা আর জানতে বাকি রইল না।

বড় লজ্জা হল আমার। এদের সকলের জন্যে, আমার নিজের জন্যেও।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, অ্যালাস্টার তার কথা শেষ করেনি। তার অসুবিধের কথা তাকে দয়া করে বলতে দেওয়া হোক।

তক্ষুনি আমার পিছন থেকে আমাদের নেতা জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, উ্য আর অ্যাবসলুটলি রাইট্। লেট আস হিয়ার হোয়াট অ্যালাস্টার হ্যাজ টু সে। আফটার উই হিয়ার হিম উই উইল কাম টু আ ডিসিশান।

অ্যালাস্টার বলল, ব্রেনার পাস বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে। কতক্ষণে বরফ পরিষ্কার করা যাবে, কতক্ষণে বরফপড়া থামবে—'It's no-body's guess.'

আসলে এ বছরে এত তাড়াতাড়ি যে বরফ পড়বে এবং এমনভাবে পড়বে—ব্রেনার পাসের তদারকী যাঁরা করেন তাঁরাও বুঝতে পারেননি।

সকলে সমস্বরে বলল, কি হবে? তাহলে কি হবে?

কেউ কেউ জুতো দিয়ে বাসের মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল।

হংকং-এর চাইনীজ মেয়েগুলো বাসের একেবারে পেছন থেকে 'চ'-কার এবং অনুস্বারের তুবড়ি ছোটাল।

www.BanglaBook.org

অ্যালাস্টার বলল, ইটালীতে তো আমাদের হোটেল ঠিক করা আছে। ডিনারও সেখানে তৈরী করে রাখবে—কিন্তু এখন সারারাত এখানে আটকে থাকলে কি হবে? এটা একেবারে আনএক্সপেকটেড ব্যাপার। আমার কাছে পয়সাও নেই যে তোমাদের এত লোকের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করি এখানেই কোথাও।

অনেক স্বর একসঙ্গে বলল, চোপ্। ইয়ার্কি পেয়েছে? পয়সা নেই মানে কি? কেন? তোমরা ক্রেডিটে বন্দোবস্ত কর—ওসব আমরা জানি না। আমরা ইটালী যাবই। এদিকেই কোথাও খাওয়া-দাওয়া করে সারা রাত বাস চালিয়ে চল।

অ্যালাস্টার অভদ্র হয়ে-যাওয়া বিক্ষুব্ধ অতজনের সামনে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। যেন ও-ই সবকিছুর জন্যে দায়ী।

তখন জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—পাস পেরোবার কোনো উপায়ই কি নেই অ্যালাস্টার?

অ্যালাস্টার বলল—ব্রেনার পাসের নীচ দিয়ে একটা টানেল আছে—ট্রেনে করে গাড়ি পার হয়। শীতকালে যখন পাস বরফে ঢাকা থাকে—। এখনও পার হচ্ছে অনেক গাড়ি কিন্তু এতবড় বাস তো ঐ টানেল দিয়ে গলবে না।

জন শুধোল, আর কোনো উপায় নেই?

আছে। যদি টায়ারে স্নো-চেইন লাগানো যায়।

তোমাদের সঙ্গে আছে? জন শুধোল।

জ্যাক বলল, এই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যে এমন বরফ পাব এখানে কে জানত? নেই! আমাদের সঙ্গে চেইন নেই!

অ্যালাস্টার তুড়ি মেরে বলল, নট আ ব্যাড অইডিয়া ; উই ক্যান ট্রাই দ্যাট আউট।

তারপর রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সাহেব, জন, অ্যালাস্টার ও জ্যাক চেইন পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে বেরোল।

আমার পাশের ফিলিপিনো ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে একগাদা বিস্কুট ও চকোলেট বের করে দিলেন। উনি বড়লোক। আমার এদেশে বাড়তি চকোলেট বা বাড়তি খরচ করারও টাকা নেই।

খিদেও পেয়েছিল। বিকেলে চা-ও খাওয়া হয়নি, এদিকে রাত নেমে এল বলে। বহু বহু বছর বাদে কুটমুট করে বিস্কুট চকোলেট খেলাম—কিন্ডারগার্টেনে পড়া ছেলের মত।

ওরা ফিরে এল।

বলল, কোথাওই চেইন পাওয়া গেল না।

অ্যালাস্টার ব্রাসেলস্-এ কস্‌মস্ কোম্পানীর হেড কোয়ার্টারে ফোন করতে চেষ্টা করল একটা দোকান থেকে। ব্রাসেলস্-এর বস-এর সেক্রেটারী বলল যে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে এক পার্টিতে গেছেন।

জনের ভগ্নীপতি যে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এসেছিলো, মুঠি পাকিয়ে বলল—টু হেল উইথ দা পার্টি'।

জন বলল, যা হয় একটা ঠিক করা হোক। বাস থেমে থাকলে তো আর ক্লোয়ার চলবে

www.BanglaBook.org

না সারারাত—আমরা কি এই ব্রেনার পাসের উপরে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব?

আর. এ. এফ.-এর সাহেব বলল, মেয়েদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে, কেউ চা পর্যন্ত খায়নি বিকেলে, বাসটাকে কোনোক্রমে পাশের গলিতে ঢুকিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে অন্তত আপাতত নিয়ে যাওয়া যাক।

ইংরেজ পুরুষগুলো ভারী সেয়ানা। যা-কিছু দয়া-ফয়া, ফেভার-টেভার চায় সব মেয়েদের নাম করে।

বাস থেকে আমি একবার নেমেছিলাম, একটু বরফের উপর হাঁটার শখ হয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটুখন পরই আবার বাসের গরমে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

জন, এয়ার ফোর্সের সাহেব এবং আমি মিলে আলোচনা করে ঠিক করা হল, সারা দিনের যাত্রার পর আবার সারারাত বাস চালিয়ে গিয়ে ইটালী পৌঁছনোর চেষ্টা করাটা খুবই ঝুঁকি নেওয়া হবে।

জন বলল, তাছাড়া জ্যাক সারা দিনে আইনমাফিক যতখানি চালানো সম্ভব প্রায় চালিয়েছে। এরপর সারারাত চালানো বেআইনী হবে।

আমার জানা ছিল না যে এরকম আইন কোথাও আছে। আছে জেনে ভালো লাগল।

জ্যাক বাসটা ব্যাক করে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকল। সেখানে পর পর অনেকগুলো দোকান, রেস্তোরাঁ।

অ্যালাস্টার বলল, আপনারা চা-টা খেয়ে নিন এখানে। আমি ততক্ষণে ব্রাসেলসে আবার ফোন করে দেখি, যোগাযোগ করতে পারি কিনা।

আগেই বলেছি, পশ্চিমী দেশে ফোনে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি যোগাযোগ করাটা কোনো ব্যাপারই নয়। এরিয়াকোড ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই হল। ডায়রেক্ট ডায়ালিং পৃথিবীর এদিকে সর্বত্র! এখন কস্‌মস্‌ কোম্পানীর ইয়োরোপীয়ান বস যেখানে পার্টিতে গেছেন সেখানকার ফোন নম্বর পেলেই ঝামেলা মিটে যায়।

বাইরে তখন বরফ পড়া থেমে গেছে, কিন্তু টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

বাস থেকে নামতেই মনে হল ঠাণ্ডায় কে যেন কান কেটে নিয়ে গেল। নেমেই, সামনে দেখি একটা বার ও রেস্তোরাঁ। প্রায় সাতটা বাজে। অন্যান্য দিন এমন সময় আমরা ডিনারে বসে যাই। ক্ষিদেও পেয়েছে।

বার-এ সার সার ওয়াইন, লিকুওর, হুইস্কী, শ্যাম্পেন ইত্যাদির বোতল সাজানো আছে। হঠাৎ একটু বড়লোকী করে গরম হওয়ার ইচ্ছে গেল। এমন সময় দেখি, আমার পিছনে সারা। জিনের ফ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর তার উপরে একটা বুক-খোলা হাতওয়ালা সোয়েটার পরে। বাস থেকে নেমেই অবশ্য সোয়েটারের সবকটা বোতাম বন্ধ করে নিয়েছে।

সারা বলল, হাই।

আমি বললাম, হাই।

www.BanglaBook.org

বাস থেকে নেমে এটুকু এসেই মেয়েটার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।

বললাম, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

সারা আমার দিকে তাকাল, তারপর স্বল্পপরিচিত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আই উডনট্ মাইণ্ড।

আমি বললাম, কি খাবে?

ও বলল, কনিয়াক।

আমরা দুটো কনিয়াক নিলাম।

এখন ডিনারের ব্রেক নয়। তাছাড়া পয়সা যখন দিয়েছে ট্যুর কোম্পানীকে তখন খিদে পেলেও নিজের পয়সায় ডিনার খাবে এমন ইচ্ছা কারোরই দেখা গেল না। এমতাবস্থায় গরীব ইণ্ডিয়ানের পক্ষে কপির স্যুপ এবং আলু-মটরশুঁটি সেদ্ধ খাওয়াটাও বড়লোকী বলে গণ্য হবে হয়ত। তাছাড়া সবাইকে ফেলে একা একা খাওয়াটা অশোভনও বটে। কনিয়াকটা শেষ করতে না করতে অ্যালাস্টার এসে খবর দিল যে, যোগাযোগ করা যায়নি ; কিন্তু জোর চেষ্টা চলছে। অন্যান্যরা কেউ চা, কেউ কফি, কেউ টকাস করে একটু স্ন্যাপস খেয়ে বাসে ফিরে এসেছেন।

বাইরে বৃষ্টি জোর হয়েছে। বাসের কাঁচে পিটির পিটির করে ছাঁট লাগছে। ব্লোয়ারটা দাঁড়ানো অবস্থায় অনেকক্ষণ চলেছে বলে জ্যাক বন্ধ করে দিয়েছে এখন। নেতা জনের নির্দেশে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কোটের কলার তুলে, হাত পকেটে ভরে হেলান দিয়ে বসে আছি। বাইরে রাত নেমে সাদা প্রতিফলিত আলো ; বড় রাস্তায় ভীড় করে থাকা গাড়িগুলো সব মিলিয়ে মাথার মধ্যে এক অসংলগ্ন ভাবনার ট্রেন চলেছে ধীরে ধীরে ক্লান্তির টানেলের মধ্যে দিয়ে।

BanglaBook.org

হঠাৎ জনের শালা বলে উঠল—লুক জন। আই টোল্ড ইয়্যু জার্মানী উইল ফাইন্যালী গেট আস্।

আমি হেসে উঠলাম।

জনও হেসে উঠল। অন্য অনেকেই হাসলেন।

জন আমাকে বলল—দিস ব্রাইটার অফ আ ব্রাদার-ইন-ল কান্ট ফরগেট হিজ ইয়ারস ইন দ্যা ওয়ার।

রসবোধ আছে শালাবাবুর। যুদ্ধের সময় হেলমেট মাথায় দিয়ে চ্যুইংগাম চিবোতে চিবোতে হাওয়াইটজারের আলোয় আলোকিত আকাশে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় এই কথাই অনেকবার মনে মনে বলেছে বাবু। আজ জার্মানীতে সত্যি এসে, তুষারবৃত ব্রেনার পাসের সামনে ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় বাসের মধ্যে বার্ধক্য ও অসহায়তার বলি হয়ে তাই বুঝি পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেছে এমন করে।

মেয়েরা অনেকে ঘুমোচ্ছেন। পিছনের সীটে এয়ার-ফোর্সের পাপা তার পাতানো মেয়েদের সঙ্গে সমানে বকে চলেছে। যুবতী মেয়েগুলো এক গামলা কইমাছের মত খল্‌বল্ করছে। চাইনীজ, ইস্রায়েলী, মালয়েসীয়ান, কেনীয়ান, অস্ট্রেলীয়ান—একগাদা মেয়ে

www.BanglaBook.org

একসঙ্গে কথা বললে ঠিক জলতরঙ্গের মত আওয়াজ হয়।

এমন সময় জ্যাক তড়াক করে দরজা খুলে ভিতরে এসে মহাসমারোহে বাও করে বলল—প্রবলেম—ফিনি............।

জ্যাক ইংরিজীর মধ্যে থ্যাঙ্ক উ্য; প্রবলেম; নো প্রবলেম; গুড; ব্যাড এবং মাদাম; মিস্টার এই কটা কথা জানত। কিন্তু এই সামান্য কটি কথা সম্বল করে চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে সে যেভাবে কথা বলত বহু ভাষাভাষী সর্বজ্ঞ হয়েও তেমন করে বলা যায় না।

সকলে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। শীতরে লম্বা রাতে অভুক্ত শয্যাহীন অবস্থায় কী করে কাটানো হবে এই চিন্তা সকলকেই কম-বেশী পেয়ে বসেছিল। এমন সময় অ্যালাস্টার এল।

মাইক্রোফোনে বলল, ব্রাসেলসের সঙ্গে কথা হলো। এ যাত্রা আমাদের ইটালী যাওয়া হবে না। আমরা আবার কেম্পটেনে ফিরে যেখানে দুপুরে খেয়েছিলাম—সেই অস্ট্রিয়ান হোটেলওয়ালার সুন্দরী ইংরেজ স্ত্রীর হেপাজতে ফিরে যাবে। ওখানেই খাওয়াদাওয়া করে দু-তিনটে হোটেলে ভাগ করে শুয়ে পড়ব। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পরে দশটা নাগাদ কনফারেন্স করে পরবর্তী গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হবে।

জ্যাক বাসটা স্টার্ট করল। আবার ব্লোয়ার চলতে শুরু করল। বাসটা মুখ ফেরাল কেম্পটেনের দিকে।

বেশ ক'দিন পর সকাল নটা অবধি পালকের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমনো যাবে যে, একথা ভেবেই আরামে আমার ঘুম পেয়ে গেল। বাস চলতে লাগল হু-হু করে। ভেতরের বাতি নিবিয়ে নাইট লাইট জ্বালিয়ে দিল অ্যালাস্টার। ভোর ছ'টায় চলা শুরু হয়েছে আর এখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। কারোরই আর জেগে থাকার ইচ্ছা বা জোর ছিল না।

পুরো বাসে বোধহয় ড্রাইভার জ্যাক, গাইড অ্যালাস্টার, নেতা জন এবং আমিই জেগে রইলাম।

সকলে যখন যা করে আমার তখন ঠিক তার উল্টোটা করতে ইচ্ছে করে চিরদিন। বরফ-ঝরা নির্জন হিমেল রাতের জার্মানীর গ্রামের রূপে চোখ ডুবিয়ে বসে রইলাম।

সকালে বলাবাহুল্য আমার উঠতে দেরী হয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট করে বাইরে এসে দেখি ঝরঝরে রোদ। চারদিকে বৃষ্টিস্নাত ঘরবাড়ি পথঘাট—চমৎকার দেখাচ্ছে!

কনফারেন্স যত সহজে শেষ হবে ভাবা গেছিল তত সহজে হল না। প্রবল আপত্তি উঠল নানা তরফ থেকে। নানা মুনির নানা মত। অনেকেই জ্যাক ও অ্যালাস্টারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। যেন ওরাই ব্রেনানর পাসের উপর নিজে হাতে গামলা গামলা বরফ ঢেলে আমাদের ইটালী যাওয়া ভন্ডুল করেছে।

আগেই বলেছি, জনগণ সর্বত্র এক। পাঁচমিশেলী লোকে ভরা। নয়াপয়সা দিয়ে টাকা উসুল করার মনোবৃত্তিটা শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয় দেখে মনে মনে আত্মশ্লাঘা বোধ

www.BanglaBook.org

করলাম।

শেষ মেজরিটী ডিসিশান মানতেই হল। অবশ্য এই ডিসিশান মানাতে জন এবং আমার অনেক মেহনত করতে হল। সেই মুহূর্তে আমাদের সেই গোল হয়ে দাঁড়ানো কনফারেন্স দেখলে যে-কেউ মনে করতে পারত যে এর মধ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ এবং গান্ধীজীও আছেন।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে বাস ছাড়ল জ্যাক।

বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল তুলে আমাদের দিকে দেখিয়ে বলল, নো প্রবলেম।

দেখতে দেখতে আমরা অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত টীরল প্রভিন্সে এসে পৌঁছলাম। এই প্রদেশের নামেই লানডানের বেজওয়াটার স্ট্রীটের সেই অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁ টীরলার হুট্। যার কথা অগে বলেছি। পথের দৃশ্য যে কী সুন্দর তা বলার নয়। চতুর্দিকে বরফ বরফ পাহাড়গুলো পা অবধি বরফে ঢাকা—উপত্যাকা-গাছপালা-পথের পাশের সবকিছু বরফে ঢাকা। সব সাদা। রাতে বরফ পড়েছে—এখন আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। অটোবান দিয়ে এত জোর ও এত বেশী সংখ্যক গাড়ি যায় সব সময় যে, পথটা ভিজে থাকার অবকাশ পায় না—গাড়ির চাকায় চাকায় শুকিয়ে যায় নিমেষে।

ডান দিক দিয়ে ইন্ নদী বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। ভারী সুন্দরী ছিপছিপে নদী। অনেকটা আসামের ও ভুটানের সীমানার যমদুয়ারের কাছের সংকোশ নদীর মতো।

যেখানে বরফ পড়ে নেই সেখানের দৃশ্য যেন আরো সুন্দর। কী যে নয়নভোলানো সবুজ, তা বলার নয়। চতুর্দিকে আল্পস-এর বরফাবৃত শ্রেণী।

আসটাগ বলে একটা গ্রামের পাঁচতলা হোটেলে আমরা দুপুরের খাওয়া খেলাম। কাছেই স্কি-লিফ্‌ট্ ও স্কি-ক্লাব আছে অনেক। হোটেলটার মধ্যে সনা বাথ, হিটেড সুইমিং পুল সব আছে। আশেপাশে কাছাকাছি কোনো শহর নেই। এখনও এখানে ভীড় তেমন জমেনি—কারণ স্কীইং-এর সময় এখনও শুরু হয়নি এখানে। বরফ এখানে যা পড়েছে তা স্কীইং করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তবুও কিছু কিছু অত্যুৎসাহী লোক এসে জড়ো হচ্ছে। নারী পুরুষ মাউন্টেনীয়ারিং-এর উজ্জ্বল লাল নীল পোশাক পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে জোড়ায় জোড়ায়।

দুপুরের খাওয়া সেরে ভারী সুন্দর পথ বেয়ে মাইল চল্লিশেক এসে একটা ছোট স্কীইং ভিলেজের ছিমছাম হোটেলে উঠলাম। গ্রামটা ইনসব্রুক-এর পথে পড়ে।

বিকেলে খটখটে রোদ থাকতে থাকতে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। তখনও ওভারকোট পরে যেতে হল এত ঠান্ডা। বিকেলেই চার ডিগ্রী ফারেনহাইট। রাতে শূন্যের নীচে চলে যায় তাপাঙ্ক। এই শুকনো রৌদ্রালোকিত ঠান্ডায় নিঃশ্বাস নিতে ভালো লাগে। মনে হয় বুকের কলজে বিলকুল সাফ হয়ে গেল।

চতুর্দিকে বরফ-ঢাকা পাহাড়; নীল আকাশ। আল্পসের চুড়ো বরফে বরফে সাদা হয়ে আছে। চুড়োর নীচে কালো জঙ্গল। বেশীর ভাগই পাইন আর ফারের। ছবির মত। কিন্তু এদেশের জঙ্গল পাহাড় ছবিরই মত। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে আদিমতা,

www.BanglaBook.org

রহস্যময়তা তা এদের নেই। বড়লোকের নিখুঁত সুন্দরী মেয়েদের মত এই সৌন্দর্য এত বেশী ভালো যে তাকে ভালো লাগাতে ইচ্ছা করে না।

আজ দুপুরে যখন অস্টিগে খাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম তখন শিঙে বাজিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে গরু-চরানো রাখাল ছেলেদের ডাকছিল সমতলের লোকেরা—লাঞ্চ খেতে আসার জন্যে। গরুর গলার ঘন্টা আমাদের দেশের গরুর গলার ঘন্টার মতই। পিতলের; মিষ্টি অথচ গম্ভীর আওয়াজ। অস্ট্রিয়ার গরুর গলার ঘন্টা বাজিয়ে সাধারণ লোকেরা নানারকম গান-বাজনা করে। নাচেও। রাখাল ছেলেদের আগে আগে বড় বড় শেফার্ড ডগ কুকুরগুলো গরুদের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গম্ভীর ঘাউ ঘাউ ডাকে পাহাড়তলী মুখরিত করে নেমে আসছিল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা স্কীইং ক্লাবের চৌহদ্দীর মধ্যে পৌঁছে গেলাম। একটা পাহাড়ের মাথা সমান করে সেখানে ক্লাব হাউস। এখন নিস্তব্ধ পড়ে আছে। বরফ ভালো করে পড়লে এই জায়গা লাল নীল হলুদ পোশাকে-সাজা স্কীইং রসিকদের ভীড়ে ভরে যাবে। স্কী-লিফ্‌ট্‌ চলে গেছে পাহাড়ের নীচ থেকে উপরে—এ পাহাড়ের নীচ থেকে ও-পাহাড়ে। লিফ্‌ট্‌ মানে কেবল্‌-কার। কেবল্‌-কারে পাহাড় চুড়োয় পৌঁছে সেখান থেকে স্কীইং করে নেমে আসে নীচে। আশে-পাশে রেস্তোরাঁ, বার, কীয়সক্‌; লগ-কেবিন, ছড়ানো ছিটানো থাকে।

অটোবান দিয়ে সোঁ-সোঁ করে গাড়ি চলেছে। যে-সব জায়গায় গাড়ি চলে সেখানে হাঁটা নিরাপদ নয়। হয়তো বে-আইনীও। রাস্তা পার হওয়াও বিপদজনক। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়িকে স্থির বিন্দুর মত কিন্তু রাস্তা পেরুতে না পেরুতেই গাড়িটা কাছে এসে পড়ল। আসলে, এত বেগে গাড়ি চলে এখানে যে, আমাদের গতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। সে কারণে আন্দাজে ভুল হয়ে যায়।

হেঁটে ফিরে এসে চা খেলাম এক কাপ। আটটি অস্ট্রিয়ান শিলিং নিল। ইনকিপারকে দেখতে জব্বর। অস্ট্রিয়ান কাউন্টের মত। কাউন্ট অব শ্যাটোনোয়ার মত চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—সাড়ে ছ ফিট লম্বা। তাঁর স্ত্রী কিচেন ও অফিস সামলায়। সার্ভ করে বাবা ও ফুটফুটে মেয়ে।

চা খেয়ে লবীতে এসেছি এমন সময় সেই বাঙালী দম্পতির একেবারে মুখোমুখি। ভদ্রমহিলা সোজা আমার চোখে তাকালেন। তারপর চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন স্পষ্ট বাংলায়, আপনি বাঙালী?

ভদ্রমহিলার আন্তরিক স্বরে প্রবাসে চমকে উঠলাম।

ছাত্রাবস্থায় অনেক শখের অভিনয় করেছিলাম। তারপর জীবনের পরীক্ষায় নেমে প্রায়ই প্রয়োজনের অভিনয় করে করে শখের অভিনয় কাকে বলে তা ভুলে গেছিলাম। তবুও ভাবলাম বলি, চোস্ত ইংরিজীতে যে আমি ইরাণের লোক।

কিন্তু পারলাম না। হেসে ফেললাম।

হাসিটা বোধহয় 'আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকীর' মত মনে হলো ওঁর কাছে।

www.BanglaBook.org

তিনি বললেন রাগত স্বরে, আপনি খুব অসভ্য! এত দিন হয়ে গেল এমন লুকিয়ে রাখলেন আপনার বাঙালী পরিচয়?

তারপরই বললেন, কিন্তু কেন?

আমি হাসলাম, বললাম, কোনো কারণ ছিল না। এমনিই।

মিথ্যে কথা বললাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। মিস্টার ও মিসেস বোস। আগেই বলেছি, একজন এঞ্জিনীয়ার আর একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন লানডানে থাকেন অন্যজন লানডান থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে—চাকরি ব্যপদেশে।

এই কন্টিনেন্টের ছুটি ওঁদের কাছে দ্বিগুণ আকর্ষণের। প্রথমত দেশ বেড়ানো; দ্বিতীয়ত কাছে কাছে থাকা।

পরে জেনেছিলাম মানে বুঝেছিলাম যে, আমার এই বাঙালী সহযাত্রীরা বর্তমান থাকতেও ভিনদেশীদের সঙ্গে এত বেশী মাখামাখি, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে এমন অবাধ মেলামেশা ওঁদের রক্ষণশীল চোখে ভালো ঠেকেনি। কিন্তু আমি যে এরকমই। ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুমা পিসীমা এমন কি মা বাবারও কোনো ভ্রূকুটি আমার স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে পারেনি। অবশ্য তার দাম দিতে হয়েছে বুকের পাঁজর দিয়ে। কিন্তু এই মূল্যবান ও মাল্যবান স্বাধীনতারও একটা দাম আছে। কিছু না হারিয়ে যে এ জীবনে কিছু মাত্রই পাওয়া যায় না! পাওয়া গেলেও যে তা ছাগলের দুধ খাওয়া স্বাধীনতার মতই জোলো প্রতিপন্ন হয় সে সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস দৃঢ় ছিল চিরদিনই।

যাই-ই হোক ওঁরা দুজনে বিশেষ করে মিসেস বোস আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলেন। মিসেস বোসের স্বভাবটি ভারী সহজ সরল ও সুন্দর। মিঃ বোস গম্ভীর, সন্দিগ্ধ; ও কিঞ্চিৎ ঈর্ষাকাতর। স্ত্রী যদি স্বামীর সামনে অন্য পুরুষের প্রতি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ভালো ব্যবহার করেন সেখানে বাঙালী স্বামী মাত্ররই ঈর্ষা হয়ে থাকে। তার উপর মিসেস বোসের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে—সুতরাং তাঁর স্বাধীনতাটাকে না মেনেও উপায় ছিল না।

ভবিষ্যৎ ভেবে আমি সেই মুহূর্ত থেকেই একটু গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। সংসারে সুখ বড় তরল জিনিস। নিজের পাত্র পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও উপচে পড়া সুখ যদি অন্য পাত্রে গিয়ে পৌঁছয় তাহলেও আমাদের সাধারণ রক্ষণশীল মানসিকতায় তা অসহ্য বলে মনে হয়। মিঃ বোসের দোষ নেই। আমারও নেই।

কিন্তু আমি অন্য কারো জীবনেই দুঃখ বা বিষণ্ণতা ইচ্ছে করে আনতে চাইনি কখনও। জীবনের অভিজ্ঞতার পাতা ভরে উঠেছে ভুল-বোঝাবুঝির কালো কালিতে। ঘর-পোড়া গরু তাই আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পেয়ে শিং নাড়ায়।

লবীতে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে গল্প করে, দেখতে দেখতে ডিনারের সময় হয়ে এল।

ডিনার সার্ভ করছিলো ইনকিপার ও তার মেয়ে। এখন একটা সবুজের উপর সাদা

www.BanglaBook.org

পোল্‌কা ডটের কাজ-করা ওয়েস্ট কোট পরেছে হোটেল মালিক। তার দুধ-সাদা রং, খয়েরী ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দীর্ঘ সুগঠিত চেহারা দেখে আমি স্তম্ভিতে নির্বাক হয়ে গেলাম। স্যুপ ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। খাওয়া ভুলে গেলাম। মেয়েটি হরিণীর মত লঘু পায়ে একটি সাদা অ্যাপ্রান পরে সার্ভ করছিল। হাসি মুখ। বাবা ও মেয়ের মুখে কথা নেই।

ডাইনিং রুমের সার্ভিস কাউন্টারে কাঁচের ডিকান্টারে বুড়বুড়ি তুলে অ্যাপল জুস তৈরী হচ্ছে অনবরত।

দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ হল।

এদিকে আমাদের সুন্দরী অস্ট্রেলিয়ান সঙ্গিনীরা এখনও ফেরেনি। ক্যারল ও জেনী আজ রাতে ফিরে আসবে ম্যুনিক থেকে তাদের বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে। কাল থেকে তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

এই হোটেলের পাশেই একটা জায়গায় ডিসকোথেক্ ডান্স ও গেমস্-এর জায়গা ছিল। ডিনারের পর প্রায় সকলেই সেখানে চলে গেল। এই রেকর্ডের সঙ্গে নাচ বা নানারকম বালখিল্য খেলায় আমার কখনও উৎসাহ ছিল না। বিদেশী নাচ সে ওয়ালটজ্ বা যে নাচই হোক না কেন বিদেশীরা যখন নাচে তখন দেখতে ভালো। কিন্তু আমাদের দিশীসাহেব-মেমদের দেশ স্বাধীন হওয়ার এতদিন পরেও বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণে ধেই ধেই নৃত্য দেখে আমার আজকাল নাচের কথা শুনলেই বমি পায়।

ক্লাবে, পার্টিতে ও অন্যান্য জায়গায় যখন পার্শে মাছের মত মহিলারা কাৎলা মাছের মত দিশী সাহেবদের সঙ্গে নাচেন তখন সেখানে বসে থাকতেও আমার অস্বস্তি লাগে। মনে হয়, সঙ্গ সুখের আরো তো অনেক উৎকৃষ্ট পথ আছে, তবুও এই নাচ কেন?

যে-কথা পরাধীনতার কালিমাময় বছরগুলোতে আমরা বুঝেছিলাম, বুঝেছিলাম ইংরেজদের পরম গৌরবময় অধ্যায়ে, যে যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্তমিত হত না সেই যুগে, সে কথাটাই আজ আমাদের নিজের দেশ নিয়ে গর্বের অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরনির্ভর গরীব ও কাঙাল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা ভুলে গিয়ে কত গর্ববোধ করি!

আমাদের মত আত্মবিস্মৃত জাত বোধহয় আর হয় না।

আজকে আমাদের ছেলেমেয়েরা, বড় হয়, ন্যক্কারজনক ইঙ্গ-ভারতীয় খিচুড়িমার্কা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াশুনা শিখে। তারা আজ আর এক্কাদোক্কা খেলে না, বাংলা ছড়া বলে না, শিশু ভোলানাথ পড়ে না, তারা 'রিঙ্গা-রিঙ্গা রোজেজ, পকেটফুল অফ পোজেজ' গান গাইতে শেখে—অ আ ক খ শেখার আগেই। ঠাকুরমার ঝুলি বা পথের পাঁচালী পড়ার আগেই তারা ইংরিজী কমিকস্ পড়া শেখে। স্বদেশেও একে অন্যাকে 'হাই' বলে সম্বোধন করে। রবিশঙ্কর বা ভীমসেন যোশীর বাজনা বা গান না শুনে তারা বিদেশী পপ্ মিউজিকের রেকর্ড শোনে।

দিনের পর দিন এসব দেখে শুনে আজকাল এক অসহায় বিষণ্ণতা আমাকে ছেয়ে থাকে সব সময়। পাতাল রেল হওয়া সত্ত্বেও, আমরা অ্যাটম বোম বানানো সত্ত্বেও, এত এত

www.BanglaBook.org

কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, বাঁধ, রাস্তা বানানো সত্ত্বেও এই সমস্ত কিছুর সমস্ত গর্ব ছাপিয়ে আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়ার লজ্জাকর মনোবৃত্তির, এই আশ্চর্য হীনমন্যতার, এই কৃতঘ্নতার গ্লানি আমাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে থাকে।

ওরা ওরা; আমরা আমরা। ওদের অনেক গুণ; দোষও অনেক। আমরা কেন আমাদের দোষ ও গুণ নিয়ে, আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের ভারতীয়ত্বতে গর্বিত হতে পারি না আজকেও? একথা ভেবে বড়ই পীড়িত বোধ করি।

আমাদের নিজেদের যা আছে, তাকে সম্যকভাবে না হলেও, মোটামুটি জেনে তারপর পরের সংস্কৃতির খোঁজ খবর রাখাটা বুদ্ধিমানের, সংস্কৃতিসম্পন্নতার লক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেদের আলমারির মধ্যে রাখা দামী বেনারসী বা আতরদানীর খোঁজ না রেখে আমরা পরের দেশের ম্যাকসি ও ইন্টিমেন্ট সেন্ট নিয়ে মাতামাতি করি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, যতদিন এই হীনমন্য প্রজাসুলভ অনুকরণপ্রিয় মানসিকতা আমরা কাটিয়ে না উঠতে পারি ততদিন আমাদের তাবৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাম কানাকড়িও নয়। এমার্জেন্সী ঘোষণা হওয়ায় স্বাধীনতা গেল গেল বলে আমরা চেঁচাই—অথচ স্বাধীনতা বলতে কী যে বোঝায় তার ন্যূনতম বোধও আমাদের অনেকের মধ্যেই নেই। স্বাধীনতা কেউ কাউকে ঝিনুকে করে গিলিয়ে দিতে পারে না, তা যে অর্জন করতে হয়।

এ সব ভাবলে উত্তেজিত বোধ করি, রক্তচাপ কমে যায়, মাথা ঘোরে কিন্তু আমার এই দুর্বল কলমে এই লজ্জাকর মনোবৃত্তির অবসান ঘটবে, এমন মনে করার কোনো কারণ দেখি না। অনেকেই যদি এই রকম ভাবেন, অন্য দশজনকে আমাদের ভারতীয়ত্বে গর্বিত ও ন্যায্য কারণে স্পর্ধিত করে তুলতে পারেন তাহলে বোধহয় এই সর্বগ্রাসী অশিক্ষাপ্রসূত হীনম্মন্যতার অবসান হবে।

কোন্ কথা বলতে বসে কোন্ কথায় এলাম!

লবীটা এখন ফাঁকা। বুড়ো-বুড়িরা গিয়ে অনেকে শুয়ে পড়েছেন। কাল ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে। কাল আমরা ইনসব্রাকে যাব। যেখানে উনিশ শ পঁচাত্তরের স্কাইং অলিম্পিক।

হঠাৎ দেখি ইনকিপারের মেয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল—জুতো হাতে করে।

বাবা-মা যাতে কাঠের মেঝেয় জুতোর শব্দ না শুনতে পান, সেজন্যে কি?

কে বলবে যে এই মেয়েই একটু আগে পরিবেশন করছিল। একটা পিংক গাউন পরেছে, চুলটা আঁচড়েছে ভালো করে, মুখে হাল্কা প্রসাধন; সেও চলেছে নাচতে। কার সঙ্গে কে জানে?

অ্যালাস্টার আমার পাশে বসেছিল।

মেয়েটি অ্যালাস্টারকে ফিস ফিস করে বলল, ওন্টা উ্য?

অ্যালাস্টার বড় লাজুক। ভারী মিষ্টি ছেলে। ওর টুরিস্ট গাইড না হয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। হবেও হয়তো কোনোদিন। ইতিমধ্যেই পাঁচটি ভাষায় ওর সমান দখল।

লাজুক মুখে ও বলল, নো, থ্যাঙ্ক উ্য।

www.BanglaBook.org

মেয়েটি অবাক হল। ওর এই প্রস্ফুটিত প্রথম যৌবনের গোলাপী অধ্যায়ে নাচের নিমন্ত্রণে এই বোধহয় ও প্রথম প্রত্যাখ্যাত হলো। মুখটা কালো হয়ে গেল বেচারীর।

কথা না বলে দরজা খুলে পথে বেরিয়ে গেল।

জ্যাক একটু পর ঘরে ঢুকল, ও লা-লা-লা-লা করতে করতে। আমাকে বলল, নো ম্যাডাম? প্রবলেম?

আগেই বলেছি, জ্যাকের ইংরিজী জ্ঞানের কথা। কিন্তু মুখে হাসি থাকলে এবং সকলের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি থাকলে ভাষার বোধহয় তেমন প্রয়োজন হয় না।

জ্যাক আবারও হেসে বলল, টু কোল্ড; নো ম্যাডাম? প্রবলেম!

আমি আর অ্যালাস্টার হাসলাম।

তারপর জ্যাক ও অ্যালাস্টার চলে গেল শুতে। যাওয়ার সময় জ্যাক হাত নেড়ে বলল, মী? ওয়ান ওয়াইফ। ইচ পোর্চ।

ওরা চলে যেতেই দেখি সারা নেমে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে।

ও বোধহয় জেনী আর ক্যারলের মতই বাড়তি জামা-কাপড় আনেনি। এসে অবধি সেইদিনের ফ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর ফুলহাতা সোয়েটার ছাড়া আর কিছু পরতে দেখিনি। একটা চামড়ার জার্কিন শুধু একবার বের করতে দেখেছিলাম কেম্পটেনের রাতে।

বললাম, কি ব্যাপার? তুমি গেলে না নাচতে? সকলেই তো গেল?

ও ঠোঁট উল্টে বলল, আমার ভালো লাগে না।

কেন? অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

ও বলল, এমনিই।

তারপর আমাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে বলল, হাঁটতে যাবে? আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না—আল্পসের চুড়োগুলো রুপোলি পাত দিয়ে মোড়া বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, চলো। দরজা খুলে বেরোতেই বুঝলাম কি রকম ঠান্ডা বাইরে। সারাকে বললাম, তোমার শীত করবে না?

ও বলল এখনও করছে না, করলে দেখা যাবে।

তারপরই দুষ্টুমি করে মুখ ঘুরিয়ে বলল, সঙ্গে সমর্থ পুরুষমানুষ থাকতেও যদি কোনো মহিলার শীত করে তাহলে কিছুই বলার নেই।

আমি হাসলাম। বললাম, ইজরায়েলীরা খুব সাহসী। সব ব্যাপারে।

ও হাঁটতে হাঁটতে ফ্লেয়ারের দু পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে বলল, আমাদের সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

আমি বললাম, বেশী কিছুই জানি না। তবে তোমাদের এক চোখে কালো চশমা মোসে দেওয়ানকে দেখে রবিনসন ক্রুসোর আমলের জলদস্যু বলে মনে হয়। শুনেছি, পড়েছি; তোমরা মরুভূমিতে চাষ করো, তোমরা খুব ডেয়ার-ডেভিল জেদী জাত।

ও বলল, জেদী হওয়া কি খারাপ?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, তা নয়, তবে জেদটা কি কারণে, জেদের প্রার্থিত বস্তু কি তার উপর সব কিছু নির্ভর করে। ভালো জেদ ভালো; খারাপ জেদ খারাপ।

আমাদের জেদ ভালো না খারাপ?

আমি বললাম, এমন সুন্দর রাতে জেদাজেদীর কথা না হয় তুলেই রাখো।

ও হাসল, পকেট থেকে এক টুকরো চকোলেট বার করে আমাকে দিল, নিজেও খেল। তারপর বলল, ঠিক বলেছ।

রাস্তায় লোক নেই, জন নেই। দূরের অটোবান দিয়েও এখন কম গাড়ি যাচ্ছে। চাঁদের আলো আল্পসের চুড়োর বরফে পিছলে পড়ে পাহাড়ে বনে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারী ভালো লাগছে।

সারা আমার বাঁদিকে হাঁটছে। ডান হাত দিয়ে চকোলেট কামড়ে খাচ্ছে কুটুর কুটুর করে। ওর সোনালি ডান হাতে একটা প্লাটিনামের বালা—সোয়েটারের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। সেই চাঁদের আলোয় ওর কাটা-কাটা চোখ মুখ, নীল চোখ, উড়াল সোনালি চুল, আর ঠোঁটের কাছে ধরা রুপোছোঁয়া সোনালি বালা পরা সোনালি হাত এক আশ্চর্য চলমান স্নিগ্ধ ছবির সৃষ্টি করেছে।

সারা হঠাৎ বলল, সারাটা জীবন এমন ছুটি হলে বেশ হত।

আমি বললাম, তুমি কি কর?

ও বলল, একটা কমপ্যুটার ফর্মে চাকরি করি এবং লড়াইও করি।

ভাবতেও আবাক লাগল যে, যে-হাতের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম এক মুহূর্তে আগেও সেই হাত দিয়ে ও অটোমেটিক ওয়েপন ছোঁড়ে; মানুষ মারে।

ভাবছিলাম, এমনিতেই সব মেয়েই মানুষ মারে হেলাফেলায়, তাদের আবার শক্ত হাতে বন্দুক ধরার দরকার কি? ভগবান এমনিতেই তো কম মরণাস্ত্রে সজ্জিত করে পাঠাননি তাদের। তবু আরো কেন?

প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, এই মেয়েটি বয়স অনুপাতে অনেক বেশী ম্যাচিওরড্। জীবনে ওর যেন সবই জানা হয়ে গেছে। ওর সমবয়সী অন্য সমস্ত ছুটি কাটাতে-আসা ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ ডিসকোথেক্ নাচে মত্ত, জুয়ার চাকার পাশে ঘুরছে, বীয়ার খাচ্ছে পাগলের মত, নিজেদের বেহিসাবী যৌবন নিয়ে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছে না, ভাবছে যে যৌবনের কোনো তল নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই; ভাবছে যৌবন অনন্ত।

অথচ এই মেয়েটি যেন যৌবনে পা দিয়েই যৌবনকে লগি দিয়ে মেপে ফেলেছে। জেনে গেছে কত বাঁও জল তাতে। জেনে শুনে সে সাবধানী ভিস্তিওয়ালার মত শরীর মনের ভিস্তিতে যৌবনকে পুরে নিয়ে মেপে মেপে খরচ করছে। কৃপণরা যেহেতু সব সময়ই সাবধানী হয়, সারার হাঁটা চলা, কথা বলা চোখ-তাকানো হয়তো সে কারণেই অতি সাবধানী। এটা খারাপও; আবার ভালোও। ভাবছিলাম।

সারা হঠাৎ বলল, তোমাদের দেশে একবার যাব ভেবেছি।

আমি খুশী হয়ে বললাম, এসো না। এলে আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়িতে, আমার

www.BanglaBook.org

অতিথি হয়ে থেকো। তোমাকে অগ্রিম নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখলাম। আমাদের দেশ ভারী সুন্দর। তোমাকে আমাদের গ্রাম দেখাবো, জঙ্গল পাহাড় দেখাবো. দেখবে আমাদের দেশের লোকেরা কত ভালো।

যাব, একবার। অস্পষ্ট স্বরে বলল সারা।

হঠাৎ সারা বলল, আমার একা একা হাঁটতে খুব ভালো লাগে।

আমি বললাম, আমরা সকলেই তো একা; সারাজীবন একা। তবু শুধু একা একা হাঁটতেই ভালো লাগে কেন তোমার? একা একা বাঁচতে ভালো লাগে না?

ও বলল, না। আমরা যে সকলেই একা, চিরজীবনের মত একা একথা জানি বলেই একা একা বাঁচতে ভালো লাগে না।

তবে একা একা হাঁটতে ভালো লাগে কেন?

ভালো লাগে, কারণ একা-একা হাঁটবার সময় অনেক কিছু ভাবা যায়। নিজেকে একা পেলে নিজের শুভাশুভ, ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ এসব ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায়। নিজেকে জানা যায়। তোমাদের গীতায় নিজেকে জানা সম্বন্ধে কি সব কথা আছে না?

আশ্চর্য। আমি বললাম।

তারপর শুধোলাম, তুমি গীতা পড়েছ?

পুরো পড়িনি। ইংরিজীতে গীতার উপরে একটা বই পড়েছিলাম। তোমাদের কর্মযোগ। তোমরা কিন্তু দারুণ জাত। তোমাদের মত ঐতিহ্য খুব কম জাতের আছে।

আমি বললাম, একজন আঠারো-উনিশের বিদেশী মেয়ের পক্ষে এত ঔৎসুক্য আমাদের দেশ সম্বন্ধে, ভাবলেও ভালো লাগে।

সারা বলল, আমার মা ও বাবা দুজনকে আমার তেরো বছর বয়সে একই সঙ্গে একই দিনে হারিয়েছিলাম। তারপর থেকে জীবন, জীবনের মানে এসব সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল জাগে আমার। যা আমার বয়সী মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, এমন অনেক বিষয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। করি।

তারপরই বলল, অন্যায় করেছি?

আমি হাসলাম। বললাম, অন্যায় কিসের? তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার গর্বিত লাগছে নিজেকে।

হঠাৎ সারা বলল, তুমি একা এসেছ কেন দেশ বেড়াতে?

আমি কি জবাব দিই ভেবে পেলাম না।

আশ্চর্য। ও বলল।

কেন? আশ্চর্য কেন?

আমি শুধোলাম।

তোমার এমন একা একা নির্বান্ধব হয়ে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয় না? মনের কথা না হয় বাদই দিলাম। শরীরের কষ্টও বোধ করো না তুমি?

আমি বললাম, শরীরের কষ্টটা তো সহজেই লাঘব করা যায়। আসল কষ্ট তো মনের।

www.BanglaBook.org

সেটাই আসল কষ্ট।

হঠাৎ সারা বলল, জানি না। আমার তো মনে হয় শরীরটাও মনের মত। ইকুয়ালী ইম্পরট্যান্ট! তোমরা ভারতীয়রা শরীরটাকে নেগেটিভ করে একটা বাহাদুরী পাওয়ার চেষ্টা করো। আমার কিন্তু মনে হয় এটা ঠিক নয়। জীবনে শরীরটা মনের মতই ইম্পরট্যান্ট্। শরীরকে পুরোপুরি অস্বীকার করে কি তার দাবীকে দাবিয়ে রেখে কি মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে?

আমি বললাম সুস্থতা বলতে তুমি কি মনে করো জানি না। তবে বাঁচতে যে পারে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

ও আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, তুমি কি সত্যিই নিঃসন্দেহ এ সম্বন্ধে, না শেখানো কথা বলছ; অথবা সংস্কারের কথা।

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত বিজ্ঞর মত বলল, সংস্কারকে কাটিয়ে ওঠাও কি মনুষ্যত্ব নয়? সংস্কার এবং যাবতীয় সংস্কারই কি ভালো?

আমি বললাম, আমার কোনোরকম সংস্কার নেই। সংস্কারবদ্ধতা একরকমের পরাধীনতা। সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই।

সারা বলল, তুমি সত্যি কথা বলছ না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এ কথা কেন বলছ?

বলছি, কারণ তোমায় পরীক্ষা করলে তুমি পরীক্ষায় পাস করবে না।

আমি হাসলাম। বললাম, করো পরীক্ষা। কি পরীক্ষা করতে চাও তুমি?

সারা বলল, আজকে তুমি আমার সঙ্গে শোবে। আমার খুব একা লাগছে; শীতার্ত লাগছে। পারবে তুমি আমার শীত কাটাতে, আমার একাকীত্ব ঘোচাতে? যে একাকীত্ব একজন মাতৃ-পিতৃহীন উনিশ বছরের সঙ্গীহীন লড়াই-করা মেয়ের মেরুদণ্ডে, মজ্জায় সেঁধিয়ে আছে—যে শীত সমস্ত সত্তায় ছেয়ে আছে সেই শীতকে তুমি উষ্ণ করে তুলতে পারবে? যদি পারো, তাহলে জানবো যে, তুমি যথার্থ পুরুষ। যথার্থ সংস্কারমুক্ত জীব।

আমি অবাক হয়ে সারার মুখে তাকালাম। চাঁদের আলোয় ওর সোনালি কাটাকাটা মুখকে খুব নিষ্ঠুর অথচ করুণ দেখাচ্ছিল।

বললাম, ঠিক আছে। তবে হোটেলে ফিরে চল।

সারা আমার হাতটা ওর হাতে টেনে নিল।

বলল, এখুনি নয়। বাইরের শীতটা আরো একটু লাগুক। ঠাণ্ডায় আমার ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে যাক্। আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে উঠুক। তখন, তখন তুমি ধীরে ধীরে আমাকে উষ্ণতায় ভরে দিও।

আমি বললাম, জানো আমার একটা উপন্যাস আছে, তার নাম 'একটু উষ্ণতার জন্যে'। ফর আ লিটল্ ওয়ার্মথ্। সেই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হলো যে, আমরা সকলেই এই শীতার্ত নিবান্ধব পৃথিবীতে একটু উষ্ণতার জন্যে, একটু উষ্ণতার কাঙালপনা নিয়ে বেঁচে থাকি। উষ্ণতাই জীবন, উষ্ণতার অভাবই মৃত্যু অথবা জীবনের অভাব।

www.BanglaBook.org

সারা বলল, স্ট্রেঞ্জ। ঠিক আমার মতটাও এই। কিন্তু তুমি কোন্ ভাষায় লেখো?

আমি বললাম, বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।

ও বলল, তোমার ইংরিজীতে লেখা উচিত। আমাদের পড়তে দেওয়া উচিত তোমার বই। বাংলায় লিখলে তো আমরা পড়তে পারবো না। নয়তো অনুবাদ করাও।

যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, তখন রাত সাড়ে দশটা। আল্পসের মাথায় লক্ষ্মী পূর্ণিমার চাঁদ অঝোরে ঝরছে। ঠাণ্ডায় কান জমে যাচ্ছে। আমি আমার ওভারকোটটা খুলে সারার গায়ে পরিয়ে দিলাম।

ও বলল, তোমার শরীরের উষ্ণতা তোমার ওভারকোটে সব মাখামাখি হয়ে আছে। তুমি বুঝি তোমার সম্পূর্ণ তুমির বদলে শুধু তোমার ওভারকোটটা দিয়েই ছুটি চাও? বলেই দুষ্টুমি করে হাসল ও একটু।

আমি শুধোলাম, হাসছ কেন?

ও বলল, হাসছি এই ভেবে যে, চিরদিনই কি আমার সব শীত তুমি এমনি করে ঢেকে রাখতে পারবে? দুদিনের আলাপ। দুদিন পরে এই ট্যুর শেষ হয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে এই ধৃষ্টতা কেন?

আমি বললাম, কারণ, ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ, জাতির ভাগ্য ও সমষ্টির ভবিষ্যৎ এসবই বোধহয় বানানো কথা। একমাত্র বর্তমানই সত্যি। বর্তমানের মুহূর্তগুলোর সমষ্টি নিয়েই জীবন। কখনো ভুলেও এর ভাবনা ভেবে বর্তমানকে মাটি কোরো না। অন্তত আমি কখনও করতে চাইনি। এই মুহূর্তের সত্যকে নিয়েই দারুণভাবে বেঁচে থাকো; উপভোগ করো প্রতিটি মুহূর্ত। জীবন মানেই তো মুহূর্তের গাঁথা মালা। তাই মুহূর্তটাই কি ফেলে দেবার!

হোটেলে ফিরে সারা আমাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে আমার সামনে নিরাবরণ হলো। তার সোনালি মরুভূমির মতো পেলব জ্বালাধরা যুবতী শরীরের উষ্ণতা আমার প্রবাসের সমস্ত শীতকে মুছে দিল।

সারা বলল, এসো, ভবিষ্যৎ-এর মুখে ছাই দিয়ে আজকের এই মুহূর্তটিকে আমরা উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলি।

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়েছিলো ও। জানলার কাঁচ বেয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরের কার্পেটে, বিছানায় পড়েছিল। জানালা দিয়ে আল্পসের তুষারাবৃত চুড়োগুলো দেখা যাচ্ছিল। নীচে অন্ধকার উপত্যকা।

সারা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কই এসো!

আমার বুকে শুয়ে সারা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমাকে দারুণ দারুণ আদর করো তুমি, খাজুরাহের দেশের লোক, কোনারকের দেশের লোক, আদরে আদরে তুমি আমার শৈশবের কৈশোরের প্রথম যৌবনের সমস্ত কষ্ট, গ্লানি, একাকীত্ব সব নিঃশেষে মুছিয়ে দাও। আমাকে সম্পূর্ণভাবে আনন্দে আপ্লুত করো। আমার সব অতীত ভবিষ্যৎ ভুলিয়ে দাও।

জবাবে কোনো কথা না বলে আমি ওর চোখের পাতায় চুমু খেলাম।

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার ন্যাটো কি সেন্টো কোনো জোটেই যোগ দেওয়ার উপায় নেই। তাহলে ভার্সাইলস্-এর চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে বসতে পারে অস্ট্রিয়াকে।

ইনসব্রুক জায়গাটা চমৎকার। ইন নদীর উপত্যকায় এই ইনসব্রুক। ইন নদীর সঙ্গে ইচ্ছামতীর তুলনা করা চলে—যদিও চওড়ায় অনেক কম এই নিটোল টলটলে নদী। নদীর উপর কাঠের সাঁকো। রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ান রাজহাঁসও আছে। স্পুনবিলড্ হাঁসও দেখলাম কয়েকটা।

ইনসব্রুকের হাঁক-ডাক আছে শপিংসেন্টার হিসাবে। কিন্তু আমাদের মত গরীব দেশের গরীব লোকেদের এসব জায়গায় দাম ও নাম দেখেই নিরস্ত থাকতে হয়। কোনো কিছু ভালো জিনিস কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই বললেই চলে। দোকানের শো-কেসে যেসব স্কীইং ইকুইপমেন্টস্ দেখলাম, মুখে মুখে তার দাম যোগ করে প্রায় সাত আট হাজার টাকা দাঁড়াল। আমাদের পক্ষে ভাবাই মুশকিল। তবে ঐ জিনিসই আমরা ওর চেয়ে অনেক সস্তায় তৈরী করতে পারতাম।

ইনসব্রুকের-এর গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের সামনের বাঁধানো চত্বরে এসে বাস দাঁড়াল। এখান থেকে অন্য ট্যুর যাবে। যারা বেশী পয়সা দিয়ে এই অন্য ট্যুরের টিকিট কেটেছেন সারাদিনের, তাঁরা এতে যাবেন। যারা কাটেনি আমার মত, তাদের সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ইনসব্রুকের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে হবে।

এখন ছুটির সময়। আজ বারটাও রোববার। চারদিকে ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ, কাফে। কিছু জায়গায় আর্টিস্টরা বসে গেছে লাইন দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকবার জন্যে। কড়ি ফেলো; আর ছবি আঁকাও। তবে বেশীর ভাগ ছবিই এমন হচ্ছে যে, একেবারে ফাস্টোকেলাশ। ঐ ছবি দেখে উত্তমর্ণর পক্ষে অধমর্ণকে চেনা প্রায় অসম্ভব। এটা একটা কম-অ্যাডভান্টেজ্ নয়।

কিছুক্ষণ পর আমাদের টা-টা করে যাঁরা নতুন ট্যুরে যাবার তাঁরা চলে গেলেন। আমরা কয়েকজন পড়ে রইলাম ইতস্তত। কমবয়েসী নীল চোখের অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে কোরাল (ক্যারল নয়), তার বয়ফ্রেন্ড—পাকা পাকা চেহারার মুখময় ব্রণ ওঠা ছোঁড়া, কয়েকজন বুড়ো ও বেতো দম্পতি এবং আমি।

গ্র্যান্ড থিয়েটারে মোজার্ট-এর কনসার্ট হচ্ছিল। চত্বরে ফোয়ারা। পায়রারা ওড়াউড়ি করছিল। ঝকঝকে রোদ। কলকাতার গড়ের মাঠে যেমন শীতের দুপুরে রাজ্যের বেকার

www.BanglaBook.org

ভবঘুরে শুয়ে বসে রোদ পোয়ায়, বা কানের ময়লা পরিষ্কার করায়, বা জয় বজরঙ্গবলীকা জয় বলে চেঁচামেচি করে কুস্তি লড়ে, না হয় কুস্তি দেখে; এখানেও তেমন রগড় করা এবং রগড় দেখার লোকের অভাব নেই দেখলাম।

সব দেশেই লম্বা লোক, বেঁটে লোক, কাজের লোক, কুঁড়ে লোক, ভালো লোক, খারাপ লোক থাকে।

গ্র্যান্ড থিয়েটারের উল্টোদিকেই রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদ নেপোলিয়ন দখল করে ফেলেছিলেন। ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য বহন করছে এই প্রাসাদ। ইনসব্রুকের মিউজিয়ামও বিখ্যাত। মিউজিয়ামে নেপোলিয়নের ইনসব্রুক আক্রমণের একটা দুর্দান্ত সার্কুলার ফ্রেসকো আছে। দেখবার মত।

সাইট-সীয়িং ট্যুরের বাস চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির করে একটা ওপেন-এয়ার কাফেতে এক ক্যান বীয়ার নিয়ে বসে চিঠি লিখতে বসলাম।

কলকাতার সাঙ্গুভালি রেস্তোরাঁতে ডাবল-হাফ চা নিয়ে নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা করে যতক্ষণ বসে থাকা সম্ভব তার চেয়েও নির্লজ্জ হয়ে এক ক্যান বীয়ার নিয়ে বসে ঘণ্টা দুই কাটালাম। পকেটে যা পয়সা ছিল তা দিয়ে একটা ক্রীস্টাল নেকলেস কিনেছিলাম দেশে যাকে ভালোবাসি তেমন একজনের জন্যে। সেটা কিনে ফেলার পর খুচরা পয়সাও রইল না যে কিছু খাই। সমস্তটা দিন পড়ে আছে সামনে—গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের সামনে বাস আসবে সেই শেষ বিকেলে। এদিকে এমন ঠাণ্ডা দিন দুপুরেও যে, এক জায়গায় বসে থাকলে কষ্ট হয়। কিন্তু হাঁটাও বা কাঁহাতক যায়?

দেশে থাকতে টানাটানি গেছে, অবস্থার উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু কখনও এমন অবস্থা হয়নি যে, পকেটে এক কাপ কফি খাওয়ার মতও পয়সা নেই। পকেটে পয়সা না থাকাটা যে কত অসহায়, করুণাকর ও হীনম্মন্য অনুভূতি তা সেই দিন ইনসব্রুকে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। সেটা একটা খুব বড় শিক্ষা সন্দেহ নেই।

যাঁরা সাইট-সীয়িং ট্যুরে গেছিলেন তাঁরা কখন যে সব দেখে-টেখে ফিরে আসবেন, তা তাঁরাই জানেন।

এদিকে সারাদিন শূন্য-পকেটে হি-হি ঠাণ্ডায় হেঁটে হেঁটে ও উইণ্ডো শপিং করে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যে স্কোয়ারে আমরা বাস থেকে নেমেছিলাম সেই স্কোয়ারে এসে তখন অনেকেই জমায়েত হয়েছেন।

বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিমাকাশের রোদ এসে ভরে দিয়েছে জায়গাটা। লানডানের ট্রাফালগার স্কোয়ারের মত একটা ঝরনা। তার পাশে ওখানকার মতই অনেক পায়রা ওড়াউড়ি করছে। ভ্যাগাবণ্ড, ট্যুরিস্ট, ভবঘুরে, কুঁড়ে; নানা রকমের লোকের ভীড়। কেউ চকোলেট খাচ্ছে রোদে বসে, কেউ বা আইসক্রীম; কোনো বৃদ্ধ পাশে লাঠি রেখে বেঞ্চে বসে বিকেলের খবরের কাগজ পড়ছেন।

স্কোয়ারের সামনেই গ্র্যাণ্ড থিয়েটার। আগেই বলেছিলাম যে মোজার্ট-এর কনসার্ট হচ্ছে সেখানে। কিন্তু কনডাকটেড ট্যুরের হতভাগ্য লোকেদেরতো কোনো স্বাধীনতা নেই যে,

www.BanglaBook.org

ইচ্ছামত কোথাও তারা থামে। পায়ে দড়ি বাঁধা তাদের সকলের, গাইডের হাতের ঘড়ির সঙ্গে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতেই আমাদের বাস এসে হাজির হল। আমরা উঠে পড়লাম।

যাঁরা ভাগ্যবান, দিনভর অনেক কিছু দেখে এলেন, কিনে এলেন। তাঁরা অনেকের প্রশ্নের উত্তরে উত্তেজিত হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলেন।

জ্যাক বাস ছেড়ে দিল, অ্যালাস্টার আমাদের মাল-জান্ বুঝে নেবার পর।

হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ডিনার সেরে নেওয়ার পর আবার আমরা হোটেল টীরল-এ এলাম! অস্ট্রিয়ার মনোরম পরিবেশে এমন সুন্দর হোটেলটা, যে কি বলব।

সেই হোটেলেই অস্ট্রিয়ানদের ফোক্-লোর দেখার ও শোনার জন্যে রাতে গেছিলাম সকলে। সঙ্গে স্ন্যাপস্ ও অস্ট্রিয়ান রেড ওয়াইন বা হোয়াইট ওয়াইন যে যা খেল তাই পরিবেশিত হল। মস্ত বড় কাঠের ফ্লোরের তিন পাশে বসার জায়গা করা হয়েছিল ডাইনিং রুমে। ছেলেরা চামড়ার শর্টস্ পরে আর সাদা জামার উপর লাল রঙা ওয়েস্ট-কোটের মত কোট পরে উরুতে, নিতম্বে জুতোর তলায়, গালে ফটাফট্ চটাচট তালি দিয়ে দিয়ে নাচল। মেয়েরা ঘুরে ঘুরে। কাঠুরেদের নাচ দেখালো একটা। সঙ্গে গান। সঙ্গত হিসেবে গরুর গলার ঘন্টা আর অ্যাকর্ডিয়ান।

ওদের নাচ দেখতে দেখতে দর্শকদের মধ্যেও অনেক স্ন্যাপস্ ও ওয়াইন খেয়ে চেগে উঠে নাচতে লাগলেন। সেই ব্রাসেলসে পাস্-পোর্ট হারিয়ে-যাওয়া মহিলা মিস্ ফাস্ট এমন সাজে সেজে এসেছিলেন যে সকলেরই চোখে পড়ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার চুল রুপোলি, বয়স পঞ্চাশের উপরে, কিন্তু অনেকগুলো ওয়াইন গেলার পর তাঁর চোখ মুখের ভাব পাল্টে গেল। অথচ ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে কেউ তাঁকে নাচার জন্য নেমন্তন্ন করল না। বুড়োরা নিজের স্ত্রী ছাড়া, অন্য কমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে নাচতে চাইছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে নয়।

এমন সময়, সমস্ত ফ্লোরের সবচেয়ে হ্যাণ্ডসাম, বছর চল্লিশের বয়সের এক অস্ট্রিয়ান অথবা জার্মান ভদ্রলোক উঠে এসে ওঁর সামনে বাও করে বললেন, মে আই?

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যত সুন্দরী মেয়েরা ছিল তাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তো আমাদের মহিলা নাচ শুরুই করেননি!

মহিলার আজ গোলাপি পোশাক, হাতে গোলাপি পাখা পুরনো দিনের ব্যারনেস্‌দের মত—ছোটবেলায় ইংরিজী সিনেমাতে আমরা বল-নাচের দৃশ্যে যেমন পোশাক ও পাখা দেখতাম, তেমন।

কিন্তু নাচ শুরু হতেই সকলের চোখ কপালে উঠে গেল। কি সুন্দর ছন্দজ্ঞান, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সে কী অপূর্ব নাচ! কে বলবে যে তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপর হয়েছে? নাচতে

www.BanglaBook.org

নাচতে উনি যেন কোনো গোলাপি পাখি হয়ে গেলেন। আমরা সকলে হতবাক। এই ঝগড়াটি-ঝগড়াটি চেহারার চুপচাপ মহিলা আমাদের কস্‌মস্‌ ট্যুর নাম্বার টু-টুয়েন্টি-টু'র প্রত্যেকের বুকের ছাতি গর্বে ফুলিয়ে দেবেন তা আধ ঘণ্টা আগে অনুমানও করতে পারিনি।

জ্যাক দুহাত জড়ো করে হাততালি দিয়ে বলল, গুড, গুড। নো-প্রবলেম।

কিন্তু নো-প্রবলেম কথাটা জ্যাক ঠিক বলেনি। ভদ্রমহিলার ততক্ষণে নেশা হয়ে গেছিল। আর তাঁর নাচের নমুনা দেখে সেখানের সমস্ত পুরুষ একবার করে তাঁর সঙ্গে নেচে নিজেদের ধন্য করতে চাইছিলেন। আমাদের সঙ্গের বুড়িরা বড় বড় হাই তুলছিলেন। এবং স্বামীদের দিকে বিরক্তির চোখে চাইছিলেন। বুড়োরা মন্ত্রমুগ্ধের মত মহিলার দিকে চেয়েছিলেন। তাতে বুড়িরা আরো চটে গিয়ে অ্যালাস্টারকে তাড়া লাগাচ্ছিলেন হোটেলে ফেরার জন্যে।

কিন্তু ফিরতে চাইলেই বা ফিরছে কে? ততক্ষণে নরক গুলজার। শেষে তিন-চারজন মিলে ভদ্রমহিলাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বাসে পৌঁছনো হল।

বেশীমাত্রায় মদ খেয়ে ফেলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নাচ দেখে মনে হলো বয়সকালে তিনি একজন কেউ-কেটা ছিলেন।

বাস ছাড়তেই বাসের বর্ষীয়সী মহিলারা ঐ মহিলাকে নিয়ে এমন টিকা-টিপ্পনী কাটতে লাগলেন যে আমার মনে হল এদের সমাজও শরৎবাবুর পল্লীসমাজের চেয়ে এখনও খুব একটা বেশী এগোয়নি। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানতে ও মানতে হল যে, পৃথিবীর বর্ষীয়সী মহিলাকুলে কোনো তারতম্য নেই। ঈর্ষা, পরচর্চা, ফিসফিসানি সব হুবহু এক। শুধু এঁদের পোশাক বিভিন্ন, গায়ের রঙ, চেহারা ও ভাষা বিভিন্ন।

জ্যাক ভদ্রমহিলাকে বাসে তোলার সময় তাঁর হাতের পাতায় চুমু খেয়ে আবারও বলেছিল, গুড গুড, নো-প্রবলেম।

সে রাতে, রাত-শেষে উঠে বাথরুমে গেছিলাম। বাথরুম থেকে ফেরার সময় দেখি চোরের মতো পা-টিপে টিপে জ্যাক সেই মহিলার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমাকে দেখেই জ্যাক প্রথমে চমকে উঠল। তারপর হাসল কর্ণমূল বিস্তার করে। তারপরই বলল, নো-গুড। মাই-ডিউটি।

জ্যাকের ইংরিজী ভাষার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা তখনকার মতো না করে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরে অনেকদিন জ্যাকের ঐ কথা দুটোর মানে ভেবেছি। যতবার ভেবেছি ততবারই নতুন নতুন মানে পেয়েছি।

সত্যিই! জ্যাক আমাদের রিয়্যাল গ্রেট। ভার্সেটাইল জিনিয়াস্‌।

ইটালীর প্রোগ্রাম তো গত রাতেই ক্যানসেল হয়েছিল। আজ ভোরে তবুও আলবার্গ পাস পেরিয়েই আমাদের সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল যে, আলবার্গ পাসও এখনো আমাদের পেরুবার উপযুক্ত হয়নি।

আজ সকালে অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটি—যারা ব্রাসেলসের সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী করেছিল, সেই ক্যারল আর জেনী আমাদের সঙ্গে যাবে। আমাদের বাস ছাড়ার আগে

www.BanglaBook.org

ভোগকস্‌ওয়াগেন গাড়িটাতে করে (যাতে ওরা ওদের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকদিন রাত কাটিয়েছে) ছেলে দুটি রওয়ানা হয়ে গেল ম্যুনিখে। ক্যারল যখন বাসে এসে উঠল, তখন পরিষ্কার দেখলাম ওর চোখের কোণে জল টলটল করছে। জেনী অন্যরকম। ও চোখ-মেরে ওর বয়-ফ্রেণ্ডকে বিদায় জানাল।

আলবার্গ পাসে না যেতে পেরে আমরা কার্ন পাস পেরিয়ে এলাম আবার জার্মানীতে ঢুকে। কার্ন পাসটি বড় সুন্দর। আল্পস-এর পাইন বন, ফার বন, বরফ আর বরফ। দুদিকে কী গাঢ় সবুজ সব গড়ানো উপত্যকা—ছবির মত ঘর-বাড়ি—ঘন নীল রঙা জলের ফার্ন লেক। মাথা উঁচু পাহাড়ের নীচে। জঙ্গলের ছায়া পড়েছে জলে। মন বলে ওঠে কী সুন্দর ; কী সুন্দর।

জার্মানী থেকে আমরা লিচেকটাইনে এসে ঢুকলাম। এই ছোট্ট রাজ্যটিতে এখনও ফিউডাল প্রথা আছে। অস্ট্রিয়ার রাজাদের কাছ থেকে কাউণ্ট অফ লিচেকটাইন বাষট্টি বর্গমাইল জায়গা কিনে নিয়েছিলেন। এখনও এই রাজ্য কাউণ্ট চালান। কাউণ্টের রাজবাড়ি দেখলাম, পাহাড়ের উপর চার'শ ফিট উঁচুতে।

আবারও ভাবছিলাম এরকম একটা ছোটখাটো রাজ্য, ছিমছাম ছোটখাটো রাজবাড়ি, ছিপছিপে একজন রানী থাকলে এ-জীবনে মন্দ হতো না। ভাবনাটা গাঢ় হতে না হতেই শহর ছাড়িয়ে এলাম আমরা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে লিচেকটাইন অস্ট্রিয়া থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এখন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

লিচেকটাইন শহর পেরুবার পরই আমরা রাইন নদী পেরিয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এসে ঢুকে পড়লাম। সামনেই লেক লুজার্ন। লুজার্ন লেকের দৃশ্যের তুলনা হয় না। সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে কেন পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর জায়গা বলে তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না।

পথটা চলে গেছে লেকের বাঁ-পাশ দিয়ে। ও-পাশে বরফাবৃত মাথা-উঁচু পাহাড়—আল্পস শ্রেণী। পথটা ক্রমাগত একটার পর একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আবার কখনও বা লেক লুজার্নের গা-ঘেঁষে, নীল আকাশের নীচে নীচে।

যখন লেক লুজার্ন পেরিয়ে এসে লুজার্নে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। লুজার্ন লেকের উপর নানারঙা আলোর প্রতিফলন। দূরে জলের উপরে একটা মেলা মত বসেছে। সেখান থেকে রঙীন আলোর ছটা আর ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা ভেসে আসছে।

লেক লুজার্নের পাশের এই গ্রামটির নাম ফ্লুইলেন। হোটেলের নাম, হোটেল ক্রুজ।

সারা পথেই, জার্মানী ও অস্ট্রিয়াতে বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার স্কীয়িং-এর এলাকাগুলোতে দেখেছি যে, এখানে ওখানে লেখা আছে গাস্টফ্‌ এবং জিমার। অর্থাৎ গেস্টহাউস্, ঘর পাওয়া যায়। যারা স্কীইং করতে হুট-হাট্ চলে আসে উইক-এণ্ডে এবং হোটেলে জায়গা পায় না অথবা হোটেলে থাকার যাদের সামর্থ্য নেই ; তারা এমনি সব ঘরে থেকে যায়। স্থানীয় লোকেদের ভালো উপরি রোজগার হয় এই সময়—এক-আধটা বাড়তি ঘর

www.BanglaBook.org

থাকলেই হল। বেশীর ভাগই বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট।

আগেই বলেছি যে, কন্টিনেন্টের ব্রেকফাস্ট আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী বিধবাদের রাতের খাওয়ার মত শর্টকাটের। এখনও পশ্চিমে শুধু ইংল্যাণ্ড ও কন্টিনেন্টেই বেড এবং ব্রেকফাস্ট প্রথা চালু আছে হোটেলগুলোতে। নইলে অন্যত্র, এমনকি ভারতবর্ষের সমস্ত ফাইভস্টার হোটেলেই এখন আমেরিকান প্ল্যান চালু। অর্থাৎ বেড ওনলি। যদি কেউ কিছু খান, সে বেড-টি খেলেও তা একস্ট্রা।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সকালবেলা আজ বেরুনোর পরই সরু পাহাড়ী রাস্তার পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। রাস্তাঘাট দার্জিলিংয়ের মত। কিন্তু অত্যন্ত শার্প সব বাঁক। প্রত্যেক বাঁকের মুখে বিরাট বিরাট আয়না লাগানো, যাতে বাঁক নেবার আগে অন্য গাড়ির ছায়া তাতে ভেসে ওঠে।

এমনি এক বাঁক পেরুতেই আমাদের বাসটা একটা সাদা মার্সিডিস গাড়ির মুখোমুখি এসে পড়ল। লেটেস্ট মডেলের ডিজেল মার্সিডিস। গাড়িটার সাদা রং, হলুদ ফগ লাইট, মাথার লাল সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো মহিলা আরোহী মিলেমিশে দারুণ দেখাচ্ছিল। বেশ জোরেই আসছিল গাড়িটা—আমাদের বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল! মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি।

গাড়িটা জোরে এলেও জ্যাক একেবারে কপিবুক ড্রাইভারের মত সাবধানে বাঁকটা নিয়েছিল আস্তে—কিন্তু তাতেও স্পর্শ এড়ানো গেল না। মুহূর্তের মধ্যেই দুটো গাড়িই থেমে গেল। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একজন এসে সাদা চক দিয়ে পথের উপরে বাস ও গাড়ির চাকার পাশে দাগ দিয়ে দিলেন। পথের দোকান থেকে ফোন করল জ্যাক। তিন-চার মিনিটের মধ্যে দুজন পুলিস দুটি গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। তারা নেমে নোটবইয়ে কিসব লিখলেন দাগ দেখে। বাস ও গাড়ির ড্রাইভারের লাইসেন্স ও ইনসুরেন্সের কার্ড দেখলেন। তারপর দুজনের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে চলে গেলেন। গাড়ি ও বাস যে যার পথে চলল। সুন্দর গাড়িটার একটা হেডলাইট চুরমার হয়ে গেছিল।

ব্যাপারটা আমার মনঃপূত হল না। ভীড় জমল না, চেঁচামেচি হল না। মার্ শালাকে, ধর্ শালাকে হল না। সেল্ফ অ্যাপয়েন্টেড ভলান্টিয়াররা এল না, মাতব্বরী করলো না—অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টের মত একটা জমজমাট কাণ্ড ঘটা সত্ত্বেও কোনো পথচারীর একটুও ঔৎসুক্য জাগল না। থার্ডক্লাস।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর লেক লুজার্নের পাশে পাশে হেঁটে এলাম কিছুটা। রাতেরবেলা কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল লেকটাকে।

পরদিন ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে ফ্লুইলেন থেকে লুজার্নে এলাম আবার। মাইল তিরিশের পথ। আসলে এখানে হোটেল অনেক সস্তা লুজার্ন থেকে। তাই এই গরীব-গুরবোদের এতদূরে নিয়ে এসে রাত কাটানোর ব্যবস্থা।

লুজার্ন লেকে বোটে চড়ে আমরা চললাম আল্পনাকস্টাড্-এ। বোট মানে ডিঙি নৌকো নয়। একেবারে আধুনিক সেন্ট্রালি হীটেড চতুর্দিকে কাঁচ বসানো রেস্তোরাঁসম্পন্ন মোটর

www.BanglaBook.org

বোট। বোটের মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচল। বাইরে আজ বড় ঠাণ্ডা। হাড়-কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। রোদে দাঁড়িয়েও অবস্থা কাহিল। সেপ্টেম্বরের শেষ—সুইট্‌জারল্যাণ্ড বলে ব্যাপার। জানি না ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে এখানে কি হি-হি অবস্থা হয়।

ছোটবেলা থেকে মাউন্টেন রেলওয়ের কথা শুনেছি ; ছবি দেখেছি। এই মাউন্টেন রেলওয়ে দার্জিলিং ও সিমলার মত নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে একেবারে সটান সোজা উঠে গেছে। ঘুরে ঘুরে পু-ঝিক্‌ঝিক্ করে যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই।

আমরা যাব মাউণ্ট পিলাটাস্-এ। চার হাজার ফিট উঁচু। এ আমাদের দেশে নয়। আল্পস-এ বিশেষ করে সুইস আল্পস-এ এ-সময় দু হাজার ফিটেই বরফ থাকে। মাউণ্ট পিলাটাস্‌কে জার্মান ভাষায় বলে পিলাটাস্‌কুলম্।

পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ ডিগ্রী সোজা ট্রেনটা উঠে চলল। বসার সীটগুলোও এমনভাবে তৈরী যে যাত্রীরা গড়িয়ে যাতে না পড়ে যান তেমন বন্দোবস্ত আছে। দুটো স্টেজে কোচ চেঞ্জ করতে হয়—ঢালু অনুযায়ী বন্দোবস্ত।

দেখতে দেখতে মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় এসে হাজির হলাম। মাঝামাঝি থেকেই বরফ পড়ছিল। চুড়োয় তো একেবারে সাদা। কোচ থেকে বাইরে বেরিয়ে যা শীত তা বলার নয়। তবে সেখানেও হীটেড রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে কফি খেয়ে গা গরম করে 'কেবল-কার'-এ করে আমরা নেমে এলাম আবার যেখান থেকে এসেছিলাম তার পাশেই।

পুরো সুইট্‌জ্যারল্যাণ্ডে কতরকম প্রক্রিয়ায় যে ট্যুরিস্টদের পয়সা খরচ করানো যায় তার সমস্ত পথই এরা বের করে রেখেছে। মাউণ্ট পিলাটাস থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা হল। আমাদের রাঁদেভু পয়েন্টে ফিরে গিয়ে অনেকে আবার বিকেলে আর একটা বোট ট্রিপ নিল। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থার জন্যে কতকটা এবং কিছুটা সারাদিন এক গাদা লোকের সঙ্গে হৈ হৈ করতে ভালো লাগে না বলে আমি গেলাম না।

ভেবেছিলাম একা একা লুজার্নের পথে হেঁটে বেড়াব। একা একা হাঁটার মত সুখ বুঝি আর বেশী নেই। কত কি ভাবা যায় মনে মনে, নিরুচ্চারে নিজের সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে, কত কি কথা কওয়া যায়।

কিন্তু বিধি বাম!

সবে পায়ারে দাঁড়িয়ে, বোটে ওঠা বাসের সহযাত্রীদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছি। আর পেছন থেকে এসে জ্যাক বলল, মিস্টার! লোনলি?

আমি বললাম, না না বাবা, সব সময় হৈ-হুল্লোড় আমার ভালো লাগে না। এ ক'দিনেই তবিয়ৎ খারাপ হয়ে গেছে। এখন একটু একা থাকতে ইচ্ছা হয়েছে।

শুনে জ্যাক তো চোখ কপালে তুললো।

ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো যে হয় ও আমায় থানায় দেবে নইলে হাসপাতালে ভর্তি করবে।

একা থাকার কথাতেই ও বোধহয় নির্ঘাৎ আমার শারীরিক বা মানসিক কোনো সুখ

www.BanglaBook.org

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হয়ে উঠেছে। আসলে ওর দোষও নেই। যাদের নিয়ে ওর বরাবর আসতে হয় সেইসব বুকে তিনটে করে ক্যামেরা-ঝোলানো সারাদিন লম্ফঝম্ফ করে বেড়ানো হনুমানসুলভ যূথবদ্ধ মানুষগুলোর মধ্যে কারো কারো যে এমন রোগ থাকতে পারে এ জ্যাকের মত সাদাসিধে মানুষের ধারণার বাইরে। হনুমান হলে দোষ ছিল না। ও ভ্যারাণ্ডার ফুল অথবা কোনো চিরঞ্জীব বনৌষধির মূল খেয়ে নিতে বলতে পারত।

কিন্তু হনুমান নই বলে ও আমাকে নিয়ে যে কী করবে ভেবে পেল না।

আমি ওকে যে বোঝাব তেমন উপায়ও ছিল না। জ্যাক ইংরিজি খুব কম জানে। তবু ও হয়তো আমার মুখ দেখে বুঝে থাকবে যে এই রোগীর সিম্‌টম্ এ-ধরনের অন্য রোগীর মত নয়। তাই আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গিয়ে একটা কাফেতে ঢোকাল। এবং নিজে পয়সা দিয়ে আমাকে কফি খাওয়াল।

তারপর চোখ মেরে বলল, বাইরে বড় ঠাণ্ডা। চল সিনেমা দেখি।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম: অপছন্দের সিনেমা দেখার মত ক্রিমিনাল ওয়েস্ট অফ টাইমে আমি অবিশ্বাসী। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

কাউণ্টারে নিয়ে গিয়ে জ্যাকই টিকিট কাটতে চাইল। কিন্তু ভারতবর্ষের ইজ্জত রাখতে আমাকেই টিকিটের দামটা দিতে হল।

ছবিটা না দেখলেই পারতাম: উল ব্রেনার নায়ক। কিন্তু তাঁকে এমন এক গল্পে এবং এমন এক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখলাম—এক রোবোটের ভূমিকায়—যে, তাঁর দ্বারা এতাবৎ অর্জিত এবং ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন-এর সময় থেকে জমিয়ে-রাখা তাঁর প্রতি আমার সমস্ত প্রশংসা সেদিন লুজার্ন লেকের ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিয়ে এলাম।

সিনেমা যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যে হবো হবো। বোট-ট্রিপ ফিরে এল একটু পর। তারপর লেকের পাশ থেকেই সকলে একসঙ্গে বাসে উঠে ফিরে এলাম ফ্লুইলেনে রাতের মত।

আজ সারা হোটেলেই ছিল। বলল ওর জ্বর। আমি বলেছিলাম যে আমি থাকি ওকে দেখাশোনা করার জন্যে। তাতে ও হেসেছিল। বলেছিল ইস্রায়েলের মেয়েরা এত সহজেই পরনির্ভর হয় না। তারপর আমার হাতে আলতো করে চড় মেরে বলেছিল, জানো এ ক'দিন আমার ভাবনাগুলো সব যেন বাসের ডিফারেনসিয়ালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গুঁড়িয়ে গেল। একটু স্থিতি দরকার। গো অ্যাহেড। তুমি যাও। তুমি এদেশে শীগগিরি আবার নাও আসতে পারো। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সামনের বছর আবার আসব। ডোণ্ট মিস্ দা ফান।

ফান আবার কি?

বেলুন ওড়ানো বাবল্-গাম চিবুনোর বয়সের পর পুজোয় নতুন জুতো নতুন জামা পরার আনন্দের পর 'ফান' বলে আর কিছুই থাকে না আমাদের জীবনে। ওদের হয়তো আছে। আমাদের এখানে তারপর থোড়-বড়ি-খাড়া ঃ খাড়া-বড়ি-থোড়। বেশীর ভাগেরই। তার কারণ হয়তো আনন্দ করা, পরকে আনন্দ দেওয়া ও নির্ভেজাল আনন্দে আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা আমরা অনেকেই বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলি।

www.BanglaBook.org

হোটেলে ফিরেই সারার ঘরে গেলাম। ওর ঘরের দরজায় টোকা দিতেই একটু পর দরজা খুললেন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সাহেব।

কিন্তু দরজা পুরো খুললেন না। আড়াল থেকে মুখটা বার করলেন শুধু। বললেন, শী ইজ সিক। আই অ্যাম ডকটরিং হার। ইটস্ আ উইণ্ডফল।

আমি অবাক হয়ে এবং কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, হাউ ইজ শী?

পাইলট দরজার আড়াল থেকে উইংক করলেন।

বললেন, ওঃ ডোণ্ট ওয়ারী! শী ইজ গুড। বাট আই এ্যাম টেকিং হার থ্রু আ প্রসেস অফ গুড-বেটার-বেস্ট্।

ভিতর থেকে সারার খিল্‌খিল্ হাসি শুনতে পেলাম।

আমি চলে যাবার আগেই আর. এ. এফ-এর সাহেব আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, আই লাইক ইণ্ডিয়ান্স। উই হ্যাভ বীন টুগেদার ইন্ দা ওয়ার। লেট আস বী টুগেদার ইন্ পীস। ...এণ্ড ইন্ লাভ।

বলেই বললেন, ডোণ্ট ডিসকাস্ দিস্ ম্যানলি এফয়ার উইথ আ উম্যান—আই মীন, মাই ওয়াইফ্।

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, হোয়্যার ইজ্ শী?

ওঃ, শী হ্যাজ গান টু সী আ ব্যাচেলর ফ্রেণ্ড অফ হার। এন ওল্ড টাইমার।

তারপর একটু থেমে বললেন, ড্যু নো, ইটস আ কাউণ্ড অফ ফ্লার্টেশান-ইটস কাটিং বোথ অফ আস। ইকুয়ালী ওয়েল।

ভিতর থেকে সারা কি যেন একটা দুম করে ছুঁড়ে মারল। আধখোলা দরজার সামনে ঝুপ করে পড়ল সেটা।—বালিশ।

সারা বলল, কাম ব্যাক কুইক্ ড্যু ড্যাম ফুল সিলি ব্যাব্‌লিং ইংলিশম্যান।

সাহেব বললেন, ডোণ্ট বী ইমপেশেণ্ট! ড্যু আনগ্রেটফুল বার্ডি! উই হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম টু স্পিল্।

আমি আমার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

উষ্ণতা-ফুষ্ণতা সব তাহলে বোগাস্। হৃদয়-ফৃদয়, ভালোলাগা বলে তবে কি সারার কিছুই নেই? ও কি সোনালি নীম্ফ্?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

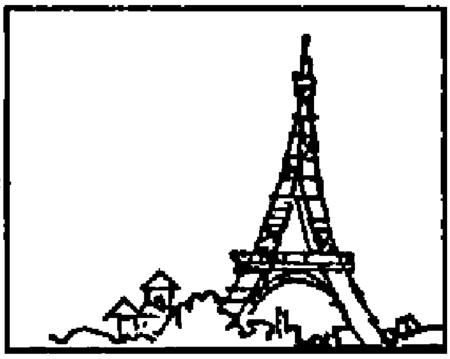

ডিনার টেবলে আজ ক্যারল আর জেনীর সঙ্গে মুখোমুখি বসা হয়েছিল। আসলে কে কোথায় বসবেন তা ঠিক থাকে না কখনোই। কিছু কিছু লোক সব জায়গাতেই নিজেদের দল নিয়ে খেতে বসেন। এও এক রকমের ক্ল্যানিশ মেন্টালিটি। অন্যেরা বেশীর ভাগই যেদিন যাদের টেবলে জায়গা হয় বসে যান।

সেদিন সারার ঘরে গিয়ে ও তারপর নিজের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুতে দেরী হয়ে গেছিল। যখন ডাইনিং রুমে এলাম তখন ওদের টেবলেই শুধু জায়গা খালি ছিল। ওদের সঙ্গে এর আগে ফর্ম্যালি আলাপ হয়নি। আলাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আমার ফারস্ট নেম শুধোলো। এটাই আজকালকার ফ্যাশান। মিস্টার স্মিথ বা মিস্টার যোশেফ বা মিস হল্যাণ্ড বলে কেউ কাউকে ডাকে না আজকাল। আজকাল সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা বোধহয় কারো সঙ্গেই কারো হয় না বলেই লোকে প্রথম আলাপেই অন্যকে অন্তরঙ্গ ভাবতে চায়—পদবী ধরে না ডেকে প্রথম নাম এমনকি ডাকনামেও ডাকতে চায়।

অন্তরঙ্গতা বলতে আমি শারীরিক অন্তরঙ্গতার কথা বলিনি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসিকতার মধ্যে আমরা বড় হয়েছিলাম, তাতে মনটার দাম ছিল অনেকখানি। আগে মন, তার অনেক পর ছিল শরীরের স্থান। মনের অন্তরঙ্গতার অনেক পরে শারীরিক অন্তরঙ্গতার কথা উঠত। কাউকে মনে মনে ভালো না বেসে তার শরীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা স্বপ্নেও ভাবা যেত না। কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই প্রাওরিটি রিভার্সড্ হয়ে গেছে। এখানে শরীরের অন্তরঙ্গতা খোলামকুচির মত সস্তা। কেউ কাউকে স্বল্প আলাপেই বীয়ার অফার করে বলে, 'উড ঊ্য হ্যাভ দ্যা বীয়ার বিফোর অর আফটার?'

অর্থাৎ আদর খাওয়ার আগে বীয়ারটা খাবে, না পরে?

এই মানসিকতার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই-ই ফলেছে। স্ত্রী-পুরুষ হৈ-হৈ করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, একসঙ্গে হুট করে বিছানায় শুয়ে পড়ছে কিন্তু এই বহির্মুখিনতার মধ্যে দিয়ে তারা একে অন্যের মন থেকে ধীরে ধীরে বড় দূরে চলে আসছে। প্রত্যেকে এক-একটি দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। মনের বন্ধুত্ব বা ভারতবর্ষে ভালোবাসা বলতে যা বুঝি আমরা, এখনও যা বুঝি ; তা থেকে ওরা বহুদূরে। তাই ওরা এত একলা, নির্জন ; দুঃখী। সব থেকেও ওরা হাহাকার করে।

সবচেয়ে দুঃখ হয় এই কথা ভেবে ও দেখে যে, আমাদের দেশের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা হঠাৎ সাহেব মেম হয়ে উঠতে তৎপর হয়েছে, বিশেষ করে সচ্ছল ঘরে।

www.BanglaBook.org

যে মুহূর্তে পশ্চিমীরা প্রাণপণে ভারতীয় হবার চেষ্টা করছে—ওদের প্রাচুর্যের মধ্যের হাহাকারে অভিশপ্ত হয়ে ওরা যখন আমাদের পারিবারিক জীবন, স্বামীর-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাবা-ছেলের সম্পর্ককে দারুণভাবে শ্রদ্ধা ও ঈর্ষা করছে ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের যারা ভবিষ্যৎ সেই যুবসমাজ উঠে পড়ে লেগেছে ওদের নকল করার জন্যে।

সাপ যে খোলস ফেলে যায় অতীতের গুহার ভিতরে, সেই খোলস গায়ে পরলেই তো সাপের চিকন শরীরের অধিকারী হওয়া যায় না। অন্যের অন্তঃসারশূন্য খোলসের প্রতি আমাদের এই জঘন্য আকর্ষণ ঃ যা স্বদেশী নয়, আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিপূরক ও সমগোত্রীয় নয়, সেই সব ফরেন জিনিসের প্রতি আমাদের এই দুর্বার ও ন্যক্কারজনক লোভ বড় লজ্জাকর মনে হয়।

সব জাতেরই দোষগুণ থাকে। নিজেদের গুণটাকে অটুট রেখে যদি দোষটাকে বর্জন করে নিজেদের মার্জিত করতে পারি আমরা, তাহলে ভারতবর্ষের মত দেশ ও জাতি পৃথিবীতে বিরল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ-কথাটা কি করে সকলে ভুলে যাই জানি না যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিজ্ঞান ওষধি এবং অনেকানেক জিনিস ওদের চেয়ে বহুদিন আগে অনেক বেশী উন্নত ছিল। মাঝে লালমুখো গুঁফো ইংরেজরা আমাদের 'গড সেভ দ্যা কিং' শিখিয়ে ওরা ভগবান আর আমরা 'নেটিভ' নামক এক মনুষ্যেতর জন্তু এ-কথাটা আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

অনুকরণপ্রিয়তার এবং আত্মবিস্মরণে বাঙালী জাতির মত দড় বোধহয় আর কেউই নয়। বাঙালীরা সাহেবদের সান্নিধ্যে সবচেয়ে প্রথম এসে সাহেব হয়ে গর্বিত বোধ করছিল। তারা সবচেয়ে আগে ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রফেসার এঞ্জিনীয়ার আই. সি. এস. হয়েছিল বলেই তাদের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, তারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাত। এ-ধারণা যে কত বড় ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এখনও আমাদের গুমোর ভাঙেনি।

আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, বাংলাকেও ভালোবাসি। আমি বাঙালী বলে বাঙালীদের সম্বন্ধে আমার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু শুধু গর্ব চিবিয়ে খেয়ে কোনো জাতি বা প্রজাতিই বেঁচে থাকতে পারে না। এখনও যদি আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না হয়, এখনও যদি আমাদের মিথ্যা দম্ভ ও অহংকার আমরা ত্যাগ না করতে পারি, এখনও যদি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র ভাঙিয়ে আমরা চালিয়ে যাব বলে মনে করে থেকে থাকি তাহলে এর চেয়ে বড় ভুল আর নেই বললেই চলে।

এই প্রজন্মে আন্তর্জাতিক বাঙালী বলতে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কারো নাম করা যায় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকটি অসাধারণ প্রতিভা তো একটা প্রজাতির কলঙ্ক, অন্ধতা ও শ্রমবিমুখতার গ্লানি মুছে দিতে পারেন না। যে স্কুলের প্রচুর ছেলে ফেল করে অথবা থার্ড ডিভিসনে পাস করে কিন্তু যে স্কুলে একজন দুজন ছেলে স্ট্যাণ্ড করে সে স্কুলের চেয়ে যে-স্কুলে কেউ স্ট্যাণ্ড না করেও প্রায় সকলেই মোটামুটি ভালো ফল করে উত্তীর্ণ হয়, সেই স্কুলকে অনেক ভালো স্কুল বলে মনে করা উচিত। আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছি প্রথম স্কুলের ছাত্র। গড়পড়তা বাঙালীর মত ঈর্ষাকাতর, শ্রমবিমুখ, বক্তৃতাবাজ লোক কম দেখা যায়। তবু মাত্র দু-একজন স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র নিয়ে আমাদের আত্মশ্লাঘার শেষ নেই। এটা বাঙালীর বড় দুর্দিনের সময়। এখনও হয়তো সময় আছে আত্মবিশ্লেষণের।

যাকগে, কি বলতে বসে কি বললাম। পাঠক ক্ষমা করবেন। বাংলা ও বাঙালীকে ভালোবাসি বলেই আমাদের এই দৈন্য ও উদাসীনতা আমাকে বড় পীড়িত করে। কেউ যদি আমার এই উপরোক্ত মন্তব্যে আঘাত পান, তাহলে আমি দুঃখিত হব। আমি জানি, আমার এই বক্তব্যকে ধূলিসাৎ করে সম্পাদকের দপ্তরে অনেক জ্বালাময়ী চিঠিও আসতে পারে। কারণ সেটাও বাঙালীর চারিত্রিক প্রকাশ। নিজের নিন্দা বাঙালী মোটে সহ্য করতে পারে না। অন্যকে না জেনেই, অন্যের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য না রেখেই নিজেকে নিজে বাহবা দেবার মত এমন নীরেট নির্বুদ্ধি শ্লথমস্তিষ্ক জাত জগতে বিরল। বাঙালীর অকারণ উচ্চম্মন্যতা এ জাতির সব গুণকে রাহুর মত গ্রাস করেছে।

ক্যারল আর জেনীর সঙ্গে আলাপ হতেই আমি ক্যারলকে বললাম, ক্যারল তুমি বড় বেশী এমোশনাল। খুব দুঃখ পাবে জীবনে তুমি।

ক্যারল স্যুপের প্লেটে চামচ নামিয়ে বড় বড় সুন্দর চোখ তুলে অবাক গলায় বলল, হাউ ডু য়্যু মীন?

আমি বললাম, আজ সকালে তুমি যখন বাসে উঠছিলে তখন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম।

তারপরই বললাম, ছেলেটির নাম কি?

ক্যারল বলল, জন।

পরক্ষণেই বলল, আই লাভ হিম ডিয়ারলি।

আমি হাসলাম। বললাম, জানি।

তারপরই বললাম, তোমায় পাশে-বসা এই বন্ধুটি কিন্তু একেবারে অন্যরকম। ও জীবনে প্রচুর লোককে দুঃখ দেবে কিন্তু নিজে দুঃখের ধারকাছ দিয়েও যাবে না।

জেনী মনোযোগ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছিল। আমার কথা ভলো করে শোনেনি।

কিন্তু ক্যারল 'মাই গড' বলায় ও ওর ঘন নীল দুষ্টু-দুষ্টু চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে বলল, কিসের আলোচনা হচ্ছে?

ক্যারল জেনীকে বলল, লুক জেনী। হিয়ার ইজ অ্যান ইণ্ডিয়ান ফেস রিডার। হি ইজ অ্যানক্যানী।

তারপর ক্যারল আমায় বলল, তুমি জেনী সম্বন্ধে যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

আমি বললাম, আর তোমার সম্বন্ধে?

ও মুখ নামাল। দেখলাম বড় বড় চোখের পাতার নীচে জল টলটল করছে।

আস্তে লাজুক গলায় বলল, তাও সত্যি।

www.BanglaBook.org

জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের কষ্টটা ক্যারল এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

আমি বললাম, তুমি লজ্জিত হচ্ছ কেন? ভালোবেসে কি সবাই কাঁদতে পারে? যে পারল না সে তো ভালোবাসার স্বর্গীয় আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হল।

বলেই আমি একটা উর্দু শায়েরী আউড়ে দিলাম।

'ঈ ঈশক্ নহী হ্যায়, ঈয়ে এক আগকা দরীয়া হ্যায়, যিস্‌মে ডুবকে জানা হ্যায়।'

তর্জমা করে শোনাতেই ওরা উহু উহু করে উঠল।

অন্য সকলে ডিনার খেয়ে উঠে চলে গেল।

ওরা আমাকে ছাড়ল না। বলল, বোসো বোসো, তোমার সঙ্গে অলাপ হয়ে এত খুশী হলাম আমরা। যে ক'দিন আছি তোমার সঙ্গ ছাড়ছি নে।

তারপর ক্যারল বলল, তুমি কি কর?

আমি বললাম, আমি একজন লেখক।

ইংরিজীতে লেখ?

না, বাংলায়। আমার মাতৃভাষায়।

জেনী বলল, ক্যারল খুব সাবধানে থাকিস। লেখকেরা শুধু ফেসরিডারই নয়। কখন কার সম্বন্ধে লিখে দেবে, কাকে গাছে চড়াবে, কার খই কেড়ে নেবে বিশ্বাস নেই।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম জেনীর কথায়।

ওদের সঙ্গে সেদিন নানারকম গল্প হল। ভারী ভালো, সভ্য শিক্ষিত মেয়ে দুটি। অস্ট্রেলিয়ান।

আমাকে লেখক পেয়ে ওরা যে কত রকমের প্রশ্ন করতে লাগল আমায় সে বলার নয়। কখন লেখো? প্লট আগে ভাবো না লিখতে লিখতে ভাবো? লেখার মধ্যে তুমি নিজে ছড়িয়ে থাকো না সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকো? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেনী বলল, উঃ আর গড।

আমি শুধোলাম, কেন?

ও বলল, এসে অবধি আমার মাকে একটা এয়ার-লেটার লিখে উঠতে পারিনি। এক পাতা লিখতে গায়ে জ্বর আসে। আর তোমরা কি করে এত এত পাতা লেখ জানি না। এ ভগবানসুলভ ব্যাপার।

ক্যারল বলল বাঃ, উনি কি আর হাতে লেখেন, নিশ্চয়ই টাইপ করেন বা ডিকটেশান দেন।

আমি বললাম, না। বাংলা লেখা হাতেই লিখতে হয়। প্রায় সব লেখকই তাই লেখেন।

পরদিন ভোরে বেরিয়ে আমরা লেক ব্রেঞ্জ-এর পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম। পথের ডানদিক দিয়ে একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছিল। এই ঝরণাটাই আয়তনে বেড়ে পরে সীন নদী হয়েছে—ফ্রান্সের। একথা নিশ্চয়ই সকলেই জানেন যে, ইয়োরোপের বেশীর ভাগ নদীই সুইট্‌জারল্যাণ্ডের উঁচু পাহাড় শ্রেণীতে জন্মেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে দেখতে আমরা ব্রুনিগ পাস পেরিয়ে এলাম। এই পাসটি মাত্র দু হাজার ফিট উঁচু। তারপর বিকেল নাগাদ পৌঁছলাম এসে পিঁও পাসে। এই পাসটি ইয়োরোপের পাসগুলির মধ্যে রীতিমত উঁচু পাস। ছ হাজার ফিট। পিঁও পাসে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই বরফ পড়ছিল। যতই উপরে উঠছিলাম ততই বরফ পড়ছিল। বরফে বরফে পথ ঘাট মাঠ প্রান্তর বাড়ির ছাদ, টেলিগ্রাফের পোল সব সাদা দাড়িগোঁফওয়ালা হয়ে উঠেছিল। পাহাড়গুলোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাদায় সাদা। এরা যে অন্য কোনো রঙের ছিল কখনো তা বোঝার উপায় নেই আর এখন। পথটাও বরফে ঢাকা ছিল, শুধু গাড়ি চলাচলের জায়গাটা পরিষ্কার। যেহেতু তখনও বরফ পড়ছিল, আশপাশ বা পথ তখনো কাদা হয়ে যায়নি। বরফ পড়া দেখতে যেমন সুন্দর, বরফ-গলা তেমনই অসুন্দর। কাদা প্যাচ্-প্যাচ্ গা-ঘিনঘিনে একটা অনুভূতি।

ঠিক পাসের উপরের মালভূমিতে একটা রেস্তোরাঁ, স্কী ক্লাব। স্কী-লিফ্‌ট্ চলে গেছে পথের মাথার উপর দিয়ে দূরের পাহাড়ে। লিফ্‌টে-এ বসে খেলাশেষের পরিশ্রান্ত লোকেরা রঙীন পোশাকের কলার তুলে ফিরে আসছে। যাচ্ছে, কফি বা ব্রাণ্ডি খেয়ে গা-গরম করা টাটকা মানুষের দল। ছেলেমেয়ে সকলে। এই অঞ্চলটা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অন্যান্য বহু জায়গার মত স্কীইং-এর স্বর্গ। পিঁও পাসের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই যে তা অনেকেই হয়ত জানেন না। কিছু লোক জার্মান বলে, কিছু ফ্রেঞ্চ। অন্যান্য ভাষাভাষী লোকও যে নেই এমন নয়। আমরা যেদিক থেকে এলাম সেদিকে জার্মানের চল। পিঁও পাস পেরলেই ফ্রেঞ্চই প্রধান ভাষা। এক কথায় বলতে গেলে পিঁও পাস সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভাজক। এখানের রেস্তোরাঁয় চা খেলাম। নাম কল্ দ্যু পিঁও। এক কাপ চায়ের দাম—নিল দেড় সুইস ফ্রাঁ।

পিঁও থেকে নামতে না নামতেই আমরা একেবারে দ্রাক্ষা-দেশে এসে পৌঁছলাম। কি আঙুর কি আঙুর! দুদিকে শুধু আঙুর। ফ্রান্সের সীন নদীর উপত্যকা আঙুর উৎপাদনের জন্যে পৃথিবী-বিখ্যাত। এখনই আঙুর তোলা হবে। থোকা থোকা ঝুলে আছে গাছে গাছে ওপাশের ঢালে এপাশের পাহাড়ী চড়াইয়ে। বেশীর ভাগই সাদা আঙুর। দু থেকে তিন-ফিট উঁচু গাছ সার সার লাগানো। সারা পৃথিবীতে যে ফ্রেঞ্চ কনিয়াক ও ব্রাণ্ডির সমাদর তার অনেকখানি আসে দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে। আঙুর; শুধুই আঙুর, যতদূর চোখ যায়।

বলতে ভুলে গেছিলুম, লাঞ্চ খেয়েছিলাম, ইণ্টারল্যাকেন-এ। পিঁও পাসের অনেক ওপাশে—সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলে। ইণ্টারল্যাকেন জায়গাটি বড় সুন্দর। গ্রামের মধ্যে দিয়ে সুন্দর একটি খাল বয়ে গেছে। অনেক বাড়ি আছে খালের এপার ওপার জুড়ে—মধ্যে পুরনো দিনের কাজ করা কাঠের সাঁকো। অমিত রায় লাবণ্যর কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ। কাঠের লকগেটও আছে গ্রামের মাঝামাঝি। কাঠ খোদাই করে নানারকম মূর্তি বানানো হয়। দোকান আছে সরু পথটার দুপাশে। ট্যুরিস্টরা শপিং করতে

www.BanglaBook.org

নামেন। ভা-ভিন্সির 'দা লাস্ট সাপার'-এর একটি উড-কার্ডিং রাখা ছিল এক দোকানের শো-কেসে। দাম দু হাজার সুইস্ ফ্র্যাঙ্ক। শীত করছিল। দাম দেখে গা গরম হল। গা গরম হওয়ার মতো মূর্তিও ছিল অনেকানেক।

কারুশিল্প; নানা মিডিয়ামে ও নানা বেস-এর ছবি, মৃৎশিল্প; কাঠের কাজ এসব নাকি ফ্রান্সের মত কোথাওই নেই। এমনকি ফ্রান্সকে দূর-ছাই করা ইংরেজরাও একথা স্বীকার করে, শুধু স্বীকার করে তাইই নয় এটা আমাদেরও শিখিয়ে ছিল, এই জ্ঞানটা গিলিয়েছিল ঝিনুকে করে পরাধীনতার শৈশবে। কেন এ বাবদে ফ্রান্সকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছিল ইংরেজরা, তার প্রধান কারণ হিসাবে মনে হয়, অস্বীকার করলে নেটিভ ভারতীয়দের উৎকর্ষের কথাই স্বীকার করতে হত।

ফ্রান্স শিল্প-সংস্কৃতির জাত নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাদের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি হেসে খেলে টেক্কা দিতে পারে। তবে ফ্রান্সের ভালত্ব এইখানে যে, ওরা নিজেরা গুণী বলে হয়ত আমাদের এ বাবদের গুণের কদর কিছুটা করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে গ্রামে জঙ্গলের আদিবাসীদের বাড়ির দেওয়ালে মুসলমানী আমল ও হিন্দু আমলের বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত শিল্পের যেরকম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা অন্য যে-কোন দেশেরই ঈর্ষার কারণ।

আমরা প্রতীচ্যের লোক বলেই হয়তো আমাদের রুচিটা অন্যরকম। রঙের প্রতি আকর্ষণ; রঙ-বাছাই; ফর্ম; একস্প্রেশন এ সবই আমাদের আলাদা ওদের থেকে। যে কারণে, ধরা যাক কাজাখিস্থানের কনসেপ্ট অফ বিউটির সঙ্গে আমাদের কনসেপ্ট যতটা মেলে ততটা হয়তো ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান কনসেপ্টের সঙ্গে মেলে না।

সাহস করে একটা কথা বলেই ফেলি। ধরা যাক পাবলো পিকাসোর কথা। স্পেশ্যালাইজড আর্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিবর্জিত এমন কোটি কোটি ভারতীয় আছেন যাঁরা ছবি বোঝেন না, মর্ডান আর্ট তো বোঝেনই না, তাঁদের কাছে পিকাসো নিশ্চয়ই একটি না-ভাল-লেগে বিস্মিত হবার ব্যাপার। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, শিল্পের এই শাখা সম্বন্ধে কিছু না বুঝেও কিন্তু কোনো ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের কাজ তাঁদের ভালো লাগবে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে কিন্তু এইখানেই সহজাত রুচি, রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি ফ্যাকটরগুলি এসে পড়ে। মডার্ন আর্ট না বুঝেও রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে গতি স্থিতি ভবিষ্যৎ বিস্মৃতি ও বক্তব্য মিশিয়ে যে ছবি তৈরী করেন ভারতীয় শিল্পীরা তা ভারতীয়দের অধিকাংশরই ভালো লাগে। রঙের ভালোলাগার জন্যে। যে কারণে জাপানী চিত্রকরদের ওয়াশের কাজ একজন গড়পড়তা ভারতীয়র যতখানি ভালো লাগে ততখানি ইয়োরোপীয় মডার্ন আর্ট হয়তো লাগে না। ইউরোপীয় যে আর্টের প্রতি ভারতীয়দের সহজাত দুর্বলতা তাতে রঙের আধিপত্য একটা বড় ব্যাপার। যে কারণে ইয়োরোপীয় ইম্প্রেসনিস্ট আর্টিস্টরা একজন ভারতীয়র কাছে জনপ্রিয়। প্রথমত তাঁদের ছবি বোঝা সাধারণের পক্ষে সহজ, দ্বিতীয়ত রঙের প্রয়োগ ও সাযুজ্য ভালো লাগে বলে।

www.BanglaBook.org

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ভ্যান গগ এবং গঁগা। এঁদের ছবির সহজ বোধগম্যতা এবং রঙের প্রাণবন্ততা সাধারণ আমাদের কাছে খুব সহজে মন কাড়ে।

যাকগে নিজের এক্তিয়ার ও জ্ঞানবহির্ভূত জলে বেশীক্ষণ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিদগ্ধ সমালোচক ও প্রফেসনাল নিন্দুকদের জোঁক ও সাপ থাকে সে জলে। যা বলছিলাম, তাই বলি।

ইন্টারল্যাকেনে যে রেস্তোরাঁটাতে আমরা খেলাম তার সামনে দিয়েই সেই খালটি বয়ে গেছে। আমি বলছি খাল; সেটা হয়তো নদী। কি নদী খেয়াল করে জিজ্ঞেস করিনি। নানারকম হাঁস, গাডওয়াল, পোচার্ড, পিনটেল, সাইবেরীয়ান ও অস্ট্রেলিয়ান রাজহাঁস ইত্যাদি ভেসে বেড়াচ্ছে তাতে। আমার নতুন অ্যাডমায়াররা জেনী ও ক্যারল জোর করে ছবি তুলল আমার সঙ্গে খাল পাড়ে। ছবিগুলো পরে দেশে ফিরে পাই। খুব ভালো উঠেছিল ওদের ছবি। কারণ, ওরা দেখতে ভাল।

কাঠ-খোদাই-করা নানারকম মূর্তির দোকান ছাড়াও অন্য নানারকম জিনিসের দোকান ছিল ইন্টারল্যাকেনে। সুইস্ চকোলেটের দোকান ; স্কীয়িং আউটফিট্, ঘড়ি, গ্রাণ্ডফাদার ক্লক থেকে ক্ষুদে রিস্ট-ওয়াচ পর্যন্ত। দেখলাম, যাঁরা এখনও কেনেননি তাঁরাও একটি করে কুক্কু-ওয়ালক্লক কিনলেন। প্রতি প্রহরে মুরগী বা অন্য পাখি মাথা ঝাঁকিয়ে যেসব ঘড়িতে প্রহর ঘোষণা করে সেই ঘড়ি। এ ঘড়ি একটা করে কিনে নিয়ে যাওয়া নাকি সুইট্জারল্যাণ্ডে আসার প্রমাণ। আমার প্রমাণ? কোনো প্রমাণ রইল না। ভাগ্যিস ক্যারল আর জেনী অন্য কো-ট্রাভেলারকে ধরে ছবি তুলিয়েছিল। ইলেকট্রনিক্স ইণ্ডাস্ট্রিতে এরা প্রচণ্ড এগিয়ে গেছে। অবশ্য পরে জাপানে গিয়ে বুঝেছিলাম যে এরা কিছুই এগোয়নি।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যের মুখে আমরা লেক জেনেভার পাশে এসে পড়লাম। ম্লান সূর্যটা তখন লেক জেনেভার জলে ডুবছিল লালিমার ম্লানিমায় জল ভরে দিয়ে। লেক জেনেভা পঞ্চাশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া। এরই এক প্রান্তে জেনেভা অন্য প্রান্তে জুরিখ্।

আমরা জেনেভার কাছে একটা ছোট হোটেলে থাকব। শহরে ঢোকার আগে বাঁদিকে জলের মধ্যে ঐতিহাসিক সিঁওর জেলখানা। পাথরের তৈরি। আপনারা যাঁরা বায়রনের 'প্রিজনার অফ সিঁও' পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে। অবশ্য বায়রনের এই বিখ্যাত কবিতাটিতে সত্যের অপলাপ আছে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে কাব্যর প্রায়শই মিল থাকে না। সত্যর সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধেও যে কাব্য তার নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এমনকি সত্যকে মিথ্যায় পর্যন্ত পর্যবসিত করতে পারে এই কবিতাটি তার প্রমাণ। অথচ যাঁরা বনিভার্ডের এই বন্দীদশার পটভূমি না জানেন এবং বন্দীদশা সম্বন্ধেও না জানেন তাঁদের মধ্যে এই কবিতাটিতে বর্ণিত কথাগুলিই সত্য হয়ে থাকবে।

স্যাভয়ের ডিউক চার্লসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে চতুর্থ চার্লস এই কারাগারে চার বছর বনিভার্ডকে বন্দী করে রেখেছিলেন। ১৫৩২ থেকে ১৫৩৬ অবধি। কবিতাটিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার কথা লেখা আছে। কিন্তু আসলে বনি মোটেই শৃঙ্খলাবদ্ধ

www.BanglaBook.org

ছিলেন না। তিনি দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতেন। এমনই বেড়িয়েছিলেন ঐ চার বছরে দুর্গের ভিতরে যে, পাথরের উপরে তাঁর চলাচলের পথ চিহ্ন তৈরি হয়ে গেছিল।

আজ রাতে আমার ভাগে যে ঘরটি পড়েছিল সেটা ভারী ভালো। একটা ছোট্ট ব্যালকনী, দোতলার উপরে। লতানো গোলাপ বেয়ে উঠেছে সে পর্যন্ত। দরজা খুলে ব্যালকনীতে দাঁড়ালেই সামনে লেক জেনেভা বহু দূর অবধি। হোটেলটা একটা পাহাড়ের উপর। সে কারণে, দোতলা হলেও মনে হচ্ছে যেন কত উঁচুতে।

রাতের আলো জ্বলে উঠেছে চারিদিকে। নীল জলে রঙীন আলোর সব প্রতিফলন পড়েছে। মাইলখানেক গিয়ে লেকটা একটা বাঁক নিয়েছে সামান্য। যত দূর চোখ যায় শুধু নীল রাতের জলে বিচিত্র রঙের প্রতিফলন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে বা চেয়ার টেনে বসতে ভালো লাগে খুব। কিন্তু বেশীক্ষণ বসা যায় না ঠাণ্ডার জন্যে।

একটা ভালো লটারী পেলে মন্দ হত না। অবশ্য লটারীর টাকা বিদেশে নেওয়া যেত না। যাই-ই হোক, যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে বেশ বড়লোক হওয়া যেত তাহলে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বা অস্ট্রিয়ায় এরকম কোনো ছোট নিরুপদ্রব হোটেলে অথবা একটা কটেজ নিয়ে থাকতাম, বেড়াতাম ; লিখতাম। কী সুন্দর জায়গা!

কিন্তু আমার দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্যে কখনোই বিদেশে আসতে চাই না আমি। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" সত্যিই কোথায় এমন দেশ? এমন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি, এমন ঘন-ঘোর বরষা, এমন মিষ্টি নরম বিড়ালছানার মতো লঘু-পায়ের শীত, এমন মহুয়ার গন্ধ-ভরা বসন্ত, এমন শিউলি-ফোটা শরৎ, এমন বিষণ্ণ হেমন্ত তো আর কারো নেই। আর কারো নেই এত বৈচিত্র্যও। কবে যে আমাদের দেশকে যথার্থ সম্মান দিতে পারব, কবে যে ভালোবাসতে পারব তা জানি না। আজও আমরা নিজেদের এবং নিজেদের দেশকে চিনলাম না বলে বড় দুঃখ হয়।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল। নীচে নেমে ডাইনিং রুমে গেলাম। ইয়োরোপের সব জায়গাতেই ইংরেজ মহিলাদের জন্যে মনে বড় কষ্ট বোধ হয়েছে। এদের সঙ্গে আমাদের মা-মাসীদের সঙ্গে এক বাবদে বড় একটা মিল আছে। প্রথমত, তাঁরা খাওয়ার পর অথবা সঙ্গে জল চান, দ্বিতীয়ত, সন্তান-সন্ততি যতই খারাপ হোক না কেন তাঁদের সর্বদা গুণগান করেন।

খেতে বসে প্রায়ই এরকম হত। বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলারা জল জল করে চাতক পাখির মতো চেঁচাতেন আর জার্মান অথবা ফ্রেঞ্চ স্টুয়ার্ড বা ওয়েটাররা 'সরী' অথবা 'মেরসী' বলে ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যেত।

ছোটবেলায় বয়স্কাউটে শিখেছিলাম দিনে কোনো না কোনো স্বার্থহীন কাজ বা উপকার কোরো কারো-না-কারো। হঠাৎ শুভবুদ্ধি জেগে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সোজা প্যানট্রিতে ঢুকে পাঁচ-ছ গ্লাস জল নিয়ে ট্রেতে বসিয়ে মহিলাদের দিলাম। তাঁদের সকলেরই বয়স ষাটের উপর। জল পেয়ে তাঁরা একেবারে পাখী সব কলরবের মত কলকল করে

www.BanglaBook.org

উঠলেন। একজন ঠাকুমার বয়সী মহিলা তো এঁটো মুখে একটা চুমু খেয়েই বসলেন আমার গালে। সকলেই বললেন, তুমি আমাদের এত দেখাশোনা করছ কেন? তখন থেকেই দেখছি যে, তুমি অন্যদের মত নও।

আমি বললাম, আমাদের দেশে সব ছেলেই মা-মাসীর দেখাশোনা এমন করেই করে। বেশী কি আর করলাম।

একজন বললেন, আহা! সকলের ছেলে যদি এ রকম হত। তুমি আমার নিজের ছেলের চেয়েও বেশী।

এ কথার জন্যে তৈরি ছিলাম না। কারণ এই মহিলাই কাল ডিনারের পর অন্য মহিলাদের সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন আমি পাশের সোফায় বসে ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছিলাম। উনি বলছিলেন, আমার ছেলের মত ছেলে হয় না, কারণ ওর ওয়েডিং-অ্যানিভারসারির সময় প্রত্যেকবার আমাকে নিয়ে যায় নটিংহামশায়ারে, বার্মিংহাম থেকে। প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে একটা চিঠি লেখে—ক্রিসমাসের সময় প্রত্যেকবার দামী দামী উপহার পাঠায় আর বার্মিংহামের ধারে-কাছে কোথাও কাজে এলেই নিশ্চয়ই দেখা করে যায় আমার সঙ্গে—আমার রান্না ক্যাবেজ স্যুপ সে খেয়ে যাবেই যাবে। সে নাকি বলে যে, তোমার হাতের স্যুপ পেলে আমি হিল্টানের রান্নাও ফেলে দিতে পারি।

আসলে ওদেশী মায়েদের প্রত্যাশা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাছে এতই কম যে, ছেলেমেয়েরা একটু কিছু করলেই তাঁরা বড় মুখ করে সবাইকে বলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মিসেস ফিনিগান, সেই চুমু-খাওয়া বৃদ্ধা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে আমার জন্যে এক বোতল ওয়াইন অর্ডার করলেন। আমি আপত্তি করাতে বললেন, আচ্ছা! আমিও খাব তোমার সঙ্গে একটু।

তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, আমাকে তোমার মায়ের কথা বলো। কেমন দেখতে উনি, তুমি কি কর ওঁর জন্যে?

আমি লজ্জায় পড়লাম।

বললাম, আমার মা খুব সুন্দরী, ভারি ভালো, মায়ের কি আর ভালো-মন্দ হয় ; মা, মাই-ই। তবে করতে কিছুই পারি না মায়ের জন্যে—করা যাকে বলে।

উনি বললেন, মায়ের জন্যে করা বলতে তুমি কি বোঝো?

আমি বললাম, আমি একা নই, আমাদের দেশে মায়ের জন্যে করা বলতে সকলে এক কথাই বোঝে। মায়ের দেখাশোনা, দায়িত্ব নেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কোনো ছেলে বড় হতে পারে না। যে ছেলে মা-বাবাকে না দেখে তার জীবনে কিছু হয় না।

মিসেস ফিনিগান তারপর বললেন, কিছু হওয়া বলতে তোমরা কি বোঝো? টাকা রোজগার করা?

আমি বললাম, না, তা নয়।

www.BanglaBook.org

সৌভাগ্যবশত আমরা এখনও টাকা রোজগারের ক্ষমতার সঙ্গে মনুষ্যত্বকে মিশিয়ে ফেলিনি পুরোপুরি। মিশে যে যায়নি তা বলব না, তবু এখনও এই অন্যায় বোধটা আমাদের পীড়িত করে।

উনি বললেন, তুমি মায়ের জন্যে কিছুই করতে পারো না বললে এর মানে কি?

আমি বললাম, এই করতে পারাটা টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে কিছু করতে পারিনি তা বলব না কিন্তু যা পেলে মা খুশী হতেন, রোজ একটু কাছে বসা, একটু কথা বলা, কখনো-সখনো তীর্থ করতে বা বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এসব প্রায় কিছুই করতে পারিনি।

পারোনি কেন?

সময়ের অভাবের জন্যে। আমার অবকাশ বলে কোনো কিছু নেই। সময়ের অভাব ছাড়া জীবনে অন্য কোনো অভাব আমার নেই। সেইজন্যেই মায়ের জন্য যা করতে পারতাম তা করতে পারিনি।

ওয়াইনের বোতল খুলে দিয়ে গেল বারের মেয়েটি। ভদ্রমহিলা বললেন, শোনো; বলেই আমার হাতে হাত রাখলেন। গলার চামড়া, মুখের চামড়া, লোল হয়ে ঝুলে গেছে। একটা প্রিনটেড ফ্রক পরা, গায়ে একটা গরম বাদামীরঙা চামড়ার বোতামের কার্ডিগান, গলায় ও মাথায় লাল স্কার্ফ বাঁধা। আমার হাতে যখন হাত ছোঁওয়ালেন তখন মনে হল আমি মরা মানুষের ঠাণ্ডা হাতে হাত ছোঁওয়ালাম।

আমি চমকে ওর মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম ওঁর চোখের কোণে জল কিন্তু সে জল যাতে গড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মিসেস ফিনিগান হাসতে গেলেন, কিন্তু কান্না চাপবার চেষ্টায় সে হাসিটা বড় করুণ দেখাল।

উনি বললেন, তোমাদের দেশে যাইনি কখনও, তোমরা আমাদের তাঁবে ছিলে বহুদিন। কিন্তু তোমাদের দেশ আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বড়। তোমরাই একদিন আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে, দেখে নিও। তুমি দেখো, তোমরা যা জানো, তাই-ই সত্যি। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কারো কিছু হয় না। আমরা বড় বঞ্চিত জাত। আমরা নিজেরা পাইনি তোমরা যা পেয়েছো তোমাদের মায়েদের কাছ থেকে, আমরা তাই দিতেও পারিনি আমাদের ছেলেমেয়েদের তেমন করে।

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, এটা ঠিক না। সমস্ত দেশের সামাজিক জীবন আলাদা আলাদা, সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক মান ও জীবনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ওভাবে বললে ঠিক বলা হয় না। আমাদেরও অনেক দোষ আছে এবং আমাদের মধ্যে সকলেই যে মাতৃভক্ত এমন নয়। আমার কথা বলতে পারি আমি।

উনি বললেন, না। আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি যে তোমাদের দেশে মা-ছেলের সম্পর্ক কেমন।

www.BanglaBook.org

আমি দেখলাম, এ আলোচনা ও এ প্রসঙ্গ অনেকক্ষণ চলতে পারে। তাছাড়া মিসেস ফিনিগান যেমন এমোশনালী ইনভলভড্ হয়ে পড়েছেন এই আলোচনায়, এর জের বেশীক্ষণ না টানাই ভাল।

ওয়াইন শেষ হতেই আমি উঠে পড়লাম। বললাম, আমার কিছু কাচাকাচি করতে হবে—কাল ভোরে তো আমরা প্যারিসের দিকে রওয়ানা হব, তাই না?

উনি দুঃখিত হলেন। আমিও হলাম। হয়তো এই ওয়াইনের দাম দিলেন উনি অনিচ্ছুক ছেলের পাঠানো সাহায্যের সামান্য অঙ্ক থেকে—যে-টাকায় ভালোবাসা জড়ানো নেই, আছে শুধু বিরক্তিময় কর্তব্যের গন্ধ। সে-টাকা যাকে নিরুপায় হয়ে গ্রহণ ও খরচ করতে হয় তার পক্ষে বড় গ্লানি জমে। অসহায়তার গ্লানি। সেই গ্লানির টাকা থেকে সঞ্চিত সামান্য পুঁজি ভেঙে আমাকে উনি ওয়াইন খাওয়ালেন শুধু একটু কাছে বসে গল্প করার জন্যে। যে ছেলের ভালোবাসা তিনি সম্পূর্ণভাবে পাননি অথচ হয়তো চেয়েছিলেন, তার পরিপূরক পুত্রস্থানীয় অন্য একজনকে পেয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ে সন্তানস্নেহ হঠাৎ উথলে উঠেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি কি করতে পারি? নিজের মাকেই সুখী করতে পারিনি যখন তখন অন্যের মাকে দুঃখ না হয় দিলামই।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছিল। মা সবসময় বলতেন, স্নেহ নিম্নগামী! ছেলে মাকে ভালোবাসুক আর নাই-ই বাসুক, মা কি ছেলেকে না ভালোবেসে পারে খোকন?

আজ আমার মা নেই। তাই অন্যের মায়ের কাছে বসে থাকলে আমার চোখও ভিজে ভিজে লাগে। আমাকে দোষী কোরো না, মিসেস ফিনিগান।

BanglaBook.org

ভোরে উঠে প্যারিসের পথে রওয়ানা হলাম।

প্যারিস নামটাতেই উত্তেজনা হয়। আসলে আমাদের মত গরীব-গুর্বোরা যে কনডাকটেড ট্যুর নিয়েছি তাতে কোনো বড় শহরে থাকাই আমাদের ভাগ্যে নেই। কস্‌মস্ কোম্পানী পয়সা বাঁচাবার জন্যে বার্লিন, ম্যুনিখ, জেনেভা ইত্যাদি কোথাওই রাতে রাখেননি। আগেই বলেছি যে, জেনেভা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের এক গ্রামের হোটেলে রাখা হয়েছিল আমাদের। ইনসব্রুকেও তাই।

সমস্ত বড় শহর বর্জন করা হলেও প্যারিসকে বর্জন করা হয়নি। কারণ প্যারিস না দেখলে ইয়োরোপ দেখার মানে নেই কোনো।

পথে একটা টায়ার পাংচার হল। ডিঁজোর আগে। ডিঁজোতে আমরা লাঞ্চ করার জন্যে থামলাম। সেখানেই জ্যাক কারখানায় নিয়ে গিয়ে টায়ার ঠিক করে নিল।

ডিঁজোতে যে লাঞ্চ খেয়েছিলাম অমন অখাদ্য লাঞ্চ আর কোথাওই খাইনি। সার্ভিসও অত্যন্ত খারাপ। ফ্রান্সে ঢুকলেই একটা এলোমেলো অগোছালো ভাব চোখে পড়ে। মনে হয় এখানে শৃঙ্খলাবোধ-টোধ ব্যাপারগুলো বোধহয় ইয়োরোপের অন্যান্য

www.BanglaBook.org

জায়গা থেকে অন্যরকম।

আণ্ডারডান বীফ-স্টেক্ আর ওয়েফার চীপস দিল। সঙ্গে না স্যুপ, না সুইট ডিশ।

প্রসঙ্গত বলি, যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে ; (আমার এ লেখা বিজ্ঞদের জন্যে নয় আগেই বলেছি) যে বীফ স্টেক্ আণ্ডারডান অর্থাৎ কম সিদ্ধই খেতে ভালোবাসে শীতের দেশের লোকেরা। বোধহয় অনেকক্ষণ হজম হতে লাগে, গা গরম থাকে বলে। আমাদের পক্ষে ওয়েল-ডান এমন কি ওভার-ডান সবই শক্ত মনে হয়। গোমাংস বলতে আমাদের ঘেন্নায় গা রি-রি করে বটে কিন্তু ওখানে গোমাংস বড় নরম আর উপাদেয়। লানডানে তো গোমাংসের দাম চিকেন ও পর্কের চেয়েও বেশী।

শুনেছি আমাদের শাস্ত্রেও আছে যে, চিরযুবক থাকার বিচক্ষণ উপায় হচ্ছে কচি বাছুরের মাংস খাঁটি গব্যঘৃত দিয়ে রান্না করে খাওয়া এবং নিজের বয়সের অর্ধেক বয়সের নারীর সঙ্গে সহবাস করা। যৌবন অটুট থাকবেই থাকবে। সেই হিসেবে, তিরিশ বছরের যুবার পনেরো বছরের যুবতীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। পঞ্চাশ বছরের যুবকের পঁচিশ বছরের যুবতীর সঙ্গে। সাধে কি আমাদের যৌবন এত দ্রুত পালিয়ে যায়! শাস্ত্রমতানুসারে ক্রিয়াকর্ম করা হয় না বলেই তো সকলের এই অবস্থা। এবং আমাদের যৌবনও ভবিষ্যতে দ্রুত কর্পূরের মত উবে যাবে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডিঁজোতে একটা মজার ব্যাপার হলো। ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে যে কী ভাব, ওদের মধ্যে থেকে তা দেখতে হয়। লাঞ্চের পর পুরুষদের ল্যাভাটরীতে গিয়ে দেখি সেখানে দরজা নেই। ওয়েস্ট-কোট সাইজের একটা সুইং-ডোর লাগানো—তার নীচে দিয়ে ও সুইং-ডোর ঠেললেই সারি সারি ইউরিনাল দেখা যাচ্ছে। আর ঠিক তার বিপরীতে মেয়েদের ঘর।

বিল, প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সুইং-ডোরটার দিকে চেয়ে বলল, উ্য নো উই আর ইন ফ্রান্স নাউ। দেয়ার কাণ্ট্রী এনি মিস্টেক বাউট দ্যাট্।

সত্যি! ঐ ব্যাপারটা কোথাও দেখিনি। অস্বস্তিকর তো বটেই। মেয়েরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শুধু অস্বস্তিকর নয়, লজ্জাকরও বটে। অন্তত আমার তাই-ই মনে হলো।

ডিঁজোর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা আবার এগোলাম। হাইওয়ে দিয়ে। বিকেল হয়ে গেল। প্যারিসের আর বেশী দেরী নেই। দূরে ডানদিকে ওর্লি এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। লানডানের হিথ্রোর মতই নামকরা প্যারিসের ওর্লি। কিন্তু আরো একটি বড় ও নতুন এয়ারপোর্ট হয়েছে। চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট। কিন্তু এই এয়ারপোর্টটি প্যারিস শহর থেকে দূরে বলে এখনও তেমন জমজমাট হয়নি।

সামনে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিস প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে লুমিনাস লাল দিয়ে ডেঞ্জার লেখা প্লাস্টিকের সাইন পথের বাঁ-পাশে রেখে গেছে। তাই দেখে সব গাড়ি আস্তে করছে গতি। অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সামান্য আগে।

বিদেশের হাইওয়েতে যখনি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখনই তা হয় মাল্টিপল্ অ্যাক্সিডেন্ট।

www.BanglaBook.org

অনেকগুলো গাড়ি একে অন্যের ঘাড়ে উঠে যায় গতি সামলাতে না পেরে। এই অ্যাক্সিডেন্টে তিনটি গাড়ি জড়িয়ে পড়েছিল।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সামান্য আগে, ইতিমধ্যে পুলিস এসেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসেছে, আহত যাত্রী ও চালকরা পৌঁছে গেছে হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিসের গাড়ি। আরো দু-তিনটে পুলিসের গাড়ি আরো দু-দিকের রাস্তার মধ্যের পথে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিসের গাড়ি মানে ভ্যান নয়। বিরাট বিরাট মোটর গাড়ি। এক একটা গাড়িতে একজন অথবা দুজন করে পুলিস থাকে। উপরে লাল-আলো ঘোরে, সাইরেন ফিট করা থাকে গাড়িতে। ওয়ারলেস থাকে। ওয়াকি-টকি থাকে।

কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে পুলিস অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি যে কত তাড়াতাড়ি এসে পড়ে এবং সবকিছুর বন্দোবস্ত করে তা বলার নয়। আমাদের দেশে নিজের কাজ এখনও যত না আমরা করি ভলান্টিয়ারিং করে পরের ব্যাপারে দৌড়ে যাই তার চেয়ে বেশী। কিন্তু ওখানে সমস্ত সামাজিক দায়িত্বগুলো অত্যন্ত স্পেশালাইজড হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একটা হৃদয়হীনতা অথবা হৃদয়বত্তার ব্যাপার আছে। যে যেমন ভাবে দেখবেন। পথের পাশে গাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ পড়ে আছে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার হলে ওরা যাবে কি যাবে না, জানি না। কেউ যাবে, কেউ যাবে না। তবে খামোকা মজা দেখতে ভীড় বাড়াতে আর উহু-আহা করতে হাজার লোক জমায়েত হয়ে পুলিস আর অ্যাম্বুলেন্সের কাজের বিঘ্ন ঘটাবে না। ঘটাবে না প্রথম, এই কারণে যে, ওরা প্রত্যেকে বড় খন্ধ জীবন-যাপন করে, এবং দ্বিতীয়ত, ওদের প্রত্যেকের সময়ের দাম আছে।

প্যারিসে ঢুকে মনে হয় কলকাতায় ঢুকলাম। মানে মেজাজের ব্যাপারে। অড্ডা-গুলতানী, সিনেমা, থিয়েটারের লাইন, বেপরোয়া এবং আইনকে থোড়াই-কেয়ার করে এমন গাড়ি চালানো ইয়োরোপের কোথাওই দেখা যায় না। ইয়োরোপের কোনো বড় শহরের পথঘাটে এমন আকছার আবর্জনা ও কাগজপত্র পড়ে থাকে না। কোনো শহরই রাতে আর দিনে এমন করে জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে না।

যে কদিন প্যারিসে ছিলাম, যদিও অত্যন্ত সামান্য দিন, কিন্তু সে কদিনে এ কথাই মনে হয়েছে বার বার যে প্যারিসের সঙ্গে কলকাতার কোথায় যেন একটা দারুণ আত্মিক যোগ আছে। মানসিকতার দিক দিয়ে, সাহিত্যরসের ব্যাপারে, শিল্পকলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যর ব্যাপারে এবং কুঁড়েমি, আড্ডা ও বৈষয়িক ব্যাপারকে আপেক্ষিক কম গুরুত্ব দেওয়ার বাবদে এই দুই শহর বলতে গেলে যমজ বোন। সিনেমার টিকিটের লাইনে মারামারি প্যারিস ছাড়া কোনো ইয়োরোপীয় শহরে এমন আকছার দেখা যায় না।

প্যারিসের সাঁসে-লিজায় যেখানে সেরেমোনিয়াল প্যারেড হয় উৎসবে-টুৎসবে, দ্য গল স্কোয়ারে যেমন বেহিসাবী ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে গাড়ি চালানো হয়, কোথাওই বোধহয় হয় না। আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গীর কথা মনে পড়ে। উপমাটা অবশ্য সমুদ্রের সঙ্গে ডোবার হলো—আয়তনের দিক দিয়ে।

www.BanglaBook.org

রাত ন'টায় আমরা প্যারিসের একেবারে বুকে কোরকে এসে পৌঁছলাম।

সেণ্ট মার্টিন ক্যানাল বরাবর আমরা এগিয়ে গেলাম। প্যারিসের শহর সীমা নির্ধারণ করে একটা সার্কুলার রাস্তা আছে। আগে একটা দেওয়ালও ছিল। এখন দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েছে। প্যারিসে প্রচুর পাথরের রাস্তা আছে, মানে যাকে কবলড্ রোড বলে। আজকালকার দিনে কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের মত এমন রাস্তা সচরাচর কোনো বড় শহরে দেখা যায় না। আগে যখন ঘোড়ার গাড়িই প্রধান বাহন ছিল মানুষের তখন অবশ্য সব জায়গাতেই এই রকম রাস্তাই ছিল। কংক্রীট ঢালাই করা বোধহয় মানুষ তখনও শেখেনি। অত পুরনো রাস্তা কিন্তু তার অবস্থা আশ্চর্যজনক ভালো দেখে বিস্মিত হতে হয়।

সীন নদীর ধারে একটা সরু গলিতে হোটেল অ্যাভিয়েটর বলে একটা ছোট হোটেলে এসে উঠলাম আমরা। অনেক তলা হোটেল, কিন্তু লিফ্‌ট নেই। সরু সিঁড়ি। শুধু ঘর ভাড়া দেয় এরা আর ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত আছে। খাওয়া-দাওয়া নেই। বার আছে অবশ্যই। প্যারিসের হোটেল অথচ বার নেই, ভাবা যায় না।

ঘরে ঢুকেই যা প্রথমে চোখ পড়ল বাথরুমে, তা 'বিদে'। ফরাসীরাই এর প্রথম আবিষ্কর্তা। বিদে এখন এদেশেও তৈরী হচ্ছে। আপনারা অনেকেই হয়তো ফাইভস্টার হোটেলের বাথরুমে ঢুকে একটা অদ্ভুত দর্শন কমোডের মত ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে যান—জিনিসটা কি অনেকেই তা জানেন না। বিদে শুধুমাত্র মেয়েদের ব্যবহারের জন্য। মেয়েদের ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারে বিদে বিশেষ সুবিধাজনক। ফরাসীরা যে অত্যন্ত শিক্ষিত জাত তা মেয়েদের সুখ-সুবিধে নিয়ে তাদের বহুকাল আগে থেকে এই ভাবনা সেটাই প্রমাণ করে।

পাছে অশিক্ষিত ইংরেজ পুরুষ বিদে নিয়ে কি করবে ভেবে না পান, তাই তাদের জ্ঞাতার্থে বিদের ওপর ইংরিজীতে লেখা আছে 'দিস ইস ফর দ্যা ইউজ অফ লেডিজ ওনলি। ইট ইজ নট আ কমোড আইদার।'

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ইলুমিনেশন্ ট্যুরে বেড়ানো গেল। প্যারিসের রাত সত্যিই দেখার মত। দিনটাই রাত কি রাতটাই দিন বোঝা মুশকিল। বার রেস্তোরাঁ কাফে সিনেমা নাইট ক্লাব থিয়েটার ইত্যাদি আরো কত কিছু জয়েণ্ট আলোয় আলোময়।

এই কনডাক্‌টেড ট্যুরের শহর দেখা আমার মোটেই ভালো লাগে না। ন্যাশানাল পার্কে জানোয়ার দেখার মত বাসের মধ্যে বসে পূর্ব নির্ধারিত ও পূর্ব নির্দিষ্ট পথে পথে ঘুরে ঘুরে গাইডের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে শহর দেখা বা চেনাতে কেমন ঠাকুর্দার হাত ধরে নাতির বেড়াতে বেড়ানোর গন্ধও আছে। একা একা মনমৌজী বেড়ানোতে যে আনন্দ তা দলবদ্ধ পূর্ব নির্ধারিত বেড়ানোর আরামে নেই।

অবশ্য দুঃখও আছে। পরদিন বুঝেছিলাম।

সাঁসে-লিঁজায় আবারও গেলাম। রাতের অন্ধকারের বুক চিরে হাজার হাজার সারি

www.BanglaBook.org

সারি গাড়ির হেডলাইট আলোয় আলোকিত করে ছুটে আসছে একদিক থেকে আর সারি সারি নরম লাল টেইল-লাইট সুন্দর এক দিগন্ত বিস্তৃত লালের প্যাটার্ন গড়ে চলে যাচ্ছে। সাঁসে-লিঁজার মত চওড়া ও বহু লেন-বিশিষ্ট পথ পৃথিবীর খুব বেশী জায়গায় নেই।

কথাবার্তায় যা জানা গেল তাতে ফরাসীরাও যে আমাদের মত হিরো-ওরশিপিং-এর জাত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। হয়তো এর কারণটা এই-ই যে দু জাতই বড় ভাবপ্রবণ। কাউকে মইয়ে চড়াতেও দেরী হয় না, মই সরিয়ে নিতেও না। তবে যখনই যা করে তা প্রবল আন্তরিকতা ও উৎসাহর সঙ্গে। মইয়ে চড়িয়ে ওপরে তুলে তারপর মই যথাস্থানে যাদের বেলা এরা সসম্মানে রেখেছে তা এ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ও দ্য গলের বেলায়। মনে হয় এদের রাজনৈতিক মনোজগতে খুব রঙীন চকমপ্রদ স্বদেশীয়তায় বিশ্বাসী ও চটকদার লোক ছাড়া কেউ তেমন দাগ কাটে না। নইলে নেপোলিয়নের পর এত নেতা এসেছেন গেছেন কিন্তু দ্য গলকে যে সম্মানের আসনে ফ্রান্স বসিয়েছে তেমন সম্মান খুব কম লোকের জন্যেই জুটেছে। নেপোলিয়নের পরই বেবাক সমুদ্দুর। পরের দ্বীপ দ্যা-গল। আলী সাহেবের ভাষায় বললাম।

সারা শহর ঘুরে দেখতে দেখতে রাত হল অনেক। আগামীকাল আমাদের নাইট ক্লাব ট্যুর। ক্যান্-ক্যান্ ডান্স, শ্যাম্পেন খাওয়া—পৃথিবীবিখ্যাত প্যারিসিয়ান নাইট ক্লাবের নাচ-গান। সকালে কোনো প্রোগ্রাম নেই যূথবদ্ধতার। এইটে ভেবেই ভালো লাগতে লাগল। দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা যাবে বহুদিন পর। ঘুম ভাঙার পরও কিছুক্ষণ আলস্যে শুয়ে থেকে কিছু ভাবা যাবে। তারপর নিজের ইচ্ছে মত ঘুরে-ঘারে দেখা যাবে শহরটাকে। রোদঢাকা পথে ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে কফি খাওয়া যাবে বা ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। তাড়া নেই কোনো, ব্যস্ততা নেই। দ্রুতধাবমান বাস থেকে দেখা প্যারিস সর্বদা অপসৃয়মান। কাল সকালে মগজের মধ্যে চোখের লেন্সে তোলা ছবি ডেভেলাপ করে নেওয়া যাবে ধীরে সুস্থে। ভেবেই ভালো লাগছে।

কাল বিকেলে একটা ট্যুর অছে শহরের বিভিন্ন জায়গা দেখানোর। সেই ট্যুর শেষ হবে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ। তারপর হোটেলে চেঞ্জ-টেঞ্জ করে সাতটায় এক রেস্তোরাঁতে এসে ডিনার খেয়ে আমরা রাতের টইলে বেরোব।

ইলুমিনেশন্ ট্যুর দেখে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত হল। দেখি অত রাতেও জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে। মুখে চোর-চোর ভাব। মুখ তুলে চাইছে না বিশেষ। এই হোটেলে এসে ওঠার পরই এই জায়গাটার নির্জনতা ও নদীপারের শীতার্ত দৈন্য দেখে মনে হয়েছিল এটা একটু অন্য রকম জায়গা।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে জেনী বলল, আই ফিল ব্যাড। দিস সিটি ইজ ভেরী নটি। আইল ফিল লাইক মেকিং লাভ টু সামওয়ান টু নাইট।

আমি হেসে মাঝ-সিঁড়িতে বাও করে বললাম, মে মাই? ড্যু নটি গার্ল?

www.BanglaBook.org

ক্যারল আমাকে ও জেনীকে ওর সুন্দর নরম হাত দিয়ে দুই চাঁটি মারল।

তারপর আমাকে বলল, আমার প্রথম নামে ডেকে, ডিয়ার ডিয়ার তুমি আমার সঙ্গ চাইলে পেতে পারো কিন্তু জেনীর অস্ট্রেলিয়ায় ফেলে আসা বয় ফ্রেন্ডকে তুমি দেখোনি ঃ যে-কোনো প্রাইজ বুলের চেয়েও সে ষণ্ডামার্কা। আর শোয়াশুয়ির ব্যাপার? মাই গুডনেস। ইটস আ ফ্রী ফর অল অ্যাফেয়ার।

তারপর জেনী এগিয়ে গেলে ফিসফিস করে বলল, জেনী ইজ আ সিলী গার্ল আদারওয়াইজ শী ক্যুডন্ট হ্যাভ লাইকড বিল।

আমার ঘুম পেয়েছিল। কে বিল? কার চেহারা প্রাইজ বুলের মত? তখন তা জানার খুব উৎসাহ ছিল না।

আমি বললাম, গুড নাইট। আমি আজ তোমাদের দুজনকে পাশে নিয়ে ঘুমোব। স্বপ্নে।

ক্যারল হো হো করে হেসে উঠল। হাসলে ওকে ভারী সুন্দর দেখায়। এমনিতে।

হাসি থামিয়ে বলল, চমৎকার ব্যবস্থা। দ্যাট উজ স্যুট এভরী ওয়ান ফাইন। ওন্‌ট ইট?

দরজা বন্ধ করে দাঁত মেজে জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম। কাঁচের জানালার ওপাশে রাতের প্যারিস পড়ে রইল। কালো পাথরে বাঁধানো রাস্তা—সীন নদী—নদীর পারের পায়ে চলা পথ। একটু এগিয়ে গিয়েই সেভাস্তেপাল বুলেভার্ড—আলোয় আলোকিত। লোকজন, হৈ হৈ, সিনেমা থিয়েটার কত মজা।

এ রকম ভাবে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ নিজের জন্যে বড় কষ্ট হল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম যে আমি বড় গরীব। এইভাবে ভিখারীর মত সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশ দেখার কোনো মানে হয় না। কলকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়ার গাড়ি ভর্তি লাল নীল শাড়ি পরা দক্ষিণ ভারতীয় যাত্রীরা যখন যাদুঘরের রাস্তা পার হয় তখন আমরা যে-চোখে তাদের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের দিকে প্যারিসের পথের লোকেরা ঠিক সেইভাবে চেয়ে দেখছিল। যে দেশে এসেছি সেই দেশের লোকের মত সচ্ছল না হলে, পকেটে সামান্য উদ্বৃত্ত পয়সা না থাকলে, দেশ বেড়ানোর মত বোকামি আর কিছুই হয় না। আবার কবে আসব কে জানে? আর কি কখনও সুযোগ হবে? কিন্তু যার পকেট ফাঁকা তার পক্ষে কনডাকটেড্ ট্যুরের গাইডের হাত ধরে থাকা ছাড়া উপায় কি?

পরক্ষণেই মনে হল এ বেড়ানোটা কি কিছুই নয়? এ কি নিরর্থক? এত দেশ দেখা, এতজনের সঙ্গে মেশা, এত বিভিন্ন রীতি নীতি আচার-ব্যবহার এত বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কি কিছুই নয়? আর্থিক সাচ্ছল্য থাকলেই যে সব মানুষ সেটাকে সঠিকভাবে চালিত করতে পারে এ কথাও তো ঠিক নয়। তবে আমাকে যদি কেউ প্যারিসে অনেক টাকা দিত, যদি একটা লটারী জিততাম এখানে, তাহলে সকলকে দেখিয়ে দিতাম টাকা কিভাবে খরচ করতে হয়, কত সুন্দরভাবে। খরচ করাটাও একটা মস্ত বড় আর্ট। আমি সে আর্টে আর্টিস্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার টাকা নেই। যাদের টাকা আছে তাদের বেশীর ভাগই টাকার ব্যবহার জানে না।

www.BanglaBook.org

এই অর্থকরী ভাবনাটা সে রাতে প্যারিসের এক দীন হোটেলের ঘরে শুয়ে আমাকে বড় পেয়ে বসেছিল।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। কতদিন পরে যে বেলা সাতটা অবধি ঘুমোলাম তা বলার নয়। বহুদিনের জমা ক্লান্তি যেন ধুয়ে নিল ঘুম।

ধীরে সুস্থে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নীচের ডাইনিং রুমে নেমে ব্রেকফাস্ট করলাম। তারপর পথে বেরোলাম।

একটা ফলের দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যেকটি ফল যে কী সুন্দর করে কাগজে মোড়া তা কি বলব। যে ফল খেয়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায় তা আবার অত কায়দা করে কাগজে মোড়া কেন? ফলের আবার এত আর্টিস্টিক ডেকরেশানের কি দরকার? এরকম কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। এমনকি সবজীর দোকানেও দেখি সেই রকম। কুমড়োর মত একটা ফল, হয়তো কুমড়োই, সাহেবদের দেশে দেখছি বলে কুমড়ো বলে বিশ্বাস হচ্ছে না, তাও কাগজে মোড়া।

এই কারণেই ফ্রান্স অন্য সব জায়গা থেকে আলাদা। স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হবার অনেক কিছু আছে ফ্রান্সের।

আর্ট কি? এ নিয়ে অনেকানেক আলোচনা হয়েছে একাধিক সময়ে বিভিন্ন দেশের একাধিক মনীষীদের দ্বারা। এ বাবদে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে একজন অতিথি জিগ্যেস করেছিলেন, 'আর্টের ব্যাখ্যা আপনার কাছে কি?'

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জানালা দিয়ে ঐ দেখছো রাধু মালী ক্যানেস্তারা করে জল বয়ে আনছে, ক্যানেস্তরার কানা বেয়ে জল উপচে পড়ছে—ঐ হল গিয়ে আর্ট। যে কোনো শিল্পর জন্মই হল সুপারফ্লুয়িটি থেকে। যা প্রয়োজন, তা প্রয়োজনই। প্রয়োজন অতিরিক্তটাই আর্ট। ক্যানেস্তারা ভর্তি হয়েছে বলেই জল চল্‌কে পড়ছে। ভর্তি না থাকলে উপচে পড়ার কথাই উঠতো না।

এই উপমাটা বড় মনে লেগেছিল। কোথায় এই কথোপকথনের কথা পড়েছিলাম তাও মনে নেই, কে এই প্রশ্নকর্তা তাও আজ মনে নেই, অনেক ছোটো বয়সে পড়েছিলাম, কিন্তু পড়েছিলাম যে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের স্মৃতিশক্তি ক্ষুরধার তাঁরা মনে করিয়ে দিলে বাধিত থাকব।

যাই হোক, প্যারিসের সকালে কুমড়োর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই উপমাটা বড় লাগসই বলে মনে হয়েছিল।

অনেক দূরে হেঁটে গেলাম। কোনো গন্তব্য নেই, তাড়া নেই, খাঁটি ট্যুরিস্টের মতো শ্লথ পায়ে উইণ্ডো-শপিং করতে করতে চলেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেভাস্তেপোল বুলেভার্ডে এসে পৌঁছে গেলাম। জমজমাট জায়গা। একটা ওপেন-এয়ার কাফেতে বসে

www.BanglaBook.org

সাদামাটা লাঞ্চ সারলাম এখানেই, অবশ্য অনেক পরে। ভাষাটা প্যারিসে বড় বিপত্তি ঘটায়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার জোরিস ফ্রেঞ্চ নিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে আমার উপর খুব রেগে গেছিলেন। প্যারিসের পথে প্যান্টের দুপকেটে দুহাত গলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেন যে ফ্রেঞ্চটা তখন শিখিনি সে কথা ভেবে আফসোস হচ্ছিল।

আমার সামনে ব্রিজিট বার্দোর মতো দেখতে অবিকল একটি মেয়ে জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পেরোল। বার্দো কি এখন প্যারিসে? কাল রাতে বার্দোর ফ্ল্যাট দেখেছিলাম। গাইড দেখিয়েছিল।

পশ্চিমের দেশের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে। কলকাতার রাস্তায় শবানা আজমী বা অপর্ণা সেন হেঁটে গেলে লোকে কি কাণ্ডটাই না করে। উত্তমকুমার কখনও কি লুঙ্গি পরে জগুবাবুর বাজারে কইমাছ কিনতে পারেন? না। শত ইচ্ছা থাকলেও না। অপর্ণা সেন লাইট হাউসের উল্টোদিকের ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারেন না কখনো, তাঁর যতই লোভ হোক না কেন। কিন্তু প্যারিসের জনবহুল এলাকাতেও বার্দো ইচ্ছে করলে ম্যাগাজিনের দোকান থেকে ম্যাগাজিন কিনতে পারেন। লোকে হাঁ হাঁ করে তাঁর উপর চড়াও হবে না। এর কারণ এখানের সাধারণ লোকও ভাবে আমিই বা কম কেডা?

'আমিও যে কম নয়' এ-কথাটা একজাতের সকলে মিলে ভাবতে পারলে নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটা দেশ মস্ত বড় হয়ে যায়।

লুভ্‌রে দেখার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছা ছিল মালরোর সঙ্গে আলাপ করার। আরো কত কী ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খাঁচার পাখীর স্বাধীনতার ক্ষণ ফুরিয়ে এল। ঘুরে ফিরে, হেঁটে চলে; দুটোর মধ্যে হোটেলে ফিরলাম।

প্যারিসিয়ানরা প্যারিসের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম্ নিয়ে খুব গর্বিত। ওরা টিউব বলে না লানডানের মত, ওরা বলে 'মেট্রো'। এক চক্কর ঘুরে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মর্তেই ভাষা না জানার জন্যে ঘুরতে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছিল, পাতালে গিয়ে শেষে চিরতরে গায়েব হয়ে যেতে হয় এই ভয়ে মেট্রো চড়ার সাধ বুকের মধ্যেই রইল এ যাত্রা। পরে কখনও এলে দেখা যাবে।

হোটেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিয়ে কনডাকটেড ট্যুরে বেরোনো হল। এই ট্যুরের গাইড একটি ফরাসী মেয়ে। ওরা ইংরেজদের ঘেন্না করে বলে বোধহয় ওদের ভাষাটাও দায়ে পড়ে শেখে। ভালোবেসে নয়। তাই বুঝি তার মধ্যে একটা ঘেন্না মেশানো থাকে। তার ফলে আমাদের মত লোকদের সেই ইংরিজী বুঝতে একটু অসুবিধে হয়।

প্রথমেই জানা গেল যে, আমরা নতর-ডাম গীর্জায় যাব। সেই ছেলেবেলায় ঠাকুমা হাঞ্চব্যাক অফ্ নতর-ডাম কিনে দিয়েছিলেন। কতদিন যে কোয়াসিমোদো আর এসমারালডাকে স্বপ্নে দেখেছি তা বলার নয়। আজ প্রথম চর্মচোখে সেই নতরদাম্ দেখব।

সীন নদীর পাশ দিয়ে রাস্তা—সার্কুলার রোড। নদী মানে নামেই নদী; আগেই বলেছি,

www.BanglaBook.org

আমাদের কেওড়াতলার আদি গঙ্গার মত। এ নদীতে কোনো ক্রমে পড়ে গেলে ঝামা দিয়ে গা ধুতে হবে এমন জলের রঙ।

হোটেল থেকে অনেক দুর এসে নতরদামের গীর্জার চুড়ো দেখা গেল। এবারে পৌঁছব আমরা। নদীর উপরে একটি সাঁকো পেরিয়ে গীর্জায় পৌঁছতে হবে। ক্রীশ্চানরা বলে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যীশুর মূর্তি পুজোও কি পৌত্তলিকতা নয় এক রকমের? ভগবানের নিরাকার রূপ তো আকাশে বাতাসে বনে জঙ্গলে ছড়িয়ে আছেই—যার দেখার চোখ, শোনার কান আছে সে তো তাঁকে নিরন্তর দেখে শোনে—তার জন্যে যীশুর মূর্তিরই বা প্রয়োজন কি?

আমি কোনোরকম পৌত্তলিকতাতেই অবিশ্বাসী। তাই যেমন কোনো মন্দিরে ঢুকি না, গীর্জাতেও যাই না। দম বন্ধ হয়ে আসে ভগবানের অমন বন্দীদশা দেখে, ভগবানের জন্য কষ্ট হয়।

যখন নতরদামে পৌঁছল বাস তখন মেয়েটি বলল আমরা এখানে ঠিক এক ঘণ্টা থাকব। ভিতরে ঢুকবো গীর্জার। এও বলল যে, যাঁরা ফ্রেঞ্চ পারফ্যুম কিনতে চান, তারা গীর্জার সামনেই একটা হলুদ সিল্কের ব্যানার লাগানো দোকান আছে, সেখানে গিয়ে কিনতে পারেন।

সকলে যখন ভিতরে ঢুকল, আমি তখন সীন নদীর ধারে ধারে যে সব পুরনো বইয়ের দোকান দেখেছিলাম সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

এই দোকানগুলো অবিকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি যেসব পুরনো বইয়ের দোকান আছে ফুটপাথে, সেরকম। ছবি, স্ক্রল, বই, সারে সারে। ভাষা জানি না বলে বইয়ের ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পারলাম না। স্ক্রল ও ছবি দেখে বেড়ালাম। দরাদরি করে একটা ওয়াটার কালারের ছবি ও একটি স্ক্রল কিনলাম।

বই আমার দ্বিতীয় প্রেমিকা, প্রথম প্রেমিকা প্রকৃতি। দ্বিতীয় প্রেমিকার সান্নিধ্যে এসে তন্ময় হয়ে গেছিলাম। ঘড়ি দেখে সময়মত নতরদামের সামনে এসে দেখি আমাদের অত বড় বাসটাকে কে বা কারা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। কস্‌মস্ কোম্পানীর আরো অনেক বাস দেখলাম কিন্তু আমাদের বাস নেই।

হায় জ্যাক্; কোথা জ্যাক্? হাই জ্যাক্?

অন্যান্য বাসের ড্রাইভারদের জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের ট্যুর নাম্বার টু-টোয়েন্টির বাসটা দেখেছো? ড্রাইভারের নাম জ্যাক্? তারা সব ফোর টোয়েন্টির মত কুড-নট্-কেয়ারলেস কায়দায় মাথা নাড়ল শুধু। এক প্রফেশনাল বাস ড্রাইভারের সঙ্গে কোম্পানীরই অন্য ড্রাইভারের আলাপ নেই, এমনকি নামও শোনেনি একে অন্যের, একথা ভাবাও যায় না।

শেষে সেই ফ্রেঞ্চ পারফ্যুমের দোকানের কথা মনে পড়ল। দোকানটাতে যে কজন মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা ইংরিজী বলে। তাদের জিজ্ঞেস করাতে

www.BanglaBook.org

তারা বলল বাস তো অনেকক্ষণ হল চলে গেছে।

শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। মেলা দেখতে যাওয়া ছেলের মতো তেলেভাজার দোকানের সামনে এসে শেষে হারিয়ে গেলাম!

ওরা বলল, তুমি উঠেছ কোথায়?

উঠব আর কোথায়? আমি কি আর হিলটনে উঠেছি না রিৎজ্-এ? হোটেলের নামটা বললাম, আর লোকেশান।

ওরা আমাকে অনেক সাহায্য করল। হোটেলের নামটা টেলিফোন ডাইরেকটরিতে খুঁজে বের করে লোকেশানটা ভালো করে বুঝে নিল, তারপর বলল, নো প্রবলেম, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও।

ট্যাক্সি ভাড়া কোথায় আমার কাছে? যা সামান্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ ছিল তা দিয়ে তো একটু আগে ছবিটবি কিনে ফেলেছি। ওদের সেকথা বললাম।

ওরা তখন বলল, মেট্রোতে করে চলে যাও অথবা বাসে।

আমি বললাম, কক্ষনোও না। পয়সাও নেই, তাছাড়া বাসে বা মেট্রোতে গিয়ে ভাষাবিভ্রাটে হয়তো আরো অনেকদূর গিয়ে পড়ব। ওদের শুধোলাম, আমার হোটেল নতরদাম্ থেকে কত দূরে?

ওরা বলল পাঁচ-ছ মাইল তো বটেই।

আমি বললাম, ফার্স্ট ক্লাস। হেঁটেই যাব।

সুন্দরী মেয়ে দুটি আমার কথা শুনে ফর্সা মুখ বেগুনী করে বলল, বল কি?

আমি বললাম, হেঁটে যাওয়া অনেক সেফ। আমার হাতে অনেক সময় আছে।

আইফেল টাওয়ার ইত্যাদির এত ছবি দেখেছি ও পড়েছি যে তা দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে কোনো দুঃখ নেই—বরং প্যারিসের পথে জনারণ্যে গা এলিয়ে এতখানি হেঁটে যাওয়া আমার কাছে অনেক আনন্দের। মনে মনে নিজেকে বোঝালাম। মনুমেন্টের চেয়ে একজন সাধারণ মানুষ আমাকে চিরদিনই অনেক বেশী আকর্ষণ করেছে।

ওরা আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে বলল, সেভাস্তেপোল বুলেভার্ডে পৌঁছে তুমি সোজা এগিয়ে যাবে।

তারপর একটু দম নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, দেন ড্যু হ্যাভ টু ওয়াক, ওয়াক অ্যাণ্ড ওয়াক—বলেই থেমে গেল। মুখ নামিয়ে নিল।

ওরা আমার মুখে অসহায়তা দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ হাঁটার সম্ভাবনায় আমার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠাতে ওরা আমাকে পাগল ঠাওরাল।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সুইং-ডোর খুলে বেরিয়ে এলাম।

ওরা আমাকে শুভকামনা জানাল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। একটু আগে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়া। সঙ্গে

www.BanglaBook.org

ওয়াটারপ্রুফ ওভারকোট ছিল। ভাগ্যিস বাস থেকে নামার সময় সেটাকে সঙ্গে করে এনেছিলাম। অন্য কারণও ছিল। সকালে কেনা একটা ছোট কনিয়াকের বোতল ছিল তার লম্বা পকেটে। তখন কি আর জানতাম যে হারিয়ে যাব? জানলে, ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে পয়সাটা রেখে দিতাম। এরপর আর কি? হাঁটা আরম্ভ হল। হন্ হন্ করে হাঁটি আর কোনো বড় মোড় এলেই থমকে দাঁড়াই। কোনো পথচারীকে শুধোই, পার্দো মঁসিয়ে, তারপর আঙুল দেখিয়ে শুধোই এটাই কি সেভাস্তেপোল বুলেভার্ড?

তারা হনহনিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলেন, উই উই। অর্থাৎ ইয়েস ইয়েস।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর দুজন ষণ্ডাগণ্ডা লোককে আবার ঐ প্রশ্ন করাতে তারা কাঁধ টান করে বললে, সরী! উই ডোন্ট স্পিক্ ফ্রেঞ্চ। উই আর অ্যামারিকানস্। ট্যুরিস্টস্।

শুনেই দাঁত বের করে বললাম, হাই! হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট ঊ্য। ইংলিশ ইজ সাচ আ সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ!

এরা বলল, ইয়া, ইট্ ইজ।

বলেই, পালিয়ে গেল।

হয়তো ভাবল, একটা পাগল ন্যালাখ্যাবার পাল্লায় পড়েছে ওরা। অথবা ভিক্ষে-টিক্ষে চাইব হয়তো।

ঠাণ্ডায় আমার কান জমে ডিসেম্বরের শেষ রাতে নেতারহাটের নেকড়ে বাঘের কান হয়ে গেল। ডান কান বাঁ হাতে টেনে দেখলাম, সাড় নেই।

সাড় নেই। পথেরও শেষ নেই। শয়ে শয়ে লোক হেঁটে চলেছে। গাড়ি চলেছে লাইন দিয়ে। লাল সবুজ নীল হলুদ বাতি জ্বলছে নিভছে মোড়ে মোড়ে। এই লোক, গাড়ি, বাতি, পথ, কারো সঙ্গে কারো কোনোরকম কম্যুনিকেশান নেই। আমার সঙ্গে নেই প্রাকৃতিক শীত ও ভাষার বিজাতীয়তার জন্যে। ওদের সঙ্গে নেই আন্তরিক শীত ও চরিত্রের জাতীয়তার জন্যে।

ব্যাপারটা আশ্চর্য কিন্তু সত্যি।

একটা মোড় পেরোবার সময় প্রায় একটা ছোট ভক্সওয়াগেন বীটল্ গাড়ির নীচে চাপা পড়তে পড়তে একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম।

খুব দুঃখ হল। চাপা পড়লাম না যে সেজন্যে নয়। চাপা পড়লে লজ্জার শেষ থাকত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, গাড়ি যদি আদৌ চাপা পড়ে মরতে হয় তবে দোতলা বাস কি মালবাহী ট্রাক চাপা পড়ে মারা যাওয়া ভালো। পৈতৃক প্রাণটা দু-ক্ষেত্রেই নির্দ্বিধায় মৃদু টায়ার পাংচারের শব্দ করে বেরিয়ে যাবে কিন্তু লোকে তেমন ইম্প্রেসড্ হবে না প্রথম মৃত্যুতে। এমন কি এমনও মনে করতে পারে যে, আমার প্রাণটা বড় পল্‌কা ছিল। ঐটুকু গাড়ি চাপা পড়ে মরল শেষে! কিন্তু বড় ট্রাক বা দোতলা বাসে চাপা পড়লে লোকের সমবেদনা অনেক বেশী হবে।

আমাদের কলেজের এক অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী অধ্যাপক 'লা ডোলচে ভিটা' দেখে এসে

www.BanglaBook.org

এই গাড়ি চাপার উপমা দিয়ে 'টু ডাই উইথ আ ব্যাং অ্যাণ্ড নট উইথ আ হুইম্‌পারের' সমীকরণ করেছিলেন।

এই হাঁটার কোনো মজা নেই—লোকজন দোকানপাট দেখার মজা ছাড়া। অনেকের জীবনের চলার সঙ্গে এই হাঁটার খুব মিল দেখি। এটা এক রকমের তুচ্ছ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মুভমেন্ট। অ্যাকশান নয়। হেমিংওয়ে বলতেন—নেভার কনফিয়্যুজ আ মুভমেণ্ট উইথ অ্যান অ্যাকশান।

মুভমেন্টে গতি আছে কিন্তু প্রাণ নেই, কোনো মহৎ অথবা দুর্গম গন্তব্য নেই; সেটা অত্যন্ত আনইন্টারেস্টিং।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় সেভাস্তেপোল বুলেভার্ডের সেই মোড়ে পৌঁছব যে, সে তো জানা কথাই—কিন্তু পৌঁছে কোনো রোমাঞ্চ হবে না। পথের মধ্যে গতির মধ্যে গন্তব্যের মধ্যে রোমাঞ্চ না থাকলে পথটা, জীবনটা; বড় ভোঁতা হয়ে যায়।

শেষমেষ অনেক ট্রাফিক পুলিস, অ্যানিম্যাল লাভারস-সোসাইটির সভ্য এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকাকে চমকে দিয়ে অত্যন্ত আনসেরীমোনিয়াসলী আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছলাম।

পৌঁছে মনে হল, না পৌঁছলেই ভালো হতো। হাতে আড়াই ঘণ্টা সময়, পকেটে সামান্য পয়সা। পারফ্যুমের দোকানের মেয়ে দুটিকে যত গরীব আমি বলেছিলাম নিজেকে, সেই মুহূর্তে ঠিক তত গরীব ছিলাম না।

দেখলাম সামনেই একটি আণ্ডার গ্রাউণ্ড সিনেমা হল। কন্টিনুয়াস শো হয়। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লেই হলো। বড় ঠাণ্ডা মেরে গেছি। আপাতত একটা হীটেড ঘরে ঢুকে গা-গরম করা দরকার। বাইরে বেশ গা-গরম করা ছবি-টবিও ছিল।

ঢুকে পড়েই বুঝলাম যে, শুদু গা-গরমই নয় ওভারকোট এবং কোটেরও বোতাম খোলার দরকার হবে এক্ষুনি।

এই সব সিনেমা, সাধারণত অপশ্চিমী দেশের লোকেরা এবং সেক্স সম্বন্ধে যে-সব দেশ গোঁড়া ও যে-সব দেশের পুরুষরা মেয়েদের এ সম্বন্ধে অনীহার কারণে সাধারণত সেক্স-স্টার্ভড—সেই সব দেশের লোকেরাই বাঁচিয়ে রাখে।

কিন্তু চুপিচুপি বলে রাখি, টিকিওয়ালা গোঁড়া মাতব্বরেরা যাই-ই বলুন না কেন; এই সব ছবিকে আমাদের দেশীয় 'আণ্ডেকা রোশান হালুয়ার' সঙ্গে তুলনা করা চলে।

আণ্ডেকা রোশান হালুয়া যদি আপনারা কেউ না খেয়ে থাকেন তাহলে কোনো আদি ও অকৃত্রিম হাকিমের কাছে গিয়ে আবদার করবেন। খুব কম হাকিমই অবশ্য এই পুরাকালের আশ্চর্য ঔষধির খবর রাখেন। বানানোর প্রক্রিয়াটা আমার জানা আছে। যাঁরা যৌবনেই বার্ধক্যে পৌঁছেচেন এবং গণ্ডারের শিংয়ের গুঁড়ো, ভাল্লুকের প্রত্যঙ্গ বিশেষের কাবাব, নানারকম বুজরুকী জরীবুটির খোঁজে বিস্তর মেহনতের টাকা বিলকুল 'পান্নিমে পানি' করছেন তাঁরা যথাসাধ্য দক্ষিণা সহকারে আমার কাছে প্রার্থনা করলে আমি এর

www.BanglaBook.org

'রেসিপি' বাংলাতে পারি।

এ ওষুধ বানানো সোজা, খাওয়া তার চেয়ে সোজা; কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই ওষুধ খাওয়ার পর এর গুণাগুণ পরীক্ষার পাত্রাভাব নিয়ে।

রসিক পাঠক আশাকরি বুঝবেন কি বলতে চাইছি।

পাঠিকারা ক্ষমা করবেন।

অন্ধকার হলে ঢুকেই দেখি একটি দারুণ হ্যাণ্ডসাম ছেলে একটি নেভি-ব্লু-রঙা ফ্লেয়ার ও লাল-রঙা গেঞ্জী পরে (যেন ভারতীয় টেক্সটাইল মিলের বিজ্ঞাপন) সাইকেল চালিয়ে পাইন স্প্রুসের জঙ্গলের মধ্যের কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর উল্টোদিক থেকে পিংক-রঙা লেস-বসানো ম্যাক্সি পরে মাথায় স্ট্র-হ্যাট চাপিয়ে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে লেডিজ সাইকেল চালিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই কোনো দৈব-দুর্বিপাকে তাদের দুই সাইকেলে ধাক্কা লেগে গেল।

কে বলে হিন্দী সিনেমাই একমাত্র আজগুবী?

মেয়েটি পড়ে গেল, ছেলেটিও। মেয়েটির ম্যাক্সি অনেকখানি উঠে গেল। তার রাজহাঁসের শরীরের মত কোমল উরুর একঝলক দেখা গেল।

তারপর তারা ফরাসী ভাষায় কি সব বলাবলি করল। আমি ভাবলাম গালাগালি করছে দুজনা দুজনকে। ওম্মা! তারপরই দেখি সাইকেল দুটো মনমরা হয়ে পথের ধুলোয় জড়াজড়ি করে পড়ে রইল এবং সাইকেলের মালিক ও মালিকিনী রোদ-পিছলানো হলুদ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর দুজনে মিলে আঁচড়-কামড় দিতে লাগল দুজনকে।

আমি ভাবলাম ফরাসীরা খুব কালচারড্ জাত বলে বোধ হয় পথের মধ্যে মারামারি করাটা অভদ্রতা ভাবে। তাই জঙ্গলে গেল।

সেলুকাসের উচিত ছিল ভারতবর্ষে আসার আগে ফরাসী দেশে যাওয়া ঃ তাহলে 'কী বিচিত্র দেশ' এই সার্টিফিকেট ফ্রান্সেরই প্রাপ্য ছিল।

এতক্ষণ হেঁটে যা ক্লান্ত হইনি তার চেয়ে অনেক বেশী ক্লান্ত হয়ে আমি বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখতে লাগলাম সিনেমাতে সামান্য মানুষ ও মানুষীকে কী ঐশ্বরিক ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির অধিকারী করা যায়। কত সহজে কত কঠিন কঠিন শারীরিক যুদ্ধকে অবলীলায় ও কী নমনীয়তার সঙ্গে ইচ্ছেমত প্রলম্বিত ও সুন্দর ও প্রায় নিরন্তর করা যায়।

এতদিন পরে হৃদয়ঙ্গম করলাম সিনেমাকে কেন মোস্ট এক্সপ্রেসিভ ফর্ম অফ আর্ট বলে।

তারপর বহুক্ষণ ধরে যেন পীপিং-হোলে চোখ রেখে আদম ইভ এবং তাদের সংখ্যাহীন কাজিনদের আপেল খাওয়ার পরের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে যাওয়া দেখে যেতে দেখলাম।

মিথ্যে বলব না, খুব ভালো লাগছিল। আবার এ ছবির নায়কদের বড় ঈর্ষাও হচ্ছিল। বাংলা ছবির নায়করা শুধু পার্কের বেঞ্চে বসে মৃদু মৃদু ভাবে কথা কয়। তারা যদি এমন ছবির নায়ক হওয়ার সুযোগ একবারও পেত তাহলে হয়তো তাদের নায়কত্ব সার্থক হত।

আমার নিজের জন্যে, আমাদের দেশের নায়কদের জন্যে, দর্শকদের জন্যে খুব

www.BanglaBook.org

অনুকম্পা বোধ করলাম। টেক্সটাইল মিলের মালিকদের জন্যেও।

জামা কাপড়ের এমন হেনস্থা ক্রমাগত হতে থাকলে তো তাঁরা না খেয়ে মরবেন!

ঘড়ির রেডিয়ামে যখন দেখলাম সময় হয়েছে তখন নন্দনকাননের সমস্ত নন্দনতত্ত্বের মায়া কাটিয়ে উঠে পথে বেরিয়ে এসে যে রেস্তোরাঁতে আমাদের সঙ্গীরা এসে ডিনার খাবেন বলে ঠিক ছিল সেই রেস্তোরাঁর দিকে হেঁটে চললাম।

প্যারিসে একটা জিনিস দেখলাম যা অন্য কোথাওই দেখিনি। ফুটপাথের নীচে হাই-ড্রেনট-এর মত গরম হাওয়ার নর্দমা আছে। মাঝে মাঝেই ম্যানহোল কভারের মত লোহার কভার বা জাল। তার উপরে দাঁড়ালে নীচ দিয়ে গরম হাওয়া বেরোয় শোঁ শোঁ করে। শীতার্ত মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে পা ও পশ্চাৎদেশ সেঁকে নিয়ে সুস্থ হয়।

পথে মাঝে মাঝেই একলা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পসারিণী। নানা বয়সের; নানা রঙা চুলের। এই জগৎ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এদের সঙ্গে শোয়াবসা না করলে নাকি কবি-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের কাছে ও তাঁদের লেখায় শুনেছি ও পড়েছি। অন্য ডিসকোয়ালিফিকেশান ছাড়াও এই এক ডিসকোয়ালিফিকেশানেই আমি হিটে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে রয়েছি। এ জন্মে আমার বড় লেখক হবার কোনো চান্সই নেই।

পথ হাঁটি আমি, ময়লা মাড়াই, ধুলো ওড়াই, কথা কই; পথচারীর গায়ে গা লাগে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বোধ আমাকে পীড়িত করে যে, আমি অন্য দশজনের মত হাঁটতে পারি না। উড়তে পারি না সহজ পাখির মত।

প্যারিসের পথে দাঁড়িয়েই হয়তো ফরাসী কবি ব্যোদলেয়ারের লেখা চারটি ছত্র তাই হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ে খুশী হলাম খুব।

চার্লস ব্যোদলেয়ারের দা আলব্যাট্রস কবিতার লাইন কটি ঃ

'দা পোয়েট ইজ লাইক দিস মনার্ক
অফ ক্লাউডস্
ফ্যামিলিয়ার অফ স্টর্মস অফ স্টারস
অ্যাণ্ড অফ অল হাই থিংগস
এক্সাইল্ড অন আর্থ এমিডস্ট্ ইটস্
হুটিং ক্রাউডস্
হি ক্যানট্ ওয়াক বোর্ন ডাউন বাই
হিজ জায়ান্ট্ উইংস।

সেই আলোকিত রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছি মিনিট পাঁচেক, তখনও টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় জ্যাক-চালিত কম্‌মস্ টু-টোয়েন্টির সেনট্রা বাসটিকে আসতে দেখা গেল।

www.BanglaBook.org

আহা! যেন আমার হারানো প্রিয়া এল।

বাসভর্তি সহযাত্রীদের কাছে আমি যে এই দশ-এগারোদিনে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি তা আগে বুঝতে পারিনি। এ জন্যেই গুণীরা বলেন বিচ্ছেদই ভালোবাসার গভীরতাকে উপলব্ধি করায়।

বাসসুদ্ধ লোক হুড়মুড় করে নেমে এল। বুড়ীরা, যারা তাড়াতাড়ি নামতে পারলেন না তাঁরা সিটে বসেই হাত নাড়তে লাগলেন।

সবচেয়ে প্রথমে এল জ্যাক। এসেই জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। জ্যাক আজ সকালে দাড়ি কামায়নি। গাল জ্বলতে লাগল।

জ্বালা প্রশমিত হল ক্যারল, জেনী ও সারার চুমুতে।

বুড়িরা বৃষ্টিতে-ভেজা আমাকে দেড় বছরের ছেলের মত ঐ রাজপথে দাঁড়িয়ে ফণ্ডল্ করতে লাগলেন। ব্যাপারটা প্রথমে আনন্দের ও হাসির ছিল। কিন্তু আমার চোখ একটু পর ভিজে এল। ভগবানের কাছে বড় কৃতজ্ঞতা জানালাম। কত কি না তুমি দিলে! এই প্রবাসের সঙ্গীরা ও এই দুদিনের পরিচয়ের মানুষগুলোর বুকে এত ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়েছ তুমি! যা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না, কাঙালপনা করে পাওয়া হয় না; সেই অমূল্য স্বার্থহীন অমলিন ভালোবাসা কত সহজে পেলাম। নিজের জন্যে, প্রত্যেক মানুষের জন্যে ভালোবাসায় ভাসমান আমার অন্তর এক কৃতজ্ঞ নম্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

যেই-ই এই আপাততুচ্ছ কিন্তু বড় দামী পাওয়া জীবনে পায়, কেবল সেই-ই জানে তার দাম।

ক্যারল ভেবেছিল আমি সীন নদীতে ডুবে মরেছি।

আমি বললাম, কোন দুঃখে? তাই যদি জন বলে তোমার কেউ না থাকত জানতাম।

ও হাসল, বলল, অসভ্য! হিংসুক! ভালোবাসা কি একজনকেই বাসা যায় জীবনে? আমাকে কি তুমি এতই সীমিত মনে করো নাকি?

বললাম, কী আছে আমার?

আমি জানি। তুমি নাই-ই বা জানলে।

জেনী বলল, অনেক ভাবিয়েছ এখন চলো একটু ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেয়ে আমাদের ধন্য করবে।

দলপতি জন, গোল্ড-ব্লক টোবাকোর টিনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাভ আ ফীল্— তারপর বলল, হ্যাভ আ কাপল্ অফস্টিফ্ কনিয়াক্স্। উ্য উইল বী অলরাইট্।

ওয়াশরুমে গিয়ে বুঝলাম কেন জন অলরাইটের কথা বলল। একে তো যা কার্তিকের মত চেহারা! তারপর বৃষ্টিতে ভিজে পাতলা চুলগুলো লেপ্টে গিয়ে একেবারে ঝোড়ো কাকের মত অবস্থা হয়েছে। নাকটা লাল ও গাল দুটো বেগুনী হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে একটু আগের সিনেমাতে ডজন ডজন অনাবৃত তরুণ-তরুণীর আদর করা দেখেও যথেষ্ট গরম হলাম না আমি? এ জন্মের মত আমি কি ঠাণ্ডা মেরে গেছি?

www.BanglaBook.org

খাদ্য ও সহসাথীদের প্রীতির সঙ্গে খাওয়ানো পানীয়তে শরীর চাঙ্গা ও উষ্ণ করে আমরা নাইট-ট্যুরে বেরোলাম।

আজই প্যারিসে শেষ রাত। আজ রাত দুপুর করে ফিরে কাল একটু বেলা করে বেরোব আমরা। তারপর লীল্ হয়ে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড। অস্টেণ্ড থেকে আবার বোটে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডের ডোভার। সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া স্টেশান—লানডান।

রাতের প্যারিস, বাস বা গাড়ি থেকে দেখার নয়। হাতে প্রচুর সময় নিয়ে যেতে হয় সেখানে, মনটাকেও খোলামেলা সংস্কারশূন্য অবসরে ভরে নিতে হয়—তারপর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়, থিয়েটারে, অপেরায়; নাইট ক্লাবে।

এখানে রাতটাকেই দিন বলে মনে হয়। এত আলো, এত লোকজন, সারা রাত সমস্ত দোকানপাট খোলা, রেস্তোরাঁ খোলা, কাফে খোলা; দেখলে ভাবতে হয় এরা দিনের বেলাতেই ঘুমোয় বোধহয় আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের স্টেশান মাস্টারমশাইদের মত। রাতের বেলা মেল ট্রেন পাস করে বলে তাঁদের গভীর রাত অবধি জাগতে হয়, তাই দিনের বেলা পয়েন্টস্‌ম্যানের হাতে সবুজ নিশান, আর লোহার রাকেট দিয়ে দিনেই তাঁদের অবসর মেলে।

নিন্দুকেরা বলেন, গ্রামগঞ্জের মাস্টারমশায়দের স্ত্রীরা প্রায়ই দিনমানে গর্ভবতী হন।

তাই?

কিন্তু এখানে দিনও জাগে, রাতও জাগে; তাহলে এরা ঘুমোয় কখন?

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল ম্যুঁলারুঁজের সামনে। সেই, চিত্রকর ভ্যানগগ থেকে সেজান্—সকলেই যে প্যারিস, যে ম্যুঁলারুঁজে এসে বসতেন সেই ম্যুঁলারুঁজে।

বাইরে উইণ্ডমিলের পাখার মত পাখা ঘুরছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ম্যুঁলারুঁজ এই ম্যুঁলারুঁজেরই বড় করুণ অনুকরণ। সহজ সমীকরণ।

ঢুকতে হলো লাইন দিয়ে। অ্যালাস্টার নিশ্চয়ই আমাদের টিকিটের বন্দোবস্ত আগে করে রেখেছিল, না কি করেনি? জানি না, কিন্তু লাইন দিয়ে ঢুকলাম একথা মনে আছে।

বেশ ভালো জায়গায় আসন ছিল আমাদের। আসনে গিয়ে বসতেই শ্যাম্পেন দিয়ে গেল গ্লাসে। টিকিটের দামের সঙ্গেই এর দাম ধরা আছে। কেউ বেশী কিছু খেতে চাইলে বা অন্য কিছু খেলে পয়সা দিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু স্টেজে একটু পরে যা দৃশ্য দৃশ্যমান হল তাতে কারো গ্লাসের দিকে চাওয়ারও অবকাশ হবে বলে মনে হল না।

প্রথমে শুরু হল বিখ্যাত প্যারিসিয়ান ক্যান্-ক্যান্ ডান্স। ক্যান্-ক্যান্ পরে সুন্দরীরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল।

এক একটা ক্যান্‌ক্যানে কত মিটার কাপড় লাগে তাই-ই ভাবছিলাম। অথচ পৃথিবীতে মেয়েদের সমুদয় সাজপোশাকের আড়ম্বর শুধু খুলে ফেলারই জন্যে। ভাবলেই হাসি পায়। পুরুষদেরই কারসাজী এসব। যা অতি সহজে দৃষ্টিগোচর করা যায়, বিনা আয়াসে সেই সুন্দর নারীশরীরটাকে বহু মিটার কাপড়ে মুড়ে তারপর কষ্ট করে খোলার কি প্রয়োজন

www.BanglaBook.org

জানি না। এও এক রকমের বিকৃতি। তবে, ক্যান্-ক্যান্ পরে মেয়েরা শুধু নাচেই, আদর খাওয়ার অব্যবহিত আগের পোশাক নিশ্চয়ই ক্যান্-ক্যান্ নয়!

আমি বাঙাল মানুষ, আমার কাছে মেমসায়েব মাত্রই মেমসায়েব। চেহারা দেখে, কে আমেরিকান, কে ইংলিশ, কে জার্মান, কে ফ্রেঞ্চ, কে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান তা বলার মত তালেবর আমি হইনি। এজন্মে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবে, একটু-আধটু যে তফাৎ নেই, তা বলা যায় না। প্রত্যেক জাতেরই বৈশিষ্ট্য থাকে। চেহারায়, ব্যবহারে, চোখের চাউনিতে, ধন্যবাদ দেওয়ার মধ্যের উষ্ণতার তারতম্যে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্যান্ ক্যান্ নাচ শেষ হলো যখন, তখন ম্যাজিক দেখানো আরম্ভ হলো।

পশ্চিমের দেশগুলো বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত—তাই ম্যাজিক ব্যাপারটাকে ওরা একটা অন্য উচ্চতায় পর্যবসিত করতে পারত। ইচ্ছা করলেই। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার পুরো ডিজনী ল্যাণ্ডটাই যেমন একটা ম্যাজিক। কিন্তু এই ম্যাজিকের বাবদে মনে হয় পশ্চিমীদের পুবের দেশের লোকের প্রতি একটা সহজাত সম্মান আছে। এমন কি হীনম্মন্যতাও আছে।

পৃথিবী-বিখ্যাত ম্যুঁলারুঁজ-এ যেমন ম্যাজিক দেখলাম তেমন ম্যাজিক আমার মেজমামা গিরিডির মামা-বাড়ির বারান্দায় পর্দা টাঙিয়েও দেখাতে পারতেন। আসলে, পরে বুঝলাম যে, এই ম্যাজিকটা স্টপ্-গ্যাপ। ক্যান্-ক্যান্ পরা সুন্দরীরা যে কি ত্বরিৎগতিতে ড্রেসিংরুমে বিবসনা হচ্ছিলেন তার কোনো ধারণাই তখন আমার ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না।

আমি যে দেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সে দেশে কোনো মহিলার গোড়ালীর ওপরে কোনো দুর্ঘটনায় শাড়ি উঠে গেলেই পুরুষের বুকে স্পন্দন ও নারীর মুখে লজ্জা ফোটে। সেই দেশের লোক একটু পরে যা দেখলাম, তাতে বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

স্টেজের মধ্যে আরেকটা স্টেজ। কত টাকা যে খরচ করা হয়েছে এই স্টেজ বানাতে তার ইয়ত্তা নেই। এদের উচিত সত্যজিৎবাবুর স্কেচে ভর করে বংশী চন্দ্রগুপ্ত যে স্টেজ করেন তা দেখা। দেখে শেখা।

যাই হোক, স্টেজে যখন একসঙ্গে প্রায় কুড়িটি তরুণী দৌড়ে এল, নাচল কুঁদল, সিঁড়ি দিয়ে উঠল নামল, যাতে আমরা পয়সা উসুল করতে পারি ভালো করে, তখন ব্যাপারটা কি ঘটছে তাই-ই ভালো করে বুঝতে পারলাম না।

ভগবানের উচিত ছিল মানুষকে দুটোর বেশী চোখ দেওয়া—এসব বিশেষ বিশেষ অকেশানে ব্যবহার করার জন্যে।

অতজন মেয়ে, তাদের কারো শরীরের কোথাওই কিছুমাত্র কাপড়-জামা নেই। তারা প্রত্যেকেই সুন্দরী, প্রত্যেকেরই দারুণ ফিগার, দারুণ নাক, দারুণ চিবুক, দারুণ বুক। কোথাওই কিছু নেই। কেবল একটুকরো গোলাকৃতি আধুলিসমান লাল, নীল, হলুদ, অথবা বেগনে রঙীন রাংতা ছাড়া। সেই গোল করে কাটা রাংতাটুকু জায়গাবিশেষে কি দিয়ে জানি না সেঁটে রাখা হয়েছে। এত নাচা-কোঁদাতেও তা স্থানচ্যুত হচ্ছে না।

ফরাসী ক্রিমিনাল আইন বা অশ্লীলতার আইনে কি আছে জানি না, তবে রাংতার

www.BanglaBook.org

রক্ষণশীলতা দেখে মনে হলো, ওদেশে আইনজ্ঞদের এবং আইন মান্যকারী ও অমান্যকারীদেরও বিলক্ষণ রসবোধ আছে একথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সম্পূর্ণ নগ্না সুন্দরীরা এল, গেল; কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, ব্যালে করার অজুহাতে আমাদের দিকে হাত পা ছুঁড়ল। পিছন ফিরে দাঁড়াল, সামনে তো দাঁড়িয়েই ছিল, অনেক কিছুই করল যাতে কোনো নিমকহারাম দর্শক বলতে না পারেন যে, ওঁদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওঁদের ঠকানো হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন যে এই শো নাকি চমৎকার।

হয়তো চমৎকার! কিন্তু এই বাঙাল দর্শক, এই শোয়ে অংশগ্রহণকারী নগ্নতার চমৎকারিত্বে এতই অভিভূত, স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে ছিল যে, শোয়ের চমৎকারিত্ব অবধি সে পৌঁছতে পারেনি।

একসময়ে শো শেষ হল। সব শো-ই একসময় শেষ হয়। শেষ হয় যৌবন, জীবনও শেষ হয়। কিন্তু কিভাবে হয়, কোন্ উদ্দেশ্যে সেই সময়টুকু ব্যয়িত হয়; তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

এই নগ্ন শো-এর চেয়ে আমার মায়ার খেলা অনেক ভালো লাগে। তার কারণ এই মুঁলারুঁজ-এর নাইট ক্লাবের সমস্ত নিরাবরণ চমৎকারিত্ব শরীরে এসেই থেমে গেছে। মনের সঙ্গে এর কারবার নেই। এই শো চারঘণ্টা দেখার আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে "আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আস রাখিলে ফেরে" এই একটি সুর অনেক গভীরতর আনন্দের উৎস বলে মনে হয় আমার।

ইচ্ছে হল বলি, (ফরাসী জানি যে বলব?) যে তোরা আমাদের দেশে আসিস। আমাদের দেশে কোনারক আছে, খাজুরাহো আছে কিন্তু তবুও আমাদের দেশের মেয়েরা কত শালীন, কত মিষ্টি করে তারা সাজে, কত সুন্দর করে হাসে, কত গভীর তাদের মনের প্রেমের দীপ্তি। তোদের নগ্ন স্টেজের, নগ্ন মেয়েদের; সমস্ত উচ্ছলতা সেই একটি হাসির ঔজ্জ্বল্যেরও সমকক্ষ নয়।

মনে মনে বললাম, আসিস এ দেশে।

মুঁলারুঁজ-এর আশার কাঁধ ঝুঁকিয়ে বলল, মের্‌সী মঁসিয়ে।

যাঃ বাবা। ভেবেছে হয়তো আমি সুখ্যাতি করলাম শো-এর।

এই সব তরল শো-এর সব ভালো। মানে, যা এর ভালো। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যা, তা হচ্ছে এই রকম শো দেখে ফিরে এসে মাঝরাতে হোটেলের একা ঘরে শুয়ে থাকা।

ইচ্ছা করে, পরানডারে গামছা-আ-আ-দিয়া বান্ধি।

সরী, শরীলডারে।

আজ সকালে প্যারিসের হোটেলে ঘুম ভাঙলো এক বিষণ্ণতার মধ্যে। বাইরে টিপ্ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দস্তা-রঙা আকাশ দেখা যাচ্ছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। ঘরের মধ্যে ফিস্‌ফিস্। ঘরের বাইরে ফিস্‌ফিস্—কারা যেন শ্বাস ফেলছে অবিরল।

www.BanglaBook.org

চোখ মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর স্যুটকেস হাতে নেমে এলাম নীচে ব্রেকফাস্টের জন্যে।

আজ রাতে লানডানে গিয়ে ডিনার খাবো। ফুরিয়ে যাবে ইয়োরোপের ঘূর্ণি-ঝড়ের ছুটির দিন।

সকলেই একে একে বাসে এসে উঠলেন। জ্যাক আজ একটা হালকা নীল টুইলের শার্ট পরেছে, তার সঙ্গে গাঢ় নীল টাই।

অ্যালাস্টারের মত বেশী লোক থাকলে কাপড়জামার ব্যবসাদারেরা সব লালবাতি জ্বালাবে। গত পনেরো দিন সে তার কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, ছাইরঙা উলের গলাবন্ধ একটি সোয়েটার এবং তার উপরে একটি বাদামী কর্ডুরয়ের কোট পরে দিব্যি চালিয়ে দিল। আণ্ডার গার্মেন্টস কি ছিল, স্বাভাবিক কারণে জানা ছিল না; তবে মনে পড়ে না ওর শার্টও কখনো দেখেছি বলে। নিশ্চয়ই প্রতি রাতে সেগুলো ধোওয়া-ধুয়ি করে নিত।

আমাদের দেশের মত চান-টান করার উপায় নেই ওদের। বডিওডোনাইজার বা শরীর-সুগন্ধি আছে বহুরকমের। কি পুরুষ কি নারী সকলেই ফ্যাস্‌স-স্‌ করে সকাল বিকেল বগলতলায়, ঘাড়ে, গলায় একবার করে মেরে নিচ্ছে সুগন্ধি হাওয়া—ব্যস্‌, তারপর সারাদিন ফুর্‌ফুর্‌ গন্ধ।

প্যারিসে ঢোকার সময় ওর্লি এয়ারপোর্ট দেখেছিলাম। পুরনো এয়ারপোর্ট প্যারিসের। ফেরার সময় দেখলাম চার্লস্‌ দ্য গল্‌ এয়ারপোর্ট। এখনও পুরোপুরি চালু হয়নি সে এয়ারপোর্ট—ওর্লির চেয়ে অনেক বড়।

কাল রাতে ম্যুঁলারুঁজ-এর যাওয়ার আগে সাঁসে-লিজে গেছিলাম। এদিকে ছটা পথ, ওদিকে ছটা পথ। মাইলের পর মাইল সোজা। এদিকের থেকে আসা অগুন্তি ছয় সারির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এবং অন্যদিকে যাওয়া টেললাইটের লাল আলোগুলি ভারী চমৎকার দেখতে লাগে।

মাঝ সকালে কোথায় যেন একবার কফি-ব্রেক্‌ হল। নাম মনে নেই জায়গাটার। তারপর লীল্‌ হয়ে বেলা বারোটার আগেই অস্টেণ্ডে এসে পৌঁছলাম—বেলজিয়ামে আবার। যেখানে বোট থেকে নেমেছিলাম।

ক্যারল ও জেনী বলল, চলো, আমরা একটু রোদে হেঁটে বেড়াই। সারাও দৌড়ে এল।

আমরা সকলেই জানি, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের সকলের সঙ্গে সকলের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আজ থেকে বেশ কিছুদিন পর আমি ফিরে যাব আমার গরীব, নোংরা কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতার ওম্‌-ধরা কলকাতায়। ওরা ফিরে যাবে যার যার, বড়লোক অথচ হৃদয়হীন দেশে। তারপর এ জীবনের মতো আর দেখা হবে না। কারো সঙ্গে কারোই।

আমি জানি যে, ছাড়াছাড়ি হবার সময় বুড়ো জন আবারও বলবে, হ্যাভ আ ফিল্‌, তার গোল্ড-ব্লক টোবাকোর টিনটা এগিয়ে দিয়ে; তারপর ওর বড় বোলের পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে এক মুখ ধুঁয়ো ছেড়ে বলবে—উই হ্যাভ আ ওয়াণ্ডারফুল টাইম টুগেদার।

www.BanglaBook.org

তারপর একটু থেমে বলবে, ডোন্ট উ্যু থিঙ্ক সো?

আমি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ব, বলব; ইয়া।

কিন্তু মনে মনে জানব, সমস্ত ওয়াণ্ডারফুল টাইমই একসময় শেষ হয়। আমরা কেউই শিখিনি, আমি, জন, ক্যারল, জেনী এবং অন্য অনেকেই; কি করে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকেই ওয়াণ্ডারফুল করে তোলা যায়।

আশ্চর্য!

আজকের লাঞ্চটা বড় তড়িঘড়ির লাঞ্চ হলো।

ইংলিস চ্যানেলে দাঁড়ানো জাহাজগুলো ভোঁ দিচ্ছে। বাঙাল যাত্রী আমি ইস্টিশানে স্টিম এঞ্জিনের কু—এবং নদীতে স্টিমারের ভোঁ শুনলেই মনে হয়েছে চিরদিন; আমার ট্রেন বা স্টিমারই বুঝি ছেড়ে গেল। এই ছেড়ে-যাওয়ার ভয়টা ছোটবেলা থেকে বুকের মধ্যে এমন করে সেঁধিয়ে ছিল যে, জীবনে যখন অনেক বড় বড় প্রাপ্তির ট্রেন ও স্টিমারও সত্যিই ছেড়ে চলে গেল আমায় তখন আর ভয় করল না।

একদিক দিয়ে ভালো। ভয়েতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ভয় করে না। তখন ভয় না করলে, ভয়ের কারণ না থাকলে; নার্ভাস-টেন্সান্ হয়।

ক্যারল স্যুপ শেষ করে আমার চোখের দিকে ওর সুন্দর নীল চোখ মেলে বলল, উড্ উ্যু রাইট্ টু মী?

আমি বললাম, সার্টেনলি ইয়েস্।

তারপর একই স্বরে বলল, উইল্ উ্যু কাম টু অস্ট্রেলিয়া?

বললাম, ওয়েল, মে বী। সাম্ ডে, সামটাইম। আই ডোন্নো।

ও বলল, ইফ উ্যু এভার কাম, প্লীজ স্টে উইথ্ আস্। তারপরই নিজেকে শুধরে বলল, আই মীন উইথ্ মী।

জেনী ফিক্ করে হেসে উঠল।

ক্যারল 'আস্' বলতেই, জেনী ভেবেছিল ক্যারল ওর জার্মান বয়ফ্রেণ্ডের কথা বলছে।

ক্যারল সত্যিই চটে গেল। বলল, স্টপ ইট্ জেনী।

আমি হাসলাম, বললাম, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি হবে জানো এই ট্রিপটা শেষ হয়ে গেলে?

কি? ওরা সমস্বরে শুধোল।

আমি বললাম, তোমাদের দুজনের সামনে বসে তোমাদের খুনসুটি দেখতে পাব না আর।

তক্ষুনি বুঝলাম। খুনসুটির ইংরেজী নেই। হয় না। যাহোক করে তাদের বোঝালাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

এবার জেটীর দিকে যাবার পালা। বিকেলের রোদ ঝলমল করছে নানারঙা নৌকো ও জাহাজের গায়ে গায়ে। আজ কি ছুটির দিন? দিনের হিসাব হারিয়েছি। সব দিনই ছুটি।

www.BanglaBook.org

রোদের মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি ভাব।

উপরের নীল আকাশ, নীল ইংলিশ চ্যানেলের জলে মুখ দেখছে। সাদা সী-গাল ওড়াউড়ি করছে। আমরা যখন ডোভারে পৌঁছব তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসবে।

লাইন দিয়ে একে একে আমরা জাহাজের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার ফিলিপিনো সহযাত্রীণী একটা বড় চকোলেট দিয়ে বলল, মাই লাস্ট গিফ্‌ট ট্যু ট্যু।

ভদ্রমহিলা বড় ভালো। সাধারণত অসুন্দর শরীরের মেয়েরা বড় সুন্দর মনের অধিকারিণী হন। ইনিও ব্যতিক্রম নন।

আমরা বোটে উঠলাম। তখনও লোক উঠছে। জেনী আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এক কোণার একটা টেবিলে বসল। বসেই, ওর ব্যাগ খুলে সেই কাগজটা বের করল।

ওকে নিয়ে আমি ইংরিজীতে একটা কবিতা লিখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'ফর জেনী'। কবিতাটি ওর খুব পছন্দ হয়েছিল—ক্যারলেরও। সারা বলেছিল, ট্র্যাশ্। আমারও তাই ধারণা।

সেই কবিতাটির উপরে জেনী একটা বলপেন বের করে আমার নাম ঠিকানা সব যত্ন করে লিখল, এমন কি আমার লানডানের ঠিকানাও, টোরোন্টোর ঠিকানা, নু-ইর্য়ক; লস্-এঞ্জেলস্-এর ঠিকানা, এমন কি হনোলুলু এবং টোকিওর ঠিকানাও।

ও যখন সব ঠিকানাগুলো লিখছিল যত্ন করে, আমি বুঝতে পারছিলাম যে, লানডানের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নেমেই ও আমাকে ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ক্যারল; সারা। ভুলে যাবে জন, জ্যাক্; অ্যালাস্টারও।

আমিও ভুলে যাব ওদের। পথের আলাপ পথেই পড়ে থাকবে; পড়ে থাকে। বেশীর ভাগ সময়ই। তার জের জীবনে, বাড়িতে; পথে-ছেড়ে-আসা মনে টানা যায় না।

টানা ভুলও হয়তো।

জাহাজ ভোঁ দিল। এতবড় জাহাজে নোঙর তোলার আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু বিরাট বিরাট শক্তিশালী এঞ্জিনের একটা গোঙানীর আওয়াজ। সেই চাপা গোঙানীটা জাহাজময় আমাদের সকলের মনে মনে ছড়িয়ে গেল। আমরা বেলজিয়ামের মাটি ছেড়ে এলাম। এখন মাঝ-সমুদ্রে। একদিকে রোদে-উজ্জ্বল অস্টেণ্ড, অন্যদিকে নীল জল। সী-গাল উড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। আজ বড় শীত বাইরে।

আমার মনের মধ্যেও।

---

www.BanglaBook.org

পঞ্চম প্রবাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোম্বে থেকে সেশেলস্-এ। পৃথিবীর মানচিত্রে এই সর্ষেদানার মত দ্বীপের গুঁড়োগুলোকে খুঁজেই পাওয়া যায় না।

এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ মাহে। তাই-ই মাত্র আঠারো মাইল লম্বা এবং তিন মাইল চওড়া। কিন্তু ছবির মত। ছবির মত বললেও সব বলা হয় না; বলা উচিত স্বপ্নের মত।

প্লেন থেকে এই সবুজ দ্বীপপুঞ্জ, তাদের চারপাশের নীল সবুজ কোরাল রীফস্, গেরুয়া, কমলা ও সাজিমাটি-রঙা তটভূমি আর কালো গ্রানাইটের পাহাড়ের পটভূমিতে গাঢ় সবুজ নরম গাছ-গাছালি, এইসব কিছু মিলিয়ে হঠাৎ মনে হয়; নৌকোডুবি যদি কখনও হয়ই হয়, তাহলে এমন দ্বীপের কাছেই হওয়া ভালো।

এয়ার-ইণ্ডিয়ার কোনো ফ্লাইট নেই বোম্বে থেকে সোজাসুজি ডার-এস্-সালামে। শুনতে পেলাম যে শীগগীরই হবে। যে প্লেন মরিশাস্ যাচ্ছিল তাতেই উঠে সেশেলস্-এ পৌঁছেছিলাম। দিন দুই এখানে থেকে তারপর ডার-এস্-সালামে যাব, পূর্ব আফ্রিকার তান্‌জানীয়ায়।

সেশেলস্ আগে ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ এবং ভারতীয় জলদস্যুদের আড্ডা ছিল। এই মাহেরই এক কোণায় বেলোম্ অঞ্চলে এখনও গুপ্তধন পোঁতা আছে এই অনুমানে বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বোঁভালো মানে সমুদ্রতট, ফরাসীতে। বোঁভালো অঞ্চলেই মাহে শহরের সেরা সব হোটেল। আমি উঠেছিলাম কাসকাড্-এক বাড়িতে। পেয়িং গেস্ট হিসেবে। শোবার ঘর থেকে হাত বাড়ালেই সমুদ্র, একটু দূরেই একটা দ্বীপ। দ্বীপটার নামই অনামা। আকাশের রঙের সঙ্গে নিজের রঙ বদলানো অতিকায় এক সরীসৃপের মত। জলের মধ্যে পিঠ উঁচিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। মাঝরাতে যখন চাঁদ উঠতো—মসৃণ ভুতুড়ে সমুদ্র আর ঝোড়ো হাওয়ায় উথাল-পাথাল করা পাহাড়ের গায়ের গাছ-গাছালির দিকে চেয়ে তখন গা-ছম্‌ছম্ করত।

লাল নীল ছোট্ট ছোট্ট মিনিমোক গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় শহরে। একটা গাড়ি ভাড়া করে দ্বীপের চতুর্দিকে চক্কর মেরে বেড়াতাম শর্টস্ আর রঙীন গেঞ্জি গায়ে। কী শান্তি, কী নিবিড় ভালোলাগা এখানে। বড় সুন্দর সব নির্জন তট। ফিস্‌ফিস্-করে হাওয়া আর নিজের মনে কথা-বলা সমুদ্রের পারের এসব তটে এলেই মধুচন্দ্রিকা করতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু আকাশে চাঁদ থাকলেই মধুচন্দ্রিকা হয় না। আমি যে একা এসেছি। তাছাড়া কোনো চাঁদেই মধু তো চিরদিন থাকে না, মধুর জায়গা নেয় নিমপাতা আর কাঁচা তেঁতুল।

www.BanglaBook.org

সেশেলস্-এর ভাষা ফরাসী এবং ইংরেজী। স্থানীয় লোকেরা একরকমের ভাঙ্গা-ফরাসী বলে। সেই ভাষায় নাম ক্রেওল। এদের নাচ গান এমন যে এই পরিবেশে তা বড়ই মানিয়ে গেছে। সুখী , শান্তিপ্রিয়, সরল এবং কিঞ্চিৎ অলস এখানের লোকেরা। আধুনিক জীবনের দুর্বার গতি এবং টেন্‌সান্ একেবারেই নেই। কাজের সময় সকাল আটটা থেকে বারোটা। লাঞ্চের পর আবার বিকেলে দুটো থেকে চারটে।

ছোট্ট ছোট্ট প্লেন আছে নানা রঙে রঙ করা। আইল্যাণ্ডার প্লেন। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে উড়িয়ে নিয়ে যায় ট্যুরিস্টদের। মাহে থেকে সেশেলস্-এর অন্য একটা দ্বীপ প্রাঁলে আইল্যাণ্ডে গেছিলাম একদিন। বোটে না গিয়ে প্লেনেই গেছিলাম ঐ ছোট্ট প্লেনে চড়বার লোভে। তেরো মিনিটের ফ্লাইট—বারো-তেরো জন লোক বসতে পারে পাইলটসুদ্ধু। একটি ভারতীয় ছেলে এই আইল্যাণ্ডার স্কোয়াড্রনের চীফ্। তার বাড়ি দিল্লীতে। আলাপ করে ভালো লাগল। একটু গর্বও হল।

সেদিন খুব দুর্যোগ ছিল। মনে হচ্ছে ছোট্ট সী-গালের মত প্লেনটা বুঝি এখুনি ডানা-ভেঙে জলে পড়বে। কিন্তু ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই একটা বাঁক নিয়ে তাল নারকোল বনে-ভরা পাহাড়ের পাশের মাঠে ঝুপ্ করে দেখি নেমে পড়ল। সারাদিন প্রাঁলেতে থেকে, মাছ ধরে, রোদে এবং জলে সাঁতার কেটে আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে এলাম মাহেতে।

সেশেলস্-এর রোজগারের প্রধান সূত্র হচ্ছে ট্যুরিস্ট-ট্রেড। এখানে কিছুই তৈরী হয় না। একটা বীয়ারের ফ্যাক্টরী আছে। ভাল ক্যান্‌ড্ বীয়ার করে এরা—নাম সী-ব্রু। কিন্তু সেশেলস্-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস হচ্ছে কোকো-ডে-মেয়্যার। সামুদ্রিক নারকোল। বিরাট বড় বড় হয়। দেখতে খুব মজার। কোনো নগ্না কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে পেছন থেকে দেখলে তাঁর নিতম্ব যেমন দেখায় ফলগুলো অবিকল তেমন দেখতে।

আগে সেশেলস্ বোধহয় জলের তলায় ছিল। এই নারকোলের এমনই বিশেষত্ব যে, সেশেলস্ ছাড়া কোথাওই এগুলো পাওয়া যায় না। অন্য কোথাও নিয়ে গেলেও বাঁচে না। গাছগুলোও বিরাট। নারকোল গাছের মতই পাতা কিন্তু লম্বায় চওড়ায় ও পাতার বৈচিত্র্যে একেবারেই অন্য রকম। দোকানে-দোকানে পালিশ-করা এবং পালিশ না-করা কোকো-ডে-মেয়্যার বিক্রি হয়। হাজার দু'হাজার টাকা দাম। আমরা যে অন্য দেশের ট্যুরিস্টদের তুলনায় কত গরীব তা বার বার নতুন করে বোঝা যায় বাইরে এলেই।

দুপুরবেলা মাহে এয়ারপোর্টে ডার-এস্-সালামের প্লেন ধরতে এলাম। এই ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট মাত্র বাহাত্তর সনে চালু হয়েছে। কুইন এলিজাবেথ এসে উদ্বোধন করেন। সেশেলস্ স্বাধীন হওয়ার পর এখন সোস্যালিস্ট দেশ। কমনওয়েলথের সদস্য। তাই ভারতীয়দের ভিসার দরকার হয় না এখানে আসতে। বোম্বে থেকে আসতেও মাত্র আড়াই ঘণ্টা মত সময় লাগে। এত কাছে, অথচ এত সুন্দর দেশ-এর খোঁজ অনেক ভারতীয়রাই রাখেন না। তবে প্রচুর ভারতীয়, বেশীর ভাগই পশ্চিম ভারতীয় এবং কিছু দক্ষিণ ভারতীয় এখানে ব্যবসা করেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য ব্রিটিশ পাশপোর্ট হোল্ডার। কোথাওই বাঙালী নেই ব্যবসায়ে। অথচ দেশ ভাগ হওয়ার পরে পাঞ্জাবীরা, সিন্ধীরা ছড়িয়ে

www.BanglaBook.org

পড়েছে সারা পৃথিবীতে ভাগ্য অন্বেষণের খোঁজে এবং নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বাঙালীর কূপমণ্ডুকতা, আমি নিজে বাঙালী বলে এবং বাঙালীকে ভালোবাসি বলেই, বড় ব্যথিত করে। যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের এখনও আমরা মানুষ বলে গণ্য করি না, অথচ তাঁদের অধীনে চাকরি করতে আমাদের আত্মসম্মানে একটুও বাধে না।

এয়ার তান্‌জানীয়ার প্লেনটা টারম্যাকে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝকঝকে নতুন বোয়িং। প্লেনটির নাম কিলিম্যান্‌জারো। লেজ-এ একটি জিরাফ আঁকা। ভিতরে উঠে দেখলাম প্লেনের মধ্যের দেওয়ালে এ্যাকাসিয়া গাছ আর জিরাফের ছবি আঁকা।

প্লেনটা মাহে এয়ারপোর্ট ছেড়ে উপরে উঠতেই আবার সেই সুন্দর পাখি-চোখের দৃশ্য। নীল, সবুজ, সাজিমাটি। তারপর দেখতে দেখতে অনেক উপরে।

এখন নীচে ভারত মহাসাগরের বড় বড় ঢেউ-ভাঙা, সাদা ফেনাগুলোকে ছোট ছোট সাদা বিন্দু বলে মনে হচ্ছে। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখনি উড়ে যাই তখনই মনে হয় পৃথিবীতে সত্যিই ডাঙা কত অল্প, অথচ নীচের অতলান্ত এবং দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও কত সীমিত।

দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিমে হেলল, সেই সূর্য যে, এই পৃথিবী নামক আদিম শীতার্ত নারীর সঙ্গে তার উষ্ণতার সমস্ত উদ্ধার নিয়ে একদিন এবং যুগযুগান্ত ধরে সঙ্গম করেছিল বলেই আমরা এখানে বাস করছি।

আফ্রিকাতে যে কোনদিনও যাওয়া হবে সত্যি সত্যিই তা কখনও ভাবিনি। কিন্তু ছোটবেলায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' পড়ার পর থেকে, জন হান্টার এবং অনেকানেক বিদেশী লেখকদের শিকার এবং অরণ্য-সম্পর্কিত লেখা পড়ে; হেমিংওয়ের আফ্রিকা-প্রীতির কথা তাঁর বইয়ে, তাঁর সমস্ত জীবনীতে পড়ে কেবলই স্বপ্নে দেখেছি আফ্রিকাকে।

আজ খুব ভোরে উঠেছিলাম। তাই ঘুমিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ খাওয়ার পর। যখন প্লেন নীচে নামতে লাগল তখন হঠাৎ চোখের সামনে কালচে-নীল জলের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে উঠল আদিম আফ্রিকা। আফ্রিকা!

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :

"উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বার বার করেছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘনঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।"

www.BanglaBook.org

প্লেনটা স্থলভূমির কাছাকাছি এসে গেল। সময় বদলাইনি ঘড়ির। ঘড়িতে এখন রাত অনেক, কিন্তু ডার-এস্-সালাম বন্দরে সারিবাঁধা জাহাজগুলোতে সবেমাত্র আলো জ্বলেছে। পশ্চিমাকাশে তখনও ম্লান লালিমা। ধীরে ধীরে কিলিম্যান্জারোর চাকা দুটি পাখির পায়ের মত পেট থেকে নেমে এল। তারপর স্পর্শ করল আফ্রিকার মাটি।

গা সিরসির করে উঠল ভালোলাগায়, উত্তেজনায়।

কমনওয়েলেথ পাসপোর্ট হোল্ডারদের লাইনে দাঁড়ালাম। চারিদিকে চোখ-ধাঁধানো রঙের কাঙ্গা-কিটেঙ্গে পরে কালো কুচকুচে কদমছাঁট চুলের ঢেঙ্গা মেয়েরা সোয়াহিলী ভাষায় বক্‌বকম করে কথা বলছে, হাসছে কোমর দুলিয়ে। ডার-এস্-সালাম-এ নামতেই মনে হল যে, বিলক্ষণ একটা বিশেষ দেশে এলাম! ইয়োরোপ, আমেরিকা, কানাডা অথবা জাপানের সঙ্গে এই দেশের যে অনেক তফাৎ তা মাটিতে পা দিয়েই বোঝা যায়। হেল্‌থ ক্লিয়ার করে কাস্টম্‌স-এ এলাম। অফিসার ভদ্রলোক আমাকে স্যুটকেস খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? কি কর তুমি?

আমি বললাম, তোমাদের দেশ দেখতে। অন্য কাজ যদিও একটা আছে, পরিচয়ও অন্য কিছু আছে কিন্তু মুখ্য পরিচয় এই যে, আমি একজন লেখক। তোমার দেশ দেখে তোমার দেশের কথা আমার দেশের লোকদের কাছে জানাবো। তাই-ই এসেছি।

ভদ্রলোক দুহাত ছড়িয়ে হেসে বললেন, কারিবু।

বলেই, নিজেই স্যুটকেসটার ডালা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর বললেন, আমার সম্বন্ধেও দু'লাইন লিখতে ভুলবেন না।

আমি হাসলাম।

পরে জেনেছিলাম, কারিবু মানে ধন্যবাদ। সোয়াহিলী ভাষায়।

যাঁদের কাজ নিয়ে আমি গেছিলাম তাঁদের তরফ থেকে একজন আমাকে নিতে এসেছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, ট্রাউজারের উপরে পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়েছিলেন। গুজরাটি। নাম বললেন, দীনুভাই। তারপর বাইরে-দাঁড়ানো সাদা একটা জাপানী ডাট্‌সান গাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে ওঠালেন।

বড় বড় আলো-জ্বলা ফাঁকা রাস্তায় জোরে গাড়ি চলতে লাগল।

চওড়া টু-ওয়ে রাস্তা, মাঝে একটু বাগানমত আছে। হ্যালোজেন বাতি হলদেটে লাল রঙের আলো ছড়িয়ে জ্বলছে পথে। লান্‌ডানের পথের কথা মনে পড়ছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গাড়ি জোরে ছুটে আসতে লাগল সাইরেন বাজাতে বাজাতে। পশ্চিমী দেশের পুলিশের বা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ির মাথায় যেমন ঘুরন্ত লাল আলো জ্বলে তেমন আলো জ্বলছিল গাড়িটার মাথার উপর। রিয়ারভিউ মিরারে দেখলাম।

দীনুভাই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর গাড়িটাকে পথের একেবারে বাঁদিকে করে স্পীড কমিয়ে দিলেন। ঐ গাড়িটা ওভারটেক করে চলে গেল আমাদের।

দমবন্ধ দীনুভাই বললেন, মিলিটারী পুলিশের গাড়ি।

বলেই, ড্যাশবোর্ডে সেঁটে-রাখা সাঁইবাবার ছবিতে নমস্কার করলেন।

www.BanglaBook.org

ব্যাপার কি বুঝলাম না।

একটু পর দীনুভাই-এর গাড়িটা তান্‌জানীয়ার সবচেয়ে বড় এবং ভালো হোটেল, হোটেল কিলিম্যান্‌জারোর সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা স্যুটকেসটা বুট থেকে নামিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে হোটেলের একজন পেজ-বয়কে ডাকলেন উনি। আমার স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

দীনুভাই বললেন, আপনি গিয়ে চেক্-ইন করুন আমি পার্কিং লটে গাড়িটা পার্ক করিয়েই আসছি।

রিসেপশানে গিয়ে যখন চেক্-ইন করছি আমি, পাসপোর্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিক্লারেশানের ফর্ম ইত্যাদি দেখাচ্ছি, তখন দীনুভাই আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই রিসেপশানের আফ্রিকান ভদ্রলোক চোখ রাঙিয়ে তাঁকে বললেন, তুমি ভেবেছোটা কি? আঙুল দিয়ে ইশারা করে পেজ-বয়কে ডাকলে কেন? ওরা কি কুকুর। খবর্দার বলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যদি কখনও এমন হয় তাহলে খুব খারাপ হয়ে যাবে এবং এ হোটেলে তোমার মত লোকদের ঢোকা বন্ধ করে দেব।

দীনুভাই মাথা চুলকে বললেন, সরী। ডুগু, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরী।

আমি বুঝলাম না, এয়ার-কণ্ডিশানড, কাঁচের দরজা দেওয়া হোটেলের ভিতর থেকে কাউকে ডাকতে হলে ইশারা না করে কি করে ডাকা যেত? বাইরে বোমা ফাটলেও তো আওয়াজ ভিতরে পৌঁছত না।

কেন যেন মনে হল, ঝগড়া করবেন বলেই, রিসেপশানের ভদ্রলোক দীনুভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করলেন। ব্যবসার দিক দিয়ে ভাবলে, কোনো দেশের কোনো ফাইভ-স্টার হোটেলের রিসেপশনিস্ট কোনো অতিথির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারেন যে, একথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রথম পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেশে এমন অভ্যর্থনাতে খুশী হওয়ার কথা ছিল না। লিফ্‌ট-এ দীনুভাইকে শুধোলাম, ডুগু মানে কি?

উনি বললেন, কমরেড। এখানে সকলকে কমরেড বলতে হয়। মানে, ডুগু।

দীনুভাই দশতলার ঘরে আমাকে সেট্ করে দিয়ে চারধারে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, খুব সাবধান। এসব ব্যাপার নিয়ে, এ দেশের সরকার নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না কারো সঙ্গেই। দেওয়ালেরও কান আছে। খুবই বিপদ হয়ে যাবে। তান্‌জানীয়া সোস্যালিস্ট দেশ।

আমি বললাম, আমার কি দরকার? সোস্যালিস্টই হোক কি ক্যাপিটালিস্টই হোক—আমি তো কাজকর্ম করতে এসেছি। কাজ শেষ হলেই জঙ্গলে চলে যাব। জঙ্গলের জানোয়ারদের সব এক জাত—তাদের একই ইজম্—মানুষদের মত গোলমালে ওরা যায় না। ওদের রাজত্বে, মনে মনে কাউকে বাপান্ত করলেও, মুখে ভালোবাসা দেখিয়ে ডুগু বলে ডাকতে হয় না। আমাকে নিয়ে কোনোই চিন্তা নেই আপনার।

যাওয়ার সময় বলে গেলেন কাল সাড়ে ন'টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরী হয়ে নীচের

www.BanglaBook.org

লবীতে থাকবেন, আমি এসে নিয়ে যাব আপনাকে। ঠিক দশটায় কনফারেন্স।

দীনুভাই চলে যেতে দরজাটা বন্ধ করতেই দেখলাম দরজার ভিতর দিকে একটা নোটিশ লাগানো। লেখা আছে, কেউ যেন ঘরে কোনো দামী জিনিস না রেখে যান; টাকা পয়সা তো নয়ই। থাকলে, রিসেপশানের সেফ-ডিপজিট ভল্টে রাখবেন। সন্ধ্যের পর স্বল্পালোকিত পথে হাঁটবেন না। ছিনতাই হবে।

চান-টান করে পাসপোর্ট, ট্রাভেলার্স চেক সব বালিশের তলায় জম্পেস করে রেখে থমথমে, প্রথম বিদেশী রাতে ঘুমের চেষ্টায় নিবিষ্ট হলাম।

ঠিক করলাম, কাল সকাল থেকেই 'ডুগুর' ডুগডুগি বাজিয়ে যাব ক্রমাগত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দার-এস্-সালামে দুদিনের কনফারেন্স ছিল। তারপর কেনিয়ার নাইরোবিতে আরেকদিন।

পরদিন জানতে পেলাম যে, তান্জানীয়ার মত কেনিয়াতেও প্রচণ্ড অ্যান্টি-এশিয়ান ফীলিংস।

এশিয়ান বলতে, এরা চাকরি করতে-আসা ভারতীয়দের বোঝায় না। যেসব পশ্চিম ভারতীয়রা এখানে ব্যবসা করছে অনেক পুরুষ হল, তাদের উপরই রাগ এখানের মানুষদের। এইসব ভারতীয়দের কিন্তু ভারতীয় না বলাই ভালো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার অথবা অন্য দেশীয়। এদের ছেলে- মেয়েদের বিয়ে হয় ইয়োরোপ বা আফ্রিকারই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে। এরা পড়াশুনা করতে, ছুটি কাটাতে বা মধুচন্দ্রিকা করতে যায় ইয়োরোপে।

যাঁরা বয়স্ক তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে গেছেন এবং ভারতের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ রেখেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্কদের কাছে ভারতবর্ষ একটা নাম মাত্র, এক বিদেশ, যেখান থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা একদিন ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিলেন এখানে।

কিন্তু চেহারাতে কেউ এশিয়ান হলেই তাঁকে "এশিয়ান" বলে মন হয়। বিদ্বেষটা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। তান্জানীয়ার প্রেসিডেন্ট নীয়েরে দেবতুল্য মানুষ। তিনি যতদিন আছেন ততদিন হয়ত কিছু হবে না। তিনি না থাকলে, এশীয়দের তান্জানীয়া থেকে বিতাড়িত হতে দেখলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এদেশে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার পিছনে অসৎ ও অর্থগৃধ্নু কিছু সরকারী আমলা এবং মুনাফাবাজ এশীয় এবং ওদেশীয় ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নেহাৎ সামান্য নয়।

আমার চিরুনিটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। হোটেলের লবীতে যখন দীনুভাই এবং হুইট্লীর জন্যে অপেক্ষা করছি তখন দোকানে একটা চিরুনির দর করলাম। বলল, চল্লিশ টাকা। আমাদের টাকাতে আটত্রিশ টাকার মত। যে চিরুনির দাম কোলকাতায় দেড় থেকে আড়াই টাকা। দোকানটি একটি এশিয়ানের। আমারই ব্রহ্মতালু গরম হয়ে গেল। স্থানীয় লোকদের দোষ দেখলাম না একটুও।

আলুর সের বারো টাকা, পেঁয়াজের সের দশ টাকা, অন্য সব জিনিসেরও সেই অনুপাতে দাম। মিনিমাম-ওয়েজ ঠিক করেছেন তান্জানীয়ার সরকার তিনশ আশী টাকা। বাড়িতে যে-সব লোক কাজ করে তারাও ঐ মাইনে পায়। চাকর-ঝি সবাই। আট ঘন্টা কাজ। রবিবার ছুটি। কিন্তু যা মুদ্রাস্ফীতি এবং সব কিছুর বাজার দর তাতে তিনশ আশী টাকার কোনো দামই নেই।

www.BanglaBook.org

বিকেলবেলা আমার মাসতুতো দিদির ছেলে টিউনিস এল। ও এখানে মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে এসেছে অল্পদিন হল। বলল, নাইরোবি গিয়ে কি করবে? পারলে ওদেরই এখানে আসতে বলে দাও। মুশকিল হল এই যে, কেনিয়ার সঙ্গে তান্‌জানীয়ার সম্পর্ক ভালো নয়। ডাইরেক্ট ফ্লাইট নেই। সেশেলস্ হয়ে এবং সেশেলস্-এক রাত কাটিয়ে যেতে-আসতে হবে।

কিন্তু অন্য সকলেই বলেছিলেন যে, নাইরোবি দেখার মত শহর। টিউনিস বলল, তুমি তো সমস্ত পশ্চিমী দেশ দেখেছো, শহর আবার কি দেখবে? জঙ্গল-পাগল লোক তুমি। জঙ্গল দেখে যাও ভালো করে।

সেদিনের খবরের কাগজেই দেখলাম যে, ডার-এস্-সালাম থেকে কিছু দূরে মোরোগোরো বলে একটি জায়গাতে একটি হিপোপটেমাস ঘুরতে ঘুরতে শহরে চলে এসেছিল। তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। টিউনিস বলল, ও নাকি বদলী হয়ে শীগগীরই মোরোগোরোতেই যাচ্ছে।

আমি বললাম, কিলিম্যান্‌জারো হোটেলে সিংহ-টিংহ ঢুকে পড়বে না তো?

টিউনিস বলল, ঢুকলেও তোমার ভয় নেই, রিসেপশানের সিংহরা তাকে তাড়িয়ে দেবে। তাছাড়া সিংহ তো লিফ্‌টে চড়তে জানে না, তোমার দশতলার ঘরে উঠে আসার সম্ভাবনা কম।

যে দুদিন কনফারেন্স ছিল, টিউনিস এবং দীনুভাই পালা করে ওদের গাড়িতে আমাকে ডার-এস্-সালামের এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন অবসর সময়ে। দেখলাম, প্রত্যেক দোকানে, রেস্তোরাঁতে এবং বারে প্রেসিডেন্ট নীয়েরে এবং প্রাইম মিনিস্টারের ছবি ঝোলানো।

এই লোক-দেখানো ব্যাপারগুলো ভালো লাগল না। এই ভয়, ফিস্‌ফিস্, চুপ-চুপ, বাধ্যতামূলক সম্মান প্রদর্শন এই সমস্তই। যে-দেশে মন খুলে কথা না বলা যায়, ইচ্ছেমত ঘোরা না যায়; সেই দেশে গিয়ে লাভ কি? যে-সব দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, বাক-স্বাধীনতা নেই, চলাফেরার স্বাধীনতা নেই; সেই সব দেশ কত ভালো সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই। যতই ভালো হোক না কেন, তাতে কিছুমাত্রই এসে যায় না। সেই ভালোর কোনোই দাম নেই যে-কোনো স্বাধীনমনস্ক; ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে।

টিউনিসকে শুধিয়েছিলাম, এখানে বাঙালীরা এসে ব্যবসা করে না কেনরে? ও বলেছিল যে, বাঙালীরা যে সাহিত্য ভালোবাসে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে, নিজেদের সংস্কৃতি নিজেদের রুচি নিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে, গরীবের মত হলেও নিজের দেশেই বাঁচতে চায়। তবে একেবারে যে করে না তা নয়। কুল্‌জিয়ান করপোরেশনের সাধন দত্ত মশাই এ অঞ্চলে বাঙালীর গৌরব। যদিও তিনি নিজে এখানে থাকেন না।

আমি বললাম, সব বাঙালীই কি সাহিত্য পড়েন? এখন আর ক'জন পড়েন? ক'জন রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন?

www.BanglaBook.org

—যাঁরা শোনার যাঁরা পড়ার তাঁরা ঠিকই শোনেন এবং পড়েন। মহাকাল বলে দেবে যে তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন। শ্যাওলার দল চিরদিনই ছিল, চিরদিনই স্রোতের মুখে ভেসে ভেসে হারিয়ে গেছে। অল্প কজনই ম্যাটার করে এ বাবদে। সব জায়গায় জনগণ চলে না। বুঝেছো।

তারপরই টিউনিস বলল, এখানে অনেক চাকুরে বাঙালী আছেন। সব দুবছর তিন বছরের কন্ট্রাক্ট নিয়ে এসেছেন। বেশীর ভাগই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, অধ্যাপক। অনেকেই তুমি আসছো শুনেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমার বাড়িতে সকলকে নেমন্তন্ন করব কিন্তু একদিন, তুমি ফিরে এলেই। নয়ত আমার ইজ্জত চলে যাবে। তুমি যে আমার সত্যিকারের আত্মীয় তা নইলে তাঁরা তা বিশ্বাসই করবেন না। তাছাড়া, প্রবাসী বাঙালীরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যতখানি শ্রদ্ধাশীল, তা বাঙলার বাঙালীরা কখনই নন। এ কথা প্রবাসে না থাকলে এমন করে জানতে পেতাম না।

আমি বললাম, প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে যা বলেছিস তা একেবারে খাঁটি কথা। আমারও তাই মত। কিন্তু আমি কাজ শেষ হলেই জঙ্গলে চলে যাব। কারো সঙ্গেই দেখা করে নায়ক হবার ইচ্ছা নেই কোনো আমার। অতএব, লক্ষ্মী ছেলে; তুই একেবারে চেপে যা। আমি চলে গেলে নন্‌শালান্টলি জানিয়ে দিস, চলে গেছি।

টিউনিস অসহায়ের চোখে তাকালো আমার দিকে। বলল, তুমি বুঝছ না, ওঁরা সত্যিই বিশ্বাস করবেন না।

আমি বললাম, আমার হয়ে দয়া করে বিশ্বাস করাস; রাগ করিস না। অল্পদিনের জন্যে অন্য দেশ দেখতে এলে সেই দেশের লোকদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হয়। আমি এখনও এমন কেউ-কেটা হইনি যে, আমাকে দর্শন দিতে হবে সকলকে। কখনও হতেও চাই না।

টিউনিস একটু চুপ করে থেকে বলল, সত্যি মামা; এখন মনে হচ্ছে, তুমি না এলেই ভালো হত। আমাকে একেবারেই ডোবালে তুমি।

আমি হেসে বললাম, তাহলে ডোবালামই।

কাজকর্ম শেষ হলে চতুর্থ দিন সকালে হোটেল থেকে চেক্ আউট করে ডার-এস্-সালামের এয়ারপোর্টে এলাম। দীনুভাই, টিউনিস এবং হুইট্‌লী আমাকে সী-অফ্ করে গেল।

চেক্-ইন করে বসে আছি। এয়ার-টান্‌জানীয়া, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সকেও হার মানায় সময়ানুবর্তিতায়। আমার আরুশার প্লেন কখন ছাড়বে এবং আদৌ ছাড়বে কী না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল।

আজ রবিবার। হুইট্‌লী এক স্থানীয় এজেন্সীর লোক, দুজন গুজরাটি ভদ্রলোক, মিস্টার মেহতা এবং মিস্টার প্যাটেল আমার দেখাশুনা করছিলেন। লাউঞ্জে বসে অগুনতি বীয়ারের বোতল খাচ্ছিলেন ওঁরা। আমাকেও সাধলেন। প্রথমে "না" করেছিলাম। শেষে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচার জন্যে এবং ঘণ্টা দুয়েক ওখানে বসে থেকে আমার রেসিস্টান্স ধসে গেল।

একরকমই বীয়ার তৈরী হয় এখানে; আমাদের দেশের বীয়ারের বোতলের চেয়ে

www.BanglaBook.org

অনেক ছোট বোতলে। খেতেও ভালো না। চার পার্সেন্ট অ্যালকোহল থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত বীয়ার কোম্পানী। কোনো প্রতিযোগিতা নেই। অতটুকু বোতলের দামও আট টাকা করে। হয় খান; নয় ভুলে যান।

এদেশীয় মানুষ কথায় কথায় সোয়াহিলীতে বলে, পোলে পোলে অর্থাৎ আস্তে আস্তে। ওরা বিশ্বাস করে তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কাজ। অযথা চিন্তাভাবনাও কম করে। টেন্‌শান কাকে বলে ঘুণাক্ষরে জানে না।

প্লেন দেরী করছে? করুক না। ভালোই তো! আরও বেশী বীয়ার খাওয়া যাবে।

এই অঞ্চলে একটি সোয়াহিলী প্রবাদ চালু আছে :

"হারাকা হরাকা হাইনে বারাকা
কোয়েণ্ডা পোলে হাজী কোয়াই।"

প্রবাদটির মানে হল : তাড়াতাড়ি করলে কোনো কাজই হয় না, আস্তে আস্তে চললে পা মচকায় না। এ বাবদে, এদের সঙ্গে কাবুলীদের খুব মিল আছে। তাড়াতাড়ি করাটা তারাও শয়তানী বলে মনে করে।

তান্‌জানীয়ার মানুষ এই প্রবাদটিকে কিন্তু যথার্থ সম্মান দিয়েছে। সারাদিন বীয়ার খাবে, মনে আনন্দ হলে পথের মাঝখানে আজানুলম্বিত হাত, দারুণ চক্‌চকে মেদহীন দৈত্যসুলভ শরীর দারুণ টরসো আর শিশুসুলভ মন নিয়ে কোমর দুলিয়ে গান আর নাচ জুড়ে দেবে। এমন কেয়ার-ফ্রী, হাসি-খুশী মানুষদের কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে।

এয়ারপোর্টে একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম ডঃ ই. এন. মেকোনি, অর্গাননন ওষুধ কোম্পানীর ইস্ট-আফ্রিকা ও জাম্বিয়ার ম্যানেজার। উনি নিজে যেচে আলাপ করলেন।

অর্গানন-ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পূর্ণেন্দু গুপ্ত আমার পরিচিত এবং ফিনান্স ডিরেক্টর, এ. ভি. জি. আয়েঙ্গার আমার সহপাঠী তা ওঁকে বলতেই ভদ্রলোক বললেন, তবে তো একটা বীয়ার আপনাকে খেতেই হবে।

ভদ্রলোকের বাবা পাদ্রী। ইংরেজী জানেন না। শুধু সোয়াহিলী জানেন। কিন্তু সেই ধর্মযাজকের চোখে মুখে এমন এক শুদ্ধ প্রশান্তি যে দেখলে মনে হয় এমন লোককেই পাদ্রী হলে মানায়। ভগবানকে যেন দেখতে পেয়েছেন সেই বৃদ্ধ, যেন কথা হয় তাঁর সঙ্গে নিয়মিত।

ভদ্রলোকের ছোট বোন অসাধারণ সুন্দরী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—চমৎকার ফেটে-পড়া স্বাস্থ্য; কিন্তু একেবারেই মোটা নন। সাংহাইতে ডাক্তারী পড়ছেন। আজই সাংহাই চলে যাচ্ছেন। তাঁকে তুলে দিতেই সকলে এসেছেন এয়ারপোর্টে।

ডঃ মেকোনী আমাকে "কারিব্যু" বলে জড়িয়ে ধরে জোর করেই বীয়ার খাওয়ালেন। ওঁরা খুবই সেন্টিমেন্টাল। আদর করে কিছু খেতে দিলে সে বীয়ারই হোক, কি মাংস দিয়ে রাঁধা ভুট্টার জবরদস্ত্ খিচুড়ি উগালীই হোক, না খেলে তা নিয়ে বিষম অভিমান এবং অপমান হবারও সম্ভাবনা আছে।

www.BanglaBook.org

তাই হেঁচকি উঠতে থাকলেও ভালোবাসার বীয়ার খেতেই হল।

অবশেষে কিলিম্যান্‌জারোর ফ্লাইট অ্যানাউন্সড্ হল। যাঁরা আরুশা অথবা মোশে হয়ে মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোর দিকে যাবেন সকলেই মুখ ব্যাজার করে টেবল ছেড়ে উঠে পড়লেন। ভাবটা প্লেনটা আরও দেরী করে ছাড়লে আরও ক'বোতল বীয়ার খাওয়া যেত।

বাইরে উজ্জ্বল দিন। নীল আকাশ। ঝকঝকে রোদ। পূর্ব আফ্রিকাতে জুলাই-আগস্টে শীতকাল। ঠাণ্ডাও আছে।

এই প্লেনটাও বোয়িং, নাম সেরেঙ্গেটি। এর লেজেও একটি জিরাফ আঁকা।

অসমান জমিতে গরু, ছাগল চরছে। আদিগন্ত লালচে মাঠ। লাল কালো গুবরে পোকার মত পাহাড়। ক্ষেত খামার কম। তান্‌জানীয়াতে কত জমি যে আবাদ না-করে ফেলে রাখা হয়েছে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অথচ জমি ভীষণ উর্বর।

কিলিম্যান্‌জারো এয়ার-পোর্টে নেমেই চমকে গেলাম। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উড়ে আসছে ট্যুরিস্টরা এই অঞ্চলের বিখ্যাত গেম পার্কগুলি দেখতে। জার্মানরা এখনও দলে ভারী। এই অঞ্চল তো কিছুদিন আগেও জার্মান শাসিত ছিল। এইসব অঞ্চলকে বলাই হতো, জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা। নরডিক্ কান্ট্রির লোকও অনেক। কারণ তান্‌জানীয়ার সঙ্গে এইসব কম্যুনিস্ট দেশ-এর বাণিজ্য সবচেয়ে বেশী। এদের ট্রাক, গাড়ি ইত্যাদিতে দেশ ভরা। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে বড় বড় রুমানীয়া ট্রাক।

ঝকঝকে কাঠের মেঝে ও প্যানেলিং করা দেওয়াল দেওয়া এয়ার-পোর্ট বিল্ডিং। উপরের লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ আর বারও দেখার মত। পৃথিবীর ধনী ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে কি করে পয়সা রোজগার করতে হয় তা এই ছোট্ট দেশ ভালো করেই জেনেছে। এদের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের অনেকই শেখার আছে। আমাদের দেশেও, বন-জঙ্গল, বন্যপ্রাণী কম নেই কিন্তু গত বত্রিশ বছরে কী-ই বা করা হয়েছে এই বাবদে? কতটুকু?

কিলিম্যান্‌জারো এয়ার-পোর্ট থেকে ডাইনে যে পথটা চলে গেছে মোশে হয়ে; কিবো হয়ে; সেই পথে গেলে মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারো। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোর গোলমত বরফ ঢাকা চুড়োটা এত কাছে দেখা যায় যে, মনে হয় এয়ার-পোর্টটা বুঝি পাহাড়ের ছায়াতেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যাব আরুশাতে। বাঁদিকে। উনত্রিশ মাইল দূর এয়ার-পোর্ট থেকে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন রওয়ানা হব জঙ্গলের দিকে।

মিস্টার মেহেতা আর মিঃ প্যাটেলের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতেই উঠলাম। এয়ার তান্‌জানীয়ার বাস ছাড়তে এখনও দেরী আছে। এদিকে বেলাও পড়ে আসছে। কিছুক্ষণ পরই অন্ধকার হয়ে যাবে।

মিঃ মেহেতা আজ রাতটা আরুশাতে থেকে কাল আবার মোয়াঞ্জার প্লেন ধরবেন। লেক ভিক্টোরিয়ার পারে। উগাণ্ডার কাছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শংকর এই মোয়াঞ্জা থেকেই গেছিল রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জে; চাঁদের পাহাড়ে।

রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জে সত্যি সত্যিই কিন্তু "মাউনটেন অফ দ্য ম্যুন" বলে একটা চুড়ো

www.BanglaBook.org

আছে। চাঁদের পাহাড় নিছক কল্পনা নয়।

আমি সশরীরে আফ্রিকাতে এসেছি। কিন্তু না-গিয়ে, শুধুমাত্র বই পড়ে, কতখানি কল্পনা এবং কলমের মুন্সীয়ানা থাকলে ''চাঁদের পাহাড়ে''র মত একটি বই লেখা যায় তাই ভাবছিলাম। বাংলার ব্যারাকপুরের গ্রামের সেই আধভোলা প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষটির কথা ভেবে মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধাতে নুয়ে এল।

আফ্রিকার মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে শুধু শহরেই রয়েছি এ ক'দিন। পাঁচতারা হোটেল, জাপানী ও জার্মান আরামপ্রদ গাড়ি, পশ্চিমী খাওয়া, কনফারেন্স রুম, ট্যাক্সেশানের জার্গন্ এবং শপটক্। এতদিন পরে যখন কিলিম্যান্‌জারো এয়ার-পোর্ট পেছনে ফেলে ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়লাম, হু হু করে দুরের গন্ধভরা হাওয়া আসতে লাগলো নাকে, তখন ভারী ভালো লাগতে লাগল।

আসলে এই উদোম উদ্‌লা প্রকৃতিতেই আমাকে মানায়, এর গায়ের ঘ্রাণেই আমার প্রাণ, এই গাছেদের নিবিড় সান্ত্বনার ছায়াতেই আমার চিরদিনের সম্পূর্ণতা। আমি শহরের নই; একেবারেই নই।

ট্যাক্সির খোলা জানালার উপরে হাত রেখে বসে আছি। নানারকম মিশ্র গন্ধ আসছে নাকে। পথের পাশে ভুট্টা ক্ষেত। আমাদের পুটুস, ইংরিজীতে যাকে বলে ল্যান্টানা; তাকেই সোয়াহিলীতে এরা বলে মেরু। এদিকে ওদিকে অ্যাকাসিয়া গাছ। কত ছবিতে দেখেছি, ফিল্মে দেখেছি এই গাছকে; কত দিনের চেনা। সোয়াহিলীতে এরা ডাকে মিগুংগা বলে। মনে মনে ডাকলাম, এই যে মিগুংগা।

হঠাৎ আমাদের ঝরঝরে ট্যাক্সির পাশ কাটিয়ে ঝকঝকে সাদা নতুনতম মডেলের মার্সিডিস গাড়িতে করে কফি প্ল্যানটেশানের মোটাসোটা এশিয়ান মালিক চলে গেলেন গুজরাটি।

আবার দুধারে ভুট্টার ক্ষেত। ভুট্টাই প্রধান খাদ্য। এদের স্টেপল্ ফুড। ভুট্টার মধ্যে গরুর মাংস মিশিয়ে একরকমের খিচুড়ি রাঁধে এরা। সোয়াহিলীতে একেই বলে উগালী =বিরিয়ানী পোলাউ-এর আফ্রিকান সংস্করণ। পরে একদিন খেয়ে দেখেছিলাম। বাঙালীর পোস্ত আর নিমবেগুন খাওয়া পাকস্থলীর পক্ষে সহজপাচ্য নয়। যদিও খেতে ভালোই লেগেছিল।

অড়হরের মত দেখতে একরকমের ডাল লেগেছে পথের দুপাশে। অড়হরও হতে পারে। গাড়ি থেকে নেমে দেখলে বোঝা যেত। এই অড়হর আমাদের দেশের জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যের ও আশপাশের গ্রামে যখন শীতের সময় ফলে তখন শম্বর ও চিতল হরিণের দলের ঝাঁক খুব শখ করে খায় এগুলো। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে স্থানীয় নাম জিগ্যেস করলাম এই ডালের। ও বলল, টুভার।

মিস্টার মেহতা এবং মিস্টার প্যাটেল বলতে পারলেন না, এটা কি ডাল। নামও জানেন না দেখলাম। শুনলাম, এই ডাল নাকি খেয়েও দেখেননি কখনও। ওঁরা তিনপুরুষ এখানে। বেশীর ভাগ মানুষ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দুই-ই; তাঁদের পরিবেশ সম্বন্ধে এতই উদাসীন

www.BanglaBook.org

যে, ভাবাই যায় না। দুঃখিত হতে হয় জেনে। সমস্ত পৃথিবীতে এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ট্যাক্সির একটা টায়ার হঠাৎ বিনা নোটিশে ফেটে গেল। পথের পাশে আমরা নেমে দাঁড়ালাম। একটা-দুটো শনে ছাওয়া বড় ঘর।। উৎসুক, অর্ধনগ্ন অথবা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, শীতার্ত; ক্ষুধার্ত বুড়ো। আমাদের দেশের যে-কোনো জায়গার যে-কোনো গ্রামের পথের পাশের দৃশ্যর সঙ্গে তুলনীয়। এরা আফ্রিকান। তফাৎ শুধু এটুকুই। আসলে ওরা সকলেই একই জাতের। ওরা গরীব; বঞ্চিত। জনগণের জন্যে ভারতীয় নেতাদের কুম্ভীরাশ্রুর মত শুধু ডুগুর ডুগডুগি বাজিয়েই কি এদেরও সত্যিকারের উপকার করা হবে?

আরুশা প্রায় দার্জিলিং-এর মত একটি শহর। তবে খুবই ছোট। অত উঁচু-নীচুও নয়। খুব ঠাণ্ডা এখন। যেখানে বুকিং করে রেখেছিল হুইট্‌লী সেই হোটেল নিউ-আরুশাতে এসে উঠলাম। এই আরুশা থেকেই বিভিন্ন দিকে চলে যান ট্যুরিস্টরা ইংলিশ ল্যাণ্ড-রোভার অথবা জার্মান ভোকস্‌ওয়াগেন-কোম্বি গাড়ি ভাড়া নিয়ে। এইসব গাড়ির ড্রাইভাররা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজী বলে।

টিউনিস সঙ্গে একটা বই দিয়ে দিয়েছিল আমাকে, বইটা পড়ে নিয়ে সোয়াহিলীতে কাজ চালানোর মত কথাবার্তা যাতে বলতে পারি। প্লেনে এবং হোটেলে সেই বই থেকে পরীক্ষার আগের রাতের ফাঁকিবাজ ছাত্রর মত পড়া মুখস্থ করেছি। আজ রাতেও করতে হবে। নইলে বিষম বিপদ। জঙ্গলে স্থানীয় ভাষা জানাটা নিজের সাধের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে প্রয়োজন, অন্য কিছুর জন্যে না হলেও।

হুইট্‌লী সব বন্দোবস্ত করেই রেখেছিল। ট্যুর-অপারেটর-এর লোক এসে দেখা করলেন হোটেলে। বললেন, কাল ব্রেকফাস্ট করে, ব্যাঙ্কে ট্রাভেলার্স চেক্ ভাঙিয়ে নিয়ে, চেক-আউট করে ঠিক দশটায় তৈরী থাকবেন। আপনার জন্যে আলাদা একটা পুরো গাড়ির বন্দোবস্ত করেছি। কন্‌ডাকটেড ট্যুর-এ গেলে স্বাধীনতা থাকে না। আপনি যেমন খুশী নিজের মত ঘুরবেন ফিরবেন। শুনেছি, আপনি অনেক ঘুরেছেন বনে জঙ্গলে কিন্তু সেই জন্যে এখানে পায়ে হেঁটে কোথাও ঘুরতে যাবেন না যেন। এখানের জানোয়ারেরা গাড়িকে কিছু বলে না, কিন্তু মাটিতে নামলেই বিপদ। তাছাড়া গাড়িতেও সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধিই শুধু ঘুরতে পারেন জঙ্গলে। সূর্য ডোবার পর একদম নয়। এখানে এরকমই নিয়ম।

আমি বললাম, তাই বুঝি?

উনি বললেন, যদি মনে কিছু না করেন, একটা কথা বলব? হুইট্‌লী সাহেব এবং দীনুভাই আপনাকে সবরকম খাতির করতে বলে দিয়েছেন। রাতে বড় শীত। রুম-হিটারে বোধহয় হবে না। আপনার জন্যে মিশরের সাপের মত কালো চক্‌চকে একটি হিল্‌হিলে তরুণী পাঠিয়ে দিচ্ছে—সফিস্টিকেটেড, ভালো ইংরেজী জানে। সব শীত তাড়িয়ে দেবে। যদি চান, তাকে সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারেন। পুরো গাড়িই তো আপনার। ঐ জঙ্গলে একা-একা এতদিন কিন্তু একেবারেই বোরড্ হয়ে যাবেন।

আমি হাসলাম।

তারপর অনেক কিছু বলতে গিয়েও, শুধু বললাম, অনেক ধন্যবাদ। আমি চমৎকার

www.BanglaBook.org

আছি। আমার জন্যে কিছুই করার দরকার নেই।

ভদ্রলোক চলে গেলে ভাবছিলাম, শুধুই ধনদায়িনী লক্ষ্মীর পূজারী হুইট্‌লী বা দীনুভাই কি করে জানবেন যে, যে-মানুষ প্রকৃতি নামক আদিম, নরম, রূপসী এক চণ্ডী নারীর প্রেমে তেমন করে পড়েছে তার কালো অথবা সাদা, কোনো মানবীকেই প্রয়োজন হয় না যখন সে তার পরম প্রেমিকার কাছে থাকে। এমন সুন্দরী, বৈচিত্র্যময়ী, এমন স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ নারী পৃথিবীতে আর কে আছে? যার চোখ আছে, কান আছে, যার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ; সেই শুধু জানে প্রকৃতিকে প্রেমিকা করার আনন্দ কি এবং কতখানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিচ্ছন্ন সকালের ঝকঝকে রোদে বেশ উঁচু মাউন্ট মেরুর চুড়োটা মুখ ঝুঁকিয়ে উপর থেকে ছোট্ট ছিমছাম আরুশা শহরটাকে যেন দেখছিল। আমি জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে মালপত্র রিসেপশান কাউন্টারে সামনে রেখে হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

ঘন ঘন মিলিটারী ট্রাক যাচ্ছে। সাফারির ট্রাকও যাচ্ছে। তান্‌জানীয়ার সঙ্গে ইদি আমিনের উগাণ্ডার যুদ্ধ সবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পথে ঘাটে সৈনিকদের ভীড়। তাদের পোশাক-আশাক দেখে মনে হয়, সোজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছে।

ডাডা আমিন যখন স্বৈরাচার এবং বিকৃতির চরমে ঠিক সেই সময় একদল তান্‌জানীয়ান সৈন্য রাতের অন্ধকারে উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে গিয়ে কাম্পালার রেডিও স্টেশান দখল করে নিল। আটশো সৈন্য ছিল সবসুদ্ধু। তাদের নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল বেঞ্জামিন।

আগে আগে চলছিল রাশিয়ার তৈরী তিনটি টি-ফিফ্‌টি-ফোর ট্যাঙ্ক। তারপর রাতারাতিই তারা কোলোলো পাহাড়ের সম্ভ্রান্ত এলাকা দখল করে ফেলল। কাম্পালার পতন হল। প্রায় ছমাস ধরে লেক ভিক্‌টোরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে তান্‌জানীয়ান সৈন্যরা যে আমিনের সৈন্যদের সঙ্গে বুশ-ওয়ারে লিপ্ত ছিল তার ফলাফল সেই রাতেই চূড়ান্ত হল।

উগাণ্ডার দক্ষিণ-পুর্বে লেক ভিক্টোরিয়া। লেক ভিক্‌টোরিয়ার কাছেই সেই বিখ্যাত জায়গা এনটেবে, যেখান থেকে ইজরায়েলী সৈন্যরা রোমহর্ষকভাবে ডাডা আমিনের গালে চড় মেরে রাতের অন্ধকারে কাজ হাসিল করে ফিরে এসেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এনটেবে অভিযান দুঃসাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এক নিদর্শন হয়ে থাকবে চিরকাল।

লেক ভিক্‌টোরিয়ার পুবে কেনিয়া। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পুবে তান্‌জানীয়া। তান্‌জানীয়ার লেক ভিক্টোরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলের বেশীর ভাগই ন্যাশনাল পার্কস ও গেম পার্কস।

পরে যখন সেরেঙ্গেটিতে যাই তখন পথে অনেক সৈন্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ধূলি-ধূসরিত ক্যামোফ্লেজ-করা জীপের ও ট্রাকের কনভয়তে করে তারা ফিরে যাচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। উগাণ্ডার এক-তৃতীয়াংশ, দক্ষিণের প্রায় পুরোটাই তান্‌জানীয়ার দখলে ছিল তখন।

সেরোনারার কাছাকাছি, তান্‌জানীয়ার একজন তরুণ অফিসার একগাল হেসে আমাকে বলেছিল ঃ আমরা আক্ষরিকভাবেই উগাণ্ডার রাজধানী চুরি করেছিলাম রাতারাতি। কোনো

www.BanglaBook.org

বাধাই পাইনি। সামান্য কিছু স্নাইপারদের বিক্ষিপ্ত গুলি ছাড়া।

হোটেলের সামনে একটা মেরুন-রঙা ভোকস্ওয়াগন-কম্বি গাড়ি এসে দাঁড়াল। পেছনের সীট থেকে লাফিয়ে নামলেন কালকের রাতের ভদ্রলোক। মেরুন-রঙা সাফারি স্যুট পরা কালো কুচকুচে বেঁটে-খাটো স্মার্ট ড্রাইভারও নেমে এল। তার মাথাটা একটি ছোট কাঁঠালের মত। চুলগুলোর জন্যে অমন মনে হল।

ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন। এই আপনার ড্রাইভার-কাম-গাইড। এর নাম কিলালা।

কিলালা, হ্যালো স্যার। বলে হ্যাণ্ডশেক্ করল আমার সঙ্গে।

আমি বললাম, হাউ ডু ড্যু ডু?

কিলালা রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে একগাল হেসে বলল, আই ডু নট ডু এনীথিং—মাই ওয়াইফ ডাজ এভরিথিং।

হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে ট্যুর অপারেটর কোম্পানীর লোকের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, কিলালা ইজ গ্রেট।

তারপর ভদ্রলোক বললেন, অফফ্ ইউ গো। হ্যাভ আ নাইস টাইম।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ড্যু।

আমার মালপত্র উঠিয়ে নিল পিছনে কিলালা। তারপর পেছনের সীটের স্লাইডিং-ডোর খুলে দিল।

আমি বললাম, আমি সামনেই বসব। তোমার পাশে।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

দেখতে দেখতে, গাড়ি শহর ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। আকাশের দুদিকে সার করে লাগানো আকাশমণি বা অগ্নিশিখা গাছ। এখন ফুল ফুটেছে। গাঢ় কমলা রঙের আগুন লেগেছে নীল আকাশের দিগন্তে। কারা লাগিয়েছিল এ গাছ কে জানে? আমাদের দেশে আকাশমণি, আফ্রিকান টিউলিপ; গরমের প্রথমে ফোটে।

আরুশা থেকে মাকুউনী এলাম। তারপর মাকুউনী থেকে কারাটু। দুপুরে লাঞ্চ খাব আমরা লেক মানীয়ারা লজ-এ। সুন্দর চওড়া, পাকা রাস্তা। খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছে কিলালা।

ঘণ্টাখানেক চলার পরই আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। এখানকার ধুলো আমাদের দেশের ধুলোর মত নয়। নানারকম ধাতব পদার্থ মেশানো আছে বলে বোধহয় অনেক ভারী। এই পথের ধুলোর রঙ লালচে। অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের ধুলো কালচে-লালচে-সাদা।

বাঁদিকে অনেক দূরে, খোলা মাঠের মধ্যে প্রায় পাঁচশ ওয়াইল্ড বীস্ট দেখলাম। আফ্রিকাতে এসে এই প্রথম জংলী জানোয়ার। এদেরই আরেক নাম ন্যু।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলেও কিলালা গাড়ি দাঁড় করাল না। মনে মনে বিরক্ত হলাম। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, কেন দাঁড় করায়নি গাড়ি। ওয়াইল্ড বীস্ট পরে এতই

www.BanglaBook.org

দেখেছিলাম যে, প্রায় যেন্না ধরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই জানোয়ারদের একটা খেতাবও আছে। ক্লাউনস অফ আফ্রিকা। ক্লাউন বলার কারণও আছে অনেক।

দুদিকে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ জমি। আফ্রিকাতে বোধহয় জমি-জমার কোনো মা-বাবা নেই। অনেক ভারতবর্ষ আফ্রিকার মধ্যে অবলীলায় সেঁধিয়ে যাবে।

কাঁচা পথ নানা জায়গায়তে নদীর জলে অথবা বৃষ্টির জলে ডুবে রয়েছে। দুতিন ফিটের মত জল এক এক জায়গাতে। এক ফার্লং দেড়-ফার্লং জায়গা ডুবে রয়েছে অনেক জায়গায়। তার উপর দিয়েই বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ আওয়াজ করে ভোকস্ওয়াগন-কম্বির পেছনের এঞ্জিন জল সাঁতরে, কাদা ছিট্‌কিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড শক্তি ধরে এই গাড়িগুলো। অথচ সওয়ারী আরামে যায়।

দুপাশে ভুট্টা ফলেছে। আর সেই কালকে দেখা টুভার ক্ষেত। সূর্যমুখীর চাষও করেছে ওরা। তেল খায় ওরা সূর্যমুখীর। ভীষণ আন্‌রোম্যান্টিক। মাঝে মাঝে বাবলা গাছ মাথা উঁচিয়ে আছে। একটা সেক্রেটারী বার্ড গলা লম্বা করে ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। এদের মাথার পেছনে পালকের মুকুটের মত আছে। মাথা নাড়লেই সেগুলো নড়ে। বহুদিন আগে সেক্রেটারীরা এই পাখির পালক দিয়ে লেখালেখি করতেন, সেই সুবাদে এদের নাম হয়েছে সেক্রেটারী বার্ড। সাপ, ইঁদুর এসব ধরে খায় এরা, আমাদের ময়ূরের মত।

ডানদিকে পড়ল একটা বড় সারস।

কিলালা বলল, ইয়োরোপীয়ান স্টর্ক, বানা।

বানা মানে স্যার, মাস্টার।

কিলালা আমাকে স্যার না বলে বানা বলাতে, গাড়ির মধ্যেও আফ্রিকান পরিবেশ তৈরী হয়ে উঠল। ইংরেজী শিকারের গল্পের বইয়ে ছোটবেলা থেকে বানা সিম্বা, বানা টেম্বো ইত্যাদি পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছিল। সিম্বা মানে সিংহ, টেম্বো মানে হাতি। কিন্তু জাম্বো মানে যে কি তা এখানে না এলে জানতাম না। জাম্বো জেট-এ চড়েছি। কিন্তু জাম্বো মানে যে সোয়াহিলী ভাষাতে "হ্যালো" তা এই অঞ্চলে এসেই শুধু জানলাম।

কিলালা উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির ড্রাইভারদের হাত তুলে বলছিল, জাম্বো ডাডা। ওরা উত্তরে বলছিল, সিজাম্বো।

সোয়াহিলীতে মেয়েদের সম্বোধন করে কাকা বলে।

আমাদের কাকারা শুনলে আপত্তি করতে পারেন।

বেলা দুটো নাগাদ লেক মানীয়ারার হোটেল-এ এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের একেবারে চূড়োতে হোটেলটা। সোজা অনেক নীচে এবং দূরে দিগন্তবিস্তৃত লেক দেখা যাচ্ছে। লেকের একটা পাশ গোলাপি হয়ে রয়েছে ফ্লেমিংগোদের গোলাপি-সাদা ডানায়। পাহাড়ের পায়ের কাছে শ্যাওলা-সবুজ ও কাঁচা-কলাপাতা সবুজ জঙ্গল। রেইন-ফরেস্টস্‌। এই লেক-মানীয়ারা আগে শিকারিদের স্বর্গ ছিল। লেক-এ নানারকম পাখি, কুমির, জলহস্তী, আর লেক-সংলগ্ন জঙ্গলে সিংহ, চিতা, গণ্ডার, হাতি এবং অন্যান্য জীবজন্তু প্রচুর। এখানের

www.BanglaBook.org

চিতা ও সিংহরা গাছে চড়ে ঘুমোয়। গাছের উপরেই দেখা যায় এদের বেশী। থমসনস্ গ্যাজেল কি ইম্পালা মেরে নিয়ে গাছের উপর ঝুলিয়ে রাখে দুটি ডালের মাঝে। তারপর ধীরে সুস্থে খায়। ট্রি-ক্লাইম্বিং লেপার্ড ও লায়নই এখানের বিশেষত্ব। এই অঞ্চলের আর এক বিস্ময় বাওবাব্ গাছ। কত হাজার বছরের পুরোনো যে সব বাওবাব্ আছে তা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাই বলতে পারেন।

বাওবাব্-কে বলে "দ্য আপ-সাইড ডাউন-ট্রি।"

কিন্তু এখানে এখন আমি থাকব না। থাকব ফেরার সময়। তিনদিন।

লাঞ্চে ভুট্টার স্যুপ এনে দিল—এত ভালো খেতে যে কী বলব! অরা একবার চেয়ে খেলাম। শীতের মধ্যে গাড়িতে এতখানি এসে ঠাণ্ডাও মেরে গেছিলাম। গরম স্যুপ চাঙ্গা করে দিল শরীর।

লাঞ্চ সেরে, পাইপ ধরিয়ে, গাড়িতে এসে বসলাম কিলালার পাশে।

আমি যা খেলাম, কিলালাও তাই খেল। দেখে ভালো লাগল। সোস্যালিজম্-এর অনেক ভালো দিকও আছে। আমাদের দেশেও কবে ড্রাইভার, চাকর, বেয়ারারা আমাদের সমান সমান সম্মান ও মর্যাদা পাবে, তাই ভাবছিলাম। মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কিছুই নেই; তফাৎ সব তৈরী করা—সুযোগের অভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

কিলালাকে বললাম, পেট ভরে খেয়েছো?

কিলালা বলল, আশান্টে বানা।

আশান্টে, মানে থ্যাঙ্ক উ্য।

শীত দেখতে দেখতে বাড়তে লাগল। সাফারি স্যুটের উপর পাতলা ওভারকোটটা চাপিয়ে নিলাম আমি। জানালার কাঁচ তুলে বসতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। তা যতই শীত লাগুক না কেন, কিলালার দেখলাম ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ নয়। সে তার দিকের সব জানালার কাঁচই বন্ধ করে দিয়েছিল। জানালা কেন সে একেবারেই খুলতে চায় না সে-কথা জেনেছিলাম অনেক পরে।

আজ রাত কাটাব গোরোংগোরোর ক্র্যাটার লজে। গোরোংগোরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মৃত আগ্নেয়গিরি। সেরেঙ্গেটির দিক থেকে দেখলে মনে হয় একটা অতিকায় সবুজ-রঙা মেঘে ঢাকা পাহাড়ের দারুণ উঁচু জামবাটি।

আগ্নেয়গিরির বলয়ের একেবারে উপরে লজটি। নীচে সোজা নেমে গেছে দু-আড়াই হাজার ফিট নীচু আগ্নেয়গিরির পথটা। নীচটা সমতল। সেখানে একটা হ্রদ আছে। জঙ্গল ও ঘাসভূমিও আছে। পাহাড়ও আছে।

মাসাইদের এ-অঞ্চল থেকে সরানো যায়নি। তাদের গোচারণের ভূমি গোরোংগোরো কনসার্ভেশান এরীয়ার মধ্যেই। অদ্ভুত জাত এই মাসাইরা। আমাদের দেশের বন-পাহাড়ের বহু উপজাতিদের সঙ্গে মেশার সুযোগ আমার হয়েছে, কিন্তু আফ্রিকার এই মাসাইরা তাদের চেহারা, পোশাক-আশাক, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তায় নিশ্চয়ই অনন্য। তাদের কথা পরে বলব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোরোংগোরো ক্র্যাটার লজ-এর উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফিটের মত। এবারে যেমন ঠাণ্ডা লাগছে তেমনই ছায়াচ্ছন্ন, পাহাড়ী হয়ে উঠেছে পথ। এখানের পথের কালচে-সাদা ধুলো নাকে গেলে নাক জ্বালা করে। আগ্নেয়গিরির লাভার সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল পৃথিবীর বুকের কোরকের কত না মিশ্র ধাতু, কত গ্র্যানাইট, বাসাল্ট, মার্বল, আরো কত কিছু। এ তো শুধু ধরিত্রীর বুকের ধুলো নয়, বুকের পাঁজরের গুঁড়োও বটে। তাই-ই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এই ধুলোয়।

আমাদের আগে আগে চলেছে একটা বিরাট স্থানীয় রেফ্রিজারেটেড ট্রাক, হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো বিভিন্ন লজের জন্য ফল, খাবার-দাবার, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি বয়ে নিয়ে।

তান্‌জানীয়ান সরকার অতিথিদের কোনোরকম কষ্টই দিতে চান না।

তান্‌জানীয়ার মত ছোট্ট সামান্য দেশ যা করতে পেরেছে আমরা তার এক শতাংশও পারিনি। না পেরেছেন বন-বিভাগ, না পর্যটন বিভাগ। বড় দুঃখ হয় একথা ভাবলে। আফ্রিকার বন-জঙ্গলের উপর যত ডকুমেন্টারী ও ফিচার ফিল্মস এবং যত বই লেখা হয়েছে পশ্চিমী ভাষায়, তার কিছুমাত্র হয়নি ভারতবর্ষের বন-জঙ্গলের উপর।

সন্ধ্যের মুখোমুখি গোরোংগোরো লজে এসে পৌঁছলাম। লজটির লাউঞ্জ থেকে নীচের ক্র্যাটারটা দেখা যায়। ক্র্যাটারের মধ্যের প্রকাণ্ড হ্রদের একপাশে ফ্লেমিংগোর দল বসে আছে। তাদের পালকের গোলাপী ছায়া পড়েছে জলে। আসন্ন সন্ধ্যায় নীচের ক্র্যাটারটাকে একটি বিরাট ধূসর-সবুজ ক্যানভাসের উপর নীল ও সবুজে আঁকা একটি ছবি বলে মনে হচ্ছে। ক্র্যাটারটার নীচের পরিধি একশ দু-স্কোয়ার মাইল। ক্র্যাটারের নীচের জমির উচ্চতাও সমুদ্র সমতা থেকে পাঁচ হাজার ছ'শ ফিট মত। আর ক্র্যাটারের উপরের বলয়ের গড় উচ্চতা সাত হাজার পাঁচশ ফিট। সেইজন্যে লজ থেকে ক্র্যাটারে নামতে হলে প্রায় আড়াই হাজার ফিট কাঁচা রাস্তা বেয়ে নামতে হয়।

গোরোংগোরোর চারপাশে যা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তার তুলনা খুব বেশী নেই। ছ'টি পাহাড় চুড়ো ঘিরে রয়েছে একে চারদিকে তাদের মধ্যে অনেকের উচ্চতাই দশহাজার ফিটের চেয়ে বেশী। আসলে, সবক'টি চুড়োই নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। তিনটি তো ভেঙে ক্যালডেরা হয়ে গেছে। সেই তিনটির নাম ওলডেআনি, ওলমোটি আর এমপাকাই। যে তিনটিতে এখনও আগ্নেয়গিরির গড়ন অক্ষুণ্ণ আছে তাদের নাম মাকারুট্, লোসিরুয়া এবং লোল্‌মালাসিন্।

লজ-এর ডাইনিংরুম বার আর লাউঞ্জটা একসঙ্গে। থাকবার জায়গা ছোট ছোট কটেজ। ইলেকট্রিসিটি নেই। গ্যাসের গীজার বাথরুমে। জেনারেটরে আলো জ্বলে। তবে রাত দশটাতে আলো নিভিয়ে দেয়। গ্যাসের রুম হিটার। প্রত্যেকেটি ঘর থেকে ক্র্যাটারটা দেখা যায়। কাঁচের বিরাট জানালা। তার সামনে বসার জায়গা। যাতে ইচ্ছে করলে ঘরে বসেই সারাদিন ক্র্যাটারের দিকে চেয়ে কাটানো যায়।

রাত আটটার সময় ডাইনিংরুমে এলাম খেতে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সোনায়

www.BanglaBook.org

সোহাগা। একে এখন এখানের শীতকাল তায় আট হাজার ফিট উঁচুতে আছি তার উপর আবার বৃষ্টি।

কিলালা অন্যান্য ড্রাইভারদের সঙ্গে বার-এ বসেছিল। ওকে বীয়ার খাওয়ালাম। ও আমাকে একটি ছিপছিপে স্মার্ট লম্বা ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এর নাম ডিক্সন্। এই আপনাকে কাল ক্র্যাটারে নিয়ে যাবে জানোয়ার দেখাতে। ল্যাণ্ড-রোভারে করে।

ডিক্সন্ মাথার টুপি খুললো। আমিও খুললাম। বললাম, জাম্বো।

সিজাম্বো! বলে ডিক্সন হ্যাণ্ডশেক করল আমার।

তারপর বলল, কাল ভোর ঠিক ছ'টায় বেরিয়ে পড়তে হবে। তখনও অন্ধকার থাকবে। কিন্তু সকাল সকাল না গেলে ভালো দেখা যাবে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তারপর আমরা তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসলাম। গা-গরম করার জন্যে আমি একটু জ্যামাইকান্ রাম খেলাম। তারপর গরম স্যুপ। ওয়াইল্ড বীস্টদের সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়াতে এখানের গেম-ওয়ার্ডেন ওয়াইল্ড বীস্ট শিকার করেছিলেন আজ সকালে। ওয়াইল্ড বীস্ট-এর স্টেক খেলাম। খেতে অনেকটা আমাদের সম্বরের মাংসের মত। কিন্তু সম্বরের মাংসে যে মাটি মাটি গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা নেই।

ওভারডান না হলে আমি খেতে পারি না কোনো স্টেকই। তাই বেয়ারাকে বলে, বেশী সিদ্ধ করিয়ে আনালাম। বীফ স্টেকের মতই ওয়াইল্ড বীস্ট স্টেকও আণ্ডারডান করে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।

ডাইনিংরুমের দেওয়ালে একটি অল্পবয়সী ইয়োরোপীয়ান ছেলের বিরাট ফোটো টাঙ্গানো ছিল, গোরোংগোরোর নানান জানোয়ারদের ছবির সঙ্গে।

ডিক্সন্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার ছবি?

খেতে খেতে ঘাড় না ঘুরিয়েই ও বলল, মাইক জিমেক্-এর।

আমি বললাম, তাই বুঝি।

তারপর খাওয়া ছেড়ে ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। ডাইনিংরুমের ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছিল এবং আমরা ফায়ারপ্লেসের কাছের টেবলেই বসেছিলাম। তবু মনে হচ্ছিল যেন হাত-পা সব জমে যাবে।

জার্মানী থেকে ইটালী যেতে গিয়ে একবার বরফে আটকে গেছিলাম প্রথম শীতে। গাড়ির হিটারও খারাপ হয়ে গেছিল। সেই রাতের শীতের কষ্টর কথাটা মনে পড়ল এই গোরোংগোরোর রাতে।

খেয়ে-দেয়ে ঘরে এলাম। বাইরে তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কটেজের টিনের ছাদে পুটুর পুটুর করে জলের নূপুর বাজছে। জামা-কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তও ছিলাম। সেই সকাল থেকে গাড়িতে আসছি। নিজে গাড়ি চালালে আমার যত না ক্লান্তি লাগে, অন্যের চালানো-গাড়িতে বসে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্লান্তি লাগে। ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স থাকলেও, ট্যুওর-অপারেটর কোম্পানীর সেই ভদ্রলোক আমাকে

www.BanglaBook.org

গাড়ি চালাতে বারণ করেছিলেন। হুইট্‌লীও বার বার বারণ করেছিল।

কারণ জানি না।

গ্যাসের রুম হিটারটা নিজের মনে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল। কী আরাম! কম্বলটা গলার কাছে গুঁজে নিলাম আর একটু।

আস্তে আস্তে, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির বলয়ের উপরের ছোট টিনের কুঁড়েতে বৃষ্টির নাচের শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম যে অজানিতে, নিজেই জানি না।

স্বপ্ন দেখছিলাম, লাল পোশাক পরা মাসাইদের এক বোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমাকে ওরা রক্ত খেতে দিয়েছে। খেতে দিয়ে অপলকে সাত ফুট লম্বা মানুষগুলো নানারঙে রঙ করা ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় কে যেন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলে। আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আবারও কে যেন ধাক্কা দিল।

তাড়াতাড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে বালিশের তলায় ঘড়ি তুলে দেখি, পাঁচটা বাজে।

বাইরের থেকে কে যেন বলল, কফি, স্যার। ইওর কফি।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলতেই মনে হল এক চাঁই বরফ কেউ আমার ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। এক হাতে কফির ট্রেটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য হাতে দড়াম্‌ করে দরজা বন্ধ করলাম। আমার সংক্ষিপ্ত আশাণ্টের সঙ্গে যে বেচারী কফি নিয়ে এসেছিল তার আঙুল-টাঙুলও দরজায় চাপা পড়ল হয়ত বা। কিন্তু উঃ আঃ শোনার অপেক্ষা না করেই আবার কম্বলের তলায় ঢুকে গিয়ে কফি ঢাললাম পট থেকে; কাপে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যখন গোরোংগোরো লজ থেকে রওনা হলাম তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চারধারে চাপ-চাপ কুয়াশা। এখনও ভালো করে আলো ফোটেনি।

ডিক্সন্ খুব জোরে বাঁক নিচ্ছে। পাহাড় থেকে পথটা ক্রমাগত নীচে নামছে। দুটো ফগ্ লাইট জ্বলছে ল্যাণ্ড-রোভারের সামনে। তবু, কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সামনের সীটে ডিক্সনের পাশে বসে হাত দুটো গরম করবার জন্যে আমি পাইপ ধরিয়েছি।

পথটা অনেকটা দার্জিলিং থেকে টাইগার হিলে যাওয়ার মত। তবে অন্ধকারে সেখানে চড়াই উঠতে হয়, এখানে উত্‌রাই নামতে হচ্ছে।

ডিক্সন্‌কে বললাম, আস্তে চলো ডিক্সন্।

ও ক্যাজুয়ালী, চাপা গলায়; বাঁক নিতে নিতে বলল, নো প্রবলেম্।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ একমাত্র ভয়, কোনো মাসাই ক্যাটল-এর গায়ে ধাক্কা লেগে যাওয়া। তাহলেই ঝামেলা বাধবে।

এত ভোরে ঐ ঠাণ্ডাতেও দেখলাম পথের পাশে, ডাইনে বাঁয়ে মোটা, লালরঙা হাতে-বোনা গরম কাপড়ের পোশাকে লম্বা লম্বা মাসাইরা বর্শা বা প্রকাণ্ড দা হাতে শিশির ও বৃষ্টি-ভেজা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে ভুতুড়ে লালচে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত।

আমি ডিক্সন্‌কে শুধোলাম, তুমি মাইক জিমেক্‌কে কখনও দেখেছো?

ও বলল, না।

তারপর বলল, আমি মাইকের বাবা বার্নার্ড জিমেক্‌কে দেখেছি। উনি তো প্রতি বছরই আসেন।

এই জিমেক্‌রা এসব অঞ্চলে প্রবাদ হয়ে উঠেছেন। মাইক আর বাবা তাদের ছোট্ট প্লেনে করে সবচেয়ে প্রথম সেরেঙ্গেটি প্লেনইস-এর জীব-জানোয়ারের সুমারি করেন। তখনই তাঁদের হিসাব অনুযায়ী সেরেঙ্গেটিতে সমস্ত জীব-জানোয়ার মিলে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার প্রাণী। বছর তিনেক বাদে একজন আমেরিকান প্রাণীবিজ্ঞানী নতুন করে গুনে দেখেন যে ঐ সংখ্যা আরও অনেক বেশী। আসলে প্রতি বছর সেরেঙ্গেটির জীবজন্তুদের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে, বর্তমানে মানে উনিশশো উনআশীতে তা পনেরো লক্ষেরও উপরে এসে পৌঁছেছে।

তান্‌জানীয়া গরীব দেশ কিন্তু বন্যপ্রাণী ও বন সংরক্ষণের জন্যে ইউ-এস-এর মত ধনবান দেশের তুলনাতেও আট গুণ বেশী খরচ করে আনুপাতিক হিসেবে। এই প্রচেষ্টার পেছনে প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নীয়েরের অবদান অসামান্য। ডঃ বার্নার্ড জিমেকের মত জার্মানদেরও অনেক অবদান আছে এই বাবদে। সেরোনারাতে জার্মানীর পল্ থীসেন্

www.BanglaBook.org

ফাউণ্ডেশানের উদ্যোগে সেরেঙ্গেটি রিসার্চ ইনস্টিট্যুট গড়ে উঠেছে। সেখানে পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীরা প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারকম গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রকৃতিই একদিন আধুনিক মানুষের সর্বশেষ অবলম্বন হবে; শেষ অভয়াসন। এতে কোনো ভুল নেই! আজকেও যদি আমরা এ বিষয়ে সচেতন না হই, এখনও যদি এই হারেই বন সম্পদ ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস করে চলি আমাদের দেশে, তাহলে এর মূল্য দিতে হবে আমাদের জীবন, সৌন্দর্যবোধ এবং মানসিক ভারসাম্য দিয়ে। সে বড় দুর্দৈব হবে।

কিন্তু এখনও আমাদের দেশে এ বিষয়ে যতখানি সচেতনতা আসা উচিত এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে যেটুকু উদ্যোগ হওয়া উচিত তার কিছুই হচ্ছে না। এর পরিণাম ভয়াবহ!

মাইক জিমেক্ ডঃ বার্নার্ড জিমেকের একমাত্র সন্তান। সেরেঙ্গেটির সুমারি যখন তাঁদের প্রায় শেষ সেই সময় একদিন এই গোরোংগোরোর কাছেরই এক পাহাড়ে মাইকের ছোট্ট প্লেনটা ধাক্কা খায় হঠাৎ। মাইক একাই ছিল প্লেনে এবং সেই-ই চালাচ্ছিল প্লেনটি। সাদা কালো ডোরা-কাটা জেব্রার রঙে রঙ করা ছিল বলে প্লেনটির নাম দিয়েছিল ওঁরা "ফ্লাইং জেব্রা"। বাবা তখন অন্যত্র ছেলের অপেক্ষায় বসেছিলেন। ছেলে এলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবেন। বিকেলে একজন পত্রবাহক বয়ে নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে এই দুঃসংবাদ।

মাইকের মৃত্যুর পর ডঃ বার্নার্ড জিমেকের জীবনে সেরেঙ্গেটি অন্য এক নতুন ও গভীরতর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেরেঙ্গেটি এখন কেবল তাঁর ভালো লাগার জায়গা মাত্রই নয়, তাঁর ক্রেজমাত্র নয়; তাঁর হারানো ছেলে মাইকের স্মৃতির জায়গা।

গোরোংগোরো ক্র্যাটার-এ ওঠার সময় পথের পাশে এই বিরাট জামবাটির ঠিক ঠোঁটের উপর একটি অনাড়ম্বর পাথর জড়ো করা কবর আছে। একটি পাথরে এই কথাকটি লেখা আছে।

He gave all he possessed for the wild animals of Africa including his life. MICHAEL GRZIMEK 12/4/34—10/1/59

আমি ভাবছিলাম, আমাদের দেশেও অনেক মাইকেল জিমেকের প্রয়োজন হয়েছে আজকে। এই মাইকেলের মত অনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে গোষ্ঠী, দল এবং রাজনীতি-নিরপেক্ষ একটি বেসরকারী সংস্থা গড়ে তোলার সময় হয়েছে আমাদের বন ও বন্যপ্রাণী বাঁচানোর কারণে।

হঠাৎ ডিক্সন্ বলল, হোয়াই আর ঊ্য সো সাইলেন্ট স্যার?

আমি চমকে উঠলাম। ভাবনার মেঘে ভেসে চলেছিলাম বাইরের কুয়াশা আর মেঘের দিকে চোখ রেখে।

বললাম, নাঃ।

ডিক্সন্ বলল, এইবার আমরা প্রায় নীচে নেমে এসেছি।

নীচে অত কুয়াশা নেই। যতটুকু আছে, তা পেঁজা পেঁজা।

এবার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করলাম। আমি নিজে কোন দিনও ক্যামেরাতে

www.BanglaBook.org

বিশ্বাস করিনি। অবশ্য জানি যে, এমন আহাম্মকের মত কথা বললে এযুগে সবাই হাসবেন, যে যুগে মানুষের চোখেরই বিকল্প হয়েছে ক্যামেরা।

সৈয়দ মুজতবা আলীই বোধহয় এক জায়গায় লিখেছিলেন, "চোখের থ্রি-পয়েন্ট ফাইভ লেন্সে ছবি তুলে মগজের ডার্করুমে রেখে দিই আমি, তারপর যখন যেমন ইচ্ছে এনলার্জ করে নিই।"

চোখ যা দেখে, কান যা শোনে, নাক যা ঘ্রাণে পায় তা শুধুমাত্র ছবিতে ধরা মুশকিল। তাছাড়া আমি যা কিছু দেখি, তা আমার সমস্ত সত্তার ওয়াইড-অ্যাঙ্গল লেন্স এবং টেলিফোটো লেন্স দিয়েই দেখি। কোনো শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যের সামগ্রিক ফ্রেমের টোটালিটিই আমার অনুভূতির ডার্করুমে পরিশীলিত, পরিশোধিত হয় বলে মনে করি। সেই কারণেই ক্যামেরা যন্ত্রটির উপর আমার তেমন আস্থা বা ভালোবাসা নেই। আমার নিজের কোনো ক্যামেরাও নেই। আমার ছোট ভাই তার মিনোল্টা ক্যামেরাতে ফিল্ম ভরে দিয়ে বলেছিল কোলকাতাতে থাকতে থাকতেই একটা রোল তুলে নাও, তাহলে হাত সড়গড় হবে। কিন্তু আসার আগে কাজের চাপে তা আর হয়ে ওঠেনি।

লজ্জার কথা কী বলব, যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার এমনই একটা জন্মগত হীনম্মন্যতা এবং অনীহা আছে যে কী করে ফিল্ম ভরতে হয় বা খুলতে হয় তা পর্যন্ত আমি জানি না। কেউ শেখালেও ভুলে যাই পরমুহূর্তে। ভাই আবার ভালোবেসে তার টেলীফোটো লেন্সটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। বেচারা জানতো না যে, তার ব্যবহার তো হবেই না বরং সুন্দর চামড়ার কেসটা হাজার হাজার মাইল প্লেন ও গাড়ির জার্নিতে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে।

আরুশাতে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে একটা ক্যামেরার দোকানে গিয়ে ফিল্মটা ভরে নিয়েছিলাম। ক'টা ফিল্মও কিনেছিলাম। সবই কালার্ড ফিল্ম।

প্রথমবার মা হওয়ার পর মেয়েরা যেমন গদগদ হয়ে সন্তান কোলে বসে থাকে, আমিও তেমন ক্যামেরা কোলে করে বসে আছি এখন—। থাকতে হবে অনেকক্ষণ। অনেকদিন।

আমরা এবার ক্র্যাটারের মধ্যে সমতলে নেমে আধ মাইলটাক চলে এসেছি। এমন সময় দুটো ওয়ার্ট-হগ প্রায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে লেজ উঁচু করে দৌড় লাগালো। এই জানোয়ারগুলো শুয়োর জাতীয়। একমাত্র আফ্রিকাতেই পাওয়া যায়। এদের অদ্ভুত স্বভাব। যখন দৌড়োয় তখন লেজটা উঁচু করে রাখে ফ্লাগস্ট্যাণ্ডের মত। এবং লেজের ডগায় কালো চুলগুলো পতাকার মত নড়তে থাকে। যতক্ষণ দৌড়োয়, ততক্ষণই লেজ খাড়া থাকে।

তারপর জীব-জানোয়ারের ভেলকি চলতে লাগল। নরম-নীলচে গিনি-ফাউলের দল গুটি গুটি দৌড়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। রাতভর পেট-মাদিয়ে খেয়ে টান টান হয়ে শুয়ে আছে স্পটেড হায়নারা কাঁচা পথের উপরে। স্ট্রাইপড় জাকেলস্‌রা ইতি-উতি চাইছে। তাদের ছানাপোনারা গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে। শেয়াল পণ্ডিত এক কুমীরের ছানাই বহুবার দেখায় জানি, কিন্তু নিজেদের ছানাদের বেলায় কি করছে এই পণ্ডিত শেয়ালেরা তা বোঝা গেল না।

www.BanglaBook.org

দূরে একদল পাহাড়-প্রমাণ মোষ চরছে। বুনো মোষ। আমাদের দেশের বুনো মোষ-এর শিং ছড়ানো হয়। এদের শিংগুলো অত ছড়ানো নয়। চেহারাতে আমাদের দেশের বাইসন-এর (গাউর) সঙ্গেই বেশী মিল যেন। গায়ের রঙ লালচে কালচে—। লোমগুলো বেশ বড় বড়।

এগুলো কি? ডিক্সন্‌কে শুধোলাম আমি।

ডিক্সন্ বলল, ওয়াটার-বাক্। এক রকমের এণ্টিলোপ্।

বুশ-বাক্, ওয়াটার-বাক্, এলাণ্ড, ইম্পালা, থমসনস্ গ্যাজেল এবং গ্রাণ্টস্ গ্যাজেল। আর ওয়াইল্ড বীস্টদের তো লেখা-জোখা নেই। ওয়াইল্ড বীস্টগুলো সত্যিই ক্লাউন। বিধাতা এদের নিয়ে কোনোরকম রসিকতাই বাদ দেননি মনে হয় সৃষ্টির সময়।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্প আছে "ঘোড়া"। তাতে আছে, বিধাতার সৃষ্টির শেষে ক্ষিতি অপ্ এবং মরুৎ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বেশী পরিমাণে রয়ে গেছিল শুধুমাত্র ব্যোম্। সেই ব্যোমের অনেকখানি দিয়ে বিধাতা ঘোড়া তৈরী করেছিলেন। তাই সে জানোয়ার কারণে-অকারণে নিজের মনে দৌড়ে বেড়াত।

তারপর অবশ্য গল্পের পরিণতি অন্যরকম ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ওয়াইল্ড বীস্ট নিশ্চয়ই দেখেননি। দেখলে, আমরা হয়ত আরও ভালো একটি গল্প উপহার পেতাম।

এই জানোয়ারগুলোর অদ্ভুত গড়ন। অসমান পায়ের কারণে তেমনই অদ্ভুত চলন। শরীরের যেখানে যেখানে চুল অন্য জানোয়ারের বেলা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি, তেমন তেমন জায়গায় একগাদা করে চুল দিয়ে দিয়েছিলেন। সৃষ্টির শেষে বোধহয় চুল বাড়তি হয়েছিল। রামছাগলের মত দাড়িওয়ালা মুখ, হরিদ্বারের সন্ন্যাসীদের মত জটাজূট-সম্বলিত মাথা, বিট্‌কেল্ কান ও মজাদার মুখশ্রীসম্পন্ন জানোয়ারগুলো যখন গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেদের খেয়ালে নাচে তখন যে-কোনো ডাকসাইটে সার্কাস কোম্পানীর ক্লাউনদেরই লজ্জা পাবার কথা। এই জানোয়ার বেশী পরিমাণে আমাদের দেশের চিড়িয়াখানাতে আনা গেলে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এদের দেখে মজা পেত। দলে না থাকলে এদের মজাটাই বোঝা যায় না। ভারতবর্ষের ক্লাউন যেমন ভারতবর্ষের কিছু রাজনৈতিক নেতারা, আফ্রিকান ক্লাউন হচ্ছে এরা।

সুন্দর ছাইতে-বাদামীতে মেশা হালকা কালোর মোটা মোটা রেখা টানা ও সাদা পেটের গ্র্যাণ্টস্ গ্যাজেল অনেক ছিল এদিক ওদিকে। তাদের চেয়ে আকারে ছোট বাদামী-কালোতে মেশা থমসনস্ গ্যাজেলরাও দলে ভারী। থমসনস্ গ্যাজেলগুলো সব সময় লেজ নাড়ায়। লেজে ব্যাটারী ফিট্ করা আছে কী না কে জানে; ব্যথাও কি ধরে না?

কালোতে-বাদামীতে মেশা লেজের উপরটা। আর তলাটা সাদা। পশ্চাৎদেশে বিশেষ করে মেয়েদের; সুন্দর সাদার উপর কালোর রেখা টেনে ডিজাইন করা। ওদের জাতের পুরুষরা মেয়েদের আদর করার মুহূর্তে বড় নয়নলোভন দৃশ্য দেখে।

বিধাতা মানুষদের আরও অনেক সুন্দর করতে পারতেন। নারীদের তাও যা সুন্দর

www.BanglaBook.org

করলেন, আমাদের বেলা তাবৎ প্রাণীজগতের ব্যতিক্রম ঘটালেন। সমস্ত জীবজন্তু পাখিদের পুরুষরাই বেশী সুন্দর নারীদের থেকে। মানুষদের বেলাই উল্টোটা।

ডিক্সনের গাড়ির ছাদ খোলা যায়। স্লাইডিং ডোর আছে। আমি পিছনের সীটে দাঁড়িয়ে সেই ফোকর দিয়ে মাথা উঁচু করে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলাম।

অন্যান্য গাড়িতে সবাই শ্বেতাঙ্গ। যদিও দেশটাই কুচকুচে কালোদের কিন্তু আজ আমিই একমাত্র কালো পর্যটক একা একটি গাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সকলেই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, আমাকে বোধহয় খুব সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে —রাজা মহারাজার মত। কিন্তু একসময় মাথা নামিয়ে গাড়ির আয়নায় তাকিয়ে দেখি, অবিকল একটি ওয়াইল্ড বীস্ট-এর মুখ। শিশিরে, কুয়াশায়, ঠাণ্ডায় চুলগুলো ভিজে লেপ্টে, নাক লাল হয়ে, দারুণই সুন্দর দেখাচ্ছিল আমাকে।

সেই মুহূর্তেই ওয়াইল্ড বীস্টদের নিয়ে আর ঠাট্টা তামাশা করব না বলে ঠিক করলাম।

আমার ভাই এখানে এলে তার ক্যামেরার কারণে সে বড় লজ্জা পেত। চারধারে এত এবং এতরকম আধুনিকতম সব ক্যামেরা দেখছি যে, ক্যামেরা দেখব, না জানোয়ার; তাইই বুঝতে পারছি না।

আমিও পটাপট্ ছবি তুলছি।

যখন শিকার করতাম, তখন শিকারে গিয়ে যেমন এক-একদিন হাত খুলে যেত, রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপলেই যেমন সব দুঃসাধ্য অসম্ভব শট্ হত, দূরে, অত্যন্ত ডিফিকাল্ট অ্যাঙ্গেলে; সেরকমই আজ আমার ক্যামেরাতেও হাত খুলে গেছে।

আহাঃ! কী সব কম্পোজিশান। ভিউ-ফাইণ্ডারের মধ্যে দিয়ে নিজেই দেখে নিজেই নিজেকে বাহবা দিচ্ছি। কম্পোজিশান তো নয় যেন প্যারিসের লুভ্‌রের কোনো মারকুট্রে ছবি!

এখনও বেশ ঠাণ্ডা আছে বাইরে। উপরের স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে ভিতরে বসলাম। পাইপটা নিভে গেছিল। ডিক্সন্ খুব পলিশড্। কিলালার মত হাউ ডু ইউ ডু বললে, আই ডু নট ডু এনীথিং মাই ওয়াইফ্ ডাজ এভরীথিং বলে না। রীতিমতে চোস্ত ইংরেজী বলে, এ্যামেরিকান এ্যাকসেন্টে।

ও দেশলাই জ্বেলে আমার পাইপটা ধরিয়ে দিল।

পাইপে টান লাগিয়ে, মুখটা তুলেছি, দেখি অনেক দূরে; ন্যাড়া পাহাড়ের উপর একটি ছোট্ট কালো বিন্দু।

ঐদিকে আঙুল তুলে বললাম, ওটা কি ডিক্সন্?

ডিক্সন্ এক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই আমার দিকে ফিরে হাসল।

তারপর ওর সিগারেটটা এ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, ইউ আর এজ গুড এজ এনী অফ আস। এণ্ড সো আর ইওর আইজ।

বলেই, জোরে গাড়ি ছোটাল সেই পাহাড়ের দিকে।

এখানে পথ বলতে কিছুই নেই। কোথাও কাদা, কোথাও বালি, কোথাও ঝোপ-ঝাড়;

www.BanglaBook.org

কোথাও ঘাসে-ঢাকা পাহাড়; যেমন একটি পাহাড়ের দিকে আমরা চলেছি এখন দ্রুতবেগে। এই কারণেই ফোর-হুইল-ড্রাইভ ল্যাণ্ড-রোভার ছাড়া কোনো গাড়িকে নামতে দেওয়া হয় না ক্র্যাটারে। এ অঞ্চলেই বোধহয় তান্‌জানীয়া সরকারের শ'তিনেক ল্যাণ্ড-রোভার আছে। সকাল থেকে লাঞ্চ অবধি ক্র্যাটার ঘুরিয়ে দেখার জন্যে এক একটি গাড়ির ভাড়া নেয় সাড়ে-পাঁচশ টাকা করে। ফলাও কারবার। তবে, যা তার বদলে দেখা যায় তাতে কেউই বলবে না যে, খেল্ খতম্, পয়সা হজম্। পয়সা কড়ায় গণ্ডায় ওসুল হয়ে যায় সকলেরই।

ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ির সঙ্গে এমনি গাড়ির তফাৎ হচ্ছে এই-ই যে, প্রয়োজন হলে সামনের চাকা দুটিকেও ঘোরাতে পারে ডিফারেন্‌শিয়াল। সাধারণতঃ চার-চাকা গাড়ির পেছনের চাকা দুটোই ঘোরে, সামনের চাকা দুটো শুধু গড়িয়ে চলে। কিন্তু খারাপ রাস্তায় বা খুব পাহাড়ী রাস্তায় চারটে চাকাই যদি ঘোরে তাহলে দ্বিগুণ জোর পায় গাড়ি। এই কারণেই ক্র্যাটারের মধ্যে এমনি গাড়ির নামা বারণ। আমাদের দেশেও জঙ্গলে গেলে সাধারণতঃ ফোর-হুইলার গাড়িতেই যায় সকলে।

ফোর-হুইল গীয়ার চড়িয়ে এবার ডিক্সন্ পাহাড়ে চড়তে শুরু করল। যতই এগুতে লাগলাম ততই কালো বিন্দুটা বড় হতে লাগল। যাঁরাই বনেজঙ্গলে ঘোরেন যে-কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশে যা কিছু অপ্রাকৃতিক বা বিসদৃশ বলে মনে হয়; সেইখানেই তাঁরা চোখ ফেলতে জানেন।

তাই যখন কালো বিন্দুটাকে দেখেছিলাম চাপ-চাপ সবুজ ঘাসে ভরা পাহাড়ের গায়ে, তখন সেটা কি তা না বুঝতে পারলেও বিশেষ কিছু একটা হবেই তা বুঝেছিলাম। এবার অনেক কাছে এসে গেছি আমরা। দেখা যাচ্ছে একটি বিরাট কালো মোষ শুয়ে আছে।

ভাবছিলাম, জ্যান্ত মোষ একা একা কখনই অমনভাবে শুয়ে থাকবে না। তাছাড়া না-মরে গেলে ঐরকমভাবে শোয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আরো কাছে যেতেই দেখলাম, মোষটার পেটে একটা প্রকাণ্ড রক্তাক্ত লাল গহ্বর আর মোষটার পিঠের ওপাশ থেকে উঁকি মারছে কেশরওয়ালা একটি প্রকাণ্ড সিংহের মুখ।

এবার ডিক্সন্ ল্যাণ্ড-রোভারটাকে একেবারে মোষটার পনেরো হাতের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম উপরের দরজা ঠেলে।

সে এক দারুণ দৃশ্য! দুটো বড় সিংহ, দুটো সিংহী; আর ছ'টি ছোট বড় বাচ্চা কামড়া-কামড়ি করে খাচ্ছে মোষটাকে। মোষটাকে মেরেছে ওরা আজই খুব ভোরে। শেষ রাতেও হতে পারে। সবগুলো সিংহর নাক মুখ রক্তে লাল। আমরা যাকে বলি কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া, ওরা সেই রকমই নাক-মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে। একটি বাচ্চা, মোষটার পেটের দগদগে লাল গর্তে ঢুকে পড়ল। ভুস্‌স্ করে পেটের মধ্যের নাড়ি-ভুঁড়ি শব্দ করে উঠল। টাটকা মড়া, তাই দুর্গন্ধ নেই—সিংহদের গায়ের গন্ধ ও মোষের টাটকা রক্তর সোঁদা-সোঁদা গন্ধ আর প্রভাতী প্রকৃতির স্নিগ্ধ নরম গন্ধ মিলে মিশে এক মিশ্র গন্ধর সৃষ্টি হয়েছে।

ফটাফট্ ছবি তুলতে লাগলাম আমি। ততক্ষণে আমাদের দেখতে পেয়ে অনেক গাড়িই

www.BanglaBook.org

ছুটে আসছিল চারদিক থেকে। সেই শিশির আর কুয়াশা ভেজা সবুজ ঘাসের গাছহীন পাহাড়ে।

বড় সিংহগুলো গরর্ গরর্ করছিল। বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে ডিগবাজী খাচ্ছিল আর দুষ্টুমীর কারণে মায়েদের কাছে চড়-চাপড়ও খাচ্ছিল।

একটা বড় সিংহ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, আরে; আমি বাঘের দেশের লোক। আমাদের বাঘ তোদের মত দলে-বলে শিকার করে না। বাঘ; বাঘ। তার চেয়ে বরং ঐ যে সাঁতরাগাছির ওলের মত চেহারার ফক্স-হাণ্টার ইয়োরোপীয়ানস্‌রা আসছে গাড়ি ভর্তি করে, তাদের তোরা ভয় দেখাগে যা।

ডিক্সন্ মুখ উপরে তুলে নীচ থেকে বলল, ডু ঊ্য নো লায়ন ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার?

আমি বললাম, ইয়েস। সার্কাস কোম্পানীতে কাজ করতাম কী না?

ও বলল, বড় সিংহটা কি বলল তোমাকে?

আমি বললাম, জাম্বো।

ডিক্সন্ হেসে ফেলল।

ঠিক সেই সময় আমার ফিল্ম শেষ হয়ে গেল। আর ঘুরছে না নব্‌টা। এর পরও কত কীই না দেখতে পাব আজ। সঙ্গে অনেক ফিল্মও আছে। কিন্তু এই শেষ-হওয়া ফিল্মটা খুলে নতুন ফিল্ম ভরবে কে? সিংহকে তো আর হেল্প করতে বলা যায় না। অথচ নিজের দায়িত্বে এমন সব ছবি নষ্ট করতেও রাজী নই আমি। প্রত্যেকটি রঙিন ফিল্মে তোলা। যা উঠবে না ছবিগুলো!

আমি জানি যে, যারাই এই সিংহের দলের ছবি তুলল আজ এত কাছ থেকে তারা সকলেই নিজের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গল্প করবে যে, পায়ে হেঁটে, পৈতৃক প্রাণ বিপন্ন করেই এইসব ছবি তুলেছে।

শালীরা শিহরিত হবেন; স্ত্রীরা গর্বিত।

আমিও ভাবছিলাম যে, আমি যে সত্যিই সাহসী, এবং যে কথা এত বছরেও কাউকেই বিশ্বাস করাতে পারিনি, তা কেমন সহজে এবার বিশ্বাস করাতে পারব। ক্যামেরার এইখানেই জিৎ। ক্যামেরা নেভার লাইজ। আই মে লাই, ইউ মে লাই, বাট ক্যামেরা নেভার লাইজ। ক্যামেরার মাধ্যমে প্রচণ্ড মিথ্যাকেও সত্যি বলে চালিয়ে দিতে একটুও কষ্ট নেই। জয় ক্যামেরার জয়!

ডিক্সনকে বললাম, তুমি ক্যামেরার কিছু বোঝ?

আমার এই ফিল্মটা বের করে একটা ফিল্ম ভরে দেবে?

ডিক্সন্ কাঁধ শ্রাগ করে বলল, নো প্রবলেম্।

ভাবলাম, ফেয়ার এনাফ্! ও কত কিছু করেছে। কত না কত জঙ্গলে বেড়াতে আসা গা-শিরশিরানো সুন্দরী যুবতী অথবা প্রৌঢ়া ধনবতী বিধবা মেমসাহেবদের তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আদর-টাদরও করেছে। সেই ডিক্সনের কাছে একটি ফিল্ম বের করে নতুন ভরে দেওয়া আর এমন কি কথা!

www.BanglaBook.org

ছেলেটার চেহারাটা স্মার্টনেসের কনসেপ্ট যেন। হি ইন্‌স্পায়ারস্ কনফিডেন্স ইন আদারস্। রিয়্যালি, হি ডাজ।

কন্যার পিতা সৎপাত্রে কন্যাকে পাত্রস্থ করে যেমন শান্তি পান, তেমন শান্তির সঙ্গে ওর পাশে বসে মুখ নীচু করে পাইপ ভরতে লাগলাম। ওর হাতে ক্যামেরাটা সঁপে দিয়ে।

হঠাৎই ফট্ করে একটা শব্দ হল।

কপাল ফাটার শব্দ বোধহয় এইরকমই হয়।

আমি নতুন ফিল্মটা ডান হাতে ধরে ছিলাম। শব্দ হতেই, বাঁ হাতে ধরা পাইপটাকে কামড়ালাম। কড়মড় করে।

ডিক্সন্ বলল, সামথিং হ্যাজ গান রং।

তারপরই বলল, ইওর ক্যামেরা ইজ নো গুড।

আমার গলায় থুথু আটকে গেল। বললাম, বেগ ইওর পার্ডন?

ও বলল, ইয়েস! আই থিং সো।

মনে মনে বললাম, শালা! ইডিয়েট! ওভারস্মার্ট! ....ওয়াইল্ড বীস্ট।

কিন্তু মুখে ভারতীয় প্রশান্তি ফুটিয়ে বললাম, আর ঊ্য শিওর?

ডিক্সন্ ক্যাজুয়ালী বলল, ডেড শিওর।

মনে মনে বললাম, ঊ্য বেটার বী ডেড এ্যাজ হ্যাম।

সিংহগুলো তখনও পিকনিক করছিল। চারধারে নানারকম ক্যামেরার হুইজ্ জ্ জ্, কিররররর-র কুররররর....শুনতে পাচ্ছিলাম।

আমি জানালা দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে পাইপ খেতে লাগলাম।

ডিক্সন্ ক্যাজুয়ালী বলল, ঊ্য লুক আপসেট্। ফর গডস সেক্ ডোণ্ট বী আপসেট। কাম নেকস্‌ট ইয়ার উইথ আ বেটার ক্যামেরা!

তারপর ল্যাণ্ড-রোভার স্টার্ট করে বলল, আমাদের দু-খড়্গাওয়ালা গণ্ডার দেখবে?

আমি বললাম, গণ্ডার আবার কি দেখব? আমাদের দেশে কাজিরাঙ্গায়, জল্‌দাপাড়ায়, গরুমারায় অনেকই গণ্ডার দেখেছি।

ডিক্সন্ বুঝলো আমি বিরক্ত হয়েছি। মুখে কিছু বলল না।

ঐ পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এলাম আমরা। উঠেই দেখি, একদল মোষ চরছে নিশ্চিন্তমনে, কান পট্‌পটিয়ে।

যে মোষটিকে সিংহেরা মেরেছে সেটা নিশ্চয়ই এই দলেরই। এখান থেকে অনেক নীচে মরা মোষ, সিংহগুলো এবং তাদের তিনদিকে ঘেরা সাদা ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িগুলো এবং গাড়ির ছাদ থেকে মুখ-বের করা রঙিন জামা পরা সাদা মানুষ মানুষীদের পুতুলের মত দেখাচ্ছিল।

প্রকৃতির মধ্যে জীবন এবং মৃত্যু এমন অবলীলায় সহাবস্থান করে যে, তা থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে।

"থাকবো না ভাই, থাকবে না কেউ, থাকবে না ভাই কিছু;

www.BanglaBook.org

সেই আনন্দে চল্‌রে ধেয়ে কালের পিছু পিছু।”

এটা জীবজন্তুরা যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছে, আমরা বোধহয় করিনি।

“সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে থাকে গানের রেশ।”

এ-কথাটা সত্যি জেনেও আমরা সবসময়ই এমন ভাব করি যেন অনন্তকাল একই পাখি একই গান গাইবে। তাই মৃত্যুভয়ে সদাই ভীত বলে জীবনকে উপভোগ পর্যন্ত করতে পারি না আমরা। অথচ এখানে জীবনের মধ্যেই মৃত্যু নিহিত থাকে—মৃত্যুকে এরা যেমন নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নিয়েছে তেমন নিশ্চিন্তিই বোধহয় শান্তির একমাত্র পথ।

এবার ডিক্সন্ চলেছে দূরের লেকটার দিকে। যেখানে ফ্লেমিংগোরা গোলাপি ছায়া ফেলেছে জলে। লেকটার নাম, লেক মাকাট্।

ফ্লেমিংগো, নানারকম হাঁস উড়ে উড়ে বসছে লেকের জলে। দূরে গাব্‌লু গুব্‌লু হিপোপটেমাসরা ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা ফ্লেমিংগো দেখতে ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ বাঁদিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনলাম।

ডিক্সন্ চকিতে ফোর-হুইল গীয়ার দিয়ে নিল। জায়গাটা কাদা কাদা। গীয়ার দিয়েই গাড়িটা ঘোরাল। দেখলাম, দুটো প্রকাণ্ড দু-খড়্গাওয়ালা গণ্ডার ট্যাঙ্কের মত দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ করছে। হঠাৎ দুটোর মধ্যে যেটা বড় সেটা পা দিয়ে বালি ও মাটি ছিটোতে লাগল—ভাব দেখালো, এক্ষুনি ঢুঁ লাগাবে আমাদের।

ডিক্সন্ গাড়ি সরিয়ে নিল, গণ্ডারদের বাঁয়ে রেখে, যাতে আমি ভালো করে দেখতে পারি। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল। দেখতে দেখতে আমরা লেকের পাশের জল-পাওয়া জমিতে টাট্‌কা সতেজ রেড-ওট ঘাসের মধ্যে এসে পড়লাম।

আমাদের গাড়ির সামনে একটা থমসনস্ গ্যাজেল আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে কী যেন দেখছিল। ওকে দেখে মনে হল, ওর ভয়-টয় সব লোপ পেয়ে গেছে। সে যে গাড়ি চাপা পড়বে একটু হলে তাতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ডিক্সন্ গাড়িটা দাঁড় করাল। থমসনস্ গ্যাজেলটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ঘাসের বনে চাইতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। লালচে মত কি একটা জিনিসের সামনে একটা মস্ত চিতা, আফ্রিকান চিতা; আমাদের দেশের চিতাবাঘ নয়, যাকে লেপার্ড বা প্যান্থার বলে, বসে আছে মুখ উঁচু করে। কালো রেখা দুটি তার চোখের পাশ থেকে নেমে এসেছে মুখে।

ডিক্সন্ গাড়িটা একটু এগোতেই আমি ওপরে মাথা বের করে দাঁড়ালাম। দেখি, একটি থমসনস্ গ্যাজেলকে মেরে একজোড়া চিতা ভোজে লিপ্ত। যে থমসনস্ গ্যাজেলটি দাঁড়িয়ে ঐদিকে দেখছে সে নিশ্চয়ই মৃত হরিণটির সঙ্গিনী। চিতাগুলোর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। মনের সুখে নির্বিকার চিত্তে খাচ্ছে।

এমন সময় আমাদের দেখে আর একটি ল্যাণ্ড-রোভার এসে দাঁড়াল পাশে। তাতে দুজন মহিলা আর একজন পুরুষ। প্রত্যেকের হাতেই মুভি ক্যামেরা। কিররর-রর করে শব্দ হচ্ছিল। চেহারা দেখে মনে হল জার্মান। ওঁদের অবজেক্ট যথেষ্ট নড়াচড়া করছে না, তাই

www.BanglaBook.org

তাদের নড়াচড়া করানোর জন্য ওঁদের মধ্যে একজন ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে হাত দিয়ে বার তিনেক চড় মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চিতা দুটো ছিট্‌কে উঠে থমসনস্ গ্যাজেলটার একটা রক্তাক্ত ঠ্যাং একজনে মুখে নিয়ে আর অন্যজন ধড়টাকে নিয়ে রেড-ওট ঘাসের গভীরে দুজনে দুদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল বড় বড় লাফে।

যে সঙ্গিনী দাঁড়িয়েছিল সে তার সঙ্গীর দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বিরস মুখে লেজ নাড়াতে নাড়াতে দৌড়ে গেল বিপরীত দিকে একা একা।

জানোয়ারমাত্রই শুধু আনন্দে লেজ নাড়ায় না। দেখলাম, থমসনস্ গ্যাজেলরা সবসময়ই নাড়ায়। আনন্দে, দুঃখে এবং উদাসীনতাতেও।

ডিক্সন্ নিজে দাঁড়িয়ে উঠে ঐ গাড়ির মেমসাহেবদের খুব বকে দিল। বলল, উ্য শুডনট্ হ্যাভ ডান দ্যাট ম্যাম। উ্য শুডনট্ ডিসটার্ব দ্যা এ্যানিম্যালস্। ইটস্ এগেইনস্ট দ্যা ল।

তাদের ততক্ষণে মুভি ক্যামেরার ফসল তোলা শেষ। একটু ভর্ৎসনাতে কী আসে যায়? ওঁরা মুখে বললেন, সরী।

চিতাগুলো দেখে মন ভরে গেল আমার। ডিক্সনের উপর রাগটাও একটু কমল। "ভালো মন্দ যাহাই ঘটুক সত্যরে লও সহজে" নিজেকে নিজে বললাম। মনে অশান্তি হলেই, মন উত্তেজিত হলেই আমি 'ক্ষণিকা'র কবিতা আবৃত্তি করি। সব অশান্তি দূর হয়ে যায়।

ডিক্সন্ এবারে আশ্চর্য এক সুন্দর জঙ্গলে নিয়ে এল গাড়িটাকে। এখানের গাছগুলো মিণ্ডংগার মত দেখতে—কিন্তু অনেক বেশী পাতা—আর গাছগুলোর গায়ের রঙ নরম সবজে-হলুদ।

ডিক্সন্ বলল, এই হচ্ছে বিখ্যাত সেরাই ফরেস্ট। ইয়ালো-ফিভার এ্যাকাসিয়া বলে এদের।

একদল জেব্রা দৌড়তে দৌড়তে আমাদের সামনে জঙ্গল থেকে বেরোল।

আফ্রিকার ভয়াবহ অসুখ হচ্ছে ইয়ালো-ফিভার। অনেকে একে স্লীপিং-সিক্‌নেসও বলেন। সেৎসী মাছির কামড়ে এই অসুখ হয়। যার হয়; সে শুধুই ঘুমোয়।

ভাবছিলাম, মরতে হলে এমন ঘুমুতে ঘুমুতে মরাই তো ভালো। কেন যে লোকে এই অসুখকে ভয়াবহ বলে জানি না। কিন্তু এই অসুখের প্রতিষেধক ইনজেক্‌শান দেওয়াও কম ভয়াবহ ব্যাপার নয়,। এখানে আসার আগে খিদিরপুরে গিয়ে প্রতিষেধক এই ইনজেক্‌শান নিয়ে আসতে হয়েছিল আমাকে।

ইয়ালো-ফিভার আসলে এক ধরনের জণ্ডিস্। হলুদ হয়ে যায় রোগীর শরীর। তাই এই হলুদ গাছগুলোকে বলে ইয়ালো-ফিভার এ্যাকাসিয়া।

কত রকমের এ্যাকাসিয়াই যে আছে আফ্রিকাতে! আম্ব্রেলা-এ্যাকাসিয়া, ছাতার মত হয়ে থাকে উপরটা। ঝোপের মত এক রকমের এ্যাকাসিয়া হয়, এ্যাকাসিয়া-মেলিফ্লোরা। এদের আরেক নাম ওয়েট-আ-বিট্ থর্ণ। লাল কাঁটার এ্যাকাসিয়া হয়। ভাল দেখতে। তাদের নাম এ্যাকাসিয়া ল্যাহাই। আরও একরকম এ্যাকাসিয়া হয়, এ্যাকাসিয়া এ্যাবিসিনিকা। বোধহয় এ্যাবিসিনিয়াতে এগুলো বেশী আছে। বটানিস্টরাই বলতে পারবেন।

www.BanglaBook.org

'কম্মিফোরা গাছগুলোও সুন্দর দেখতে। বেশী বড় হয় না এগুলো। এ্যাকাসিয়া ছাড়াও এখানে আছে সেডার, আল্‌বিজিয়া, গাম্মিফেরা ইত্যাদি নানারকম গাছ।

গোরোংগোরো ক্র্যাটারে মধ্যের লেরাই জঙ্গলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে ঝির-ঝির করে পাশের উঁচু পাহাড় থেকে বয়ে-আসা ঝরণাগুলো। লেকের জল বিশেষ পায় না এই গাছগুলো। বরং লেকের জল বেড়ে গেলে অনেক গাছ পড়ে যায়। উনিশশ চৌষট্টি-পঁয়ষট্টিতে মাকাট লেকের জল খুব বেড়ে গেছিল। এখনও তাই লেরাই জঙ্গল দেখে মনে হয় যেন''কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।"

স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা জায়গায় ছাড়া ইয়ালো-ফিভার এ্যাকাসিয়া হয় না। মশার শিশুমঙ্গল এসব জায়গায়, তাই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ম্যালেরিয়াতেও লোকে হলুদ হয়ে যায় পিলে খারাপ হয়ে গেলে। সেইসব কারণে এই সুন্দর গাছগুলোর বদনাম।

হঠাৎ দেখি, ডিক্সন্ ক্র্যাটারের দেওয়ালের পথে উঠতে শুরু করল।

আমি বললাম, এ কি? আমরা এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছি না কি?

ডিক্সন্ বলল, এর পরে ফিরলে আর লাঞ্চ পাবে না।

মানে? ক'টা বেজেছে?

বলেই, ঘড়ি দেখলাম। একটা বেজে পনেরো।

উপরে পৌঁছতে পৌঁছতে দুটোর বেশী হয়ে যাবে।

কী করে যে সময় কাটে; সময়, যদি সুন্দরভাবে কাটে!

ফোর-হুইলে গীয়ার চড়িয়ে গোঁ-গোঁ করে জোরে চড়াই উঠতে লাগল ডিক্সন্।

আমি পিছন ফিরে তাকালাম। আস্তে আস্তে ক্র্যাটারের সমান জমি, যেখানে আমরা ছিলাম এতক্ষণে দূরে চলে যাচ্ছে, নীচে চলে যাচ্ছে।

অমার মনটা খুব খারাপ লাগতে লাগল। আমি জানি যে, একটু পর, এই সজীব অনুভব; ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখা সুন্দর কম্পোজিশানের মত শুধু একটি কম্পোজিশান হয়ে যাবে; হয়ে থাকবে। ছেলেবেলার স্মৃতির মত, দূরের বহু দূরের; চলে যাওয়া মায়ের মুখের মত, বড় উজ্জ্বল; কিন্তু অস্পষ্ট।

গোরোংগোরোর লজে ফিরে গিয়ে প্রথমেই সামনে যে জার্মান লাজুক লাজুক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর কাছে ক্যামেরাটা নিয়ে দৌড়ে গেলাম। ওঁর সঙ্গিনীই চিতাদের ভাল ছবি তুলবেন বলে ল্যাণ্ড-রোভারের ছাদে থাপ্পড় মেরে ডিক্সনের কাছে বকুনি খেয়েছিলেন।

ইংরেজীতে বললাম ওঁকে, দেখুন তো কি হয়েছে ফিল্মটার।

সাবধানী ভদ্রলোক, ক্যামেরাটা ঘরের অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলেন। তারপর বাইরে এসে গাল ফুলিয়ে অদ্ভুত অভিব্যক্তির সঙ্গে বললেন, কাপুত্!

কাপুত্?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

তারপর জার্মান ভাষা না-জেনেই বুঝতে পারলাম যে কম্ম ফতে হয়েছে। ডিক্সন্ ফিল্মটা

www.BanglaBook.org

ছিঁড়ে দিয়েছে যে শুধু তাই নয়, মধ্যে আলোও ঢুকিয়ে দিয়েছে। মুখ নীচু করে বললাম, ডাক্কেশান্।

বলে ক্যামেরার মুখ আর এজন্মে দেখব না এই প্রতিজ্ঞা করে ক্যামেরাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোরোংগোরো কনসার্ভেসান এরীয়াতে নানারকম জানোয়ার আছে। তবে জানোয়ার না থাকলেও এই অঞ্চলের আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের কারণে এখানে এমনিতেই পর্যটকরা আসতেন।

উপত্যকা মালভূমি, মৃত আগ্নেয়গিরির উদোম বুক, বুকের মধ্যের মাকাট হ্রদ, উঁচু উঁচু পর্বতমালা থেকে নেমে আসা ঝিরঝিরে ঝর্ণা, নানারকম গাছ-গাছালি এসবে চোখের ও মনের ভালো লাগার এতই কিছু আছে যে, পৃথিবীর অন্যতম নাম করা এককালীন শিকার-ভূমি এবং অধুনা সংরক্ষিত বন না-হলেও মানুষ এখানে বরাবর ছুটে আসতই।

মাসাইদের দেখা যায় এখানে। এদের সঙ্গে বন বিভাগের চিরদিনের ঝগড়া। কারণ এরা বন পাহাড়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল এবং এখনও আছে। বন্যপ্রাণী বা বন সম্পদের সংরক্ষণের কারণে মাসাইদের বন্য এলাকা থেকে বিতাড়িত করতে হবে এমন ধারণা ইয়োরোপীয়ানদের, তান্‌জানীয়া সরকারের এবং তাঁদের বন বিভাগের থাকলেও, মাসাইরা তাদের জন্মগত লীলাভূমি ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। এরা বড় আশ্চর্য, কৌতূহল উদ্রেককারী এক জাত। এমন কোনো আদিবাসী আমাদের বিচিত্র ভারতবর্ষেও নেই বলে আমার বিশ্বাস।

একদিন নীলনদের দেশ থেকে এসেছিল এরা পুব আফ্রিকায়। এখনও মিশরের খুব পুরোনো কবরে কবরে এদের মমী দেখা যায়। মাসাইরা ভগবানের নির্বাচিত মানুষ বলে নিজেদের বিশ্বাস করে। নীলনদের দেশ থেকে আস্তে আস্তে তাদের গবাদি পশু চরাতে চরাতে যখন তারা দক্ষিণে নেমে আসতে থাকে তখন তাদের সঙ্গে তাদের চেয়ে বেশী কালো, মল্লি-নীল উপত্যকার লোকদের সঙ্গে সহবাস হয়। ফলে তাদের মিশরীয় মদের মত হাল্কা বাদামী রঙে কালোর ছোপ লাগে। পূর্ব আফ্রিকাতে তারা পাহাড় ও উপত্যকা-ভরা গ্রেট রিফট্ ভ্যালীতে এসে আস্তানা গাড়ে। এই রিফট্ ভ্যালী কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানিকার মধ্যে দিয়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

আগেকার ট্যাঙ্গানিকা ভেঙ্গেই তো এখন তান্‌জানীয়া হয়েছে।

মাসাইরা তথাকথিত সভ্যতা একেবারেই পছন্দ করে না। প্রফেসর বার্নার্ড জিমিক এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দরভাবে এক জায়গায় বলেছেন যে,

"A Masai spits on civilisation, quite literally."

সত্যিই তাই। মাসাইরা ঘন ঘন থুথু ফেলে এবং এমন কায়দায় মাথা ঝাঁকিয়ে এবং এমন দূরে সে থুথু ফেলে যে, তা দেখবার মত। গা ঘিন্‌ঘিন্‌ও যে একেবারে করে না, তা নয়।

www.BanglaBook.org

চাষ-বাস করার কথা ওরা ভাবতেই পারে না কারণ মাটি; প্রকৃতি ওদের কাছে ভগবান। ভগবান ধরিত্রীর গায়ে যে আঘাত লাগে চাষ-বাস করতে হলে! তাই তারা গরু-মোষ, ছাগল ইত্যাদি চরিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চারণ-ভূমির সঙ্গে সরে গিয়ে এক আশ্চর্য যাযাবর জীবন যাপন করে। ওরা খুবই যুদ্ধং দেহি। যদিও সাধারণতঃ কেড়ে-মেড়ে খাওয়ার চেয়ে ওদের গরু ছাগলের বিনিময়ে অন্য চাষী উপজাতিদের কাছ থেকে ফল এবং শস্য বিনিময় করাই ওরা পছন্দ করে।

কেনিয়ার নাইরোবি শহরের খুব নামডাক আছে। আগেই বলেছি। আফ্রিকাতে এমন সুন্দর পাহাড়ী শহর নাকি আর নেই। দার্জিলিং-এর মত ঠাণ্ডা জায়গা, তাই ব্রিটিশ জার্মান এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয়ানদের ভারী পছন্দসই। আসলে, মাসাইদের আস্তানা ছিল এই নাইরোবি। সাহেবদের পছন্দ বলে বেচারারা সেখান থেকে বিতাড়িত হল। নাইরোবি শব্দটাও একটা মাসাই শব্দ। নাইরোবি মানে, মাসাই ভাষাতে "ঠাণ্ডা"।

যেহেতু তারা নিজেদের ভগবানের নির্বাচিত মানুষ বলে মনে করে, সেই কারণেই ইয়োরোপীয়ান এবং অন্যান্য আফ্রিকানদের এরা সহ্য করতে পারে না। ওদের ধারণা, ভগবান সমস্ত পৃথিবী শুধু মাসাইদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন। যারা মাসাই নয়, তাদের গবাদিপশু থাকারই কথা নয় ওদের মতে। সুতরাং যখন যেমন খুশী মাসাইরা অন্যদের গবাদিপশু চুরি করতে পারে। এবং করেও। এতে ওদের বিবেকে বাধে না। ওদের সমস্ত জীবনই গবাদিপশুদের সঙ্গে জড়িত ও একাত্ম হয়ে আছে। ঐ ওদের ধ্যান জ্ঞান।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, যখন জল শুকিয়ে যায় সর্বত্র, তখন দেখা যায় মাসাই গো-চারকরা ছোট্ট ছোট্ট বাছুরদের কোলে-কাঁধে করে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাচ্ছে দাবদাহর মধ্যে। জলের খোঁজে। শিক্ষিত মাসাইদের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের স্বজাতি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে স্বজাতিকেও গবাদিপশু, "The Cattle" বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে, এই গো-চারক জাত গবাদিপশুদের সঙ্গে এমনই একাত্ম হয়ে আছে যে, তাদের প্রতিপালিত পশুদের থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাবতে পর্যন্ত পারে না তারা।

কিল্লালা বলছিল, দূর থেকে লাল পোশাকের মাসাই দেখলে সিংহ পর্যন্ত পাশ কাটায়। সিংহ, চিতা এবং অন্যান্য অনেকানেক হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে একই জায়গায় খোলা মাঠের বন জঙ্গলের মধ্যে তাদের পশুদের নিয়ে যুবক মাসাইরা থাকে। ভয়-ডর কাকে বলে ওরা জানে না। আগে নিয়ম ছিল একা হাতে বল্লম গেঁথে সিংহ শিকার না করতে পারলে কোনো যুবককে কোনো মাসাই যুবতী স্বামী বলে বরণ পর্যন্ত করবে না।

মাসাইরা বল্লম তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করে অথবা শিকার করে কিন্তু যারা এই সব বানায়, সেই কামারদেরই ওরা নোংরা বলে জানে। যদি কেউ কোনো কামারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে পরে তাকে হাতে তেল মেখে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কোনো কামারের মেয়ের সঙ্গে কোনো মাসাই যোদ্ধা সহবাস করলে তার কপালে নির্ঘাৎ দুর্ভোগ আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে। পরের যুদ্ধযাত্রায় তার মরে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

একই দিনে দুধ আর মাংস খেলে, যে-গরুর দুধ খেয়েছে সেই গরু মরে যায় ওদের

www.BanglaBook.org

ধারণা। তাই, পরে মাংস খাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ওরা কখনও দুধ খায় না। যদি-বা কেউ ভুল করে খেয়ে ফেলে তাহলে মাংস খাবার আগে একটি লম্বা ঘাসের পাতা গলায় ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে সেই দুধ বমি করে উগরে দেয়।

ওরা পশুকে না মেরেও তার গা থেকে অদ্ভুতভাবে রক্ত খায়। একটা সরু দড়ি গলায় জড়িয়ে দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে তাতে চাপ দেয়। চাপ দেওয়াতে গরুর গলার মোটা শিরা ফুলে ওঠে। তখন অল্প দূর থেকে ছোট্ট চওড়া ফলাওয়ালা তীর ছোঁড়ে কেউ সেই শিরাতে। ফোয়ারার মত ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ওঠে তখন ঐ শিরা থেকে এবং সেই রক্তকে একটা কাঠের বাটির মধ্যে জমা করা ওরা। তারপর তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে থুথু দিয়ে যেখানে তীর লেগেছিল, সেই ফুলে ওঠা জায়গাটা ভিতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তার উপর ধুলো ঘষে দেয়। টার্নিকেট খুলে নিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এবং ফুটোটাও চামড়াতে ঢেকে যায়। তারপর কাঠের পাত্রের রক্তটা একটা কাঠি দিয়েও নেড়ে নিয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেক মাসাই ছেলেরাই কেষ্ট ঠাকুর। কেষ্ট ঠাকুরের শত নামের মতই এদের প্রত্যেকের অনেকগুলো করে নাম থাকে। কয়েক বছর বাদে বাদেই পুরোনো নামে ঘেন্না হয়ে যায় বলে, নতুন নাম নেয় ওরা।

নিজেদের নতুন নতুন নামে ডাকতে ওরা বড় ভালোবাসে।

যখনই কোনো বাচ্চা হয়, বাচ্চার বাবা একটা ষাঁড় মারে ওদের বোমার সব মেয়েদের ও বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য। একসঙ্গে থাকবার বড় খড়ের ঘরকে ওরা বোমা বলে। চারদিন বাদে আবার এটা ষাঁড় মারে। এই খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানে বাচ্চার নামকরণ হয়। কোনো বাচ্চার বাবা যদি সন্দেহ করে যে বাচ্চাটির বাবা সে নিজে নয়, তাহলে বাচ্চাটিকে ওদের ক্রাল-এর দরজার কাছে শুইয়ে দেওয়া হয়। ওদের গোয়ালকে বলে ক্রাল। সন্ধ্যেবেলা গোয়ালে ফেরা গরুদের খুরের চাপে পদদলিত হয়ে যদি বাচ্চাটা মারা যায় তাহলে বাবা নিঃসন্দেহ হয় যে ঐ বাচ্চার বাবা সে নিজে নয়।

মাসাই মায়েদের তুলনায় অন্যান্য জাতের মায়েরা যে কত নিরাপদ তা আমাদের মধ্যে এই প্রথা নেই বলেই বোঝা যায়। থাকলে কত না কত বিপদ ঘটে যেত! পাঠিকারা কি বলেন?

সব মাসাই-ই যে যোদ্ধা এমন নয়। ওদের যোদ্ধাদের বলে, মোরান্‌। যুবকদের ছুন্নৎ করা হয় এবং ছুন্নৎ-এর অনুষ্ঠানে খুব জাঁকজমক, খাওয়া-দাওয়া; নাচ গানও হয়। এক একটি অঞ্চলের এক-বয়সী সব যুবকদের, যারা যোদ্ধা হবে; তাদের একই সঙ্গে ছুন্নৎ করা হয়। ছুন্নৎ হয়ে গেলে তারা নিজের নিজের বাবা-মায়ের বোমা ছেড়ে নিজেদের জন্যে একটা বড় ঘর বানায়। তার নাম মান্‌জাটা। সেই ঘরের চারপাশে কাঁটার বেড়াটেড়া কিছুই থাকে না। ঐ অঞ্চলের যত কুমারী মেয়ে আছে তাদের সকলেরই অবাধ আনাগোনা থাকে সেই মান্‌জাটাতে এবং মুক্ত প্রেমের জীবন যাপন করে যোদ্ধারা তাদের সঙ্গে। মোরান্‌দের উপর অনেক বিধিনিষেধ আছে। তারা দুধ আর রক্ত ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারে না। তরি-তরকারি খেতেও তাদের মানা। মদ খাওয়াও। মোরান্‌রা শুধু নাচবে, মেয়েদের আদর

www.BanglaBook.org

করবে আর যুদ্ধ করবে।

এইসব কারণে, এখানে আসার পর থেকেই ভাবছি, বড়ই ভুল হয়ে গেছে। এক নামে চিরজীবন পরিচিত হবার গ্লানি, আলুপোস্ত খাওয়ার হীনম্মন্যতা, একই নারীর সঙ্গে চিরদিন একই বিছানায় শুয়ে থাকার একঘেয়েমি এ সব-কিছু থেকেই মুক্তি পাওয়া যেত। টেম্বো ও সিম্বা-ভরা জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে মান্‌জাটাতে থাকতাম। রোজ সকালে নতুন নামে ডাকতাম নিজেকে। রোজ রাতে নতুন যুবতীর সঙ্গে শুতাম। রঙিন মালা আর নানারঙে নিজের মিশকালো সাত ফুট লম্বা চেহারাটাকে সাজাতাম। যখন খুশী, যাদের ঘেন্না করি, তাদের মুখে অবলীলায় থুথু ফেলতাম যখন তখন। আর চাঁদের রাতে, চাঁদের পাহাড়ের দিকে চেয়ে, রাত জেগে উপন্যাস লেখা নয়, যশের ও অর্থের কাঙালী হয়ে নয়; একজন সাধারণ অমিত-বল মাসাই যোদ্ধা হিসেবে নিজের বুকের টাটকা তাজা রক্তে নিজের বুককে আর লাল পোশাককে আরো লাল করে উদাত্ত আকাশের নীচে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতাম। এবং ঠিক মরবার মুহূর্তেই নিজের নাম আবার বদলে দিয়ে মরে গিয়েও বেঁচে যেতাম।

কিছুই হল না। এ জীবনে কিছুই হল না।

দুপুরের লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। এখানে সব ভালো; কিন্তু চারধারে ভীষণ মানা। হেঁটে কোথাও যেতে পারবে না। গাড়ি থেকে নামলেই সিংহ কিংবা চিতা ঘাড় মট্‌ক দেবে। ঘাস থেকে বা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে। গণ্ডার এসে ঢুঁ মারবে, জিরাফ লাথি কষাবে, জেব্রা বা ওয়াইল্ড বীস্ট চাঁট মারবে ব্যাকগীয়ারে।

এসব ভয়, ওরা মাখনবাবুদের দেখালে দেখাক। আফ্রিকাতে না-হয় অনেকরকম জানোয়ারই আছে এবং অনেকই আছে সংখ্যায়, কিন্তু আমিও তো এমন কোনো দেশ থেকে আসিনি যেখানে জানোয়ার বলতে শুধুই পুমা বা খেঁকশিয়াল।

রাজা যদি বলে ধরে আনতে, পেয়াদা তবে বেঁধে আনে। কিলালার হয়েছে সেই অবস্থা। একবার গোরোংগোরোর পথে একদল মোষ দেখে নামবার উপক্রম করেছিলাম। ভালো করে ছবি তুলব বলে, কিলালা এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে তার শরীরটাকে অন্য প্রান্তে নিয়ে এসে আমার বেল্ট ধরে সজোরে আকর্ষণ করে আবার আমাকে গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কিলালা জানে না যে, আমিও আজ থেকে আমার নাম বদলে ওলালা হয়ে গেছি। ওকে এ্যাইসা টাইট দেব এরই মধ্যে একদিন যে, ও ডাডা, কাকা, মাম্মা ডেকে কূল পাবে না।

নামটা বদলানো অন্য কারণেও খুবই দরকার। প্রায়ই অন্যমনস্ক অনেকে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, এই যে, ইনিই বুদ্ধদেব বসু।

আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর বাড়িতে যখনই ফোন করি তখনই তার মা ফোন ধরেন। মাসীমাকে বলি, আমি বুদ্ধ বলছি।

মাসীমা বলেন, চিনতে পারলুম না বাবা।

আমি বলি, বুদ্ধ, বুদ্ধদেব; দীপকের বন্ধু।

www.BanglaBook.org

মাসীমা বলেন, ও-ও-ও বুদ্ধু! —তাই বল বাবা। অন্য নাম বললে চিনি কি করে?

না! আমি বুদ্ধদেবও নই, বুদ্ধুও নই। আজ থেকে আমি ওলালা। কিলালার পাশে বসে ট্যাঙ্গানিকা, থুড়ি তান্‌জানীয়ার বন-জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াব।

ঘুরে-ফিরে এসে দেখি, যে জার্মান সাহেব আমার ক্যামেরা দেখে কাপুত্‌ বলেছিলেন, তিনি দুজন মহিলার সঙ্গে লাউঞ্জে বসে কনিয়াক্‌ খাচ্ছেন।

আমি ঘরে ফিরে গিয়ে আবার ক্যামেরার ব্যাগ সমেত ফিরে এলাম। ফিরে এসে ওঁকে বললাম যে, আমাকে একটা নতুন ফিল্ম ভরে দিন আর ক্যামেরাটা ম্যানুয়াল করে দিন অটোমেটিক থেকে।

ওদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে, আমি যেখানে যাব; ওঁরাও যাবেন। ফলে ক্যামেরা নিয়ে আপাতত ভাবার কিছু নেই। একজন ভালো এ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু ভদ্রলোক যদি ভলাণ্টিয়ারী করতে আপত্তি করেন সেজন্য তাকে একটু খাতির যত্ন করা দরকার এবং হাতেও রাখা দরকার।

যাঁরা সেয়ানা, তাঁরা বলেন, কাউকে হাতে রাখতে হলে বশংবদ করে, তার দুর্বলতার খোঁজ নাও।

খবরের কাগজের বন্ধুরাও তাই বলেন।

কারো দুর্বলতাকে এক্সপ্লয়েট করে কার্যসিদ্ধি যুদ্ধে বা রাজনীতিতে বা সাংবাদিকতার পেশায় চলতে পারে। তা বলে ব্যক্তিগত জীবনে এমন অভ্যাস করলে চরিত্র নষ্ট হবার এবং নিজের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয় থাকে। কিন্তু এখন আমার জীবনে প্রচণ্ড সংকট। সিংহ, চিতার ছবি নষ্ট হলেও নিদেনপক্ষে কিছু নিরীহ জেব্রা-জিরাফের ছবিও না তুলে নিয়ে গেলে আমি যে এসব জায়গায় আদৌ এসেছিলাম এমন কথা আমার শত্রুরা ও যারা আমাকে ঈর্ষা করে বিনা কারণে; তারা বিশ্বাসই করবে না।

ভদ্রলোক ও তার সঙ্গিনীদের কনিয়াক্‌ খাওয়ালাম এক রাউণ্ড।

ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি করি?

আমি বললাম, লেখক এবং ফেস্‌-রিডার।

ফেস্‌-রিডার? ওঁরা সকলেই চমকে উঠলেন।

তারপর বললেন, কোন ভাষায় লেখো?

আমি বললাম, ওয়াণ্ডারাবো।

ওয়াণ্ডারাবো একটি আফ্রিকান উপজাতি। এরা বিষ-মাখানো তীর দিয়ে চুরি করে হাতি মেরে বেড়ায়। তারা সাংঘাতিক বলে তাদের দুর্নাম আছে। গেম-ওয়ার্ডেনদেরও মেরে দিতে পিছপা হয় না একটুও। তাই সাংঘাতিক লোকদের ভাষায় লিখি বলে কাপুত্‌ ভদ্রলোক একটু ভয় পাবেন ভেবেই ও কথা বললাম। তাছাড়া ওদের কাছে বাংলা এবং ওয়াণ্ডারাবোতে কোনো তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না।

জানা গেল, ভদ্রলোক ইলেকট্রনিকস্‌ ইঞ্জিনীয়ার। সীমেনস্‌ কোম্পানীর বড় সাহেব একজন। বয়স অল্পই। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং শালী।

www.BanglaBook.org

ওরা সকলেই ধরে পড়লেন যে, ওদের ফেস্-রিড করতে হবে।

আমি বুঝলাম, এই মওকা! বললাম, গোপনীয় সব কথা সকলের সামনে তো হবে না। এক এক করে বলতে হবে।

শালী বললেন, আমাকে আগে বলুন।

আমি বললাম, ঠিক আছে। অন্যরা উঠে যান তাহলে।

মিস্টার কাপুত্, ওঁরও নাম বদলে দিলাম, সত্যি নাম বললে বিপদ আছে, কেন আছে তা একটু পরেই জানতে পারবেন; তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লাউঞ্জের অন্য কোণায় চলে গেলেন।

শালী, কম্পারেটিভ ফিলোলজীর ছাত্রী। বার্লিনে পড়াশুনা করে।

আমার সামনে বসে বলল, বলুন, কি বলবেন।

আমি সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, মানে?

আমি কথা ঘুরিয়ে বললাম, তোমার দিদির কবে বিয়ে হয়েছে?

দুবছর।

ছেলেমেয়ে হয়নি?

না।

তারপর বললাম, তোমার জামাইবাবুকে তোমার মোহ থেকে মুক্ত করো। নইলে তাকে বিয়ে করো। দুজনের জীবনই এমনই করে দুর্বিষহ কোরো না।

বাইরেও তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাইরে খুব শীত। গোরোংগোরো ক্র্যাটার কালো মেঘ আর কুয়াশায় ঢেকে গেছে—এখন দেখে কে বলবে যে, সকালে এত রোদ ছিল। মনে হল, বাইরে প্রকৃতির সব অন্ধকার মেয়েটির মুখে নেমে এল।

এই অন্ধকারেই তীরটা ছুঁড়েছিলাম। সাবাস ওলালা। ওয়াণ্ডাবোরো এমনি করেই বিষ মাখিয়ে ছোট্ট ছোট্ট তীর ছুঁড়ে দেয় অন্ধকারে বিরাট হাতিদের দিকে। কোনোটা লাগে, কোনোটা লাগে না। ওলালা, ইউ আর লাকি! তীরটা লেগেছে।

মেয়েটি মুখ নীচু করে হাতের নখের নেইল পালিশ দেখতে দেখতে বলল, ইটস্ ফ্যান্টাস্টিক। বাট ফর গডস্ সেক্, ডোণ্ট টেল মাই সিস্টার।

আমি বললুম, আই এ্যাম নট ক্রেজী।

আমার প্রফেসনের এসেন্সই হচ্ছে সিক্রেসী।

তারপর বললাম, আর কিছু জিগ্গেস করবে?

মেয়েটি বলল, নো। ইটস্ এনাফ্। তোমার একটা কার্ড দাও আমাকে। দরকার হলে চিঠি লিখে পরামর্শ নেব ভবিষ্যতে। ইউ ইণ্ডিয়ানস আর ফ্যান্টাস্টিক্।

আমি গম্ভীর আত্মশ্লাঘার মুখ করে বললাম, ইয়েস! উই আর।

পরমুহূর্তেই মনে হল ওয়াণ্ডারাবোরা ওয়াণ্ডারফুল। ওলালা। ওলালা!!

মেয়েটি উঠে চলে গেলে তার দিদি এল। শালী গিয়ে জামাইবাবুর কাছে বসল।

ছোটবেলা থেকে শিকারে গিয়ে গিয়ে আমার একশ-আশি ডিগ্রী ভিসান্ ডেভালাপড্

www.BanglaBook.org

হয়েছিল। চোখের কোণায় দেখলাম, লাউঞ্জের এক পাশে শালী জামাইবাবু ফিস্‌ফিস্ করছে!

মিসেস কাপুত্ আমাকে কিছু বলার আগেই বললাম, আজকে ক্র্যাটারের মধ্যে যেমন পুঞ্জীভূত মেঘ, তোমার মনের মধ্যেও তেমনই। তোমার হাসির আড়ালে অনেক জটিল ভাবনা লুকোনো আছে। তুমি আনন্দ করছ; কিন্তু করছ না।

ভদ্রমহিলা সন্দিগ্ধ এবং বিস্ময়াভিভূত চোখে চেয়ে রইলেন আমরা মুখে।

তাও তো বলিনি যে, ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছো কিন্তু গিলছো না!

ভদ্রমহিলা চুপ করেই রইলেন।

তারপর বললাম, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা বলছি। তোমাদের একটি বাচ্চা হওয়া উচিত।

বাচ্চা? কেন? ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন।

মুখে বললাম, তোমার মনের সব অশান্তি চলে যাবে। দ্যা বেবী উইল বী দ্যা ব্রিজ বিটউইন ইওরসেল্ভ এণ্ড ইওর হাজব্যাণ্ড। কোনো কারণে তোমরা দুজনে দুজনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছো অথচ তোমরা দুজনে দুজনকে সত্যিই ভালোবাসো।

মিসেস কাপুত্ অনেকক্ষণ আমার চোখে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, দ্যাটস্ অল। এখন আর কিছু বলব না।

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। মিস্টার কাপুত্ এলেন।

উনি বসতেই আমি বললাম, আমার নতুন করে বলার কিছুই নেই। তোমার শালীই তোমাকে বলে দিয়েছে, আমি যা বললাম। তোমাকে শুধু একটা কথা বলি। কথাটা হচ্ছে এই যে, শালী অনেকেরই থাকে। কিন্তু শালীরা শালীই। শালারাও শালা! শালীর সঙ্গে সব জামাইবাবুরই মিষ্টি সম্পর্ক থাকে কিন্তু কখনও ভুল করে শালীকে ভালোবাসতে যেও না। মরতে চাও তো সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্-এ গিয়ে জিরাফের চাঁট খাও, গণ্ডারের ঢুঁ খাও, কিংবা,....ওয়াণ্ডারাবোর তীর খাও। এমন বোকামি আর দুটি হয় না।

মিস্টার কাপুত্ ঐ শীতেও ঘেমে গেছিলেন।

বললেন, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

আমি বললাম, একটা সোজা উপায় আছে। তোমাদের এক্ষুনি একটা বাচ্চা হওয়া উচিত। বাচ্চা হলেই গোল মিটবে। দ্বিতীয়ত, শেক্ হার অফ্ স্লোওলি। এক ঝটকায় যে-কোনো মেয়েকেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে ট্রি-ক্লাইম্বিং-লেপার্ডের মত তোমার ঘাড়ে চড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় মট্‌কে দেবে। স্ক্যাণ্ডাল রটাবে। মেয়েদের মত নরখাদক জানোয়ার ভগবান আর দুটি বানাননি। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে; তাকে সরিয়ে দাও। দুধ খেলে শরীরে বল হয়, কিন্তু রাবড়ি খেলে বদহজম হয়। হালকা ভালোলাগা, ভালোবাসা, মানে ভালোলাগাটা হচ্ছে দুধ, কিন্তু মোহ, অবৈধ-প্রেম এসব হচ্ছে রাবড়ি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, অবশ্য আই কোয়াইট এ্যাপ্রিসিয়েট যে প্রত্যেক শালীই এক একটি মার্জিনাল কেস্।

www.BanglaBook.org

মিস্টার কাপুত্ রাবড়ির মানে বুঝলেন কিনা জানি না। আমি রাবড়ির ইংরেজী জানি না। কারণ রাবড়ির ইংরিজী হয় না। আর জার্মান মিঃ কাপুত্ আমার চেয়ে অনেক খারাপ ইংরিজী জানেন। রাবড়ির ইংরিজী থাকলেও উনি জানতেন না।

আমিও জার্মানি জানি না।

অতএব, কাপুত্।

ভদ্রলোক প্রথম কথা বলেন,। হোয়াটস্ ইওর ড্রিংক।

আমি বললাম, হুইস্কী।

বারম্যানকে ডেকে উনি বললেন, ওয়ান লার্জ স্কচ্।

আমি বললাম, ইউথ প্লেইন ওয়াটার। নো-আইস প্লিজ।

মিস্টার কাপুত্ বললেন, দিস ওয়ার্লড ইজ স্ট্রেঞ্জ। তুমি জানো না, আজ সন্ধ্যেবেলাতে তুমি আমাদের স্যেভিয়র হয়ে এসেছো। মনে হচ্ছে, আমার জীবনের খুব একটা বড় ক্রাইসীস্ কেটে গেল।

আমি বললাম, দ্যাখো, ভালোবাসার অনেক রকম আছে। একসঙ্গে দুজন নারীকে যে ভালোবাসা যায় কাউকেই কিছুমাত্র না ঠকিয়ে, এটা আমরা পুরুষরা বিলক্ষণ বুঝি। কিন্তু মেয়েরা বোঝে না। দে ক্যান শেয়ার এনীথিং ইন দ্য ওয়ার্লড। বাট নট দেয়ার হাজব্যাণ্ডস্। নট বাই এনি মীনস্। তোমার স্ত্রীর দিকটা তোমার বোঝা উচিত। একটা সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু যে নতুন সম্পর্কের আশায় পুরোনো সম্পর্ক ভাঙছো, তাও যে একদিন ভাঙবে না তা জানছো কি করে?

মিস্টার কাপুত্ বললেন, এসব এতই পার্সোনাল ব্যাপার, এতই ডেলিকেট যে, আমি কখনও কারো সঙ্গে, এমনকি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও ডিসকাস্ করিনি। ট্যু হ্যাভ ব্রোকেন দ্যা আইস। ট্যু আর বেটার দ্যান আ সাইকো-এনালিস্ট।

আমি হাসলাম। পেটের মধ্যে ভয় গুড় গুড় করছিল। ভাবছিলাম, অন্ধকারে ওয়াণ্ডারবোর তীর একবার লেগেছে বলে কি বার বার লাগবে?

বললাম, থ্যাঙ্ক ট্যু ভেরী মাচ। আই এ্যাম হ্যাপী উইথ হোয়াট আই এ্যাম।

মিস্টার কাপুত্ বললেন, আমার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছ নাকি?

আমি বললাম, পাগল! তবে বলেছি—অন্য ভাবে।

তুমি ওর সঙ্গে কথা বললেই বুঝবে।

মিস্টার কাপুত্ বললেন, এবার তাদের ডাকি?

নিশ্চয়ই। আমি বললাম।

তারপর বললাম, মাঝে মাঝে আমার ক্যামেরার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য....?

মিস্টার কাপুত্ বললেন, রুথ ক্যামেরা-ট্যামেরা আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝে। ফ্রম নাউ অন শী উইল টেক কেয়ার অফ ইট।

রুথ অর্থাৎ শালী। বলা বাহুল্য, তার নামও বদলে দিলাম। রুথ নামটা পছন্দ হল না আমার । তার নাম রাখলাম লাইলাক্। মনে হচ্ছে এখন থেকে আমরা ক্যামেরার এবং

www.BanglaBook.org

আমারও লোকাল গার্জেন হল সে।

হুইস্কীটা এল। বড় শীত।

একটা বড় চুমুক দিয়ে ভাবলাম, লাইফ ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

মনে মনে এই ক্যামেরার মালিক আমার ছোট ভাইকে একটা থ্যাঙ্ক উ্য দিলাম। ক্যামেরাটা না নিয়ে এলে তো এতসব কাণ্ড ঘটতো না!

এবং আরো কত না কাণ্ড ঘটবে এ ক'দিনে তা কে জানে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরদিন দেরী করে উঠে ধীরেসুস্থে ব্রেকফাস্ট করে, লজের দোকানে কিছু কেনাকাটা করে গাড়িতে উঠলাম। দেখলাম, এ দুদিনে বীয়ার খেয়ে আর ঘুমিয়ে কিলালার চোখ-মুখ ফুলে গেছে।

লজের কাছেই পথের উপরে নানারকম স্যুভেনির নিয়ে বসে আছে ক'জন লোক। মাসাইদের রঙিন মালা, নানারকম কাঠের উপর খোদাই করা হাতের কাজ, আরও নানা টুকিটাকি। পূর্ব আফ্রিকায় কাঠের কাজের বিশেষত্ব আছে। মাফোন্ডে কার্ভিং বিশ্ববিখ্যাত। আস্ত কাঠে খোদাই করে ওরা নানা মূর্তি বানায়। চমৎকার ওয়ার্কম্যানশিপ। রঙিন কাঙ্গা-কিটেঙ্গে, মেয়েদের প্রিয় পোশাক। এই সব কিছুই ডার-এস্-সালাম বা আরুশাতে কেনা যাবে। হাতির লেজের লোম দিয়ে চমৎকার বালা তৈরী করে এরা। সিংহের দাঁতের লকেট হয় হাড়ের। নখেরও হয়। আমাদের দেশে যেমন বাঘ-এর লাকি বোন-এর কদর, এখানে সিম্বার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কদর।

দু-খড়্গ গণ্ডার শিকার করে জংলী চোরা-শিকারীরা গণ্ডারের খড়্গ চালান দেয় পশ্চিমে। পশ্চিমী মানুষরা বিশ্বাস করে যে, গণ্ডারের খড়্গ গুঁড়ো খেলে রতি-শক্তি বাড়ে। আমাদের দেশেও এ কারণেই গণ্ডার চুরি করে শিকার করে শিকারীরা। গণ্ডারদের মতই। আমাদের ভাল্লুক বাবুরাও এ বাবদে কম যান না। গাবলু-গুবলু গোলগাল দেখতে হলে কি হবে? ভাল্লুকের অণ্ডকোষ গুঁড়ো করে খেলে নাকি বৃদ্ধর শরীরেও হারেম-পেষার ক্ষমতা আসে।

সুন্দরবনে একবার আমাদের মোটরবোটের প্রপেলারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা মাঝারি হাঙর অজ্ঞান হয়ে ডাঙায় গিয়ে গুঁতো মারে। তখন তাকে রাইফেল দিয়ে মারি, কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। খুব কম লোকেরই হাঙ্গরের জননেন্দ্রিয় দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে। আমার হয়েছিল। হাঙরটিকে যখন বোটের ডেকে ওঠানো হল। তখন দেখা গেল তার তলপেটে অতিকায় একটি পেন্সিলের আকারের অত্যন্ত শক্ত হাড়ের মত সাদাটে বস্তু। তাই নিয়ে সারেঙ এবং মাল্লাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতেই, লোকগুলোকে যত শক্তসমর্থ ভেবেছিলাম ততখানি যে তারা নয় তা জেনে দুঃখিত হতে হল। হাঙররাও যে এই বিশেষ বাবদে কুলীন তা আগে জানা ছিল না।

সঙ্গে আমরা প্যাক-লাঞ্চ নিয়ে নিয়েছি। জলের বোতলের বিকল্পে চার বোতল বীয়ার আমার ও কিলালার জন্যে। আস্তে আস্তে গাড়ি নামছে দশহাজার ফিটের ঘন জঙ্গলাবৃত পাহাড় থেকে গাঢ় ও কচি কলাপাতা সবুজ উপত্যকাতে। ঝকঝক করছে রোদ, নীল মেঘহীন আকাশে, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা। জানালা খুলে রেখেছি বটে কিন্তু হাওয়ায় কান কেটে নিয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে।

www.BanglaBook.org

গাড়ির মধ্যে বসেই টুপিটা চড়ালাম মাথায়।

পথের দুপাশের সবুজ টিলার উপরে মাসাইরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ফোটো তুলতে যেতেই কিলালা আমার ক্যামেরা কেড়ে নিল। বলল, বর্শার খোঁচায় মরার ইচ্ছা হয়েছে?

এ-লোকটা এখানে আসা-ইস্তক্ আমাকে এতবার ও এতরকম মরার ভয় দেখাচ্ছে যে; আমি সত্যি সত্যিই রেগে যাচ্ছি।

দূরে, নীচের উপত্যকাতে মাসাইদের গরুদের সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক ওয়াইল্ড বীস্ট এবং শ-পাঁচেক জেব্রা চরছে। জেব্রা অনেক রকম হয়, আফ্রিকাতে না এলে হয়ত জানতাম না।

এক ধরনের জেব্রা সাদা কালো। অন্যরা খয়েরী সাদা। জেব্রারও একটা সোয়াহিলী নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না। নামটার মানে জংলী গাধা।

গাধাদের সঙ্গে জেব্রাদের আশ্চর্য মিল। সব জায়গাতেই কালারবার। এদের গায়ের রঙ সুন্দর বলে এরা দিব্যি খোশমেজাজে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অন্যরা ধোপার কাছে জীবন বাঁধা দিয়ে মোট বয়ে মরছে। ধোপার গাধাদের বুকে যে কত চাপা কষ্ট, কত যুগ ধরে সঞ্চিত গ্লানি; তা গাধার ডাক শুনলেই বোঝা যায়। এখন দেখছি, গাধা হলেই যে গাধা হয়, এমন নয়। জেব্রাগুলো সেয়ানা গাধা।

ভারী ভালো লাগছে। কাজ নেই, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে দিন বাঁধা নেই, সওয়াল নেই, জবাব নেই; সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ টেলিফোন নেই, রাশভারী স্বল্পবাক সম্পাদকদের তাগাদা নেই। এই মুহূর্তে আমি এই রোদ পোয়ানো, ঘাস-খাওয়া জেব্রাগুলোর মতই স্বাধীন। এখন আমার মালিক আমি নিজেই। একটা আদিগন্ত আস্ত নীল আকাশ, আগ্নেয়গিরির লাভা ঢাকা উর্বর পৃষ্ঠ, প্রান্তর, লালচে-কালচে ধুলো; সবুজ গাছ-গাছালি সবই আমার।

কথা আছে, আমরা সারাদিন আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যের মুখে সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্-এর মধ্যে সেরোনারা লজ-এ গিয়ে উঠব। সেরোনরাতে থাকব তিনদিন। তারপর সেখানে থেকে যাব লোব লজ-এ। লোবো লজ প্রায় কেনিয়ার বর্ডারে। যদিও ক্লীনস্ ক্যাম্পটা একেবারেই কেনিয়ার বর্ডারের উপর।

কোলের উপর ম্যাপটা খুলে বসেছিলাম। লাঞ্চের সময়ের একটু আগে আমরা নাবি গেটে গিয়ে পৌঁছব। নাবি গেট পেরোলেই সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্ শুরু হবে।

এত পড়েছি, এত ছবি দেখেছি, আজ ক'ঘণ্টা পরেই সেই সেরেঙ্গেটিতে গিয়ে পৌঁছব তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার আগে ডানদিকে পড়বে ওল্‌ডুভাই গর্জ। যেখানে পৃথিবীর প্রথম মানুষ বাস করত। ওল্‌ডুভাইতে ঢুকব ফেরার পথে।

এই আমি, বাইরের রোদ, আকাশ, বন-জঙ্গল, পাহাড়; দূরের উপত্যকায় বেলজিয়ান কাট্-গ্লাসের মত রোদ পড়ে ঝলসে ওঠা হ্রদ এই সবই আমার। আর কিছু চাই না আমি। কিছুই পেতে চাই না; জানতে চাই না।

নাক ভরে আদিম আফ্রিকার গন্ধ নিচ্ছি। কত ক্রীতদাস-দাসী হেঁটে গেছে এই পথে—

www.BanglaBook.org

কত মাসাই মোরান্‌রা যুদ্ধ করেছে। মোরান্‌দের রক্তের গন্ধ, কত মাসাই যুবতীদের বুকের খাঁজের গন্ধ, ভালোবাসার গন্ধ, রিক্ততার গন্ধ মিশে গেছে বনের গন্ধের সঙ্গে।

কত বিদেশী সাদা চামড়ার মানুষ কত বিচিত্র শুভ ও অশুভ ফিকিরে এই পথে গেছে তাদের ক্যারাভানে।

কোটি কোটি বছর আগে এইপথেই ডাইনোসোরাস দাঁড়িয়ে থেকেছে পাহাড়ের মত, চাঁদরে পাহাড়ের চাঁদকে ঢেকে। তাদেরই বংশধর, হাতিরা বৃংহণ তুলছে আজকে এই বনের আড়াল থেকে।

বর্তমানই অতীতের শব; ভবিষ্যৎ-এর ভ্রূণ। বর্তমানেই, রেডি, গেট, সেট, গো! বর্তমানের সাদা দাগে বাঁ-পা ছুঁইয়েই আমরা প্রত্যেক মানুষই জীবনের অজানা দৌড়ে সামনে দৌড়ে যাই। জেনে, না-জেনে, বুঝে না-বুঝে; গন্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করে অথবা না-করে আমরা তবুও সকলেই দৌড়ই। সূর্য ডোবে, সূর্য ওঠে, আমরা দৌড়ই।

ঐ জেব্রারা অথবা ওয়াইল্ড বীস্টরা, আমাদের চোখে যারা ছোট, যারা মূক, মূর্খ জানোয়ার তারা কিন্তু আমাদের মত দৌড়োবার জন্যেই দৌড়য় না। ওরা কখনও কখনও দৌড়য়। শীতে বা গ্রীষ্মে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাবার জন্যে; যেমন উড়ে যায় শীতের পাখি এক দেশ থেকে অন্য দেশে। সিংহ, চিতা দৌড়য় খাবার সংস্থানের জন্যে। যারা ওদের খাদ্য, তারা দৌড়য় প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। ওরা দৌড়বার কারণ ঘটলেই দৌড়য়। কিন্তু আমরা অকারণে এবং কারণ না জেনেই দৌড়ই সবসময়ই; এই দু-পেয়ে জানোয়ারেরা।

জেব্রারাই জংলী গাধা, না আমরাই সভ্য গাধা, সে সম্বন্ধে বিবেচনা এখনও হয়ত কেউ করেনি। করার সময় হয়ত এসেছে। আধুনিক সভ্যতা বলে যাকে আমরা জানি, সেই গর্বিত অবয়বহীন ডাইনোসরও শীগগিরই একদিন বিলুপ্ত হবে পৃথিবী থেকে। সব মুছে যাবে—আজকের আমি, এই পটভূমি, আমার এবং আমাদের সমসায়িকদের দম্ভভরা সব জ্ঞান-গরিমা। আবারও ধু-ধু করেবে প্রান্তর। আবার কচিকলাপাতা সবুজ ঘাস গজাবে নতুন করে। নতুন কোনো অনামা প্রাণী সেই ঘাস ছিঁড়ে খাবে। আমাদের নতুন কোনো বংশধর, যারা লোভী নয়, গর্বিত নয়, যাদের সমতাজ্ঞান আছে, যারা সাম্যর মানে বোঝে; যারা এই ব্রহ্মাণ্ডে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে স্থিরজ্ঞানী তারা তাদের উজ্জ্বল পবিত্র চোখে, তাদের সুন্দর নরম পায়ে অন্য সব মানুষ অথবা কোনো নাম-না-জানা মানুষ বংশোদ্ভবের সঙ্গে, অন্য সমস্ত ছোটবড় প্রাণীর সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করবে এই আশ্চর্য দান—এই আশ্চর্য প্রাপ্তি—এই পৃথিবীকে। পরমাকে।

হঠাৎ কিলালা ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, ওরা আসছে।

দূরে দেখলাম, একটি ছোট্ট ধুলোর বিন্দু আস্তে আস্তে বড় হতে হতে কাছে আসছে বিপরীত দিক থেকে।

আমি বললাম, কারা?

আমাদের সৈন্যরা। ডাডা অ্যামিনকে ঠাণ্ডা করে ওরা ফিরে আসছে।

www.BanglaBook.org

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলপাইসবুজ ক্যামোফ্লেজ-করা জলঢাকা একটা স্থানীয়া ভ্যান আমাদের মুখোমুখি এল।

কিলালা গাড়ি বাঁয়ে রেখে জানালার কাঁচ নামিয়ে বলল, হাবারি সানা?

সৈন্যরা উত্তরে বলল, নুজুরি সানা।

আমার মনে পড়ল, টিউনিস আমাকে বলেছিল যে, ভদ্রতাতে এরা লক্ষ্ণৌওয়ালাদেরও হার মানায়। কারো সঙ্গে কারো দেখা হলে বাড়ির সকলের নাম ধরে ধরে কুশল জিগ্‌গেস করার রেওয়াজ আছে এখানে। হাবারি বাবা, হাবারি মা, হাবারি কাকা, হাবারি পুটু, হাবারি পেঁচি, ইত্যাদি।

প্রত্যেক প্রশ্নর উত্তরে অন্যজন সমানে বলে যাবেন নুজুরি সানা, নুজুরি সানা।

তারপর একজনের প্রশ্ন শেষ হলে অন্যজন প্রথমজনের বাড়ির সকলের নাম ধরে ধরে আবার প্রশ্ন করবেন হাবারি কালা, হাবারি ধলা, হাবারি হাবুল, হাবারি শ্যামল, হাবারি মনি, হাবারি চানু। আবার উত্তর হবে। নুজুরি কালা, নুজুরি ধলা, নুজুরি শ্যামল, নুজুরি...ইত্যাদি।

টিউনিস ঠাট্টা করে বলেছিল, এরা হাবারি বিল্লী, হাবারি কুত্তা, হাবারি চিড়িয়াও বলে।

এ ক'দিনে কিলালাকে দেখে টিউনিসের ঠাট্টা-করে বলা কথাটা যে হেসে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, তাই-ই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কিলালা বলল, লালা সালামা!

সৈন্যরা সমস্বরে বলল, লালা সালামা!

নকশালবাড়ির রাজ্যের লোক আমি। এই কথাটার মানে আর বলে দিতে হল না। লাল সেলাম।

মনে পড়ল, হোটেল কিলিমান্জারোর ওয়াইন-কার্ডের শেষ আইটেম ছিল লালা সালামা—তান্‌জানীয়াতে তৈরী একরকমের ওয়াইন। লেখা ছিল, "ট্রাই আওয়ার নাইট ক্যাপ—লালা সালামা"।

সৈন্যরা চলে যেতে, আমরাও এগোলাম।

এই হাবারি সানা, নুজুরি সানার যেমন ভালো দিক আছে খারাপ দিকও আছে। হাতে কত অফুরন্ত সময় থাকলে যে, মানুষ প্রত্যেকের নাম করে পনেরো মিনিট ধরে কুশলবার্তা জানাতে পারে এবং নিজেও জানাতে পারে তা এই প্রচণ্ড সময়াভাব এবং গতিস্মানতার দিনে ভাবলেও অবাক লাগে। আসলে, মুল ব্যাপারটাই হচ্ছে; পোলে পোলে। আস্তে আস্তে।

টেনশান এদের জমবে কি করে? হাবারি সানা, নুজুরি সানা, নুজুর সানা করতে করতেই যতটুকু বা টেনশান জমা হয় কখনও, তা গলে জল হয়ে যায়।

গাড়ি চলছে। এখন আশে-পাশে, গাছ-গাছালির চেহারা বদলে গেছে। গোরোংগোরোর মত ঠাণ্ডাও আর নেই। আমরা পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে সমতলে চলে এসেছি। মাঝে মাঝে অ্যাকাসিয়া গাছ দেখা যাচ্ছে। ঝোপঝাড়। রেড-থর্ন এ্যাকাসিয়া।

এমন সময় দুরে একটা টিলা মত চোখে পড়ল। টিলাটার উপরে নানারকম গাছ-

www.BanglaBook.org

গাছালি। তবে খুব বড় গাছ নয়। ছোট্ট ছোট্ট গাছগুলো। মাথাগুলো ঝুপড়ির মত সুন্দর দেখতে।

দেখতে দেখতে আমরা সেই টিলার মুখে বড় একটা বিরাট লোহার গেটের সামনে এসে পৌঁছলাম। তার ওপর লেখা রয়েছে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক। গেট-এর পাশেই গার্ডের ঘর। এখানে এণ্ট্রি করে, পয়সা দিয়ে ঢুকতে হবে।

কিলালা নামল। গিয়ে খাতা-টাতা ভর্তি করতে লাগল। তারপর আমাকে ডাকল সই করার জন্যে। নেমে গিয়ে ছোট্ট অফিসে পৌঁছলাম। যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁকে বললাম, জাম্বো।

ভদ্রলোক ইংরিজীতে বললেন, ওয়েলকাম্! কোথা থেকে আসছেন আপনি?

ইণ্ডিয়া থেকে আসছি শুনে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন।

মনে হল, ভারত থেকে এখানে খুব কম লোকই আসেন। যদিও স্থানীয় এশিয়ানরা আসেন কখনও সখনও। তবে স্থানীয় এশিয়ানদের এসব ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই। প্রচুর টাকা রোজগার করে, উঁচু ভল্যুমে হিন্দী ফিল্ম-এর গান শুনে, চুড়মুর, ঢোকলা এবং একগাদা চিনি ও দুধ-দেওয়া চা খেয়ে, বীয়ার পান করে পোলে পোলে জীবন কাটিয়ে দেন এঁরা।

ভদ্রলোক শুধোলেন, কেমন দেখলেন গোরোংগোরো? কেমন লাগছে আমাদের দেশ?

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, আপনার যাত্রা শুভ হোক, আপনি আনন্দে থাকুন!

জুলিয়াস নীয়েরে শুধু নিজেই যে বড় নেতা তাই নন, ভদ্রলোক তাঁর দেশের সমস্ত লোকদের মধ্যে একাত্মতা এনেছেন ও নিজেদের দেশ সম্পর্কে এক বিশেষ গৌরব বোধ করতে উদ্বুদ্ধ করছেন যে, এটা কম কথা নয়। নেতারা নিজেরা যদি ত্যাগে, চারিত্রিক দৃঢ়তাতে সাধারণের চেয়ে বড় না হন, তাহলে জনসাধারণ তাঁদের নেতা বলে মানবেনই বা কেন?

এক ঝাঁক পাখি কিচির-মিচির করছিল গাছগুলোতে। এক ঝাঁক বললে বোধহয় ঠিক বলা হয় না। সেখানে অন্তত শ'খানেক পাখি ছিল। পাখিগুলোর শরীরের রঙ দারুণ উজ্জ্বল কমলা, বাদামী, নীল ও স্বল্প সাদায় মেশা। এগুলোর নাম স্টার্লিং। আমাদের দেশের ময়নাদের মত স্বভাব, কিন্তু ময়নাদের চেয়ে দেখতে ছোট এবং গলার স্বরও অনেক মিষ্টি।

যেখানেই এই পাখিগুলো থাকে, সেখানেই কিচির-মিচির করে এবং ক্রমাগত উড়ে বসে জায়গাটা সরগরম করে রাখে।

গেটটা খুলে দেওয়ার আগে আমি কিলালাকে একটু জল খাওয়ার কথা বললাম। পেছনেই একটি ছোট্ট ঘর মত ছিল। তার সামনে একটি বাচ্চা খেলা করছিল।

কিলালা মহা আপত্তি করল। বলল, বীয়ার খাও। ম্যালেরিয়া হতে পারে, পেটের অসুখ হতে পারে, এমনকি ইয়ালো-ফিভারও হতে পারে।

আমি বললাম, যাই-ই হোক, জল যখন এখানে আছে, তখন আমি একটু জল খাবোই।

www.BanglaBook.org

নাচার হয়ে কিলালা নেমে গিয়ে অর্গানাইজ করল ব্যাপারটা। আমাদের দেশেরই যে-কোনো গ্রামের কুঁড়ে ঘরের মধ্যে যেমন ঝকঝকে বাসনে কেউ জল এনে দেয় তৃষ্ণার্তকে, তেমনই পরিষ্কার একটি কাঠের পাত্র করে সযত্নে জল নিয়ে এল একটি লোক। এবং ঘটির মতই একটি কাঠের বাটি করে আমার আঁজলাতে সসম্ভ্রমে ঢেলে দিল।

কী মিষ্টি স্বাদু টাটকা জল! আর কিলালা খেতে দিচ্ছিল না!

লোকটিকে বক্‌শিশ দিতে চাইলাম, সে আহত হল। কিছুতেই নিচ্ছিল না। কিলালা বুঝিয়ে বলাতে, তারপর নিল।

পৃথিবীর সব দেশের, সব গ্রামের গরীব মানুষরা শহরের ধান্দাবাজ মানুষদের চেয়ে অনেক ভালো।

আমি খেতেই, কিলালাও খেল আঁজলাভরে অনেক জল। উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসার পর থেকেই একটু গরম লাগছিল। ওভারকোট খুলে ফেলেছিলাম।

গাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে কিলালাকে জিগ্‌গেস করলাম, জল খেতে মানা করছিলে কেন? চমৎকার জল তো!

কিলালা মুখ নীচু করে বলল, সাদা-চামড়ার লোকেরা কালোদের দেশে এসে জল খেতে চায় না কোথাও। ওরা এরাটেড ওয়াটার বা বীয়ার বা ওয়াইন খায়।

আমি বললাম, আমি তো সাদা-চামড়ার নই।

কিলালা বলল, কালো চামড়া হলেও অনেকে সাহেব হয়। যারা এসব জায়গায় বেড়াতে আসে, দেখতে আসে, তারা সবাই বানা। সাহেব।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমাদের দেশেও কি কালো চামড়ার সাহেব নেই? যারা সাহেব বলে নিজেদের মনে করে খুশী হয়?

আমি হেসে ফেললাম।

বললাম, আছে, আছে। অনেক আছে। এবং তেমন লোক সাহেবরা দেশ ছেড়ে যাবার পর সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি সাহেবী পোশাক পরলেও, মাঝে মাঝে সাহেবী খানা-পিনা করলেও, একবারেই নেটিভ, নিগার; সাহেবদের ভাষায়। তোমারই মত। আমিও কালো, তুমিও কালো। আমার ধলো হবার কোনোই বাসনা নেই।

কিলালা আমার পশ্চাৎদেশে দুটি চাপড় মেরে বলল, গুড ম্যান।

ওরা খুশী হলে পিঠে চাপড় না মেরে পশ্চাতে মারে।

ভালোই হল। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে সাড় চলে যাবার উপক্রম হয়ে গেছিল। সাড় ফিরে এল।

কিলালা গাড়ি স্টার্ট করল।

করতেই আমি সেই গানটা গেয়ে উঠলাম ঃ

উই আর ইন দ্যা সেম বোট ব্রাদার, ইফ্ ঊ্য টিপ্ দ্যা ওয়ান এণ্ড ঊ্য আর গোয়িং টু রক্ দ্যা আদার। উই আর ইন দ্যা সেম বোট ব্রাদার!

কিলালা স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে দুহাতে তালি দিয়ে উঠল।

www.BanglaBook.org

আমি তাড়াতাড়ি স্টীয়ারিং ধরলাম। একটু হলেই পাথরে ধাক্কা লাগত।

আবার স্টীয়ারিং-এ হাত ছুঁইয়ে কিলালা বলল, কার গান?

বললাম, এই গান শোনোনি? বিখ্যাত এ্যামেরিকান কালোগাইয়ে পল্ রোবসন্-এর গান?

কিলালা বলল, আমাদেরও এরকম একটা গান আছে ঃ বলেই গাইতে আরম্ভ করল...

কিন্তু আমি সামনে চেয়ে ওর বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে থামিয়ে দিলাম।

বললাম, এখানে দাঁড়াও কিলালা। একটু চুপ করে থাকো।

যে গেটটা আমরা পেরিয়ে এসেছিলাম, তার নাম নাবি গেট। একটা টিলার এক প্রান্তে সেই গেটটা। লাল ফুল ফোটা গাছেদের আর স্টার্লিংদের ভীড় ছেড়ে আমরা যেই নীচে নেমে এলাম, হঠাৎ সামনের দৃশ্য দেখে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে গেল।

ছোটবেলা থেকে আমাদের দেশের অনেক জঙ্গল পাহাড়ে অনেকানেক স্তব্ধ-করা দৃশ্য দেখেছি। বড়ো হয়ে পৃথিবীর নানা মহাদেশেও কম আশ্চর্য দৃশ্য দেখিনি। কিন্তু এই মহাদেশে, এই মুহূর্তে যা দেখলাম তেমন কোনো কিছুই বুঝি আগে দেখিনি।

পৃথিবী বিরাট বলে জানতাম আমি; সকলেই জানে। সমুদ্রের সামনে জীবনে প্রথমবার এসে দাঁড়ালেও সকলেরই বুকের মধ্যে অসীমত্ব একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। কিন্তু সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মেশে, সেখানে সমুদ্র আকাশে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়ে একে অন্যকে কিছুটা সীমায়িত ও অস্পষ্ট করে।

আমার সামনে হলদে-লাল ঘাসে-ভরা এক সমান জমির সমুদ্র। তার তিনদিক মিশে গেছে আকাশের নীলে গিয়ে। এই অসীম শূন্য প্রান্তরে একটিও গাছ নেই, ঝোপ নেই, কুঁড়ে নেই; শুধু আকাশ আর এই সেরেঙ্গেটি। ইংরিজীতে ভাস্টনেস্ বলে যে কথাটা আছে এবং যা আমরা সকলেই জানি, অভিধানে তার পাশে যেসব কথা লেখা আছে তা মুছে দিয়ে শুধু "সেরেঙ্গেটি" কথাটি বসিয়ে দেওয়া উচিত। সেরেঙ্গেটিই হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ভাস্টনেস্।

ধরিত্রীর বিস্তৃতি সম্বন্ধে যদি কোনো ধারণা কারোই জন্মাতে হয়, তবে তাঁর এখানেই আসা উচিত। এখন তবুও পিছনে গাছপালা পাহাড় আছে কিন্তু আমি জানি যে, আরও দশ মাইল গাড়ি চালিয়ে যাবার পর পিছন দিকে তাকালেও দিগন্ত দেখতে পাব। মনে হবে, মরুভূমির মধ্যে এসে গেছি। মনে হবে, যে-কোনো মুহূর্তে হারিয়ে যাব বুঝি।

এই অসীম, উদাত্ত, বাধাবন্ধনহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা কালচে-সাদা পথ চলে গেছে—সোজা। সোজা বললেও সব বলা হয় না। এই সোজা ন্যাড়া পথটিও সরলত্বের ধারণাস্বরূপ। কোথাও বাঁক নেই, গাছ নেই, ছায়া নেই, পথটা তেপান্তরের শান্তির মাঠ পেরিয়ে, কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়ে; কল্পনারও অতীত অন্য এক অনামা কল্পলোকে উড়ে গেছে নীল আকাশের মধ্যে দিয়ে।

এ যেন পথ নয়, এ বুঝি মহাকাশের ছায়াপথ; মহাকালেরও!

কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম মনে নেই।

www.BanglaBook.org

কিলালা তার ফোলা গালের মধ্যে কুত্‌কুতে চোখ আর ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল একটু।

বলল, ইউ রাইটার। রাইট স্টোরীজ। মাই বানা টোল্ড মী।

তারপর বলল, নাউ আই নো, ইউ রাইটার। ইউ ডিফারেন্ট।

মনে মনে বললাম, হ্যাঁ কিলালা। ভগবানের অশেষ দয়াতে লেখকরা অন্য দশজনের থেকে অন্য রকম হন। খুব কম মানুষই এই ব্যতিক্রমকে বোঝে; মেনে নেয়। তুমি অতি সাধারণ মানুষ হয়েও বুঝেছ।

কৃতজ্ঞ আমি! আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর কিলালা বলল, শুড উই মেক আ মুভ, বানা?

আমি ওর কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বললাম, প্লিজ ডু।

গাড়িটা নাবি-হিলের উপর থেকে গড়িয়ে এসে সমতলে নেমে পড়ল তারপর চলতে লাগল সোজা।

অন্তবিহীন পথ বেয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন আমরা লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে পথের বাঁদিকে চেপে, গাড়ি দাঁড় করিয়েছি।

নাবি গেট ছাড়ানোর পনেরো মিনিট পর থেকেই নানান জানোয়ার পড়তে লাগল দুপাশে। উটপাখি, জিরাফ, জেব্রার দল, অসংখ্য থমসনস্ গ্যাজেল, গ্রান্টস্ গ্যাজেল, ওয়াইল্ড বীস্ট, ওয়ার্ট হগ, সেক্রেটারী বার্ড, স্ট্রাইপড্ শেয়াল, হায়না, বড় বড় শকুন; লাল মাথাওয়ালা।

অনেক দূরে এক জোড়া সিংহ, সিংহী ও ছ'টি বাচ্চাকে দেখা গেল। আরেক জায়গায় থমসনস্ গ্যাজেলদের লড়াই দেখলাম। দুটো বড় শিঙাল পথের পাশে দাঁড়িয়ে শিং নাড়িয়ে, শিং বেঁকিয়ে খটাখট্ আওয়াজ করে লড়াই করছে।

আমি বললাম, মাটিতে নেমে ঘাসের উপর আরাম করে বসে খাই।

কিলালা হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, মাথা খারাপ।

আমি বললাম, হয়ত তাই।

ও বোধহয় এমন অবাধ্য ট্যুরিস্ট এর আগে দেখেনি, যে গাড়ি থেকে আধমাইল দূরে সিংহ দেখেই ভয়ে জবুথবু হয়ে যায় না, অথবা ও যাই-ই বলুক না কেন; তা-ই বাইবেলের বাণীর মত শ্রদ্ধা সহকারে শোনে না।

আমি দরজা খুলে নেমে পড়েই হাত-পা টান করে ঘাসের উপর শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

কিলালা দুটো বীয়ার আর আমাদের প্যাক-লাঞ্চের বাক্স দুটো নামিয়ে আনল। এনেই, ভয়ে ভয়ে চারধারে তাকাতে লাগল।

আমি উৎসুক চোখে কিলালার দৃষ্টি অনুসরণ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখতে পেলাম না।

কিলালা মুখ গোঁজ করে বলল, তুমি কি ভাবছ আমি সিম্বার ভয় পাচ্ছি?

আমি হেসে বললাম, সিম্বার ভয় যদি না পাও, তাহলে কি ভূতের ভয় পাচ্ছো? ভয় যে কিছুর পাচ্ছো, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

কিলালা গম্ভীর মুখে বলল, ভূত-প্রেত নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। এই সেরেঙ্গেটিতে নেই এমন ভূত-প্রেত দুনিয়াতে নেই। কিন্তু আমার ভয় সেজন্যে নয়। আমার ভয় সেৎসী মাছির। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে যে, গাড়ির কাঁচ নামাচ্ছিলাম না আমি একবারও। এখন সেৎসীদের এলাকায় এসে গেছি আমরা। এবার জানালা বন্ধ করে যেতে হবে তোমার।

আমি বললাম, অসম্ভব। আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। খুব শীত থাকলে অন্য কথা। জানালার কাঁচ খুলে জানালায় হাত না রেখে বসলে আমার কাঁধ ব্যথা করে।

www.BanglaBook.org

কিলালার দিকে চেয়ে মনে হলো, 'আমি খেলব না কিন্তু' গোছের একটা ভাব ওর চোখে মুখে।

ওকে আমল না দিয়ে আমি বীয়ারের ছিপি খুললাম।

তারপর বললাম, তোমারটা খুলে দিই?

ও বলল, আমি খাওয়ার শেষে বীয়ার খাব।

ওর দিকে একটা প্যাকেট এগিয়ে গিয়ে বললাম, খাও।

প্যাকেটে দুটো করে ডিম সেদ্ধ, কোল্ড-চিকেন, দুটি কমলালেবু, একটি কলা এবং দুটি ব্রেড-রোলস্। এলুমুনিয়াম ফয়েলের ক্ষুদে ঠোঙাতে মাখন, মার্মালেড, নুন ও এবং গোলমরিচ।

বীয়ারের বোতলের মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে চুমুক দিলাম।

কিলালা ব্যাজার মুখে খেতে লাগল মুখ নীচু করে।

এই সেৎসী মাছিরা আফ্রিকার কুখ্যাত এক জীব, সন্দেহ নেই। এরাই মানুষের ইয়ালো-ফিভার এবং গবাদিপশুর জন্যেও এক মৃত্যুবাহী রোগ বয়ে আনে। সে অসুখের নাম, এদের ভাষায়, নাগানা। কিন্তু এই মাছিরাই আবার সেরেঙ্গেটির বন্য জন্তুদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। কারণ, এদের ভয়েই মানুষ এখানে আস্তানা গাড়তে পারেনি, অথবা যতখানি শিকার করতে পারত, তা পারেনি। এই মাছিদের জন্যে মানুষ এসব অঞ্চলে বসবাস যেমন করতে পারেনি, মাসাইরাও তেমন তাদের পশুদের চরাবার জন্যে এখানে আসেনি।

বইয়ে পড়েছি, মাছিগুলো আমাদের দেশের ডাঁশের চেয়ে একটু ছোট। আমাদের দেশে ডাঁশ বা হর্স-ফ্লাই খুব বড় হয়। এবং তাদের কামড় মারাত্মক বেদনাদায়ক এবং কামড়াবার ফলও সাংঘাতিক। যে জঙ্গলে ডাঁশ থাকে সে জঙ্গলে বাঘ পর্যন্ত ঢোকে না।

আমাকে এই ডাঁশ একবার কামড়েছিল যমদুয়ারে। আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ভুটানের সীমান্তে এই জায়গাটা। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বরফ গলা জলের সংকোশ নদী।

আমরা সেবার যখন গেছিলাম তখন মে মাস। বাঘেদের মিলনকাল। একটি বড় বাঘের পায়ের দাগ খুঁজে বের করে শুকিয়ে যাওয়া রাঙা নদীর তীরে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দেখে মাটিতেই বসে ছিলাম। সেই বাঘ, বাঘিনীর জন্যে ডাক ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যের ঠিক পরেই এসে পৌঁছেছিল। এবং আমাদের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু সে কাহিনী অন্যত্র বলা যাবে।

সেই রাতেই যখন আমরা রাঙা নদীর বুক থেকে জীপে করে যমদুয়ারের বাংলোয় ফিরছি তখন হঠাৎ একটা ডাঁশ আমার ডান গালে ফটাস্ করে কামড়ে দিল। চলমান জীপের উল্টোদিক থেকে উড়ে আসা ডাঁশের কামড়ের ইমপ্যাক্ট-এ সত্যিই ফটাস্ করে আওয়াজ হয়েছিল।

মনে হল, কেউ যেন কোনো বিষাক্ত তীর ছুঁড়ল। দেখতে দেখতে আমার মুখটা ফুলে সেই সঙ্গিনীর সঙ্গ-কামী বাঘেরই মুখের মত বড় এবং লাল হয়ে গেল। প্রচণ্ড জ্বালা

www.BanglaBook.org

এল যন্ত্রণার সঙ্গে।

বাংলোয় যখন পৌঁছলাম তখন আমার হুঁশ প্রায় ছিল না। যমদুয়ারের বহু মাইলের মধ্যে কোনো লোকালয় নেই। সঙ্গে তেমন কোনো ওষুধপত্রও ছিল না। মনে আছে, আমার সঙ্গীদের কাছে একমাত্র যা সর্বরোগনাশক তরল পদার্থ ছিল সেই স্কচ-হুইস্কীই একটি বড় করে ঢেলে গরম জলের সঙ্গে আমাকে খাইয়ে দিয়ে ওঁরা ধরাধরি করে শুইয়ে দিলেন। তার আগে আমার চরিত্র অটুট ছিল এবং কখনও ওসব খারাপ জিনিস খাইনি। ডাঁশের কামড়ের কষ্ট এবং চরিত্র-নাশের কষ্ট দুইই স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে আজও।

আমাদের দেশের ডাঁশের চেয়ে আফ্রিকান সেৎসী মাছি আকারে ছোট হয়। ইয়োরোপে যে-আকারের মাছি দেখা যায় শহরে-গ্রামে সেৎসীর আকার সেরকমই। আফ্রিকাতে সব-সুদ্ধু কুড়ি রকমের সেৎসী মাছি আছে। কিলালা বোধহয় এ তথ্য জানে না। জানলে, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে। পৃথিবীর আর কোথাওই সেৎসী মাছি দেখা যায় না। এদের ওড়া বা বসা দেখলেই এদের চেনা যায়। এরা ডানা দুটো একটার উপর দিয়ে অন্যটাকে মুড়ে রাখে, কাঁচির ফলার মত খোলে আবার জড়ো করে রাখে।

আমার সকলেই জানি যে, মশাদের বিভিন্ন জাতের মেয়ে মশারাই রক্ত খায়, পুরুষরা ফুল ফলের মধু ও রস খায়। কিন্তু সেৎসী মাছিদের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই রক্ত খায়। এবং শুধু রক্ত খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এরা সিংহ বা চিতা বা বুনো কুকুরের চেয়েও যে বেশী রক্তপিশাচ, শুধু তাই-ই নয়, এদের রক্ত-পিপাসাও কখনও মেটে না। ওদের শুঁড়ে খুব তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। গায়ে বসেই এক কামড়ে চামড়া ফুটো করে দিয়ে রক্ত চুষতে থাকে। ওদের থুথুতে এমন কিছু আছে যা ছিটিয়ে দিয়ে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না ওরা। তারপর দেখতে দেখতে ওদের পেট রক্তে ফুলে লাল হয়ে ওঠে।

সেৎসী মাছিদের ব্যাপার স্যাপার একটু অন্যরকম। সেৎসী মাছিদের মিলনকাল লাগাতার ঘণ্টাপাঁচেক। কিন্তু ভয়ের ব্যাপারে এই যে, স্ত্রী মাছি একবার গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর সারাজীবনে মা হওয়ার কারণে অন্ততঃ তার আর কোনো পুরুষ মাছিকে দরকার হয় না।

অন্য কারণে হলেও বা হতে পারে!

অন্যান্য মশা বা মাছিরা যে ডিম পাড়ে তাদের সব ডিম ফুটে মশা হয় না। অনেক ডিম থেকেই মশা মাছি জন্মায় না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সেৎসী মাছি ডিম পাড়েই না। ওদের জরায়ু স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের মত। একটি খোলসের মধ্যে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়। এবং ভূমিষ্ঠ হবার পঁয়ত্রিশদিন পর পূর্ণাবয়ব মাছিতে রূপান্তরিত হয়।

সেৎসী মাছি নিয়ে লোকের এত দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, যদি না কুড়িরকম সেৎসী মাছির মধ্যে ন'রকমের মাছির কামড়ে ঐ রোগ হত। সব সেৎসী মাছি কামড়ালেই যে ইয়ালো-ফিভার বা স্লীপিং-সিকনেস্ হয় তা নয়। এটা কিলালার মত অনেকেই হয়ত জানে না। অবশ্য কত পশু আর কত মানুষ যে আফ্রিকাতে এই রোগে মরেছে তার লেখা-জোখা নেই। তাই এই মাছির ডানার ভন্ ভন্ শব্দে যে কিলালা একাই ত্রাসে চমকে ওঠে তাও নয়।

www.BanglaBook.org

এই অসুখে প্রথমে ঘাড়ে খুব যন্ত্রণা হয়, তারপর জ্বর আসে আর ঘাড়ের গ্লাণ্ড ফুলে ওঠে। তারপর রুগীর মস্তিষ্কতে এই অসুখের প্রভাব পড়ে। শরীর ক্ষয় পেতে থাকে এবং মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যায় ধীরে ধীরে।

এখন অবশ্য নানারকম ওষুধ বেরিয়েছে। প্রতিষেধক ইনজেক্‌শান বেরিয়েছে। কিন্তু তবুও কিলালার মত আফ্রিকার যারা বাসিন্দা তারা সেৎসা মাছিকে সিংহের চেয়েও বেশী ভয় পায়। সেৎসী মাছিরা জংলী মোষ, জিরাফ, নানারকম এন্টেলোপ, ওয়ার্ট-হগ্, হায়েনা এবং অন্যান্য প্রায় সব বন্য প্রাণীকেই কামড়িয়ে তাদের মধ্যে নানারকম ট্রাইপানোসোমস্ ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এই সব জংলী জানোয়ারেরা তাদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্যেই হোক বা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াতেই হোক কখনও মরে না এই মাছির কামড়ে।

এই মাছির জন্যে কত শত লোকালয় লোকশূন্য হয়ে পড়ে ছিল একসময় আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। গৃহপালিত পশুরাও এদের কামড়ে মারা যাচ্ছিল। জংলী জানোয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে এই মাছিগুলো ঘোরে বলে একসময় সমস্ত লোকদের বিনা পয়সায় বন্দুক ও গুলি দিয়ে জংলী জানোয়ার মেরে শেষ করতে বলা হয়েছিল এই ভেবে যে, জংলী জানোয়ারদের নিধনের সঙ্গে সঙ্গে এই মাছিদের অত্যাচারও বন্ধ হবে।

একটা বাঁচোয়া, সেৎসী মাছিরা যা কিছু করার দিনের আলোতেই করে। রাত নেমে এলে তারা আর ওড়ে না। কিন্তু আফ্রিকার বন-জঙ্গলে শুধু সেৎসী মাছিই নেই, মশারাও জোরদার। তারা দিনে রাতে সমানে অত্যাচার চালায় এবং ম্যালেরিয়া ও ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ায়।

বীয়ারটা শেষ করে আমি যখন খাওয়া শুরু করলাম তখন কিলালা খাওয়া শেষ করে বীয়ার খুলল। বীয়ার খেয়ে মুখটা তেতো হয়ে গেল। তান্‌জানীয়ার বীয়ার মোটেই খেতে ভালো নয় এবং ভীষণ পেট ভার করে। কিন্তু সরকারী আইনের বাধায় এখানে অন্য কোনোরকম বীয়ারই পাওয়া যায় না।

নাবি-হিলের দিক থেকে দূরে একটা গাড়ি আসছে দেখা গেল। গাড়িটা অনেক সময় নিল আমাদের কাছে আসতে। নেবেই। কারণ রাস্তাটা সোজা কত মাইল অবধি যে দেখা যাচ্ছে তা বলা মুশকিল।

গাড়িটা কাছে আসতেই দেখলাম একটা সাদা ল্যাণ্ড-রোভার। মিস্টার কাপুত্‌দের গাড়ি।

ওঁরা থামলেন।

মিঃ কাপুত্ শুধোলেন, এনি ট্রাবল্?

আমি বললাম, নো; থ্যাঙ্ক উ্য।

রুথ, সরী; লাইলাক্, হেসে বলল, নট ইভিন উইথ ইওর ক্যামেরা?

আমিও হেসে বললাম, নট ইয়েট।

তারপর ওঁরা গাড়ি থেকে নামলেন।

শুধোলাম, বীয়ার খাবে? আছে।

ওরা জাতে জার্মান। বীয়ারে কখনও "না" বলতে নেই ওদের। শাস্ত্রে মানা আছে।

www.BanglaBook.org

আমি উঠে একটা বীয়ার খুলে দিলাম মিঃ কাপুত্কে, অন্যটা মিসেস কাপুত্কে।

এমন সময় লাইলাক্ বলল, তুমি তো সেরোনারাতেই যাচ্ছো, চলো আমি তোমার গাড়িতে যাই, আর কতক্ষণেরই বা পথ! এই ল্যাণ্ড-রোভারে আমরা টাইট হয়ে আছি মালপত্রসমেত তিনজন লোকে।

আমি বললাম, মাই প্লেজার।

মিঃ কাপুত্ শালীর দিকে চেয়ে বললেন, আর উ্য সীরিয়াস?

লাইলাক্ বলল। সার্টেনলী; আই এ্যাম।

বীয়ার খাওয়া শেষ করে ওঁরা এগোলেন। লাইলাক এবং আমরা আমাদের গাড়িতে উঠলাম।

সামনেই বসতে যাচ্ছিলাম। লাইলাক্ বলল, এ কি রকম ব্যবহার? মহিলাকে একা 'কা পেছনে বসতে দিচ্ছ?

বললাম, হাত পা ছড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তো গাড়ি বদলালে।

ও বলল, শুধু সেই জন্যেই কি?

বলেই, আমার দিকে তাকাল।

গাড়ি চলতে লাগল।

লাইলাক্ আমার পাশে বসে বলল, আমার মনে হচ্ছে আমি ফিরে যাই এখান থেকে। তুমি কাল যা বলেছো তা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আসলে ও আমাকে কখনও ভালোবাসেনি। পুরুষরা ওর কমই হয়। ওরা ফাউ চায়। ভালোবাসলে, কালই আমি বুঝতে পেতাম। ওরা খেলার ভালোবাসা খেলতে ভালোবাসে। বিপদ দেখলেই সরে পড়ে।

আমি বললাম, মেয়েদের বেলাতেই তো এ-কথা বেশী করে প্রযোজ্য বলে জানি আমি। আসলে, ভালোবাসা ব্যাপারটা ইন্ট্যানজিবল এ্যাসেটের মত। ব্যালান্সশীটে যেমন গুডউইল ইন্ট্যানজিবল ব্যাপারগুলোই এমন যে, থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে আছে; না-থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে নেই।

তারপর বললাম, কিছু মনে কোরো না; ভালো সকলে বাসতেও জানে না। আসলে খুব কম লোকেই জানে। তাও যদি জানে তো পুরুষরাই জানে। মেয়েরা বেশীর ভাগই জানে না। আমার নাম এখন ওলালা। আমি একজন ব্রিলিয়ান্ট ডিভাসটেটিং ফেস্-রীডার। তাই ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণ অবান্তর এখানে।

আমার মিথ্যা অথবা সত্যি কথা শেষ হবার আগেই, বাঁদিকের খোলা জানালা দিয়ে বা-জ্-জ্-জ্- আওয়াজ করে দুটো ইয়াব্বড় মাছি ঢুকে পড়ল গাড়ির মধ্যে। মাছিগুলো এত তাড়াতাড়ি পাখনা নাড়াচ্ছিল আর উড়ে বেড়াচ্ছিল এমন শব্দ করে যে, আমি চমকে উঠলাম।

সেৎসী মাছি সম্বন্ধে এযাবৎ তাবৎ পুঁথি-পড়া বিদ্যা শিকেয় উঠলো।

এদিকে গাড়ির মধ্যেই সাংঘাতিক বিপদ ঘটল। কিলালা। সে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে ওরিজিনাল সোয়াহিলীতে যত খারাপ খারাপ গালি ছিল, আমাকে দিতে দিতে; সামনের

www.BanglaBook.org

সীটে গ্রীষ্মর পুকুরে পোলো দিয়ে কইমাছ ধরার মত দুহাত দিয়ে খপাৎ খপাৎ করে মাছি দুটোকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

লাইলাক্ ইনোসেণ্ট গলায় বলল, হাউ ইণ্টারেস্টিং।

এমন সময়, আমার ওপর কিলালার যত বিদ্বেষ জমা ছিল, তার সমস্তটুকু পুঞ্জীভূত করে প্রচণ্ড গতিতে, অর্তকিতে এসে একটা মাছি আমার ইয়া-মোটা গ্যাবাডিনের জামার মধ্যে দিয়ে ছুঁচলো তরোয়াল চালিয়ে দিল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

উঃ বাবা। এত্ত লাগে!

তারপরই গাড়ির মধ্যে সার্কাস আরম্ভ হয়ে গেল। সামনের সীটে কিলালা আর পেছনের সীটে লাইলাক্ ও আমি লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে মাছি দুটোকে মারবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ছোঁয়া গেলেও, থাপ্পড় মারলেও; বোধহয় কিছুই হয় না এদের। আমি আমরা টুপিটা তুলে নিয়ে উইণ্ডস্ক্রীনে, সীটের ওপর যেখানে যেখানে মুহূর্তের জন্য বসছিল মাছি দুটো, সেখানে সেখানেই বিদ্যুৎগতিতে বাড়ি মারতে লাগলাম।

অবশেষে স্কোর হল। একটা আমি। একটা কিলালা। দুটো মাছিই সামনের সীটে কিলালার পাশে পড়ল।

দেখলাম, তাতেও কিলালার শান্তি হল না। ভাও সে নীচু হয়ে গাড়ির মেঝেতে কি যেন হাতড়াতে লাগল দুহাতে।

আমি বললাম, ওকি করছ? মরে গেছে যে!

কিলালা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, সিম্বা মরে, টেম্বো মরে; কিন্তু সেৎসী অত সহজে মরে না। ডানা ভেঙ্গে যাবে, পা ভেঙ্গে যাবে, শরীর থেঁৎলে যাবে, তবু মরবে না। যতক্ষণ না নিজে হাতে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করছ তুমি, ততক্ষণে সেৎসী মাছি মরে গেছে ভাবার মত ভুল কখনও করবে না। তুমি করলেও করতে পারো, কিলালার ধড়ে প্রাণ থাকতে কিলালা কখনও করবে না।

ইয়ালো-ফিভারের প্রতিষেধক ইনজেক্‌শান নেবার সময় খিদিরপুরের সরকারী, কিন্তু তবুও অতি ভদ্র ডাক্তারের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ব্যথা পেয়ে—। কিন্তু তখন জানতাম না যে, ইয়ালো-ফিভার হোক চাই-না হোক সেৎসী মাছির হুল ঢুকলেই ইনজেক্‌শানের চারগুণ যন্ত্রণা হয়।

সারা হাতটা জ্বলতে থাকলো পনেরো মিনিট ধরে।

আমি চোখের কোণে চেয়ে দেখলাম, কিলালা আড়চোখে আমার দিকে চাইছে।

ও গম্ভীর গলায় বলল, এবার কি জানালাটা বন্ধ করবে?

আমি বললাম, মাথা খারাপ! দমবন্ধ হয়ে মরার চেয়ে ইয়ালো-ফিভার হয়ে মরা অনেক ভালো।

আসলে সেরেঙ্গেটি বড় সমান, বড় নিস্তরঙ্গ; বড় চিড়িয়াখানা-চিড়িয়াখানা লাগছে আমার। গাড়ি চলেছে, আর দুধারে হরেকরকম জানোয়ার শয়ে শয়ে চরে বেড়াচ্ছে, খেলে

www.BanglaBook.org

বেড়াচ্ছে, ঘাসের মধ্যে। গাছ নেই, ছায়া নেই, আলোছায়ার রহস্য নেই, বুটি-কাটা গালচে নেই, বুনোফুলের গন্ধ নেই, মহুয়া নেই, করৌঞ্জ নেই, সবুজের সমারোহ নেই; নানা পাখির চিকন গলার ডাক নেই। আমি বোরড হয়ে যাচ্ছিলাম।

কিলালার সঙ্গে একটু খিটিমিটি লাগিয়ে না রাখতে পারলে হয়ত পৃথিবীর এই আদিমতম এবং নিশ্চিন্ততম চিড়িয়াখানায় এসে হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়েই পড়ব।

সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। কয়েক মাইল আগে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা পেয়েছিলাম বাঁয়ে। একটা কাঠের টুকরো লাগানো ছিল মাটিতে পোঁতা এক টুকরো কাঠের উপর। লেখা ছিল—

TO NDUTU SAFARI CAMP.

ফেরার সময় ঐদিকে যাব আমরা— লেক লাগাজার পাশের ছোট্ট সাফারি ক্যাম্পে।

সেরোনারা লজে আশে-পাশে অনেক গাছ-গাছালি আছে। কাছ দিয়েই বয়ে গেছে সেরোনারা নদী। এঁকে বেঁকে। জলের পাশে জংলী তাল খেজুর—। যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। লেরাই জঙ্গল। আম্ব্রেলা এ্যাকাসিয়া। দূর থেকে সেরোনারা লজটা দেখা যাচ্ছে। দেখবার মতই বটে। কিন্তু আপাততঃ লজে পৌঁছনোতে একটু অসুবিধা ঘটল।

একটি প্রকাণ্ড কালো-কেশরী সিংহ তার হারেম ও বাচ্চা-কাচ্চা সুদ্ধু পথের মধ্যে বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। বলতে গেলে একেবারেই গাড়ির বাম্পার ছুঁয়ে। তার কবি-মনে ভাবের সঞ্চার হয়েছে। শীগগিরী নড়াচড়া করবে বলে মনে হচ্ছে না।

লাইলাক্ দাঁড়িয়ে উঠে, ঝুঁকে পড়ে, উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্যে দিয়েই তার মুভি ক্যামেরা তাক্ করে কি-র-র-রর করে ছবি তুলতে লাগল।

আমি মনে মনে বললাম, মেয়ে, তুমি ছবি তোলো। আর আমি সেরোনারার আসন্ন সন্ধ্যায়, এ্যাকাসিয়া গাছেদের আকাশে হাতছড়ানো কালো কালো শিল্যুটভরা অস্তগামী সূর্যের গোলাপী আর কমলা রঙের দিগন্তবিস্তৃত পটভূমির এই ভরন্ত ছবিটির কমপোজিশানের মধ্যে পথের থেবড়ে-বসে-থাকা সিংহগুলোকেও ভরে দিয়ে, স্মৃতির ফ্রেমে চিরদিনের জন্যে বাঁধিয়ে রাখি ততক্ষণে।

ক্যামেরা নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে লাইলাক্ বলল, ইজনট্ এভরীথিং ওয়াণ্ডারফুল?

আমি বললাম, ওয়াণ্ডারফুল ইনডিড।

হঠাৎ কিলালার দিকে চোখ পড়ে যেতেই দেখলাম, কিলালা অতি কষ্টে ওর মোটা ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকের জানালার কাঁচটা কতখানি নামানো আছে তাই দেখছে।

বলাই বাহুল্য; সিংহদের ভয়ে নয়।

www.BanglaBook.org

সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের এলাকা সবসুদ্ধ তেরো হাজার বর্গ কিলোমিটার। এর একদিকে গোরোংগোরো, অন্যদিকে কেনিয়া, অন্য দুদিকে লেক ভিক্টোরিয়া আর লোলিয়োণ্ডো।

সেরেঙ্গেটি নামটা একটা মাসাই শব্দ থেকে এসেছে। মাসাই ভাষায় SIRINGET বলে একটা শব্দ আছে; যার মানে, বিস্তৃত এলাকা। ইংরেজী শব্দের 'E' মাসাইদের 'I'-কে বদলে দিয়েছে। আর সোয়াহিলীর 'I' এসে লেগেছে একেবারে শেষে—তাই—SERENGETI.

গোরোংগোরো থেকে আসার সময় পথে ছোটো ছোটো অনেক কালো পাথরের অদ্ভুত আকৃতির টিলা পড়েছিল। এই টিলাগুলোতে খুব বড় বড় কিছু চ্যাটালো এবং বেশীই গোলাকৃতি পাথর থাকে। মনে হয়, কেউ বুঝি-বা বয়ে এনে একটার উপর অন্যটাকে বসিয়ে দিয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এদেরই বলে কোপী। কিন্তু বানান KOPJE। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-বীরভূমের কিছু কিছু জায়গায় এবং উড়িষ্যায় এই আকৃতির টিলা চোখে পড়ে, কিন্তু ঠিক এরকম নয়। কোপীর মধ্যে গুহাও থাকে। ছায়াও থাকে। তাই এখানে সিংহর আস্তানা। চিতাবাঘও থাকে অনেক সময়। প্রায়ই দেখা যায় কোপীর পাথরের উপরে সিংহরা সপরিবারে আপাতঃ উদাসীন মুখে বসে আছে। উঁচু জায়গা বলে এ্যান্টিলোপ ও অন্যান্য প্রাণীর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে মাংসাশী জানোয়ারেরা এর উপর বসে।

সেরোনারা লজটি, সেরোনারা গ্রাম থেকে এক কিলোমিটার দূরে। সেরোনারাতে সেরেঙ্গেটি রিসার্চ ইনস্টিট্যুট আছে। গেম-ওয়ার্ডেন আছেন। এবং সেরোনারা লজে যে-সব কর্মচারী আছেন, তাঁরাও ঐ গ্রামেই থাকেন। একটি কোপীর চারপাশে কোপীটিকে ব্যবহার করে লজটিকে তৈরী করা হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যার অপূর্ব নিদর্শন এটি। বিরাট আকৃতির বড় বড় পাথরের মধ্যে দিয়ে ডাইনিংরুমে যাওয়ার কাঠের রাস্তা। ডাইনিংরুমটিও বড় বড় নানা আকৃতির পাথরের মধ্যে। ঝক্‌ঝকে পালিশ-তোলা দুর্মূল্য কাঠে আগাগোড়া লজটি তৈরী; মেঝে, বারান্দা ইত্যাদি। এখানে একশ ঘর আছে। সিংগল ও ডাবল বেড মিলিয়ে। আধুনিক পাঁচতারা হোটেলের মতই বন্দোবস্ত। সুইমিং পুল অবশ্য নেই। তবে গরম জলের বন্দোবস্ত আছে। চমৎকার ঘর, বিছানা; আসবাব। প্রত্যেক ঘরের সামনে একদিকে, দেওয়ালের বদলে শুধু কাঁচ, যাতে ঘর থেকে বসেই জানোয়ার দেখা যায়।

রাত দশটার মধ্যে অতিথিদের খাইয়ে-দাইয়ে কর্মচারীরা সেরোনারা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান। হেঁটে কেউই যান না। গাড়িতে করেই যাতায়াত করেন। অনেক দূরে-বসানো খুব শক্তিশালী জেনারেটরের মাধ্যমে সবকিছু বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। অথচ জেনারেটর দূরে থাকায় তার শব্দ এসে পৌঁছয় না লজে।

www.BanglaBook.org

এই পরিবেশে, এরকম এলাহী বন্দোবস্ত, অনেকের পছন্দ না-ও হতে পারে। আমার তো একেবারেই হয় না।

তাঁবুর বন্দোবস্ত আছে অন্যান্য জায়গাতে। সেসব জায়গাতে পুরো আস্তানাই তাঁবুতে তৈরী। সব লজেই রেফ্রিজারেটেড ভ্যানে করে পৃথিবীর সেরা খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় যোগান দেওয়া হয়, যাতে বিদেশী পর্যটকদের আরামে বিঘ্ন না ঘটে।

এয়ার-স্ট্রিপও আছে নানা জায়গায়। সেরোনারাতেও। যাদের সময় কম ও টাকা বেশী; তাঁরা ছোট ছোট প্লেনে করে ঘোরেন এ সব জায়গা। এই সেরোনারা লজটিই সেরেঙ্গেটির সেরা লজ।

আজকাল প্যাকেজ-ডলী, প্যাকেজ-ট্যুর-এর যুগ। অথচ বেড়ানোর আসল মজাটাই এতে মাঠে মারা যায়। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে ব্যস্ত পশ্চিমীরা এই-ই চায়।

ভারতে অনেক জীবজন্তু থাকলেও, ভারতের জঙ্গল এমন যে; আফ্রিকার মত গ্যারান্টি দিয়ে জানোয়ার দেখানো অনেক জায়গাতেই সম্ভব নয়। আফ্রিকার মত জনমানবহীন হাজার হাজার মাইলের বিস্তৃতিও ভারতে নেই। আধুনিক মানুষের হাতে সময় কম, কষ্ট করে অনেকদিন সময় হাতে নিয়ে জঙ্গলে আসার মত লোকও কম। তাছাড়া, আমাদের দেশে পর্যটকদের জন্যে প্লেন এবং ভালো গাড়ির এবং সেইমত থাকার জায়গা ও রাস্তারও বন্দোবস্ত নেই। এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার অনেক অবকাশ আছে আমাদের। যাতে বিদেশীরা আরো অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের দেশে আসতে পারেন ও আসেন তার সুষম বন্দোবস্ত করলে আমরাও কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারতাম বিদেশী মুদ্রায়।

সন্ধ্যের পর, সাতটা থেকে ভোর ছ'টা অবধি এখানে গাড়ি চালানো বারণ। রাতে লজের বাইরে যাওয়াও বারণ। ঘরের বাইরেও না-গেলে ভালো হয়। কারণ অনেক সময় লজের নীচে সিংহ অথবা হায়নারা এসে ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে কত যে জন্তু জানোয়ারের ডাক শোনা যায়, তা বলার নয়।

আমাদের দেশের অনেক জানোয়ারের ডাকই আমার চেনা। কিন্তু এখানের বেশীর ভাগ জানোয়ারের ডাকই চিনি না। তাই সব কেমন রহস্যময় লাগে। আদিগন্ত চন্দ্রালোকিত ধু-ধু প্রান্তরে এমন গা-ছম্‌ছম্‌ রাতেই বোধহয় কিলালার ভূত-প্রেতরা ঘুরে বেড়ায়। এই রকম জায়গাতেই, অশিক্ষিত, আদিম মানুষদের কাছে ভূত-প্রেতের কল্পনা এক বাস্তব অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।

লজের আশেপাশে হায়না ও সিংহ ছাড়াও আরো অনেক জীবজন্তু ও পাখিদের নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। টোপী, বড় কঙ্গোনী; নানারকম গ্যাজেল। হাইরাক্সরা সাধারণতঃ পাথুরে জায়গা অথবা কোপীতে থাকে, কিন্তু লজের আশে-পাশে তারা নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। কারণ তারা জানে যে, দিনের বেলা লজের সামনে মানুষজন এবং গাড়ি থাকাতে সিংহ অথবা অন্য মাংসাশীরা তাদের ধরতে সাহস পাবে না। অবশ্য লজের কাছে যে নিরাপত্তার জীবন তারা যাপন করে, সেই জীবন অস্বাভাবিক

www.BanglaBook.org

হতে বাধ্য। লজের রান্নাঘর থেকে সব্জি ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয়, তাই খেয়েই তারা বাঁচে।

নানারকম শকুন, ম্যারাবু, সারস এবং সাদা-গলার কাকেদেরও দেখা যায় এখানে। আমাদের দাঁড়কাকের চেয়েও গম্ভীর গলায় ডাকে এই কাকগুলো। ডার-এস্-সালাম এবং আরুশাতেও এই কাক দেখেছি।

ছোট পাখিদের মধ্যে স্টার্লিং, বারবেট; বুলবুলির মত দেখতে। নানারকম উইভার, নীল-রঙা আর ছাই-রঙা ফ্লাই-ক্যাচার, আর ন্যাড়া-মুখের "গো-এওয়ে" পাখিদেরও খুব দেখা যায় সেরোনারা লজ-এর কাছাকাছি।

এই "গো-এওয়ে" পাখিগুলো বড় মজার। ছাই ও সবুজে-সাদা রঙে তাদের সহজেই চেনা যায়। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে ওঠানামা করে যখন, তখন পাখিদের চেয়ে কাঠবিড়ালীদের সঙ্গেই তাদের বেশী মিল আছে বলে মনে হয়। তাদের এই অদ্ভুত নামটা হয়েছে তাদের ডাকের জন্যে। ডাকটা শুনলেই মনে হয় যেন বলছে : গো এওয়ে। যেমন আমাদের দেশে টি-টি পাখিদের নাম হয়েছে ডিড-ইউ-ডু-ইট। পিউ-কাঁহা পাখি বা বউ-কথা-কও পাখিদেরও যেমন ব্রেইন ফিভার।

ছোট পাখিদের মধ্যে এখানে সবচেয়ে ভাল লাগল আমার স্টার্লিংদের। ডানায় রঙ-চম্‌কানো এমন প্রাণবন্ত, ছটফটে পাখি বড় একটা দেখা যায় না। আফ্রিকাতে অনেকরকম স্টার্লিং আছে। তার মধ্যে সাত রকমের স্টার্লিং দেখা যায় সেরেঙ্গেটিতে। এই পাখিগুলো খুব নকলবাজ। কাকাতুয়া বা ময়নার মত। সেই কারণে এদের পোষ মানিয়ে অনেকে বুলি শেখান।

আরো কত ছোট বড় জীব দেখা যায় যে, সেরোনারা লজেরই আশে-পাশে; তা বলে শেষ করা যায় না। আগামা গিরগিটিরা তাদের নীল শরীর আর দারুণ লাল গলা এবং মাথার বাহারে সহজেই চোখ কাড়ে। দিনের বেলা আমাদের মেঠো ইঁদুরের মত এখানে ঘাস-ইঁদুরদেরও খুব দেখা যায়; ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে সবসময়।

রাতের বেলা শজারু এবং লাফানী-খরগোশ চোখে পড়ে। এই খরগোশদের লাফানী-খরগোশ নাম হয়েছে এই কারণে যে, এরা ক্যাঙ্গারুর মত বড় বড় লাফে লাফিয়ে চলে। যে জানে না, তার মনে হতে পারে যে, উড়াল-খরগোশ, আমাদের দেশের উড়াল-কাঠবিড়ালীর মত।

টর্চ ফেললে এই খরগোশদের চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বল জ্বল করে, মাংসাশী জানোয়ারের চোখের মত। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সামনে থেকে আলো পড়লে এদের চোখ একেবারেই জ্বলে না; কেবল পাশ থেকে আলো ফেললেই জ্বলে। এই কারণেই কখনও এদের দুটি চোখকে একসঙ্গে জ্বলতে দেখা যায় না।

সেরোনারার কাছাকাছি যেসব এ্যাকাসিয়া গাছ আছে, তার বেশীর ভাগই এ্যাকাসিয়া টর্‌টিলিস্। এ্যাকাসিয়া ফ্লাভিগেরাও আছে, যার অন্য নাম : দুর্গন্ধছালের এ্যাকাসিয়া। স্টিঙ্ক বার্ক্। একধরনের আলবিজিয়া হয় এখানে। দেখতে মনে হয় কাঁটা গাছ কিন্তু আসলে

www.BanglaBook.org

পাতাগুলোই কাঁটার মত দেখতে। কাঁটা থাকে না এদের। শুনলাম, অক্টোবর মাসে যখন এই গাছগুলোতে ফুল আসে তখন চারদিক গন্ধে ম'ম করে আর জংলী মৌমাছিরা ফুলের মতই ছেয়ে থাকে তখন তাদের উপর।

টোপী বলে এখানে যে হরিণ জাতীয় এক রকমের জানোয়ার আছে তাদের পা শরীরের যেখানে মিশেছে, সেখানটা হালকা নীলচে রঙের। অথচ সারা শরীরটা বাদামী। এরা চেহারায় প্রায় আমাদের শম্বরের মত বড়। কিন্তু শিং-এর তেমন বাহার নেই বলে অত বড় বলে মনে হয় না।

এই অঞ্চলে কুড়ু, গ্রেটার এবং লেসার; কোনোরকমেরই নেই। স্প্রিংবক এবং অন্যান্য সুন্দর দেখতে হরিণও নেই।

সব জানোয়ারদেরই গায়ে রঙ হয় পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে। সেরেঙ্গেটি ঘাসের রাজত্ব বলে বেশীর ভাগ জানোয়ারেরই, কী মাংসাশী, কী তৃণভোজী, গায়ের রঙ বাদামী-বাদামী। বৃষ্টির জঙ্গলে, সবুজের সমারোহ যেখানে, যেখানে আলো-ছায়ার, সাদা কালোর মজা; সেখানকার জানোয়ারেরা অনেক সুন্দর হয়। তাদের রঙের বাহার অন্যরকম।

আমাদের দেশে, উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের বাঘ, বিহারের বাঘ, ডুয়ার্স ও আসামের বাঘ এবং সুন্দরবনের বাঘের গায়ের রঙে অনেকই তফাৎ দেখা যায়। ডোরার কালো রঙেও অনেক পার্থক্য থাকে। যেমন জঙ্গলে তারা থাকে, প্রকৃতি ক্যামোফ্লেজ করে দেন তাদের সেই রঙে; যাতে তারা কোথাও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয় ঐ পরিবেশেরই এক টুকরো বুঝি। এমন না হলে শিকার করে খেতে অসুবিধে হত বৈকি। যিনি প্রাণ দেন, তিনিই তার আহার সংস্থান করে দেন এবং তাতে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, তাও তিনিই দেখেন।

BanglaBook.org

দিনশেষে সেরোনারা লজে পৌঁছোনোর পর ভালো করে বাথটাবে শুয়ে গরম জলে চান করা গেল। শ্যাম্পুও করলাম। এখানের ধুলোগুলো গন্ধকের গুঁড়ো আর লোহাচুরের মত ভারী হয়ে বসে গেছে মাথায়। কেউ দয়া করে দেশলাই ঠুকে দিলেই তুবড়ির ফুল বেরোত।

চানের পর জামাকাপড় বদলে ডাইনিংরুমের উপর তলায় পাথরের মধ্যে দারুণভাবে বানানো বার-এ গেলাম। মিস্টার এণ্ড মিসেস কাপুত্ এবং লাইলাক্ আগেই পৌঁছেছিল। কিলালা আরো অনেক নিগ্রো ড্রাইভারদের সেঙ্গে জটলা পাকিয়ে বীয়ারের মোচ্ছব লাগিয়েছে দেখলাম। কয়েকটি নিগ্রো মেয়েও দেখলাম বার-এ। কোথা থেকে এবং কি করে তারা এখানে এলো বুঝলাম না। বেশ সেজেগুজে, কদমছাঁট চুলে ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁচালংকার মত বিনুনী পাকিয়ে হেয়ার-ডু করে, চোখ-ধাঁধানো রঙিন পোশাকে কিলালাদের মধ্যে বারের লম্বা লম্বা টুলে বসেছিল তারা। হাসির হর্‌রা তুলছিল। হৈ রৈ।

আমি আলাদাই বসলাম। ওদের থেকে দূরে।

একটু পরে লাইলাক্ আমার টেবলে উঠে এল। বলল, তোমার প্রোগ্রাম কি?

আমি বললাম, একটু হেঁটে আসব ভাবছি খাওয়া-দাওয়ার পর চাঁদের আলোয়; লজের

www.BanglaBook.org

লোকজন চলে গেলে; আমার লোকাল গার্জেন কিলালা ঘুমিয়ে পড়লেই।

লাইলাক্-এর দুচোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, গ্রেট আইডিয়া! আই এ্যাম গেম্।

আমি বললাম, ফাইন্। বাট্ কীপ ইট আ সিক্রেট। কারণ, কেউ জানতে পারলে, আর যাওয়াই হবে না। আর কিলালা জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবে; নয় নিজেই আত্মহত্যা করবে।

লাইলাক্ বলল, ওকে।

লাইলাক্-এর জন্যে একটা কনিয়াকের অর্ডার দিলাম।

গোরোংগোরোর মত উঁচু না-হলে কি হবে, এই হাজার হাজার মাইল উদোম জায়গায় শীতের হু-হু হাওয়ায়; ঠাণ্ডাটা বেশ ভালোই।

আমার টগ্‌বগে যৌবনের শিকারের বন্ধু গোপাল সঙ্গে থাকলে সেরেঙ্গেটি দেখে বলতো ঃ বিশ্ব-টাঁড় জায়গা।

হাজারীবাগ অঞ্চলে ফাঁকা জায়গাকে বলে, টাঁড়। 'বিশ্ব-টাঁড়' কথাটা বাংলা শব্দকোষে গোপালের এক অনবদ্য, স্বকীয় অবদান। আমিও ভেবে-টেবে সেরেঙ্গেটি সম্বন্ধে গোপালের এই বিশেষণের চেয়ে বেশী এ্যাপ্রোপ্রিয়েট অন্য কোনো বিশেষণ আর ভেবে পেলাম না।

আসলে গোরোংগোরোতে ডিক্সনের সঙ্গে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন থেকেই ভাবছি, এই সব জায়গায় একা একা এসে একেবারেই মজা নেই। একবার, সদলবলে এলে খুবই ভালো হত।

গোপাল চিরদিনই নারী-বিদ্বেষী। যখন বন্ধুদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে তখন জঙ্গলের গভীরে কোনো সুন্দর বাংলো দেখলেই আমি বলতাম, এখানে সস্ত্রীক সকলে মিলে আসব একবার, বুঝলে?

গোপাল সঙ্গে সঙ্গে বক্রোক্তি করত। বলতো, মেয়েছেলে ছাড়া কি তোমার চলে না?

আমি বলতাম, স্ত্রীদের সম্বন্ধেও কি একটু ভালো কথা বলা যায় না?

গোপাল বলতো, ঐ হল।

তারপর বলতো, আসব, নিশ্চয়ই; কিন্তু আমরা একা একা। একেবারে "মেন উইদাউট উইমেন্"।

ভাবছিলাম, আসব একবার ছোটবেলার সব জঙ্গলের বন্ধুরা দল বেঁধে। যারা দলে ছিলাম তখন, বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন জঙ্গলে; তাদের মধ্যে সকলে আজকে নেই। অনেকেই পরপারের হ্যাপি-হান্টিং গ্রাউণ্ডস্-এ চলে গেছে। শিকারের ও জঙ্গলের বন্ধুত্বে বয়সের অসাম্যটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমার সঙ্গে আমার দ্বিগুণ বয়সী লোকেরও এমন বন্ধুত্ব হয়েছে যে, অটুট আছে পঁচিশ-তিরিশ বছর। এবং থাকবেও মৃত্যুদিন পর্যন্ত।

হাজারীবাগের নাজিমসাহেব, সুব্রত, কুসুমভার কাড়ুয়া, উড়িষ্যার চাঁদুবাবু সকলে মিলে একবার সত্যিই এলে ব্যাপারটা জমে যায়। শুধু পুরোনো দিনের গল্প, জঙ্গলের গল্প, শিকারের গল্পই হবে তখন।

www.BanglaBook.org

ইজারুল হক জমিদার ছিল। টুটিলাওয়ার। অল্পবয়সে চলে গেছে পরপারে। সাত্তার ছিল এক কুখ্যাত চোরা-শিকারী। কিন্তু চমৎকার লোক। সাত্তারের ফাঁসী হয়ে গেছে। খুব বদরাগী ছিল ও। জমি নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় একই দিনে পর পর তার পাঁচ আত্মীয়কে গুলি করেছিল। বাঘের বেলাতে যার বন্দুকের গুলি কখনও ফসকায়নি, মানুষের বুকে ফসকানোর কোনো প্রশ্নই ছিল না। পাঁচজনই স্পটডেড্ হয়েছিল।

লাইলাক্ হঠাৎ বলল, লেট মী বাই উ্য আ ড্রিঙ্ক্।

আমি বললাম, হোয়াট্ ফর?

ও চুপ করে রইল। পরক্ষণেই দারুণ হেসে বলল, ওয়েল। ফর গ্রেটফুলনেস।

আমি হাসলাম। বললাম, নন্‌সেন্স।

ও তবু শুনলো না। আমার জন্যে একটা হুইস্কি অর্ডার করল।

বার থেকে ডাইনিংরুমে নেমে এলাম আমরা, ডিনার খেতে। খাওয়া-দাওয়ার পর ডাইনিংরুমেই অনেকক্ষণ গল্পগুজব চলল। ফায়ারপ্লেস-এর কাছে বসে। জেনারেটর দিয়ে রুম হীটিং সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ পরে, ডিনার সেরে মিস্টার এণ্ড মিসেস কাপুত্ গুডনাইট করে চলে গেলেন।

লাইলাক্ অনেকক্ষণ ওদের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, কেমন হাত ধরাধরি করে চলে গেল ওরা! ওদের দেখে মনে হচ্ছে না যে, ওরা হানি-মুনিং কাপ্‌ল?

লাইলাক্ হাসল। বলল, চাঁদে যে তিক্ততা ছিল তা তো তুমিই ধুয়ে দিয়েছ। কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব, সব তোমারই।

আমরা আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পর স্টুয়ার্ড এসে বলল, সে ডাইনিংরুম বন্ধ করবে এবার।

লাইলাকের সঙ্গে, আস্তে আস্তে, বড় বড় কালো পাথরের মধ্যে, আলোছায়ার রহস্যময়তার ভিতরে ভিতরে কাঠের পাটাতনে ভুতুড়ে শব্দ তুলে হেঁটে এলাম ওর ঘরের সামনের বারান্দাতে। তারপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম।

নানা জানোয়ারের আওয়াজ আসছে চারদিক থেকে। লজ-এর কর্মচারীরা ভ্যানে করে ফিরে যাচ্ছেন সেরোনারা গ্রামে। শাটল্ করছে দু-তিনটি ভ্যান ক্রমাগত। হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছে আর যাচ্ছে।

লাইলাক্ বলল, সত্যিই যাবে?

আমি বললাম, তোমার ভয় করলে যেও না। আমি তো যাচ্ছিই।

জার্মান আর ইজরায়েলী মেয়েদের কখনও ভয়ের কথা বলতে নেই। তার চেয়ে সাপের মাথায় পা দেওয়া ভালো।

লাইলাক্-এর সুন্দর লম্বাটে মুখ আর নীল চোখে কঠিন ভাব লেগেই মিলিয়ে গেল।

আমি বললাম, আমাদের দেশেও সাধারণ লোকের এমন ধারণা আছে যে, গাড়ি থেকে জঙ্গলে নামলেই বাঘ তোমাকে গিলে ফেলবে, হাতি তোমাকে পিষে ফেলবে, সাপ

www.BanglaBook.org

তোমাকে তাড়া করে ছোবল মারবে। আমরা যেমন জঙ্গলের জানোয়ারদের ভয় পাই সহজাত কারণে, ওরাও তেমনি আমাদের মত সভ্য শহুরের জানোয়ারদের ভয় পায়। ওরা হয়ত এতদিনে পুরোপুরি জেনেও গেছে যে, আমরা বেশী খারাপ জানোয়ার ওদের তুলনাতে।

লাইলাক্ বলল, তবে এসব নিয়ম করে কেন? বাইরে যেতে পারবে না, হেঁটে যেতে পারবে না, ইত্যাদি.....? এত ভয় দেখাবার কি আছে?

বললাম, নিয়ম করে; কারণ দুর্ঘটনা তো হতেই পারে। সেটা একশেপসান্। আর একশেপশান্ প্রুভস দ্যা জেনারাল রুল। একজনও ট্যুরিস্ট-এর যদি কিছু হয়, তাহলে পুরো ন্যাশনাল পার্কের বদনাম হবে। লোকে ভয়ে আসবে না। তবে আমি তো ভারতীয়; কপালে বিশ্বাস করি। যে দৌরাত্ম্যপনা করেছি এতদিন কপালে লেখা থাকলে তাতে বহুবারই মরে যাওয়ার কথা ছিল।

এবার চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে এল। শুধু বাইরের চাঁদের রাতের পশু-পাখিদের আওয়াজ ছাড়া।

লজ-এর বাইরে পাওয়ারফুল আলোগুলো জ্বলছিল। সামনে দিয়ে গেলে আলোতে আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। এবং দেখে ফেললে, আর যাওয়াই হবে না। ওভারকোট আর টুপি নিয়ে এলাম আমার ঘর থেকে। লাইলাক্ একটা জার্কিন পরেছে। মাথায় সুইস-টুপি, লেজওয়ালা। সুইজারল্যাণ্ডে বাচ্চারা বরফের মধ্যে খেলা করার সময় যেমন টুপি পরে; তেমন। হাতে একটা খেলনা।

সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে, বারান্দার কাঠের রেলিং টপকে আমরা নীচে এলাম। আমি আগে। লাফিয়ে নীচে নামতেই পায়ের কাছ থেকে একটা শজারু ঝন্‌ঝন্ করে ভয় পেয়ে দৌড়ে গেল।

আমি নেমে, লাইলাক্‌কে কোমরে হাত দিয়ে নামালাম।

তারপর গুটিগুটি সেরোনারা গ্রামের উল্টোদিকে এগোলাম।

একটু যেতেই, একদল হায়নাকে দেখা গেল দূরে। চোখে টর্চের আলো ফেলতেই সরে গেল।

দেখতে দেখতে, আমরা লজের থেকে বেশ দূরে চলে এলাম। কোপী ঘিরে তৈরী-করা সেরোনারা লজটিকে চাঁদের আলোয় দারুণ দেখাচ্ছে এখন। দূরের এ্যাকাসিয়া গাছের নীচে ভিজে ভিজে চাঁদের আলোয় তিনটি জিরাফ চরছে। আমাদের দেখেই দৌড়তে লাগল। সেই আধো-আলোতেও ওদের দৌড়োনোর অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসি পেয়ে গেল। জিরাফগুলো দৌড়লেই মন হয় যে, ওদের হাঁটু থেকে সামনের পা দুটো বুঝি এক্ষুণি আলগা হয়ে খুলে বেরিয়ে যাবে। জিরাফ তৈরীর সময়ও বিধাতার মাল-মশলাতে নির্ঘাৎ কম্‌তি হয়েছিল।

লজ থেকে যখন আধমাইলটাক দূরে এসে পড়লাম তখন চারদিকে শুধু ফিকে হলুদ ঘাসের বনে গাঢ় হলুদ চাঁদের আলো। ভেজা ঘাসের উপর আমার ওয়াটারপ্রুফ-

www.BanglaBook.org

ওভারকোটটা পেতে দুজনে বসলাম।

লাইলাক্ তার ঝোলা থেকে কন্ত্রুর একটা সাদা শিশি বের করল। তারপর, নিজে একটু খেয়ে, আমাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও। শরীর গরম হবে।

আমি হাসলাম।

বললাম, তোমার মত নারীর সান্নিধ্যেও যার শরীর গরম হয় না তার গণ্ডারের খড়্গর খোঁজে যাওয়া উচিত।

লাইলাক্ জার্মানে এমন একটা কিছু বলল, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়; অসভ্য। ঠিক যেমন করে, পৃথিবীর সব মেয়েদের চেয়ে বেশী মিষ্টি, সকলের চেয়ে বেশী নমনীয় বাঙালী মেয়েরা বলে।

একদল টোপী চরতে চরতে আমাদের বেশ কাছে চলে এল আর ঠিক অমনি সময়ে আমাদের পেছন থেকে উঁ ম্মম্ করে পশুরাজ সিংহ একবার ডেকে উঠল। গম্‌গম্ করে ছড়িয়ে গেল তার ডাক বিশ্ব-টাঁড়ে।

লাইলাক্ হঠাৎ ভয়ে আমরা হাত জড়িয়ে ধরল।

আমি বললাম, মুখপোড়া সিংহ থামল কেন? তুমি যদি বার বার ভয় পেয়ে এমনি করে জড়াও আমাকে, তবে সে ডেকেই চলুক না সারারাত।

টোপীর দল, সিংহর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হাঙরে-তাড়া-করা মাছের ঝাঁকের মত চমকে উঠেই ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্রুত ছুটে গেল। এ্যাকাসিয়াদের ছড়ানো হাতের মানা-না-শুনে, হলুদাভ দিগন্তের দিকে। অনেকটা দূরে গিয়ে আবার ঝাঁক বাঁধল ওরা।

লাইলাক্ আমার দিকেই মুখ করে বসেছিল। ও আমার পিছন দিকে চেয়ে বলল, একটা সিংহ আর পাঁচটা সিংহী আসছে মনে হচ্ছে। এই দিকেই আসছে।

আমি মুখ না-ঘুরিয়েই বললাম, চোখ ভরে দেখে নাও। এখানে দিনের বেলা সকলেই সিংহ দেখতে পায়। রাতের বেলা এমন করে কেউই পায় না।

লাইলাক্ আবার বলল, ধ্যুৎ। ক্যামেরাই আনা হল ন। বলেই বলল, সিংহগুলো যে খুব সন্দেহজনকভাবে এদিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখে কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। শুনছো!

আমি বললাম, শুনছি না। আরও একটু কাছে আসুক, তারপর ভয় পাব।

লাইলাক্ এবার সত্যিই ভয় পেল।

আমিও যে পেলাম না; এমন নয়।

আমাদের দেশের জ্ঞান এদেশে নাও খাটতে পারে। মনে হচ্ছিল, রাতের বেলা পায়ে হেঁটে না এলেই হয়ত ভালো হত। নিজের দায়িত্ব নিজে যা খুশী করতে পারি, কিন্তু পরের শালীকে এরকম বিপদের মধ্যে এনে ফেলা ঠিক হয়নি। নিজের শালী হলেও হয়ত ঠিক হত না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরেই সঙ্গের বড় পাঁচ-ব্যাটারীর বণ্ডের টর্চটা সিংহগুলোর উপরে ফেললাম।

www.BanglaBook.org

ফেলেই, আলোটা একবার ওদের চোখের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি বুলিয়ে দিলাম, আর দিয়েই, ওদের চোখে আবারও একটু জ্বেলে ওদের কাছেই বাঁ পাশে ঘাসের উপর ফেলে রাখলাম।

আলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ওরা আস্তে আস্তে বাঁ পাশে সরে গেল। তারপর আলোটা আবার আকশে ফেলে আবারও বাঁ পাশে ফেললাম।

ওরাও আরও বাঁ পাশে সরে গেল একটু দূরে। আমাদের দেশের জানোয়ারেরা যেমন করে হাঁটে আলো চোখে পড়লে, তেমন করেই।

এমনি করে করে ওদের নিয়ে যখন আমি চ্যাম্পিয়ানের মত খেলা দেখাচ্ছি লাইলাক্‌কে, ঠিক সেই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল অনেক দূরে—সেরোনারা গ্রামের দিক থেকে আসছে গাড়িটা।

গাড়িটা লজকে অতিক্রম করে দ্রুতবেগে চলে এল দেখতে দেখতে। গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজে এবং হেডলাইটের তীব্র আলোতে সিংহগুলো আরও বাঁয়ে সরে যেতে লাগল। মনে হল, রাতে গাড়ি দেখে না ওরা সচরাচর। দিনের আলোতে গাড়িতে অভ্যস্ত থাকলেও রাতের গাড়ির হেডলাইটে অভ্যস্ত নয় সেরোনারার সিংহ।

সিংহগুলো সরে গলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই গেম-ওয়ার্ডেনের গাড়ি এসে আমাদের প্রায় গায়ের উপরে ব্রেক করে দাঁড়াল, ধুলো উড়িয়ে।

দুজন আর্মড গার্ড ল্যাণ্ড-রোভারের সামনের সীট থেকে নামলেন। নেমেই বললেন, হ্যাণ্ডস আপ্‌।

আমার হাতে তখন কম্ভ্রুর শিশিটা ছিল। এক হাতে জ্বলতে-থাকা টর্চ আর অন্য হাতে শিশি নিয়ে দুই হাতই উঠালাম।

লাইলাক্‌ও হাত তুলল।

একজন এসে আমার হাতে থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে, নিবিয়ে দিল। অন্যজন আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা দেখে নিল। কিন্তু হাতে যে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল সাদা ফরাসী দেশীয় চারকোণা শিশিতে, তার জন্যে কিছুই বলল না। তারপর তারা আমাদের দুজনকেই ল্যাণ্ড-রোভারে উঠিয়ে গেম-ওয়ার্ডেনের অফিসে নিয়ে গিয়ে বিস্তর ধমকা-ধমকি করে জেলে যাবার ভয় দেখিয়ে; শেষমেষ রাত একটা নাগাদ নিজেরাই লজ-এ পৌঁছে দিয়ে গেল।

লাইলাক্‌ পুরো ব্যাপারটা খুব এনজয় করছিল। আমি তো বটেই। যদিও বেচারাদের ঘুম নষ্ট করলাম আমরা। সিংহগুলোও হয়ত তখনও আমার টর্চের নিভে-যাওয়া আলো খুঁজে-খুঁজে বাঁয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সাইড-ওয়াইজ। ওদেরও হয়ত ঘুম নষ্ট হল।

গেম-ওয়ার্ডেনের গাড়ি চলে গেলে, লাইলাক্‌ ওর সুন্দর সবকটি দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, কী মজা করলাম আমরা! তাই না?

তারপর বলল; তুমি আমার ঘরে এসো, বাকি রাতটাও খুব মজা করা যাবে দুজনে মিলে। দ্যা নাইট ইজ ভেরী ইয়াং। কম্ভ্রু খাব আর অনেক গল্প করব।

গোপালের কথা মনে পড়ে গেল। "মেয়েছেলে ছাড়া কি তোমার চলে না?"

www.BanglaBook.org

যদি লাইলাকের ঘরে বসে সারারাত গল্প করি, তবুও গোপাল জানতে পারলে আমার চরিত্রের চামড়া বাইসনের চামড়ার মত খুলে নেবে।

লাইলাক্‌কে বললাম, আমরা তো একসঙ্গে আরো অনেকদিন আছি। রাতটা ভালো করে ঘুমোও। মজা করার দিন তো পড়েই রইল। লাইলাক্ বলল, তুমি ভীষণ সাবধানী। এবং কৃপণও। খুবই খারাপ।

আমি বলাম, যা বল, তাই-ই।

বলেই ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লাইলাক্ আমাকে দারুণ রোম্যান্টিক গলায় গুডনাইট জানাল।

লাইলাক্‌কে খুব সুন্দর, মোহময়ী, আমন্ত্রণী দেখাচ্ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র গোপালের ভয়েই গুডি-গুডি বয়ের মত ওকে গুডনাইট জানিয়ে চলে এলাম।

অথচ নিশ্চিত জানি যে, তবুও গোপাল আমাকে অবিশ্বাস করবেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেরেঙ্গেটিতে এবং অন্যান্য সমস্ত ন্যাশনাল পার্কে সরকারের তরফের এতরকম সাবধানতা সত্ত্বেও এখনও চোরা-শিকারীরা চুরি করে সবরকম শিকার করে। সেরেঙ্গেটির মধ্যে যেখানে একেবারে ফাঁকা জায়গা সেখানে পারে না, কিন্তু যেখানেই আড়াল আছে তার কাছাকাছি করে।

তাছাড়া, আফ্রিকাতে যেমন মাস-কিলিং হয় জানোয়ারদের তেমন আমাদের দেশে ভাবাই যায় না। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই-ই যে, আমাদের দেশে এত বড় বড় দলে, হাজার হাজার জানোয়ার একসঙ্গে ফাঁকা জায়গাতে দেখতেও পাওয়া যায় না।

সেরেঙ্গেটিতে আড়াল কম বলেই জানোয়ারদের চলা-ফেরার খোঁজখবর নিয়ে এবং ঋতু পরিবর্তনের সময় হাজার হাজার জানোয়ার যখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মাইগ্রেট করে, শয়ে শয়ে মাইল পেরিয়ে; তখন লোহার তারের ফাঁদ পেতে শিকারীরা এদের সহজে মারে। "স্নেয়ার" বলে এইরকম তারের ফাঁদকে।

কোনো নদীর শুকনো বুকে এদিক থেকে ওদিক টানা দিয়ে তারের ফাঁদ পাতে—যেখানে ফাঁক থাকে সেখানে কাঁটা গাছ কেটে দেয় যাতে পালাতে গেলে তারা ফাঁদে পড়ে। কখনও জানোয়ারদের তাড়িয়ে নিয়ে ফাঁদে ফেলে। কখনও বা তাদের স্বাভাবিক চলাচলের পথের হদিস নিয়েও এই ফাঁদ।

সেরেঙ্গেটির মধ্যে মধ্যে চোরা-শিকারীরা রীতিমত দু-তিন মাসের মত আস্তানা গাড়ে, চামড়া ও মাংসর বাণিজ্য করবে বলে। আড়াল দেখে, পাহাড়ী বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে আড্ডা গাড়ে।

জানোয়ারের মাংসকে রোদে পুড়িয়ে, বা ধুঁয়ো দিয়ে বা অন্য প্রক্রিয়ায় তার পচনক্রিয়া বন্ধ করে, তারপর কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল মাংস পাইকারি হারে চালান দেয় সেখান থেকেই। চামড়া, শিং ইত্যাদিরও সেইরকম তৈরী বাজার আছে। গণ্ডারের খড়গর তো বটেই।

ওরা বড় জানোয়ার মারে অন্যভাবে। বিষাক্ত তীর দিয়ে। এবং হেভী রাইফেলস্ দিয়েও। ওয়াণ্ডারাবো উপজাতিরা তীর দিয়ে হাতি মারার জন্যে কুখ্যাত।

আমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিদেশী এবং দেশী সৈন্যরা ওয়েপন-ক্যারীয়ার ও ট্রাকে করে ব্রেন-গান দিয়ে হরিণ, শম্বর, শুয়োরের মাস-কিলিং করেছিল বিভিন্ন জঙ্গলে। সবসময়ই যে তারা তাদের খাদ্যের অভাবে এমন করেছিল তা নয়, এমনিই; নিছক শখের জন্যেও করেছিল।

গণ্ডার ও হাতিও যে আমাদের দেশে চুরি করে মারা হয় না তাও নয়। তবে হয়ত

www.BanglaBook.org

তাদের সংখ্যা আফ্রিকার তুলনায় কম।

যখন আসামের কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক সবে গড়ে তোলা হচ্ছে তখন মিস্টার স্ট্রেসী ছিলেন আসামের কনসার্ভেটর অফ ফরেসটস্। উনিশ'শ বাহান্ন সনের কথা বলছি। এখন যেখানে সারি-করা আধুনিক কটেজ, বিরাট দোতলা বাংলো। এলাহী কাণ্ড-কারখানা; তখন তেমন ছিল না। কাজিরাঙ্গার বনবিভাগের অফিস ছিল একটা বড় খড়ের ঘর। শক্ত করে বেড়া-দেওয়া। কাঠের গেটের উপর দুদিকে দুটো কাঠের গণ্ডার বসানো ছিল। চারদিকে ঘাসবন।

সেই সময়ই মিস্টার স্ট্রেসীর কাছে শুনেছিলাম, ওখানে চোরা-শিকারীরা কি করে গণ্ডার মারে।

গণ্ডারদের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। যেখানে তারা মলত্যাগ করে সেই একই জায়গায় বেশ কিছুদিন ধরে করে। এই জন্যে যেসব বনে গণ্ডার থাকে, সেই সব বনে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে; এক এক জায়গায় পুরীষের ছোটো-খাটো টিলা মত হয়ে আছে।

চোরা-শিকারীরা খুঁজে-খুঁজে ঐরকম জায়গা বের করে। তাদের কাছে প্রায়শঃই আধুনিক রাইফেল থাকে না। যখনকার কথা বলছি, তখন তো থাকতোই না। যেহেতু তাদের সম্বল গাদা বন্দুক; তারা বন্দুকে বিস্তর বারুদ গেদে ঐসব জায়গার কাছাকাছি কোনো গাছে-টাছে বসে থাকে। যেই গণ্ডার মলত্যাগ করবার জন্যে লেজ তোলে অমনি তারা গণ্ডারের শরীরের নরমতম জায়গায় গুলি চালায়। প্রথমতঃ নরম জায়গা বলে গুলি অনেক ভিতরে চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐ জায়গায় গুলি লাগলে তার ক্ষত কখনোই শুকোয় না।

গণ্ডার আহত হবার পর তার রক্তর দাগ অনুসরণ করে করে ঐ শিকারীরা দিনের পর দিন তাকে অনুসরণ করে ঘাস বনে; নয়ত জঙ্গলে। এমনি করে অনুসরণ করতে করতে যখন শিকারীরা দেখে যে, গণ্ডারের আর চলচ্ছক্তি নেই তখন তারা সুযোগ বুঝে কাছে যায়। অনেক সময় দা ইত্যাদি দিয়ে তাকে শেষ করে। আবার অনেক সময় গণ্ডারের নড়াচড়া করারও শক্তি না থাকলে জীবন্ত কিন্তু মুমূর্ষ গণ্ডারের নাক থেকে খড়গ কেটে নিয়ে চলে যায়।

আফ্রিকাতে ওয়াণ্ডারাবো ছাড়াও অন্য অনেক উপজাতিরা তীরে বিষ মাখিয়ে শিকার করে। এই তীর-ধনুক হাতে থাকলে ভালো তীরন্দাজ হবার দরকারই নেই। শরীরের যেখানেই এই তীর লাগুক না কেন, তীর বিঁধলেই মানুষ কি জানোয়ার কারোই রক্ষা নেই। এই বিষের কোনো প্রতিষেধকও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মৃত্যু সুনিশ্চিত।

ওদের জঙ্গলে একরকম গাছ হয়। গাছগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এরা এমন মৃত্যুবাহী। গাছগুলোকে দেখতে শুকিয়ে-যাওয়া সাধারণ ইটালিয়ান জলপাইগাছের মত। এদের বটানিকাল নাম, এ্যাপোকান্থেরা ফ্রিস্টিওরাম্। এই গাছগুলোর সবগুলোই যে বিষের গাছ তাও নয়। এদের ডালে একরকমের ছোট ছোট গোল গোল ফল হয়। লাল হয়ে ফলে, যখন পাকে। খুব সুন্দর জ্যামও তৈরী হয় এই ফল দিয়ে। কোন্ গাছ মৃত্যুবাহী

www.BanglaBook.org

তা জঙ্গলের লোকেরা বোধহয় কোন্ গাছে পিঁপড়ে মরে আছে বা কোন্ গাছের নীচের ইঁদুর বা পাখি মরে আছে তা দেখেই বুঝতে পারে।

গাছের ডাল আর শিকড়গুলো টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে জল ফুটিয়ে ঘন ক্বাথের মত করে ওরা। তারপর বাক্সে বা পাতায় মুড়ে চোরা-শিকারীদের কাছে বিক্রী করে। একটা তীর বিষাক্ত করতে যতটুকু বিষ লাগে, তারই দাম অনেক।

লুকিয়ে থেকে হাতির গায়ে এই তীর মেরে দিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে টলতে টলতে হাতি পড়ে গিয়ে মরে যায়। অন্য জানোয়ারেরা তো মরেই। তবে হাতির মত বড় জানোয়ারকে তাড়াতাড়ি মারতে বেশী বিষ মাখানো তীর অথবা একাধিক তীর মারতে হয়। সিংহকেও মারে ওরা এই তীর দিয়ে। তবে, অনেক সময় তীরন্দাজকে দেখে ফেললে, মরতে মরতেও সিংহ মরণ কামড় বসিয়ে দেয়। যেসব জানোয়ার এই বিষের তীর খেয়ে মরে তাদের মাংস খেতে কোনো ভয় থাকে না। শুধু যেখানে তীর লেগেছে, তার আশে-পাশের কালো হয়ে যাওয়া মাংস কেটে ফেলে দিলেই হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সকালে উঠে চানটান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে, কিলালাকে সঙ্গে করে হিপ্পো-পুলে ফিরে গেলাম। পথে অনেক জেব্রা ও জিরাফ দেখলাম। এদিকে জল থাকায় মাঝে মাঝেই লেরাই জঙ্গল আছে। লেরাই-এর ছায়াতে বিরাট বিরাট দাঁতওয়ালা হাতির দল দাঁড়িয়ে আছে, ডালপালা থেকে পাতা খাচ্ছে। কেউ কেউ শুঁড় দিয়ে চড় চড় শব্দ করে গাছের ছাল তুলে চেটেপুটে খাচ্ছে।

হিপ্পো-পুলে পৌঁছে অনেকগুলো হিপোপটেমাস্ দেখা গেল। সেরোনারা নদীতে একটা দহ-এর মত সৃষ্টি হয়েছে। জল সেখানে গভীর। তারই মধ্যে শুধুমাত্র নাকগুলো উঁচিয়ে হিপোপটেমাস্‌রা জলে ডুবে রয়েছে। মাঝে মাঝে ফুচচ্ চুস্ভুসুস্ আওয়াজ করে নাক দিয়ে পিচ্‌কিরির মত জল ছিটিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

এদিকে সেৎসী মাছি অনেক। জানালা খুললেই অতর্কিতে একসঙ্গে গোটা দশ-বারো ঢুকে পড়ছে গাড়িতে। তখন আমি ও কিলালা দুজনেই জাম্পিং-বীনস্-এর মতো লাফাতে লাফাতে তাদের নিধনে লাগছি।

এদের মারতে এতই ক্ষিপ্র হতে হয় যে, এর চেয়ে ট্র্যাপিজের খেলা করা সোজা। প্রাথমিক নিধন-পর্ব সমাপ্ত হলে কিলালা কিলালা-সম্মত প্রক্রিয়াতে প্রত্যেকটা রণে ভঙ্গ দেওয়া মাছিকে একে একে ধরে অতি সাবধানে প্রত্যেকটির ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করছে।

ইংরিজী প্রবাদ আছে যে, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস্। কিলালাকে দেখে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সোয়াহিলীতে প্রবাদ নিশ্চয়ই আছে যে, সেৎসী মাছির অন্ততঃ আঠারোটা জীবন।

আজও আমি আর কিলালা প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে নিয়েছি। আমরা ইকোমা ফোর্ট ঘুরে আসব। প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ সেরোনারা থেকে। যাওয়া আসা নিয়ে একশ।

হিপ্পো-পুলে সেৎসী মাছির ভয় থাকা সত্ত্বেও নেমেছিলাম। পায়ে হেঁটে গিয়ে জলহস্তীদের ছবি তুলছিলাম খুব কাছ থেকে। ব্যাটারা তো জলেই ছিল। অত ভারী শরীর নিয়ে গোয়ালন্দী স্টীমারের মত বিস্তর জল ছিটিয়ে ডাঙ্গায় ওঠার আগেই আমি এ্যাবাউট-টার্ন করে দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারব যে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

তাছাড়া, পরম নিশ্চিন্তির কথা এই-ই যে, কিলালা গাড়ির এঞ্জিন কখনোই বন্ধ করে না। এক মুহূর্তের জন্যেও না—। কোনো চান্সের মধ্যেই নেই ও। এ্যাকসিলারেটরের উপর ডান পা-খানা রাখাই আছে সবসময়। প্রয়োজন হলেই চাপ দেবে। আমার শরীরের যে কোনো অংশ গাড়ির শরীর ছুঁলেই, সে গাড়ি চালিয়ে দেবে। আমার বাকি অংশ উঠল,

www.BanglaBook.org

না কি সিংহ খেল অথবা গণ্ডারে টুঁশোল তাতে তার বিন্দুমাত্রও যায় আসে না।

আসলে, কিলালার স্বভাবের সঙ্গে ওয়ার্ট-হগদের স্বভাবের দারুণ মিল আছে। একটু গণ্ডগোল দেখলেই লেজ-খাড়া করে ওয়ার্ট-হগগুলো কমসে কম কয়েকশ গজ দৌড়ে যায়। তারপর নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে থেমে পড়ে, পিছনে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। অথবা, আদৌ কিছু ঘটেছিল কি না।

আফ্রিকাতে নানারকম বিষাক্ত সাপও আছে। তার মধ্যে আফ্রিকান গাব্বুন ভাইপারের একটু বিশেষত্ব আছে। এরা এত জোরে হিস্‌স্‌ শব্দ করে যে, যে-কোনো শিশু সেই হিস্‌স্‌ শুনে হিসি করে দেবে এবং তাদের বাবা-মায়েরাও করে ফেলতে পারেন।

হিস্‌স্‌টা এত জোরে দেয় ওরা যে, মনে হয় গাড়ির টায়ার পাংচার হল।

হিপ্পোদের ছবি-টবি তুলে, ক্যামেরাটা, সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরাম্যান সৌম্যেন্দু রায় যেমন কায়দায় ক্যামেরা ও এক্সপোজার-মিটার ঝোলান, তেমন কায়দায় বুকে ঝুলিয়ে, গ্যাবার্ডিনের সাফারি স্যুটের এক পকেটে বাঁ হাত ঢুকিয়ে ডান হাতে পাইপ ধরে নিজেকে নিয়ে বড় বড় ভাবনা ভাবছি ঠিক সেই সময় পিছন থেকে হিস্‌স্‌সস করে খুব জোরে আওয়াজ হল। গাব্বুন ভাইপার!

আমি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পিছন ফিরলাম।

গাড়িতে ফিরব কি? গাড়ির দিক থেকেই তো আওয়াজটা এল। পেছনে হিপ্পো-পুলে ডজনখানেক হিপ্পো আর সামনে গাব্বুন ভাইপার।

বাবা-মায়ের নাম ধরে, কিলালার নাম ধরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল আমার। হাতে বন্দুক থাকলে এত ভয় করে না। জঙ্গলে যখন হাতে বন্দুক বা রাইফেল থাকে না, সারা বিশ্বের ভয় আমার দুহাত জুড়ে থাকে। এমন বোধহয় সকলেরই হয়। যাঁরাই সশস্ত্র অবস্থায় বনে জঙ্গলে ঘুরেছেন এক সময় খালি-হাতে তাঁদেরই এতই অসহায় লাগে যে, সে বলার নয়।

আওয়াজটা আস্তে আস্তে মরে গেল। ভালো করে তাকিয়ে যখন কোনো সাপই দেখতে পেলাম না, তখন দৌড়ে না গিয়ে, খুব সাবধানে গাড়ির দিকে এগোলাম। গাব্বুন ভাইপারে কামড়ানো আর ওয়াণ্ডারাবোর তীর খাওয়া একই ব্যাপার।

গাড়ির কাছে গিয়ে দেখি, গাব্বুন ভাইপার নয়; গোটা ছয়েক বিকট-দর্শন বেবুন কিলালাকে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে রাস্তা থেকে আর কিলালা বাইরে, পথে; আমার গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দুহাত মাথায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে ভাবলাম, বেবুন কামড়ে দিয়েছে কিলালাকে। অথবা, আদর করে দিয়েছে কোনো মেয়ে বেবুন কিলালাকে অন্য বেবুন বলে ভুল করে।

কিন্তু নাঃ! ব্যাপার তার চেয়েও সাংঘাতিক।

যে হিস্‌স্‌ শুনেছিলাম তা গাব্বুন ভাইপারের নয়। গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ারই আওয়াজ। দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থাতে পিছনের একটা চাকা এত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আমার সাহসী পিলেও চমকে দিয়ে অত্যন্ত ইন্‌কন্‌সিডারেটের মত চুপ্‌সে গেছে।

www.BanglaBook.org

কিলালা বলল, প্লিজ লেণ্ড মী আ হ্যাণ্ড।

লোকটা বলে কি?

যে-লোক ক্যামেরাতে ফিল্ম ভরতে পারে না, সে ভোকস্‌ওয়াগন্‌-কোম্বির চাকা বদলাবে?

মুখে বললাম, সরী কিলালা!

আই ওজ জেনুইনলী সরী। মনে মনে বললাম।

সত্যিই পারি না। গাড়ি চড়ছি; চড়ি। কিন্তু কখনও টায়ার বদলাইনি নিজের হাতে। প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বদলাবোও না।

জীবনে দুবারই টায়ার পাংচার হয়েছিল আমার। মানে, আমার গাড়ির। প্রথমবার হয়েছিল রোয়িং-ক্লাবে। সকালে রোয়িং করতে গেছিলাম। কাছের পেট্রোল-পাম্প থেকে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ডেকে এনে চাকা পাল্টেছিলাম। আরেকবার হয়েছিল গ্যারেজের মধ্যেই। দাদার গাড়ির ড্রাইভার বদলে দিয়েছিল।

আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। স্টীয়ারিং-এ বসে একবার নমস্কার করি লঙ-ড্রাইভে যাবার সময়। সুন্দরী এবং অসুন্দরী মহিলা এবং শান্ত এবং বিচ্ছু বাচ্চাদের নিয়েও হাজার-দু'হাজার মাইল বনে জঙ্গলে ঘুরে এসেছি অনেকবার। একবারও টায়ার পাংচার হয়নি। যে, জীবনে নিজের, অথবা নিজের গাড়ির টায়ার পাল্টায়নি, সে ট্যুওর কোম্পানীর ভাড়াকরা গাড়ির টায়ার পাল্টাতে যাবে কোন্ দুঃখে! টায়ার পাল্টানো অথবা কারবোরেটারে কি করে ময়লা জমে, অথবা ডিস্ট্রিবিউটর কি কি ডিস্ট্রিবিউট করে এসব যে-মুহূর্তে জানব সেই মুহূর্তেই গাড়ি চড়তে যে অনাবিল আনন্দ পাই আমি—সেই আনন্দ থেকেই চিরতরে বঞ্চিত হব। ওর মধ্যে আমি একেবারেই নেই। গাড়ি চলে, আমিও চালাই, বা অন্য যেই-ই চালাক—মজা লাগে, খুশী লাগে। সেই মজা ও খুশী নষ্ট করতে রাজী নই।

কিলালা আমাকে মনে মনে যা-তা গালাগালি করতে করতে জ্যাক লাগিয়ে টায়ার পাল্টাতে লাগল।

আমি গাড়ি থেকে একটা বীয়ার বের করে খুললাম।

গাড়িটা প্রায় উঠে এসেছে, চাকাটা আলগা হয়ে এসেছে; এমন সময় যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হল। হুইজজজ্ করে কোথা থেকে এক ঝাঁক সেৎসী মাছি সোজা উড়ে এসে পড় তো পড় কিলালারই ঘাড়ে-মাথায়।

হিপোপটেমাস্ আক্রমণ করলেও এমন ক্যালামিটি হত না।

কি হল, তা বোঝবার আগেই দেখলাম, কিলালা বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং সেই প্রক্রিয়াতে কিলালার নিজের পায়ের লাথি খেয়েই জ্যাকটা সরে গেল। গাড়িটা অতর্কিত আওয়াজ করে ডিমে তা দেওয়া উটপাখির মত বসে গেল ধুলো উড়িয়ে। কিলালা তার চারদিকের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে লাফাতে লাগল এবং দু-হাতে থাপ্পড় মেরে মেরে সেৎসী মাছি মারতে লাগল।

আমি একবার কামড় খেয়েছি। ওদের কামড় মধুর নয়। ইয়ালো-ফিভার হবে কি

www.BanglaBook.org

ক্রিমসন্-ফিভার হবে সে পরের কথা। গরম গরম কামড়ই যথেষ্ট। ওকে ওরা বেছে নিয়েছে। ওর রক্ত মিষ্টি। তার আমি কি করব? ওদিকে আমি যাচ্ছি না।

কিলালা ছট্ফট্ করছিল দেখে আমি যে সামান্য সোয়াহিলী শিখেছিলাম, তাতেই বললাম : পোলে পোলে, কিলালা। ডুগু, পোলে পোলে।

কিলালা লাফাতে লাফাতেই আমাকে বলল, আশান্টে।

ওর বলার ভঙ্গীতে মনে হল যে আশান্টে শব্দটির আসল মানে ধন্যবাদ নয়; তার মানে, সাম্রাজ্যবাদী, বুর্জোয়া, নিপাত যাও, নিপাত যাও।

চাকা সারানো হয়ে যাবার পর কিলালাকে জিগ্‌গেস করলাম, পাংচার হল কি করে?

আমার কাছে টায়ার-পাংচার যে, এ্যাকুপাংচারের মতই কম্‌প্লিকেটেড ব্যাপার।

কিলালা নিঃশব্দে মিগুংগা গাছগুলো দেখল। হাতিতে মিগুংগার ডাল ভেঙেছে; পথময় ছড়িয়ে গেছে কাঁটা।

তারপর মনে হল, কিলালা অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

ভালোই হল, কিছু সময় একা ভাবার জন্য পাওয়া যাবে।

জিম ক্যালান্ জঙ্গলে গিয়ে মাচায় বসেই বলত : শিকার পাওয়া যাক আর নাই-ই যাক, ইটস আ নাইস প্লেস ফর কনটেমপ্লেশান্।

জিম, স্কটল্যাণ্ডের লোক। নীট স্কচ-হুইস্কীতে বিশ্বাস করত। মোটাসোটা আমুদে। কোলকাতার ব্রিটিশ কনস্যুলেটের সেক্রেটারী ছিল বছর পনেরো আগে। তারপর কানাডাতে গেছিল। এখন আর যোগাযোগ নেই। কিন্তু এখনও জঙ্গলে এলেই ওর ঐ "কন্‌টেমপ্লেশোনের" কথা মনে পড়ে।

সেরোনারা গ্রামে যতক্ষণে কিলালা টিউব ঠিক করল, ততক্ষণে আমি সেরেঙ্গেটি রিসার্চ ইনস্টিট্যুটটা ঘুরে দেখলাম। পৃথিবীর সব বাঘা-বাঘা জুওলজিস্ট এখানে গবেষণা করছেন নানা পশুপাখির উপর। জার্মানীর পল্ থীনেক ফাউণ্ডেশানের কল্যাণে এই ইনস্টিট্যুট গড়ে উঠেছিল, তা আগেই বলেছি। পৃথিবীর সব জাতের মধ্যে জার্মানদের মত গবেষক ও এ্যাডভাঞ্চারার জাত বোধহয় খুব বেশী নেই। যেমন সুন্দর দেশ জার্মানী আর অস্ট্রিয়া, তেমনই সুন্দর শরীর মনের সব মানুষ। অন্ততঃ যতজনকে দেখেছি, তাদের দেখে এই ধারণাই হয়েছে।

কাল রাতে আমাদের সেরোনারাতে গ্রেপ্তার করে যারা নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন গার্ডের সঙ্গে দেখা হল। তিনি একটা সিগারেটও খাওয়ালেন।

পাইপ খেলেও, তাঁর দেওয়া সিগারেট প্রত্যাখ্যান করলাম না। কি বিপত্তি ঘটে কে জানে?

তিনি বললেন, মাঝরাতে সিংহদের রাজ্যে উদোম মাঠে চরতে গেছিলেন কেন? এটা কোন্ দেশ জানেন না?

বাঙালের মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

বললাম, আপনার কি ধারণা জঙ্গল আর জানোয়ার শুধু আপনাদের দেশেই আছে?

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক বললেন, জানোয়ার তো সব দেশেই আছে কিন্তু পশুরাজ সিংহ কি আছে?

আমি বললাম, যে-সিংহকে নিয়ে আপনাদের এত গর্ব, সে আমাদের বাঘের কাছে একটা বড়-বিড়াল মাত্র। ঘেয়ো কুকুরের মত লোমহীন, স্ত্রীর রোজগারে বসে-খাওয়া, দল বেঁধে শিকার-করা ঐ জানোয়ারের প্রতি আমার একটুও ভক্তি নেই। অনেক রাত, অনেক দিন আপনাদের এই সেরেঙ্গেটির চেয়েও অনেক বেশী ভয়াবহ বনে কাটিয়েছি। আমার দেশের নাম ইণ্ডিয়া। আপনাদের বন জঙ্গল হয়ত পৃথিবীতে প্রচার পেয়েছে অনেক বেশী; কিন্তু আমাদের বন-জঙ্গলও কিছু ফেল্‌না নয়।

তারপর বললাম, আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, সেরেঙ্গেটিতে রাতে হেঁটে বেড়ানো যায় না?

উনি বললেন, আমরা পারি; ইচ্ছে করলে। তা বলে আপনি। সৌখীন ট্যুরিস্ট! কাল আমরা সময়মত গিয়ে না পৌঁছলে তো সিংহের হাতে কিমা হয়ে যেতেন।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমার একটা কার্ড দিলাম ওঁকে।

বললাম, কোনোরকমে যদি আমার দেশের যে-কোনো এয়ারপোর্টে একবার পৌঁছতে পারেন, তাহলে তারপর থেকে আপনি আমার অতিথি। আপনাকে আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যাব। সঙ্গে কয়েকটা এক্সট্রা ট্রাউজার আনতে ভুলবেন না কিন্তু।

ভদ্রলোকটি বেজায় চটে গেলেন। চটাবার জন্যেই বলা। চটবেন তা বিলক্ষণ জানতাম। উনি কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

কিলালার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না আজ ইকোমা-ফোর্টে যেতে। কিন্তু আমি জোর করলাম।

ও বলল, সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে ফিরতে পারব না।

তখন বাজে বারোটা মাত্র। হাতে অনেক সময়। পঞ্চাশ কিলোমিটার মত ফাঁকা পথ যাবো। যদিও পথ কাঁচা, কিন্তু পথে গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় নেই এবং কাঁচা হলেও শক্ত ধুলোর চমৎকার পথ। যথেষ্ট সময় আছে হাতে লাঞ্চ-এর সময় নিয়েও। লাঞ্চ আমরা ওখানে গিয়েই খাব, প্যাক-লাঞ্চ সঙ্গেই তো আছে।

বললাম, জোরে চালালো আমরা ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসব।

কিলালার আপত্তি টিকল না। সেরোনারা লজের বারে, কাঁচা লংকার সাইজের বিনুনী-পাকানো রঙচঙে পোশাকের মেয়েদের সঙ্গে বসে হ্যাঃ হ্যাঃ করে বীয়ার খাবে ও, সেটি হতে দিচ্ছি না।

অতঃপর চললাম, ইকোমা ফোর্টের দিকে।

সেরোনারা এলাকা পেরুনোর পর থেকেই আবার পথের পাশে জানোয়ারের মেলা। এতই জানোয়ার যে, গাড়িতে বসে সবসময়ই দু-পাশে কিছু না কিছু দেখা যাচ্ছেই।

কিলালা চুপচাপ। কোনো কথাই বলছে না। বরফ-ভাঙতে কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে বললাম, কিলালা, টিউবের পাংচারটা ভালো করে সারিয়েছ তো? ও মুখে কিছু না বলে, মাথা নাড়ল। ওকে অনেকগুলো সেৎসী মাছি কামড়ে দিয়েছিল হিপ্পো-পুলের সামনে চাকা বদলানোর সময়। তা নিয়ে ও খুব চিন্তিত ছিল এবং বিরক্ত তো বটেই।

www.BanglaBook.org

ইকোমা ফোর্ট জার্মানদের তৈরী। এই পুরো এলাকাই আগে জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা বলেই পরিচিত ছিল। আগেই বলেছি, এই অঞ্চলের নাম ছিল ট্যাঙ্গানিকা।

উনিশশ শতকের গোড়ার দিকে কি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এই ফোর্ট তৈরী করেন তখনকার জার্মান শাসকরা। স্থানীয় লোকদের লড়াকু-মাসাইদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ভিক্টোরিয়া হ্রদের পাশে মাসাবী প্লেইনস্। সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের সীমানার বাইরে মাসাবীর দিকে এই ইকোমা ফোর্ট। হাজার হাজার মাইল নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল, বিশ্ব-টাঁড়, এলাকায় একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট, তার সার্জেন্ট এবং কয়েকজন এন-সি-ওদের নিয়ে থাকতেন সেখানে। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা, পথঘাট কত অন্যরকম ছিল। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

জার্মানরা নাকি এই কেল্লা ছেড়ে যাবার সময় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ একটি গভীর গর্ত করে তাতে পুঁতে তার উপর সিমেন্টের আস্তরণে ঢেকে দিয়ে গেছিলেন। চল্লিশ বছর ঐ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ অমনি অবস্থাইয়ই অক্ষত ছিল। মাউ-মাউ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশরা, পাছে ঐসব অস্ত্রশস্ত্র মাউ-মাউদের হাতে পড়ে, সেই ভয়ে ঐ গর্ত খুঁড়ে সব সরিয়ে নেন। মাউ-মাউ আন্দোলন অবশ্য তান্‌জানীয়ান অঞ্চলে হয়নি; হয়েছিল, পাশের কেনিয়াতে।

এখানেই শুনলাম যে, মাউ-মাউ আন্দোলনের সময় জিম করবেট-এর লেখা বিখ্যাত বই "ট্রি-টপস্"-এ বর্ণিত সেই বড় ফিকাস্ গাছটি এবং ট্রি-টপস্-এর জানোয়ার-দেখা-টাওয়ার, মাউ-মাউরাই নষ্ট করে দেয়।

এই ট্রি-টপস্-এর উপরই রাজকুমারী এলিজাবেথ এক রাত কাটাতে এসেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে। করবেট তখন কেনিয়াতে। করবেটকে উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে থাকতে সেই রাত ট্রি-টপস্-এ। সেই রাত কাটানোর বর্ণনাই দিয়ে গেছেন করবেট তাঁর ঐ বইয়ে। ঐ "ট্রি-টপস্"-এই খবর পৌঁছেছিল যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ মারা গেছেন। জিম করবেট তাই লিখেছিলেন ঃ "She went up as the princess and came down as the queen of England."

www.BanglaBook.org

ইকোমা ফোর্ট দেখে আমরা ফিরে আসছিলাম।

ফোর্টে যখন ঢুকি, তখন একদল টোপীর সঙ্গে দেখা হল। তারা, বলতে গেলে; কিছুটা পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তারপর পথ ছেড়ে দিল আমাকে।

ফোর্টের মধ্যে সিংহ যে, সপরিবারে নেই এমনও বলা যায় না।

এই ফোর্টের বর্ণনা ডাঃ বার্ণার্ড জিমেকের একটি বইয়ে আছে। তাঁদের ফ্লাইং-জেব্রা থেকে তিনি আর মাইকেল আফ্রিকার অসীম নির্জনতার মধ্যে হঠাৎ একটি ইয়োরোপীয়ান ধাঁচের পরিত্যক্ত দুর্গ দেখে চমকে উঠেছিলেন। তারপর ঐ দুর্গর কাছাকাছিই প্লেন ল্যাণ্ড করতে গিয়ে ওয়ার্ট-হগ-এর গর্তে পড়ে প্লেনের ক্ষতি হওয়ায় সেখানেই তাঁদের পড়ে থাকতে হয় বেশ কয়েকদিন। যতদিন না প্লেন মেরামত হয়।

কিলালা গাড়ির পাশে বসেই লাঞ্চ খেয়েছিল। আমাকে বলেছিল, তুমি একাই ঘুরে এসো বানা। আমি এ জায়গাটা ভালো জানি না।

তাই একাই ঘুরে এসেছিলাম। উৎসাহের আতিশয্যে লাঞ্চ প্যাকেটটাও গাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছিলাম সঙ্গে; দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ে মনে পড়েছিল। তখন দেরী হয়ে যাবে ভেবে আর ফিরিনি। সেরোনারা ফেরার পথে গাড়িতেই খেয়ে নেব ভেবেছিলাম।

কিলালা মনে করাতে পারত। হয়ত ইচ্ছে করেই মনে করায়নি। হয়ত, ভেবেছিল, ক্ষিদের কারণেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

আসলে, কিলালা কিন্তু আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। আমি জীবনে এই প্রথমবার এবং হয়ত শেষবার আফ্রিকার এই বনে-জঙ্গলে এসেছি। সামর্থ্য থাকলে, বার বার আসতাম। আবার কখনও আসার সম্ভাবনা খুবই কম। কেউ না-নিয়ে এলে, নিজের এমন সামর্থ্য একেবারেই নেই যে; আবার আসি। তাছাড়া, বিদেশী মুদ্রাই বা পাব কোথায়? কাজও রোজ রোজ পড়বে না এই রাজ্যে। তাই আশৈশব কল্পনার, চাঁদের পাহাড়ের; স্নোজ অফ কিলিম্যান্‌জারোর আফ্রিকাকে একটু উল্টে-পাল্টে, নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে তো করবেই আমার।

আমি ভাবছি এই; আর কিলালা ভাবছে, কখন ডিউটি শেষ হবে, কখন গিয়ে লজ-এ চানটান করে বার-এর টুলে বসে কাঁচা-লঙ্কা বেশি দেখবে। ও যে প্রতি মাসেই ট্যুরিস্ট নিয়ে আসে সঙ্গে করে। আমার জীবনের প্রথম ও শেষ আফ্রিকা সফরের তাৎপর্য ও কি বুঝবে? এই সব অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওর ঘেন্না ধরে গেছে। তাছাড়া প্রকৃতিকে তো আর সকলেই ভালোবাসে না। ও মোটেই একা নয়; ওর মানসিকতার দলে।

www.BanglaBook.org

এখন ইকোমা ফোর্টকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পিছনে ফেলে এসেছি আমরা। পশ্চিমাকাশে তাকিয়ে মনে হল, সূর্যও আজ কিলালার মতই তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার বন্দোবস্ত করছেন বোধহয়।

ঘড়িতে চেয়ে দেখলাম, দোষটা সূর্যদেবের নয়; আমারই। সাতটা বাজতে আর আধঘণ্টা বাকী। আধঘণ্টার মধ্যে তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা এই পথে পেরোনো অসম্ভব।

কিলালার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, ওর চোয়াল শক্ত, ঠোঁট টাইট।

আমার খাওয়া হয়ে গেছিল। বীয়ারটা খেলাম, জলের বিকল্পে। শীত বেড়ে গেল তাতে। জানালার কাঁচ সব তোলা আছে। সকালে সেৎসী মাছির অনেক কামড় খেয়েছে কিলালা। আর কামড় না খাওয়াই মঙ্গলের। আমিও এক কামড় খেয়েই বুঝেছি যে, সেৎসী মাছির কামড় খাওয়াটা মোটেই সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়।

দ্রুতগামী গাড়ির সামনের সীটে বসে ভাবছিলাম যে, আজও আবার গেম-ওয়ার্ডেনের অফিসে ওরা ধরে নিয়ে যাবে আমাকে। রাতের অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে যখন আমরা সেরোনারা লজ-এ ফিরব, সকালের সেই নিগ্রো গার্ডটি বদলা নেবে নিশ্চয়ই এইবার। বলা যায় না; জেলেও পুরতে পারে। বার বার কি বাংলার ঘুঘুকে ধান খেতে দেবে? লোকটির ব্যবহার সত্যিই ভাল নয়।

কালো চামড়ার লোক মাত্রই সাদা চামড়ার লোকেদের খাতির করে বেশী। সব জায়গাতে, এমন কি ঘোরতর কালোদের দেশেও, সাদা চামড়ার তুলনায় কালো চামড়ারা অবহেলিত হয়। আমাদের দেশেও দেখেছি। কালোরা বোধহয় তাদের অহেতুক হীনম্মন্যতা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কিলালা সোজা স্টীয়ারিং ধরে যত জোরে পারে গাড়ি ছুটোচ্ছিল। কোনো কথা বলছিল না।

হঠাৎ কিলালা আমাকে বলল, আমি যখন টিউব-মেরামত করছিলাম সেরোনারা গ্রামে তখন গার্ড তোমাকে কি বলছিল? তুমি কি আগে ওকে চিনতে?

আমি বললাম, কাল রাতে আমি আর লাইলাক্ মেমসাহেব একটু চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তাই ওরা আমাদের ধরে ওদের অফিসে নিয়ে গেছিল। তারপর রাত একটায় ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়।

কিলালা বলল, বেড়াতে গিয়েছিলে? রাতে? মানে?

আমার কাছ থেকে উত্তর না-পেয়ে হঠাৎ ও বাঁ হাতের মুঠিটা দিয়ে নিজের বাঁ কানের পাশে বার বার বিরক্তির ঘুষি মেরে হতাশ গলায় বলল, তোমার মত ট্যুরিস্ট দু'চারজন নিয়ে এলে আমার চাকরি যাবে যে শুধু তাই-ই নয়; আমি পাগল হয়ে যাব। পাগল।

কিলালা যখন পাগল হব হব করছে ঠিক সেই সময় আমি লক্ষ্য করলাম, গাড়ির সামনের ডানদিকটাও কিরকম যেন করছে পাগলেরই মত। কিলালাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছিল। ও ব্রেক করতেই, পথ ছেড়ে পথের বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইল গাড়ি, সিংহের তাড়া-খাওয়া জেব্রাদের মত।

www.BanglaBook.org

অবাধ্য, কথা-না-শোনা বলদের উদ্দেশ্যে গাড়োয়ানরা যেমন স্বগতোক্তি করে, কিলালা তেমন বিড় বিড় করে কিসব বলে-টলে ব্রেক ও গীয়ারের যুগপৎ খেল দেখিয়ে তার বশংবদ গাড়িটাকে থামাল।

থামিয়েই, দরজা খুলে নামল।

আমিও নামলাম। নেমে সামনে গিয়ে দেখি টায়ার ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। কিলালা ফ্ল্যাট। আমিও।

কিলালা একবার ঘৃণার চোখে আমার দিকে তাকাল। এই আসন্ন সন্ধ্যাতেও তাকে আমি টায়ার বদলাতে সাহায্য করবো কি করবো না তা আঁচ করে নিলোও।

করবো না যে, তা আমি আগেই ঠিক করেছিলাম। প্রথমতঃ, মিনিটে মিনিটে টায়ার পাংচার হওয়া গাড়ি নিয়ে কেউ এইরকম জঙ্গলে আসে না। দ্বিতীয়তঃ, যার কাজ; সেই করবে। সবাই সব করতে পারলে বা করলে দেশ, জাত, সভ্যতা সবই থেমে থাকত। টাকাও এরা কম নেয়নি হুইট্‌লী ও দীনুভাই-এর কাছ থেকে। নিখরচায় জামাই আদরে ঘুরিয়ে দেখালে অন্য কথা ছিল।

কিলালা গাড়ির পিছনটা খুলে জ্যাক্‌টা বের করে লাগাল। তারপর গাড়িটা তোলবার আগে, কি মনে করে স্টেপনীটাকে বের করতে গেল। বের করতে যেতেই, একটা অতর্কিত আর্তনাদ শুনলাম।

কি হল বুঝতে না পেরে আমি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ইলিশ মাছের পেটে ডিম আছে কি নেই যেমন করে দেখে তেমন করে স্টেপনীর পেট টিপতেই আমারও আর্তনাদ করতে ইচ্ছে গেল। স্টেপনীটাও ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে রিমের মধ্যে।

কি সারাল সকালে সেরেংগেটিতে, তা ওরাই জানে। যেমন কিলালার কেরামতি, তেমনই এখানে টায়ার মেরামতি।

কিলালা একবার আম্ব্রেলা-এ্যাকাসিয়া গাছেদের ছাতার পটভূমিতে গোলাপী হয়ে-যাওয়া আকাশের দিকে চাইল, তারপর খুব নরম হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত গলায় বলল, রিয়্যাল ট্রাবল বানা। নাউ রিয়্যাল ট্রাবল।

আমরা মুখ দিয়ে কেবল একটি কথাই বেরোল! কাপুত্‌।

এখন কি হবে, কি করা যেতে পারে; তা কিলালা নিশ্চয়ই ভাবতে পর্যন্ত পারছিল না। আর আমি তো এখানে আনপড়্‌।

চুপ করে রইলাম।

সন্ধ্যে হয়ে যাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে। কাল সকাল ন'টার আগে এ-পথে কোনো গাড়ির দেখা পাওয়া যাবে না কোনোমতেই। সকালে পাওয়া গেলেও বরাত ভালো বলতে হবে।

কিলালা ডান হাত বাঁ হাত দিয়ে নিজের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চড়-চাপড় মেরে যেতে লাগল। সন্ধ্যের পর তো সেৎসী মাছি ওড়ে না। তবে কি মশা! লোকটা বড় বাতিকগ্রস্ত। যতেক বাতিকের কথা শুনেছি, মশা-মাছির বাতিকের কথা শুনিনি কখনও।

www.BanglaBook.org

আমি আর বেশী চিন্তা-ভাবনা না করে আবার নিজের জায়গায় উঠে বসে কাঁচটা তুলে দিয়ে পাইপ ধরালাম। কোথায় পড়েছিলাম যে, Ther's no point in trying to do something, when there is nothing to be done.

প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতেই খুব ভালো লাগল আমার। আসলে এই-ই তো চেয়েছিলাম। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় অবধি প্রাকৃত, আদিম আফ্রিকার এটি পরিপূর্ণ রাত আমার। এর সমস্ত শব্দ, বর্ণ, গন্ধকে চিরতরে আমার করে রাখব। এ এক আশ্চর্য দৈবপ্রাপ্তি।

মনে মনে বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য কিলালা।

কিলালা জ্যাক্‌টাকে আবার গাড়ির পিছনে তুলে রাখল। কোনো জানোয়ার এসে নতুন খাদ্য ভেবে টেনে নিয়ে গেলেই চিত্তির। গাড়ির বুট বন্ধ করে এসে সীটে স্টীয়ারিং-এ হেলান দিয়ে বসে ওর ডান হাতের পাতায় ডান কানটা ঢেকে সমাধিস্থ হল।

বোধহয় বোধিলাভের আশায়।

সমস্ত পশ্চিমাকাশে লাল গোলাপীর, গাঢ় ও নানারঙা প্যাস্টেল শেড-এর রঙ দিয়ে অনেক নীরব একান্ত সব ছবি আঁকা শেষ হলে সাদা শ্লেটখানা নিয়ে কোন্ অদৃশ্য হাত চলে গেল অলক্ষ্যে। তারপরই পশ্চিমাকাশের সন্ধ্যাতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

কত রাত এই তারার দিকে চেয়ে, মাচায়, জঙ্গলের বাংলোয় বা জঙ্গলের গভীরে অথবা এমনই খারাপ-হওয়া গাড়িতে বসে নিজের দেশে কেটেছে! কত কি ভেবেছি! একা ভাবার মত সুখ আর কি আছে? সন্ধ্যাতারা অনেক কথা মনে আনে। তাই, তারাটা বড় দেশী দেশী মনে হল। আমার শৈশব আর প্রথম যৌবনের কত দুর্মূল্য জংলী স্মৃতি জড়ানো আছে ঐ তারাতে; তার নীলাভ দ্যুতিতে।

খুব অবাক হলাম। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে নানা জানোয়ারের ডাক ভেসে আসল না কিন্তু; সেরোনারাতে যেমন শুনেছিলাম। মনে হল, আমরা কোনো ভুতুড়ে বা অলৌকিক এলাকাতে এসে পড়েছি।

একদল ছোট্ট পাখিকে, বোধহয় স্টার্লিং খুব জোরে উড়ে যেতে দেখেছিলাম পুব থেকে পশ্চিমে। মনে হচ্ছিল, ওরা দিগন্তরেখায় নেমে-আসা লাল উজ্জ্বল সূর্যটার মধ্যে খড়-কুটো দিয়ে বাসা বানাবে এক্ষুনি। সূর্যের মধ্যেই যেন ঢুকে পড়বে বলে দ্রুত উড়ছিল পাখিগুলো।

আমাদের পিছনে কিছুটা জায়গায় জঙ্গল আছে। লেরাই জঙ্গলও একটু। নিশ্চয়ই জল আছে সেখানে।

আটটা-ন'টা অবধি ছোটো-ছোটো নানান জানোয়ার, ঘাস-ইঁদুর, খরগোশ, সজারু এবং রাত-চরা নানা শিকারী পাখির আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না।

এখন রাত কত কে জানে? হাতে ঘড়ি আছে, কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করছে না। সাহস তো নেই।

হঠাৎ কিলালা ওর বাঁ-হাত দিয়ে আমার কাঁধ ছুঁল।

চাঁদ উঠেছে। চাঁদের নরম হলুদ আলোয় শীতের রাতের দিগন্ত-বিস্তৃত, মাঠকে একটি হলুদ জাপানী ওয়াশের কাজের ছবি বলে মনে হচ্ছিল। সেই ভুতুড়ে চাঁদের আলোতে

www.BanglaBook.org

একদল হাতি আসছিল নিঃশব্দে। ওদের হঠাৎ দেখে, দূর-সমুদ্রে ভেসে-আসা একসার নিঃশব্দ যুদ্ধ জাহাজ বলে ভুল হলো। যুদ্ধ জাহাজের মতই ব্যাটলশিপ—গ্রে রঙের হাতিগুলো অন্ধকারে ভাসছিল।

আমি সোজা হয়ে বসলাম।

দাঁতাল হাতিগুলোর দাঁতগুলো এতই বড় যে, মনে হচ্ছিল মাটি ছুঁয়েছে সেই দাঁত। সামনেই চার-পাঁচটা বিরাট বিরাট দাঁতাল। ওরা খুব আস্তে আস্তে, বড় বেদনাদায়ক আস্তে আস্তে; গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম যে, ওরা বোধহয় একদল গেম-ওয়ার্ডেন। প্রাকৃতিক। কারা এই স্বর্গরাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করতে এল এই রাতে, তাই-ই দেখতেই জীবজন্তুদের দেবতা বুঝি ওদের পাঠিয়েছেন।

দাঁতালগুলো এসে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলল। কিলালা বিনা বাক্যব্যয়ে বডিথ্রো দিল। ক্লাচ আর এ্যাকসিলারেটরের মধ্যে ওর মুখ ঢুকে গেল। উবু হয়ে বসে রইলো ও। আমিও দরজাটা লক করে দিয়ে, সীটে হেলান দিয়ে, সোজা বসে রইলাম নড়া-চড়া না করে।

হাতিগুলো জানালার কাঁচ, গাড়ির সাদা গায়ে শুঁড় বোলাতে লাগল। কয়েকটা বাচ্চা ছিল দলে। ছোট বড় বাচ্চা। ছোটরা মায়েদের পায়ের ভিতরে ছিল। একটা ছোট বাচ্চা চলমান মায়ের সঙ্গে চলতে চলতে মায়ের দুধ খাচ্ছিল। আর একটা বড় বাচ্চা গাড়ির সঙ্গে গা ঘষতে গাড়িটা দুলে উঠল।

গাড়ি গীয়ারেই ছিল, কিন্তু হ্যাণ্ডব্রেক টানা ছিল না। কিলালা উপুড় হওয়া অবস্থাতেই হ্যাণ্ড-ব্রেক টানতে যাচ্ছিল, আমি ওর মাথায় হাত ছুঁইয়ে মানা করলাম। হ্যাণ্ড-ব্রেক টানতে যেটুকু শব্দ হবে সেই শব্দকে হাতিরা কিভাবে নেবে কে জানে?

হঠাৎ একটা হাতি গাড়ির পিছনে গিয়ে, বাম্পারে শুঁড় লাগিয়ে গাড়িটাকে উঁচু করে তুলে ধরল। কিলালার গলা, হাঁড়িকাঠের মতো গিয়ে ক্লাচ আর একসিলারেটরের মধ্যে আটকে গেল। উইণ্ডস্ক্রীনে ধাক্কা খেয়ে আমার কপাল ফুলে গেল। হয়ত, খুলেও গেল। তারপর গাড়িটাকে কিছুক্ষণ উঁচু করে ধরে থেকেই ছেড়ে দিল হাতিটা।

বিনা পয়সায় একটু নাগরদোলা চড়ে নিলাম।

ওরা ইচ্ছে করলেই আমাদের নিয়ে এবং গাড়িটাকে নিয়েও ফুটবল খেলতে পারত। কিন্তু করল না। গাড়ির চারদিকে ওরা ঘুরতে লাগল। একসময় গাড়ির চারদিকে ঘিরে হাতিরা এমন করে দাঁড়াল যে, কোনো দিক দিয়েই আর আকাশ কী মাঠ দেখা যাচ্ছিল না। সব কালো হয়ে গেল। মনে হল, আমরা একটা আলোবাতাসহীন গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

কতক্ষণ যে ওরা গাড়িটাকে ঘিরে ছিল তার হিসাব রাখিনি। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন কয়েক ঘণ্টা। যখন সরে গেল ওরা একে একে, তখন আবার আকাশে তারা ফুটতে লাগল, চাঁদ বেরোল; নীচে মাঠ বেরোল, পথটাকে টাইপ-রাইটারের সরু ফিতের মত মনে হতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর তারা শুঁড় তুলে বৃংহণ করতে করতে আবার যেমন আস্তে আস্তে

www.BanglaBook.org

এসেছিল, তেমনই আস্তে আস্তে বাঁদিকে চলে গেল। যতক্ষণ ওদের ছায়া দিগন্তে মিলিয়ে না গেল ততক্ষণ কিলালা কোনো কথাই বলল না।

কিলালাকে হাত দিয়ে ইশারা করায়, হাতিগুলো চলে গেছে কী-না ভালো করে একবার দেখে নিয়ে সীটে উঠে বসল কিলালা। একটা সিগারেট ধরালো। আমিও পাইপ ধরিয়ে ওর সিগারেটে আগুন জ্বেলে দিলাম। লাইটারটা জ্বালাতেই লক্ষ্য করলাম যে, কিলালার কপালে ঘাম।

ও বলল, আশান্টে?

তারপর আমরা দুজনেই জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম—ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার জন্যে।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু উত্তেজনায় আমার শরীরও গরম হয়ে গেছিল বলে ঠাণ্ডাটা বেশ ভালোই লাগছিল।

সিগারেটে একটা বড় টান দিয়ে, এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে কিলালা প্রথম কথা বলল অনেকক্ষণ পর।

ফিসফিসে ভয়ার্ত গলায় বলল, উন্‌কুলুঙ্কুলুর হাতি!

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, উন্‌কুলুঙ্কুলু?

তারপর শুধোলাম, কোনো জায়গার নাম?

কিলালা অধৈর্য, কিন্তু নীচু গলায়, যেন ওর কথা কেউ শুনে ফেললে বিপদ হবে; এমন ভাবে বলল : না না, জায়গা নয়। উন্‌কুলুঙ্কুলু পৃথিবীর প্রথম মানুষ। যার আগে আর কেউ ছিল না; কিছুই ছিল না।

আমি সোজা হয়ে বসলাম। জলন্ত মীরশাম্-পাইপের গরমে হাত গরম হয়ে উঠছিল আমার। পাইপটাকে বাঁ হাতে নিয়ে বললাম, বলো কিলালা, থামলে কেন? উন্‌কুলুঙ্কুলুর সম্বন্ধে যা জানো, সব আমাকে বলো।

কিলালা বলল, সে অনেক কথা। তুমি শুনে কি করবে?

আমি বললাম, বলোই না।

কিলালা ওর সিগারেটে আরেকটা টান দিল, তারপর জ্যোৎস্না ভেজা প্রান্তরের দিকে চেয়ে বলল, উন্‌কুলুঙ্কুলু বহুরূপীকে ডেকে বলেছিলেন, যাও। যাও, তুমি গিয়ে মানুষদের বলো যে; তোমরা সব অমর হবে। যারা জন্মেছে, তারা কেউই আর মরবে না।

কিন্তু সেই কুঁড়ে বহুরূপী বড়ই আস্তে আস্তে চলতে লাগল। তাতে উনুকুলুঙ্কুলু রেগে গিয়ে গিরগিটিকে পাঠালেন তার পিছনে। তাকে বলে দিলেন, মানুষদের গিয়ে বলো যে, মৃত্যু আসবে তাদের প্রত্যেকের কাছে। তাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

বহুরূপী মানুষদের কাছে পৌঁছবার আগেই গিরগিটি পৌঁছে গেল। তাই-ই আজ মানুষরা মরণশীল। বহুরূপীর অবশ্য খুব বেশী দোষ ছিল না। যদিও কুঁড়ে সে ছিল নিশ্চয়ই। সে পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই পৃথিবীতে আছে। তখন পৃথিবী ছিল জল আর কাদার। সে ছিল উভচর। সে বেচারীর শক্ত মাটিতে হাঁটতে সময় লাগত, তাই সে খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল।

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, ঐ হাতিগুলো যে উন্‌কুলুঙ্কুলুর হাতি তা বুঝলে কি করে?

কিলালা অন্যমনস্ক গলায় বলল, উন্‌কুলুঙ্কুলুর হাতি না হলে আমরা কেউই আজ প্রাণে বাঁচতাম না। আমার জীবনে আমি অমন পাহাড়ের মত হাতি দেখিনি। সবচেয়ে বড় হাতিটার কপালের মাঝখানে একটা আলো জ্বলছিল, তুমি লক্ষ্য করোনি? আমি দূর থেকে দেখেছিলাম। তাই-ই তো অত ভয় পেয়েছিলাম।

আমি কিছুই দেখিনি। জানি না কিলালা কি দেখেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তোমাদের আর কি দেবতা আছে?

কিলালা বলল, আছে তো অনেক! কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক। এখন চুপচাপ থাকো। আবার কী না কী ঘটে!

আমি বললাম, বলোই না। আর কিছু ঘটবে না। বলো, তোমাদের দেবতাদের কথা।

কিলালা বলল, এক দেবতা টিলো। বৃষ্টি আর ঝড় হয়ে তিনি আসেন মাঝে মাঝে। বাজ পড়লে যে শব্দ হয়, তা আর কিছু নয়, টিলোর গলার স্বর। টিলো যখন কথা বলেন, তখন ঐ রকম শব্দ হয়। বাচ্চারা যে মূর্ছা যায়, ভিরমী খায়, কোনো কোনো মেয়ের যমজ বাচ্চা হয়; এ-সবের পিছনেই টিলার হাত আছে। যমজদের তাই আমরা বলি আকাশের সন্তান।

কখনও কখনও টিলো কোনো জংলী-জানোয়ারের রূপ ধরে পৃথিবীতে এসে অনেক মজার গল্প বলে যান।

একটু থেমে কিলালা বলল, আরও একজন দেবতা আছেন তাঁর নাম সাংখাম্বি।

মণিপুরী মণিপুরী গন্ধ পেলাম নামটাতে। কিন্তু কিলালাকে কিছু না বলে বললাম, বলো; থামলে কেন? তোমাদের দেবতা দৈত্য সব কিছুর কথা আমাকে বলো। সারারাত তো গল্প করেই কাটাতে হবে আজ। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে। বলো, কিলালা।

কিলালা একটু চুপ করে থেকে বলল, একজন দৈত্যও আছে যাঁর নাম কাম্মাপ্পা। তিনি শুধু কপাকপ্ করে মানুষ গিলে খেতেন। সব মানুষকেই তিনি খেয়ে ফেলেছিলেন। একমাত্র বাকি ছিল একজন বুড়ি। সেই বুড়ি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল বলেই, প্রাণে বেঁচে গেছিল। কোনো পুরুষের সঙ্গে না-শুয়েই সেই বুড়ির একটি ছেলে জন্মেছিল, গায়ে অনেক গয়নাগাঁটি নিয়ে। সেই ছেলের নাম রেখেছিল বুড়ি, লিটুওলোনে—এক দেবতার নামে।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই লিটুওলোনে বিরাট লম্বা চওড়া এবং খুব বলশালী হয়ে গেল।

জন্মেই সে তার মাকে জিগ্‌গেস করল, অন্য মানুষরা সব গেল কোথায়?

সেই বুড়ি তখন তাকে বলল যে, কাম্মাপ্পা সব মানুষদের খেয়ে ফেলেছে। এবং কাম্মাপ্পার দৌরাত্ম্যের কথাও বলল।

সব না শুনে; লিটুওলোনে একটা মস্ত ছোরা হাতে কাম্মাপ্পাকে মারতে গেল। কিন্তু কাম্মাপ্পা তাকে আস্তই কপাৎ করে গিলে ফেলল। লিটুওলোনে তার পেটের ভিতরে গিয়েই কাম্মাপ্পার নাড়ি-ভুঁড়ি সব ছোরা দিয়ে কেটে ফেললে টুকরো টুকরো করে এবং কাম্মাপ্পার পেটের ভিতর থেকে হাজার হাজার গিলে-ফেলা মানুষকে বের করে আনল। পিল্ পিল্

www.BanglaBook.org

করে মানুষরা বেরিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু কাম্মাপ্পার পেট থেকে বেরিয়ে এসেই অন্য মানুষরা লিটুওলোনকে দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। যে-বাচ্চা ছেলে, বাচ্চা বয়সের মজা জানেনি, বাচ্চাদের খেলা খেলেনি এবং রাতারাতিই বড় হয়ে গেছে এবং যে-কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়াই একজন নারীর গর্ভে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে; সে মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোনো দুর্দান্ত ভয়াবহ জানোয়ার। মানুষেরা বলল, কাম্মাপ্পার মা সেই বুড়ি নিশ্চয়ই কোনো পরাক্রমশালী দুর্দান্ত ভয়াবহ জানোয়ারের সঙ্গে সহবাস করেছিল।

আমি বললাম, বলো। কিলালা, থামলে কেন?

কিলালা বলল, লিটুওলোনেকে তারপর মানুষেরা বার বার মেরে ফেলার চেষ্টা করল। ওকে আগুনে পুড়িয়ে, অথবা পাহাড় থেকে ফেলে মারার মতলব আঁটল, বিষাক্ত তীর মারার ফন্দি করল; কিন্তু লিটুওলোনে বার বার তার বুদ্ধির কৌশলে বেঁচেই গেল। তাই লিটুওলোনে আমাদের গল্প-গাথা মহাবীর হয়ে আছে আজও।

এ পর্যন্ত বলেই, কিলালা আরেকটা সিগারেট ধরাল।

এখন শীতটা বেশ বেশী মনে হচ্ছে। বাইরে নেমে আমি টুপি মাথায় দিয়ে কিছুটা পায়চারী করে গা-গরম করতে লাগলাম। কিলালা কিছুতেই নামল না। উন্‌কুলুঙ্কুলুর রাজত্বে সে রাতের বেলা কোনোক্রমেই নামতে রাজী নয়।

ঘড়ির রেডিয়ামে দেখলাম, বারোটা বাজে। গাড়ির বাইরেটা ফ্রস্টেড হয়ে গেছে। হাত ছোঁওয়ালে মনে হচ্ছে ফ্রিজ-এর ভিতরে হাত ঢুকিয়েছি।

কিছুক্ষণ পায়চারী করে আবার গাড়িতে ফিরে এসে কাঁচ বন্ধ করে বসলাম।

এমন সময় হঠাৎ; অনেক মাইল দূরে সামনের পথের উপর পাশাপাশি দুটি জোনাকি জ্বলে উঠল। জোনাকি দুটো একটু পর স্পটলাইট-পড়া নাইটজার পাখির চোখ হল, আরও পরে বন-বিড়ালের চোখ; তারও পরে চিতাবাঘের চোখ। এবং সবশেষে বাঘের চোখ। দুটি চোখের ব্যবধান ক্রমশই বাড়তে লাগল এবং চোখ দুটো উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

কিলালা নড়ে-চড়ে বসে চোখ কচ্‌লাতে লাগল। ওকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। উন্‌কুলুঙ্কুলুর এ আবার কী নতুন কারসাজি।

জানালার কাঁচ নামাতেই আমি গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলাম। দেখতে দেখতে গাড়িটার হেডলাইটের দুটো আলোই স্পষ্ট হল। এবং এক সময় গাড়িটা দ্রুত কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

গাড়িটা এসে আমাদের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন দুজন গার্ড এবং মিস্টার কাপুত্‌ এবং লাইলাক্‌। দেখল সঙ্গে ওরা স্টেপনীও এনেছেন।

লাইলাক্‌ জানত যে, আমি ইকোমা ফোর্টে গেছি। ডিনারের সময়ও আমরা ফিরিনি দেখে ও লজের ম্যানেজারকে বলেছিল। রাতে, আমরা গিয়ে ডিনার খাব, একথা ম্যানেজারও জানতেন। তাছাড়া, আমার আর কিলালার মালপত্র সব ঘরেই ছিল— চেক-

www.BanglaBook.org

আউট করেও যাইনি আমরা। তাই কিছু একটা ঘটেছে তা ওঁরা অনুমান করেছিলেন।

লজ্-এর ম্যানেজার ওয়ার্ডেনের অফিসে ফোন করেন। সেখানে সকালে যে গার্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়, তিনিই বলেন যে, আমাদের টায়ার সারাতে দেখেছেন তিনি সেরোনারা গ্রামে। তখন ওঁরা অনুমানেই একটি স্টেপনী নিয়ে, বড়কর্তার কাছ থেকে রাতে গাড়ি চালাবার পারমিশান নিয়ে ইকোমার দিকে রওয়ানা হন।

যতক্ষণে কিলালা এবং গার্ডরা এবং মিস্টার কাপুত্ টায়ার বদলাচ্ছিলেন, লাইলাক্ সঙ্গে করে আনা কনিয়াকের বোতলটা আমাকে এগিয়ে দিল আর পুরু হ্যাম-ভরা স্যাণ্ডউইচ। ঢক্ ঢক্ কনিয়াক আর স্যাণ্ডউইচ খেয়ে গা-গরম হল।

চাকায়; বলা বাহুল্য, আমি এবারেও হাত লাগালাম না।

চাকা পাল্টানো হলে, কিলালাকে খাইয়ে, লাইলাক্ আমাদের গাড়িতে এল। আমার পাশাপাশি বসলাম। মিস্টার কাপুত্ ভদ্রতার কারণে ওয়ার্ডেনদের সঙ্গেই উঠলেন গিয়ে ল্যাণ্ড-রোভারে। ওঠবার আগে বোতল থেকে ঢক্ ঢক্ করে কনিয়াক খেয়ে প্রায় বোতলটা খালিই করে দিলেন।

মুখে বললেন, বড্ড ঠাণ্ডা!

সকালের গার্ডটি আমার জানালার কাছে এসে ঠাট্টা করে বলল, আজ আবার কি দেখতে এখানে এসেছিলেন?

আমি বললাম, উন্‌কুলুঙ্কুলু, টিলো, কাম্মাপ্পা, লিটুওলোনে আরও কত কি!

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

তারপর আমাদের গাড়ি পেছনে পেছনে ল্যাণ্ড-রোভারের রিয়ারগার্ড নিয়ে আলো জ্বালিয়ে সেরোনার দিকে চলতে লাগল। একদল ওয়াইল্ড বীস্ট লাফাতে লাফাতে, গোল হয়ে নাচতে নাচতে পথ থেকে সরে গেল।

লাইলাক্ বলল, তোমার জন্যে আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল।

আমি ওর গরম হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, আমি খুব ভাগ্যবান। আমার জন্যে চিন্তা করে এমন লোক খুব বেশী নেই। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

www.BanglaBook.org

সেরোনারাতেই মন বসে গেল। মন যখন বনে বসে, তখন আর বেশী ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে না। লাইলাক্‌রা লোবো লজে চলে যাবে আজ সকালে। সেরোনারাতে তিনদিন চার রাত থাকা হল আমাদের সকলেরই।

ঘুম থেকে উঠতেই দেরী হয়ে গেছিল সেদিন। তাড়াও ছিলো না কোনো। চান করে, দেরী করে ব্রেকফাস্ট সেরে; আমি যাব ডুটু সাফারি ক্যাম্পে। বেশী দূরের পথ নয়।

বিছানাতে শুয়ে শুয়েই জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে, চা খাচ্ছিলাম। লাইলাক্ এসে দরজায় নরম হাতে নক্ করে ঢুকল। বলল, চললাম তাহলে।

আমি বললাম, নিতান্তই চললে?

লাইলাকের দৃষ্টি, মুহূর্তের জন্যে শূন্য হয়েই; আমার মুখে পড়ল। বলল, যাওয়াটাই তো সত্যি; থামাটাই মিথ্যা।

আমি বললাম, তাই হয়ত থামার দাম এত বেশী।

ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল একটুক্ষণ। বাইরে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল, আবার কি দেখা হবে কখনও?

বললাম, হতে পারে। তবে না হলেই খুশী হব আমি।

ও বলল, আমাকে তোমার এতই অপছন্দ?

বললাম, যা পছন্দের তাকে কখনও বেশীদিন কাছে রাখতে নেই। সে অপছন্দেরই হয়ে পড়ে তাতে। আমাদের এই স্বল্পদিনের দেখা-শোনার স্মৃতিটা থাকবে বহুদিন। তবে দেখা যে হবে নাই-ই এমনই বা কে বলতে পারে? কখন, কোথায় আবার ঘুরতে ফিরতে দেখা হয়ে যাবে। তান্‌জানীয়াই তো পৃথিবীর সবটুকু নয়।

ও বলল, আমাদের দেশে এবারে এলে আগে থাকতে লিখো। তোমার কারণে সময় রাখব জমিয়ে, বেহিসাবীর মত খরচ করার জন্যে।

আমি বললাম, তুমিও যদি পারো তো, আমাদের দেশে চলে এসো একবার। ন্যাড়া-নেড়ী সিংহ নয়, তোমাকে আমাদের বাঘ দেখাবো; যে পৌরুষের সংজ্ঞা। চেনাবো, আমাদের জঙ্গলের রঙ, গন্ধ। আমাদের দেশের বনে বনে আমার সঙ্গে যদি ঘোরো, তাহলে আমার প্রেমেই হয়ত পড়ে যাবে তুমি।

লাইলাক্ হাসল।

বলল, প্রেম তো বনে থাকে না; মনে থাকে।

তারপর বলল, প্রেম কাকে বলে জানিই না! জানতে চাইও না। তবে তোমার জন্যে

www.BanglaBook.org

এক বিশেষ অনুভূতি জমা রইল! এই জমা তামাদি হবার আগেই পারলে, একবার জার্মানীতে এসো। বেশীদিন জমা থাকলে সবকিছুই তামাদি হয়ে যায়। মেয়াদ ফুরোবার আগেই চলে এসো।

আমি বললাম, ভালো থেকো; সবসময়।

ওর দিকে চেয়ে মনে মনে বলছিলাম, নিজেকে ভালোবেসো লাইলাক্ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। নিজেকে ভালোবাসার মত নির্ভেজাল নিত্য আনন্দ আর কিছু নেই। আর তোমার জামাইবাবুকে মুক্ত করে দিও। একটা জয়ের আনন্দ নিয়ে কৃপণরা এবং ভীতুরাই দিন কাটাতে পারে। নিত্য নতুন জয়ের এবং জয়ের সাধনার মধ্যে দিয়েই তো আমরা আমাদের প্রাচীনতাকে অতিক্রম করি, নিজেদের উপরে নিজেদের বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত ফুরিয়ে ফেলেও আবারও তাকে ফিরে পাই গভীরতর করে। তাই না?

লাইলাক্ তখনও দাঁড়িয়েছিল বাইরে চেয়ে। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, ইট ওজ ভেরী ভেরী নাইস মীটিং উ্য ইনডিড!

বলেই, আমার দিকে আর একবারও ফিরে না তাকিয়ে, ঘরের দরজা আল্‌তো করে বন্ধ করে চলে গেল।

কাঠের বারান্দায় ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে এল আস্তে আস্তে।

হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। একটু পরেই ওদের ল্যাণ্ড-রোভারটার এঞ্জিন শব্দ করে উঠবে। তারপর ধুলো উড়িয়ে কেনিয়ার দিকে লোবো লজের উদ্দেশ্যে চলে যাবে।

যখন ওদের সাদা গাড়িটা আমার জানালার তলায় এল, তখন আমি অনেকবার হাত নাড়লাম।

আশ্চর্য! গাড়ির একজনও আমাকে লক্ষ্য করল না। লাইলাক্‌ও না।

এমনিই হয়।

যখন কেউ আর দেখে না, তার উৎসুখ চোখ বুজে ফেলে; যখন মনকে লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে নেয়, তখন হাত নাড়া-না-নাড়ায় কোনোই তফাৎ হয় না।

চিরজীবন আমি এই-ই করে এলাম। যখন কাউকে ভালো লাগল, কাউকে ভালোলাগা, ভালোবাসা জানাতে ইচ্ছে হল, যখন তাকে ইশারা করলাম সমস্ত অন্তরের উষ্ণতা দিয়ে, তখন তারা সকলেই উদাসীনতা, অথবা অভিমানের শীতের পথে দূরে চলে গেল। বারে বারে।

জানালা থেকে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম, সবকিছুর সময় আছে। সেই সময় পেরিয়ে গেলে কোনো কিছুরই আর মানে থাকে না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই 'পোলে পোলে' চলে না। যখন সময় থাকে, তখন চোখের নীরব ভাষায়, মুখে কিছু না বলেও অনেক কথাই বোঝানো যায়; আর যখন থাকে না, তখন চিৎকার করলেও কেউ কিছুই শুনতে পায় না।

www.BanglaBook.org

আমি জানি, যতদিন তান্‌জানীয়াতে থাকব, ততদিন সময় পেলেই আমার মন বলবে; হাবারি লাইলাক্?

কল্পনায় শুনতে পাব, লাইলাক্ তার হাস্কি, সেক্সী গলায় বলছে, নুজরি সানা।

আর যেই মুহূর্তে তান্‌জানীয়ার কোনো শহরের এয়ারপোর্টে আমার দেশমুখো প্লেন ট্যাক্সিং করে দৌড়বে উড়বার জন্যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুলে যাব যে, লাইলাক্ বলে একজন সুন্দরী বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার তান্‌জানীয়ার বনে পাহাড়ে।

আমার দেশে যে, লাইলাক্-এর চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরী, অনেক মিষ্টি, অনেক সুগন্ধী ফুলেরা সব আছে। আমি যে আমারই দেশের। যেমন, দেশ নেই কোনো আমার নিজের দেশের মত; তেমন নারী নেই কোথাও ভারতীয়ও নারীদের মত। আমার দেশজ প্রেম, বনজ প্রেম, মনজ প্রেম; কেবল আমার দেশেই পাপড়ি মেলে।

বিজাতীয় কিছু ভালো লাগে না এমন নয়; কিন্তু তাদের কোনোক্রমেই ভালোবাসতে পারি না আমি। হয়ত বুদ্ধু বলে। নাম বদলে ওলালা হয়েও পারি না। ওয়ানস্ আ বুদ্ধু; ওলওয়েজ আ বুদ্ধু।

চান সেরে, ব্রেকফাস্ট করে গাড়িতে উঠলাম। কিলালা আমার স্যুটকেস টুপি, টুকিটাকি সব পিছনের সীটে সাজিয়ে রাখল। ওভারকোট আর ক্যামেরার থলে নিয়ে আমি সামনে বসেছিলাম।

স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে এসে কিলালা বলল, শুড উই মেক্ আ মুভ্ স্যার?

তারপর গাড়ি চলতে শুরু করার পরই কিলালাকে চটাবার জন্যে বললাম, চলো একবার মরু-কোপজে দেখে যাব ভুটুতে যাবার আগে। কত মাইলেরই বা ঘুর হবে আর!

কিলালা গাড়ি থামিয়ে দিয়ে, আমার দিকে ঘুরে বসল। ও আমাকে আজকাল সেৎসী মাছির মতই ভয় পেতে শুরু করেছে।

বলল, নো। নো, নো বানা। উই ডোন্ট গো দেয়ার।

বলল, ডোন্ট; আসলে বোঝালো ওন্ট।

যাত্রার প্রথম অংকে এবং প্রথম দৃশ্যেই ঝামেলা করা ঠিক নয়, বললাম, ওক্কে কিলালা। চলো, ভুটুতেই চলো।

আসলে, শুধু সেরেঙ্গেটি ভালো করে ঘুরে দেখতে গেলেই মাসখানেক লেগে যায়। তাছাড়া এক একটা ন্যাশনাল পার্কের প্রায় গায়ে গায়েই অন্য ন্যাশনাল পার্কের সীমানা। আরুশা থেকে আমি যদি মোশি যেতাম, তাহলে সেখান থেকে সাভো ন্যাশনাল পার্ক বেশ কাছে। তার অন্য প্রান্ত গিয়ে শেষ হয়েছে মোম্বাসাতে। একসময় 'ম্যান-ইটারস অফ সাভো' বইটির খুব নাম হয়েছিল। ঐ অঞ্চলে রেল লাইন পাতার কাজ বন্ধ হয়ে গেছিল সিংহদের অত্যাচারে। সাভো জায়গাটাই কুখ্যাত হয়ে গেছিল সকলের কাছে।

ডার-এস্-সালাম থেকে যখন প্লেনে কিলিম্যান্‌জারো এয়ারপোর্টে উড়ে আসছিলাম, তখন বাঁদিকে টারাঙ্গিরে ন্যাশনাল পার্ককে ফেলে গেছিলাম। আরুশাতেও একটি পার্ক আছে। তার নাম আরুশা ন্যাশনাল পার্ক। পার্ক আর গেম-রিসার্ভের ছড়াছড়ি

www.BanglaBook.org

তান্‌জানীয়াতে তা আগেই বলেছি। মিকুমি, সেলো, রুআহা, রুগোয়া, কিগোজা, কিটাভি, উয়াণ্ডা, মাসাই, আম্বোসেলি আর কত কি পার্ক। এই সব পার্কের একদিকে ভারত মহাসাগর আর মধ্যে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বড় ছোট নানা লেক। এক একটা বড় লেক তো সমুদ্রেরই মত। যেমন লেক ভিক্‌টোরিয়া, লেক ট্যাঙ্গানিকা, লেক নীয়াসা। ছোট লেকের মধ্যে আছে লেক মানীয়ারা, লেক ইয়াসী এবং সবচেয়ে ছোট্ট আশ্চর্য এক লেক... লেক লাগাজা।

আমরা আজ যাব এই লেক লাগাজারই পাশের ডুটু সাফারি ক্যাম্পে।

গাড়ি চলেছে তো চলেছেই—লোক নেই, জন নেই, গাছ নেই, গাড়ি নেই, শুধু চতুর্দিকে দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসবন। পাহাড় অবশ্য নেই, তা নয়। একটু পরই ডানদিকে পড়বে এক দীর্ঘ ও বেশ উঁচু পাহাড়শ্রেণী। অনেক দূরে। পাহাড়ও যেন একা একা এই বিশ্ব-টাঁড়ে লক্ষ লক্ষ বছর ঠায় দাঁড়িয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। ঐ সব পাহাড়শ্রেণী কত দূরে তা বলা শক্ত। আরও শক্ত, ঘাসবনের শেষে বলে। হেমিংওয়ে "গ্রীণ হিলস্ অফ আফ্রিকা" বলতে এই পাহাড়দের বোঝাননি! সেসব পাহাড় ট্রপিকাল জঙ্গলের। আমাদের দেশের পাহাড়ের মত। এই অঞ্চলের পাহাড়দের রঙ শীতকালে নীলচে দেখায়। কারো বা রঙ তেলাপোকার পেটের রঙের মতো কালো-বাদামী।

গাড়ি চলছে। কিলালা নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে। আমিও ভাবছি। জিম ক্যালান যদি কখনও তান্‌জানীয়ার ব্রিটিশ এ্যাম্বাসীতে চাকরি করতে আসে তবে কনটেম্‌প্লেশানের এত ভালো জায়গা পাবে যে, বোধহয় রিটায়ার করে এখানেই থেকে যেতে চাইবে।

পথের দু'পাশে থমসনস্ গ্যাজেল, গ্রাণ্টস্ গ্যাজেল, ওয়াইল্ড-বীস্টস্, ওয়ার্ট-হগ্‌স, জেব্রা, জিরাফ, শেয়াল; মাঝে মাঝে সিংহ, টোপী প্রায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চরে খাচ্ছে। আমি যদি রাজনৈতিক নেতা হতাম তবে উপরের ঢাকা খুলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে অথবা হাত তুলে এখানে মহড়া দিতাম। নেতা হওয়া অনেক কারণেই শক্ত। তার মধ্যে একটা কারণ এই-ই যে, কিছুই না ধরে চলমান গাড়িতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এখানে এসে অবধি কোথাওই ইম্পালা দেখলাম না। এই এন্টিলোপরা শুধু দেখতেই সুন্দর সোনালী তাই নয়, এদের লাফ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার ভঙ্গিটিও বড় সুন্দর। আমাদের দেশের চিতল হরিণ যখন দৌড়ে যায় জোরে, মনে হয় দৌড়চ্ছে না; উড়ে যাচ্ছে বুঝি। ইম্পালার লাফ দেখেই বোধহয় বিখ্যাত এ্যামেরিকান মোটর গাড়ি শেভ্রলের একটি বিশেষ মডেলের নাম রাখা হয়েছিল শেভ ইম্পালা। কিলালা বলল, টুডু সাফারি ক্যাম্পের। আশেপাশে দেখতে পাবেই ইম্পালা, যদিও...।

কিলালার বাক্‌রোধ হয়ে যেতেই তাকিয়ে দেখি পিছনের কাঁচের ফাঁক দিয়ে এক ব্যাটা পাজী সেৎসী ঢুকে পড়েছে।

আমার টুপিটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করে মেরে ফেললাম মাছিটাকে। এঞ্জিন বন্ধ করে মাছিটার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করতে করতে কিলালা সন্দেহের

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বরে বলল, মাছিটা ঢুকল কি করে পিছন দিয়ে? পিছনের সব কাঁচ তো আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম নিজে হাতেই।

আমি বললাম, হয়ত ঝাঁকুনিতে খুলেছে! তারপর আমাকে সন্দেহ করছে দেখে, রেগে গিয়ে বললাম, যা তোমার গাড়ি, স্টেপনীর টায়ার ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকে, গাড়ি চললে কাঁচ নেমে যায়! এর পরের বার আর তোমার কোম্পানীর গাড়িতে আসার মত ভুল করছি না।

এমনভাবে বললাম, যেন আমিও হেমিংওয়ের মত প্রতি বছরই এখানে সাফারিতে এসে থাকি। এবং আসব!

কিলালা তাদের কোম্পানীর এহেন ক্ষতি হতে পারে জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বরং বেশ আশ্বস্ত গলায় বলল, তাহলেই ভালো। আর যদি ভুলেও ঐ কোম্পানীর গাড়িতেই আসো আবারও, তবে আমি ভুল করেও আর সে গাড়ি চালাচ্ছি না। এবার মানে মানে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারলেই বাঁচোয়া।

ধূলিধূসরিত পথের ডানপাশে একটুকরো কাঠ পোঁতা আছে কোমর সমান। তার উপর একটা কাঠের তক্তা, পেরেক মারা। লেখা আছে TO NDUTU SAFARI CAMP.

কিলালা বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিল, হঠাৎ হুঁশ হওয়াতে ডানদিকে ঢুকে পড়ল।

এই পথে খুব কম গাড়িই যায়। ঘাসের উপর শুধু দুটি চাকার চাপে ঘাস মরে গিয়ে সমান্তরাল দুটি রেখা পড়েছে। সে রেখা চলে গেছে সোজা। ঘাস-মরা মাটির রঙ এখানে কালো। প্রধান সড়কের মাটির রঙ ছাই ছাই, স্লেট রঙা। এই অস্পষ্ট পথের দু'পাশে ছড়ানো-ছিটানো জানোয়ার। উটপাখি দৌড়ে বেড়াচ্ছে—ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। পাগুলো ভারী বিশ্রী দেখতে। বিধাতা এদের বড় বে-আব্রু করে গড়েছেন। অত লম্বা পা অনাবৃত—দেখলে অসভ্য অসভ্য লাগে। মেয়ে পাখিগুলো খয়েরী, পুরুষরা কালো। এপাশে-ওপাশে বড় বড় নানারকম স্যাণ্ড-গ্রাউজ চরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি ঘাড়ে পড়ার উপক্রম হলে তবে এদিক -ওদিক দৌড়ে যায়।

আধ-ঘণ্টাটাক যাওয়ার পর দূরে, সামনে একটু একটু ঝোপ ঝাড়, দু-একটি ইয়ালো-ফিভার এ্যাকাসিয়া, মিগুংগা চোখে পড়তে লাগল। তার মানে কাছাকাছিই কোথাও জল আছে। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে আশ্চর্য এক দৃশ্যে মুগ্ধ হলাম। সদ্য-বিধবার মত বিষণ্ণ, নীলচে ছাই-রঙা কোনো খনিজ পদার্থে ভরা একটি বিধুর হ্রদ। এখন জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কিছু জলজ পাখি, অল্প ক'টি ফ্লেমিংগো, হ্রদের জলে ওড়াওড়ি করছে। কিছু বসে আছে।

হঠাৎ কিলালা বলল, ইম্পালা।

ডাইনে তাকিয়ে দেখি, গাছ-গাছালির নীচে এক ঝাঁক ইম্পালা দাঁড়িয়ে আছে। রোদ পড়েছে এসে তাদের সোনালী গায়ে, সবুজ পটভূমিতে। কিলালা বারণ করার আগেই গাড়ি থেকে নেমে আমি ছবি তুললাম। আমাকে নামতে দেখেই ইম্পালাগুলো লাফাতে লাফাতে উধাও হয়ে গেল জঙ্গলের আড়ালে। এমন সময় দেখি একটি ছোট্ট হরিণ, আমাদের মাউস-

www.BanglaBook.org

ডিয়ারের চেয়ে একটু বড়; গায়ের রঙও প্রায় ওরকম, চুপটি করে, ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের ছায়ায়। বুঝলাম যে, এই-ই ডিক্-ডিক্। আফ্রিকার সবচেয়ে ছোট্ট হরিণ। আমি ভাগ্যবান বলতে হবে। ডিক্-ডিক্ সকলকে দেখা দেয় না। ছবি তুলতেই ডিক্-ডিক্ ছোট-ছোট পায়ে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। ইম্পালার ঝাঁক এবং ডিক্-ডিক্টাকে দেখে মনে হল ওরা যেন কী কারণে বিশেষ ভীত হয়ে রয়েছে। এমন সময় কাছ থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ করে সিংহ ডেকে উঠল। লেকের মধ্যে পাখিগুলোও চমকে উঠে ডেকে উঠল। আর কিলালা বাঁ হাতে দরজা খুলে আমাকে ডাকতে লাগল।

ওকে চটাবার জন্যে বললাম, "পোলে পোলে।" ও রোষকষায়িত নেত্রে বলল, নো পোলে পোলে বানা, দিস নো প্লেস্ ফর পোলে পোলে।

আমি ধীরেসুস্থে গাড়িতে উঠলাম,যাতে কিলালার উত্তেজনা আরও বাড়ে।

সিংহগুলোর ডাকেও কোনো মহিমা নেই; দড়াম্ করে ডাকে। বোম-ফাটার আওয়াজের মত আওয়াজ করে। বাঘের ডাকের আরোহণ অবরোহণই আলাদা। উদারা মুদারা তারার খেলা কতরকম! ভারতীয় মার্গ সংগীতের পটভূমি, এই হারেম-সঙ্গে-করে শিকার করা ঘি-খাওয়া কুকুরের মত সিংহরা কি করে জানবে? জানত হয়ত একদিন এদের পূর্বপুরুষরা। আফ্রিকার সিংহ জাতটার উপরই ধীরে ধীরে ঘেন্না ধরে গেল।

কিলালা এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। ডানদিকে মোড় নিয়ে আর একটু এগোতেই দেখি পথের বাঁ পাশের একটা মিগুংগা গাছের ডাল থেকে চিচিঙ্গার মত কি যেন একটা ঝুলে আছে। কিলালা দেখেনি। ওকে কাঁধে হাত দিয়ে থামতে বললাম। চিচিঙ্গা সবুজ-সাদা হয়, এ দেখি হলুদ-কালো। কি ব্যাপার? একটা প্রকাণ্ড লেপার্ডের লেজ—টান টান হয়ে ঝুলে রয়েছে উপর থেকে। ভালো করে চেয়ে দেখি একটা থমসনস্ গ্যাজেলকে মেরে দুটি ডালের মধ্যে লট্কে রেখে দুটি মোটা ডালের সংযোগস্থলকে বালিশ করে বাবু শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাতেই চার চোখের মিলন হল।

কিলালা আমার উরুতে খাম্চে ধরে বলল, গাড়ি থেকে নামলেই ডাল ছেড়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে তোমার। তোমার সাধের ঘাড়টি যাবে এবং আমার চাকরি।

চিতাবাঘের চোখের দৃষ্টি আমারও ভালো লাগল না। আমার চোখের দৃষ্টিও হয়ত ওর ভালো লাগেনি। সাধের ঘাড় ভিতরে করলাম। কিলালা ছবি তোলার সুযোগ না দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দিল।

আমি বললাম, একি করলে?

কিলালা বলল, লেক মানীয়ারাতে তুলো, ওখানকার সিংহ আর চিতারা গাছে বসে পোজ দিতে ভালোবাসে ফোটোগ্রাফারদের জন্যে। এরা ফোটোজিনিক তো নয়ই, তাছাড়া, ক্যামেরা-কনশাস্। এদের ছবি ভালো উঠবে না।

এবারে লেকটাকে ঘুরে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই খড়-ছাওয়া একসারি কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম। বুঝলাম যে, এই জন্যেই একে বলে সাফারি ক্যাম্প। আগে যখন

www.BanglaBook.org

এসব অঞ্চলে শিকারের পারমিট পাওয়া যেত তখন হয়ত শিকারীরা এই ক্যাম্পে থেকে শিকার করতেন।

পরিবেশটি ভালো লাগল। একেবারে সাদা-মাটা। আড়ম্বর কিছু নেই। দু-তিনটি ভোকস্‌ওয়াগন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পার্কিং লটে।

কিলালা আমার স্যুটকেস বয়ে নিয়ে খড়ে-ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের রিসেপশানে এল। দেখি, একটি ভারতীয় ছেলে হলুদ-গেঞ্জী পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকে কালোয় লেখা, আই লাভ টু লাভ। ছেলেটি ভারী স্মার্ট। পরে জেনেছিলাম যে, সে গুজরাটি মুসলমান। কখনও ভারতে যায়নি—ইয়োরোপে গেছে। এই ক্যাম্পটির মালিক, কফি প্লানটেনশানেরও মালিক। এক গুজরাটি ভদ্রলোক। তাঁরই চাকরি করে এই স্মার্ট ছেলেটি বিশ্ব-টাঁড়ে। দুপুরে কোনো বেয়ারা না-থাকায় সেই ম্যানেজার ছেলেটিই আমার স্যুটকেসটি বয়ে ঘরে নিয়ে এল।

এক সার ঘর। সামনে একফালি করে বারান্দা। দুপাশে দুটি ছোট খাট। মধ্যে একটি বেড-সাইড টেবল। বোতলে খাওয়ার জল, পাশে গ্লাস। লাগোয়া এক চিলতে বাথরুম। জেনারেটর চলছে—আলো ও জল গরমের জন্যে। রাত ন'টায় থেমে যাবে। তার আগে সকলে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়বেন অতিথিরা। সব ক'টা ঘর ভর্তি থাকলে হয়ত জনাকুড়ি লোক হবে। দুপাশে দুসারি ঘর, মধ্যে রিসেপশান লবী; ডাইনিংরুম এবং বার।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে বারান্দার চেয়ারে বসে সামনের নীচু দেওয়ালে পা তুলে দিয়ে ডাইরী লিখছিলাম। চা চেয়েছিলাম একটু। একজন বেয়ারা, নিগ্রো; চা নিয়ে এল। লোকটি বেঁটেখাটো—ময়লা উর্দি গায়ে। চোখে ঘষা কাঁচের চশমা। চশমার একদিকের হাতল ভাঙা। তাই সুতো দিয়ে বেঁধে রেখেছে কানের সঙ্গে। মুখে এমন এক প্রশান্তি ও সমর্পণ-তন্ময়তা যে তার দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। লোকটি বড় গরীব যে, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু বহিরঙ্গের দারিদ্র এ মানুষটিকে ছুঁতে পারেনি। তার অন্তরঙ্গ বৈভব তাকে এক অসামান্যতা দান করেছে। এর পক্ষে যীশুখৃষ্ট, নদের নিমাই, বা রামকৃষ্ণদেব হওয়া অসম্ভব ছিল না। যারা মন্দিরে ভগবানকে খুঁজতে যান, আমি তাঁদের দলে নই। ভগবানকে আমি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি প্রকৃতির মধ্যে, আমার সামনের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ; তাদের ভালোবাসা, দয়া, সহধর্মিতা এবং অনেক সময় উদাসীনতার মধ্যেও।

অনেকদিন পর আবার ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল। শেষ দেখা হয়েছিল ডার-এস্-সালাম এয়ারপোর্টের সেই অর্গানন কোম্পানীর ভদ্রলোকের পাদ্রী বাবার মধ্যে। ভগবানকে খুঁজলে, দেখার চোখ থাকলে, প্রায়ই হয়ত দেখা দেন তিনি।

ঘরগুলোর সামনে বেশ কিছুটা জায়গায় ঘাস আগুনে পুড়িয়ে ও কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারপরই ঘাসবন, জঙ্গল, মিগুংগা ও নানারকম গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড়। দুটি গাছের কাণ্ডে ছোট্ট সাইন বোর্ড টাঙানো আছে। "ডেঞ্জার! নো বডি পাস্ট দিস পয়েন্ট"। অর্থাৎ ঐ পরিষ্কার জায়গা ছেড়ে ঘাসে ঢুকলেই মৃত্যু যে কোথায় ওৎ পেতে

www.BanglaBook.org

থাকবে তা অজানা।

এই যে লেকটি, সাদা-নীল আর ছাই-নীলে আশ্চর্য বিষণ্ণতা মাখা, এর নাম লেক লাগাজা। লাগাজার মত আরেকটি লেক আছে। তার নাম মাগাডী। মাগাডী লেক কেনিয়াতে পড়ে। লাগাজার চেয়ে অনেক বড়। লাগাজা আর মাগাডী দুই-ই সোডা লেক । মাগাডী একটি সোয়াহিলী শব্দ—যার মানে সোডা।

লাগাজা হ্রদটি খুবই অগভীর। বর্ষাকালেও যখন জল সবচেয়ে গভীর, তখনই এর গভীরতা দু'মিটার মত। এখন তো প্রায় শুকিয়েই গেছে শীতে। স্বাভাবিক দোলা মত জায়গায় এই হ্রদটির সৃষ্টি। বর্ষাকালে মাটি-ধুয়ে-আসা নদী নালা এতে নানারকম ধাতব পদার্থ এনে ফেলে। মুখ্যতঃ ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম। এখন যেহেতু জল প্রায় শুকিয়ে গেছে, নুনের শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের আস্তরণে আলো পড়লে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন বরফ পড়ে রয়েছে।

এই সব সোডা-লেকের সোডা-ক্রীস্টাল, গুঁড়ো করা তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে স্থানীয় লোকেরা একরকমের নস্যি তৈরী করে। এক সময় পুরো পুব-আফ্রিকাতে এই নস্যি খুব জনপ্রিয় ছিল।

এই সোডা-লেকগুলো ফ্লেমিংগোদের খুব প্রিয় জায়গা। ওয়াইল্ড বীস্টরা যখন কাছাকাছি থাকে তখন এরা লেকের অল্প জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় এক ঘাসবন থেকে অন্য ঘাসবনে যেতে। এটাও বোধ হয় ওদের একটা খেলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি যখন ডাইরী লিখছি, একটা বাচ্চা দুষ্টু সাদা-চামড়ার ছেলে কখন যে আমার বারান্দাতে এসে হাজির হয়েছে টেরই পাইনি। শয়ে শয়ে স্টার্লিং সামনের পরিষ্কার করা জায়গাটাতে উড়ে বসে কিচির-মিচির করছিল। রোদ পড়ে ওদের উজ্জ্বল বহু-রঙা পালকগুলো ঝিক্‌মিক্ করে উঠছিল।

ছেলেটাকে হ্যালো বলতে যাব, এমন সময় লম্বা ছিপছিপে এক শ্বেতাঙ্গিনী অল্পবয়সী মহিলা এসে বিজাতীয় ভাষায় ছেলেটাকে কিসব বললেন। ভদ্রমহিলার উপরের ঠোঁটটা রক্তাক্ত। মনে হয়, কেউ কামড়ে দিয়েছে। তাঁর স্বামী নিশ্চয়ই কামড়াননি। এরকম কামড়া-কামড়ি পরকীয়া প্রেমে হয়, বিবাহিত প্রেমে চুরি করে চাঁচি-পুঁচি করে খাওয়ার রেওয়াজ নেই। বলা যায় না, কোনো পিরীত-পিয়াসী বেবুনও ঝোপঝাড়ে থাকতে পারে।

বাচ্চাটাকে হ্যালো বলা আর হল না। বদলে, তার মাকেই বললাম। ভদ্রমহিলা ইংরিজী জানেন। যদিও ইংরেজ নন। একদিন যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যেত না, তারাই বোধহয় এখন সবচেয়ে গরীব হয়ে গেছে। ইংরেজদের কোথাওই প্রায় দেখা যায় না। সব দেশেই এ্যামেরিকান, জাপানীজ, অস্ট্রেলিয়ান ও কন্টিনেণ্টের ট্যুরিস্টদেরই ভীড় বেশী। ইদানীং তেল-দেওয়া দেশের লোকদেরও দেখা যায়। সবাই-ই তাদের তেল দিতে ব্যস্ত।

যাই-ই হোক, ভদ্রমহিলা কোন্ দেশী বুঝতে না পারলেও বললাম, বসবেন না? বলেই ঘর থেকে আরেকটা চেয়ার বার করে আনলাম।

ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমাকাশে হারিয়ে যাওয়ার আগে নানা রঙে আকাশ ভরেছেন! এ্যাকাসিয়া গাছগুলোর আড়ালে আড়ালে সেই সূর্যাস্ত, আফ্রিকার পটভূমিতে তোলা অনেকানেক ছবির কথা মনে করিয়ে দিল। এই সব ছবি বহু পরিচিত আমার। পণ্ডোরা, হাণ্টার, হেমিংওয়ে এবং রুয়ার্কের নানা লেখায় এর বর্ণনা পড়েছি। ফিল্মে দেখা ছাড়াও।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ক্যামেরা এনে পটাপট্ বিভিন্ন এক্সপোজার দিয়ে সেই আশ্চর্য সূর্যাস্তের অনেকগুলো ছবি তুললাম। যাতে অন্ততঃ একটা ওঠেই।

ভদ্রমহিলা দেখলাম নিজের ঠোঁটের রক্তাক্ততা সম্বন্ধে সচেতন। পাছে আমি যা প্রথম দর্শনেই ভেবেছি, তেমন কিছু ভেবে বসি; তাই তিনি তড়িৎঘড়িৎ বললেন, এখানে খুবই ঠাণ্ডা। আমার ঠোঁটটার কি অবস্থা দেখছ না?

আমার দুঃখ হল। অমন ঠোঁটের এমন হাল ঠাণ্ডার বিকল্পে অনেক রমণীয় কোনো উষ্ণ ঠোঁটের দ্বারাও তো হতে পারত! কিন্তু সংসারে প্রায়শঃই, যা হবার তা হয় না। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল শীতে সিঁটিয়ে আছেন। শারীরিক শীতে। আক্ষরিক অর্থে।

www.BanglaBook.org

সেশেলস্ থেকে আসার সময় প্লেনে কেনা দুবোতল স্কচ হুইস্কী ছিল আমার সঙ্গে। আমি বললাম, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

ভদ্রমহিলা বললেন, আই উড নট্ মাইণ্ড।

মেয়েরা বেশীরভাগ সময়েই আণ্ডার স্টেটমেণ্ট করে। যখন মন বলে, আই উড লাভ ইট অথবা আই এ্যাম ডাইং ফর ইট; তখন ওদের মুখ বলে : আই উড নট্ মাইণ্ড।

ঘরে গিয়ে বড় করে একটা নীট হুইস্কী ঢেলে এনে দিলাম ওঁকে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শীতার্ত মহিলাকে সবসময় উষ্ণতা দেবে, পিপাসার্তকে জল দেবে। অতএব।

উনি বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না।

পাছে খেলব না, বলে বসেন, তাই আমাকেও সঙ্গ দিতে হল। তবে ঠাণ্ডাটা বেশ বেশীই। সেরোনারার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। কাছেই লেক আছে এবং গাছ-গাছালি আছে বলেই বোধহয়।

সূর্য ডোবার আগে স্কটল্যাণ্ডের জল খেতে বারণ আছে সায়েবদের শাস্ত্রে। সেই বারণ ভাঙ্গা হল।

ডাইনিংরুমের সামনে সোজা কিছুটা জায়গা একটা পথের মত করা আছে। সেটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আগুন জ্বালাচ্ছিল একজন বেয়ারা। দেখতে দেখতে চার-পাঁচটি যুবক যুবতী এসে সেই আগুনের পাশে জড়ো হল। বীয়ার এনে সাজিয়ে দিল বারম্যান।

আমার সঙ্গী মহিলা বললেন, ওরা আমাদের সঙ্গেই এসেছে। আমরা হল্যাণ্ডের লোক। আমার স্বামী জিওগ্রাফীর প্রফেসর, ডক্টরেট। আর ঐ ছেলে-মেয়েরা স্কুল-টিচার। সকলের বিষয়ই জিওগ্রাফী।

তারপর বললেন, চলো না ওখানে। সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

অগত্যা সদ্য-খোলা বোতলটাকে সম্বল করে ওখানে গিয়ে বসলাম। সকলের সঙ্গে আলাপ হল।

আমি ভূগোলের বিশেষ কিছু জানি না, এক ভূ যে, গোল তা ছাড়া। তবে নানারকমের মাটির মধ্যে পোরাস্ এবং নন-পোরাস্ মাটি হয় জানি। দেখলাম ভূগোলের ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই পোরাস্। আধঘণ্টার মধ্যে আমার সাধের এবং সযত্নে রক্ষিত হুইস্কী বোতলটি শেষ করে দিল ওরা।

অন্ধকার হয়ে যাবার বেশ খানিকক্ষণ পর সেই প্রফেসর, আমার সঙ্গিনীর স্বামী এলেন। তিনি এতক্ষণ অন্ধকার বনে-বাদাড়ে কোন্ বাদুড় পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনিই জানেন।

পরদিন সকালে আবিষ্কার করলাম, এতরকম ক্যামেরা ও গ্যাজেটস নিয়ে এঁরা এসেছেন যে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির এক্সপ্লোরারও লজ্জা পাবেন এঁদের দেখলে। এই কারণেই বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা ঝগড়া। একটু সময়ও এরা একা থাকে না; নিজের নিজের চোখের এবং কানের ক্যামেরা এবং সাউণ্ড ট্র্যাককে ব্যবহার করে না। এদের সমস্ত অস্তিত্ব যন্ত্রনির্ভর হয়ে গেছে। নিজেদের চোখ কান যেন এরা হারিয়ে ফেলেছে। বিধাতার দেওয়া

www.BanglaBook.org

সেই সব সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য যন্ত্রপাতির আসনে এরা ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডারকে সসম্মানে বসতে দিয়েছে। বনবে না! এদের সঙ্গে বনবে না আমার।

ওরা পরদিন ব্রেকফাস্টের পর যখন সদলবলে গাড়ির ছাদের স্লাইডিং ডোর খুলে, ক্যামেরা-ট্যামেরা ঠিকঠাক করে তিনখানা গাড়িতে ছবি তুলতে ও সার্ভে করতে বেরিয়ে গেল তখন আমিও চারদিক ভালো করে দেখে কিলালা কোথাওই নেই যে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম।

গুজরাটি-মুসলমান সেই হ্যাণ্ডসাম স্মার্ট ছেলেটি আমাকে ধরল। বলল, কোথায় চললেন?

আমি বললাম, সোডা লেকটা ভালো করে দেখে আসি।

একটু সোডা-ক্রীস্টালও নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। আমার স্কুলের সংস্কৃতর পণ্ডিতমশাই এখনও বেঁচে আছেন—তাঁকে নস্যি বানিয়ে দেব একটু। যদিও এককালীন বকা এবং খারাপ ছাত্রর এহেন অসময়ের গুরুভক্তি তাঁকে বিচলিত করবে সন্দেহ নেই।

ছেলেটি বলল, এখানে পায়ে হেঁটে কোথাও যাওয়া খুব বিপজ্জনক। গেলে, কিন্তু নিজের দায়িত্বেই যাবেন। কিছু হলে আমাকে দোষ দেবেন না। আপনাকে জেনে-শুনেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে জানাজানি হলে আমার চাকরি যেতে পারে।

আমি বললাম, যদি কিছু হয়ই তবে এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। হয় আস্তই ফিরব লাঞ্চের আগে, নয়ত একেবারেই ফিরব না।

ছেলেটির আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না মনস্থ করে বলল, বেশী দূরে যাবেন না। এখানে সবরকম হিংস্র জানোয়ার আছে। বুনো কুকুরও আছে। খুব সাবধানে যাবেন।

ওকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে যেতেও ও বলল, ক'টার মধ্যে ফিরবেন বলে যান।

বললাম, বললামই তো, লাঞ্চের আগে। ক্ষিদে পেলেই ফিরে আসব!

একটা বাঁক নিতেই আমার পুরোনো-আমির মালিক আবার আমি একা হয়ে গেলাম। এখানে আসা অবধি এমন আনন্দ আর পাইনি। বনে-জঙ্গলে একা একা না ঘুরে বেড়াতে পারলে আসা-না-আসা সমান।

কত পাখি চারদিকে। একদল ইম্পালাকে দেখলাম দূরে; আমাকে দেখতে পায়নি। বোধহয় কালকের দলটাই হবে। আমাদের দেশে চিতল হরিণের দল যেমন আমলকী বনে আমলকী কুড়িয়ে খায়, কোটরা হরিণ যেমন শিমুল ফুল খেতে আসে গরমের দিনে শিমুল গাছতলায়, তেমনই এরা একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে কি যেন কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

গাছটার নাম জানি না আমি। আমি ভৌগোলিক নই, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী নই; আমি একজন লেখক। সব জানা ছাড়িয়েও যে জানা অজানাই থাকে, যে অজানাকে কোনো সীমা, কোনো জ্ঞান দিয়ে কেউ বাঁধতে পারেনি; যে-অজানা এক সুরে বাঁধা থাকে কল্পনা আর কৌতূহলের দিগন্তে, আমি সেই অজানাকে জানতে চাইনি কখনও। সব সময়ই বলি, কখনও যেন সর্বজ্ঞ না হই। যা-কিছু দেখি, যা-কিছু শুনি, যা-কিছু অনুভব করি; সব কিছুরই মানে যেন কখনও প্রাঞ্জল না হয় আমার কাছে। আমি আমার মতই থাকতে চাই। আমার অনভিজ্ঞতা, আমার

www.BanglaBook.org

হৃদয়ের, অনুভবের প্রাকৃত ভাবকে আমি নব্য আধুনিকতাতে কখনও ঢাকতে চাই না। নাই-ই বা জানলাম কিছু কিছু। তাতে কী-ই বা আসে যায়? যদি, যা জানলাম, যা দেখলাম, যা শুনলাম তাতেই হৃদয় ভরে কানায় কানায়। এক জীবনে কতটুকুই বা জানা যায়? অনেকই বাকি থাকে। সব সময়েই সেই বাকি থাকার মানে শূন্যতা নয়।

কাল এখান থেকে যাবো ওলডুভাই গর্জে—যেখানে প্রথম মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছিল। একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রাহক প্রজাপতি খুঁজতে খুঁজতে এই ওলডুভাই গর্জে হঠাৎ এসে পৌঁছোন। তিনিই, বলতে গেলে, আবিষ্কার করেন ওলডুভাই। তারপর জার্মান প্রফেসর লিকী, সস্ত্রীক এখানে আসেন। অক্লান্ত গবেষণা এবং খোঁড়াখুঁড়ির পর এর রহস্য উন্মোচন করেন তাঁরা।

এখান থেকে ফেরার পথে গোরোংগোরোকে ডান পাশে ফেলে রেখে, লেক মানীয়ারাতে যাব। দু'দিন থাকার কথা সেখানে। প্রাগৈতিহাসিক সব বাওবাব গাছ দেখব। মাটিতে দাঁত লুটিয়ে চলে বেড়ানো পাহাড়-প্রমাণ হাতিদের দেখব।

নাঃ। ভয়ের কিছুই নেই। ডালা নদীর বুক ধরে হাতিদের রাজত্বে একা একা হেঁটে বেড়াব লেক মানীয়ারার পাশে। ভয়ের কিছু নেই, কারণ এ পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত শ্বাপদ; মানুষ নিজে। পৃথিবীর হিংস্রতম জানোয়ারও লজ্জায় মুখ লুকোয় মানুষের হিংস্রতার কাছে।

তারপর মোশি হয়ে, কিবো হয়ে, মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোতে যাবো।

আমি জানি যে, অনেক কিছুই দেখব, কিন্তু তবু কখনই সব দেখা হবে না। আর যা দেখা হবে না, তার আকর্ষণ যা দেখা হয়েছে; তার চেয়ে অনেক বড় হয়েই থাকবে। ইয়ারো আনভিজিটেড, ইয়ারোর ভিজিটেডের সমকক্ষ কখনই হতে পারে না; পারেনি কখনও।

তাই-ই আমি দেখি, আবারও দেখিও না। দেখলে দেখি; না-দেখতে পেলে দুঃখিত হই না। যা পাই, তাতেই খুশী থাকি, যা পাই না, তার দুঃখে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসি না কখনও।

ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিকে ঘুরে লেক লাগাজার সাদা, নীল, ছাই-নীল আশ্চর্য উজ্জ্বল শরীরের কাছে চলে এলাম। একটি ফ্লেমিংগো পরিবার সকালের রোদে, নিজেদের মধ্যে পারিবারিক কথা বলছে, চাপা স্বরেই। একদল মোষ লেকের জলে হুড়োহুড়ি করে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

লেকের জলের কাছে দাঁড়িয়ে আমার সাফারি-স্যুটের পকেট ভরে সোডা ক্রীস্টালস্‌ ভরতে লাগলাম। পকেট যখন ভর্তি হয়ে গেছে, নীচু—হওয়া অবস্থা থেকে যখন মুখ তুলেছি, ঠিক তখনই দেখি আমার কাছ থেকে প্রায় হাত পনেরো দূরের ঝোপের আড়াল থেকে কালো-কেশরে ঘাড়-ঢাকা একটা প্রকাণ্ড সিংহর মাথা এবং দুটি চোখ আমার মুখে চেয়ে আছে।

আমি মনে মনে বললাম, হ্যালো।

সিংহ উত্তর দিল না। ম্যানারস্‌ জানে না ব্যাটা। ভালো স্কুলে পড়েনি বোধহয়। কিন্তু সে কারণে তাকে আমার খারাপ লাগল না, কারণ আমিও ভালো স্কুলে পড়িনি। যে কারণে

www.BanglaBook.org

খারাপ লাগলো, তা হচ্ছে যে, তার চোখে কোনো বুদ্ধি নেই। নির্বীর্য হতাশ, এক্সপ্রেসানলেস ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন মানুষের দৃষ্টির মত দৃষ্টি, সিংহটার।

ভাবলাম হয়ত ও ইংরিজী মিডিয়াম স্কুলে পড়েনি, সোয়াহিলী মিডিয়ামে পড়েছে। তাই আমি আবার বললাম, জাম্বো! সিম্বা! বলেই, হাত তুলে সম্ভাষণ জানালাম। এবার মনে মনে নয়, সত্যি সত্যিই।

সিংহটা গরর্‌র্‌র্ করে উঠল। ওর পাশে তিনটি সিংহী এসে দাঁড়াল।

সিংহটা আবার গরর্‌র্‌র্ করে আওয়াজ করল। ন্যাড়া, বিশ্রী লেজটার ডগার কালো চুল দিয়ে ধুলো ঝাড়ল এ-পাশের ও-পাশের।

অমাকে বসতে বলছে নাকি কে জানে?

আমি বললাম, বাড়ি যা। আমার এখন তোর সঙ্গে ফাক্‌সা আলাপের সময় নেই।

সিংহটা আবার বলল, গরর্‌র্।

সিংহদের শব্দকোষে একটাই কথা আছে মনে হল।

হঠাৎ মানুষের গলার স্বরে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, কাল রাতের ডাচ ছেলেমেয়েরা একটা ঝাঁকড়া ইয়ালো-ফিভার এ্যাকাসিয়া গাছের পিছনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ির ছাদ থেকে মুভি ক্যামেরাতে ছবি তুলছে। সিংহদের এবং যে এখুনি সিংহদের আলু-চাট হতে চলেছে, তার।

ওরা চেঁচিয়ে বলল, তুমি দৌড়ে পালিয়ে এসো আমাদের গাড়ির দিকে, নইলে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

আমি বিশুদ্ধ ভারতীয় গাম্ভীর্য এবং ঔদাসীনতার গলায় বললাম, তোমরা ছবি তোলো, আমার জন্যে তোমাদের মত বালখিল্যদের একেবারেই ভাবতে হবে না।

যদি সিংহদের মতলব সত্যি খারাপ হয়, তবুও ওদের কথামত দৌড়নো আত্মহত্যার সামিল হবে।

এবার আমি বিশুদ্ধ বাংলায় খুব ধমক দিয়ে বড় সিংহটাকে বললাম, কান ছিঁড়ে দেব একটানে। বৌয়ের রোজগারে বসে বসে খাস্। লজ্জা করে না হতভাগা! বেরো, বেরিয়ে যা; এক্ষুনি বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। এক মিনিট দাঁড়ালেও খুব মুশকিল হয়ে যাবে। আমি বাঘের দেশের মানুষ। তোরা আমাকে ভয় দেখাস না।

ভাগ্য এ পর্যন্ত সবসময়ই সহায় আমার। নইলে, সেদিন শুধু যে সেই পোরাস্ ভৌগোলিক ডাচদের কাছেই ইজ্জৎ যেত, তাই-ই নয়, চিরদিনের জন্যে সোডা-ক্রীস্টালের সঙ্গে রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে হত আফ্রিকার এক নির্জন, নির্জল হ্রদে। কোনো হিঁদুর পক্ষেই এমন নির্জলা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নয়।

বড় সিংহটা হঠাৎ লজ্জায় অধোবদন হল। সঙ্গিনীদের দিকে ফিরে কি যেন বলল। তারপরই ডাকতে ডাকতে যেদিকে ফোটোগ্রাফাররা ছিল তার বিপরীত দিকে চলে গেল।

সিংহরা চোখের আড়াল হতেই সবকটা ডাচ-গোয়ালা আর গোয়ালিনী অসম-সাহসী হয়ে দৌড়ে এল গাড়ি থেকে নেমে, পড়ি-কি-মরি করে। সকলেই আমার সঙ্গে আলাদা

www.BanglaBook.org

আলাদা ছবি তুলতে চাইল।

সেই রক্তাক্ত ঠোঁটের মেয়েটি বলল, তুমি কি সিংহদের ভাষা জানো? তাহলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফীক সোসাইটীর জার্নালে একটা আর্টিকেল লেখো না এর উপর?

তারপর বলল, আমার সঙ্গে ছবি তোলো একটা।

আমি বললাম, ভেবে দেখব। সময় পেলে লিখব।

কিন্তু ঠিক করলাম যে, ওর সঙ্গে ছবি তুলব না। ছবি তুললে আমাকে নিশ্চয় ওরা ছবি পাঠাবে। এবং ওদের সব রঙীন ফিল্ম। দেশে ফিরে ঐ রক্তাক্ত ঠোঁটের একস্‌প্ল্যানেশান দিতে প্রাণান্ত হবে সকলের কাছে।

এসব যখন ভাবছি, ঠিক সেই সময় দেখি আর একটা গাড়ি এসে পৌঁছল। কিলালা! কোথায় ছিল, কি করে জানল; আমি চলে এসেছি ওই-ই জানে! কিলালা কিন্তু গাড়ি থেকে নামল না। মাথার স্লাইডিং ডোর খুলে, দূরে আঙুল দেখিয়ে দুহাতের পাতা জড়ো করে কি যেন বলল। খুব চেঁচিয়ে।

দেখলাম, সিংহরা সদলবলে এদিকেই আবার ফিরে আসছে। অপমানটা হজম করা ঠিক হয়নি এমন কোনো সিদ্ধান্তে এসে থাকবে হয়ত ওরা। ওদের ফিরে আসার ধরন দেখে মনে হল বে-পাড়ায় ওস্তাদী করতে আসা মস্তানকে ঠাণ্ডা করবে বলেই আসছে।

সিংহদের দেখেই পড়ি-কি-মরি করে ডাচরা দৌড়ে গেল ওদের গাড়ির দিকে।

যতটুকু জোরে গেলে সময়মত গাড়িতে উঠতে পারি এবং যতখানি আস্তে গেলে একটু আগের হঠাৎ-অর্জিত সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরকম জোরে ও আস্তে এবং কেয়ার-ফ্রি ভাবে কিলালার গাড়ির দিকে এগোলাম। গাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছি তখন চোখের কোণায় দেখলাম বড় সিংহটা আমাকে লক্ষ্য করে দুলকি-চালে দৌড়তে শুরু করেছে। কিলালা চিৎকার করে উঠল।

জীবনের চেয়েও সম্মান বড়। হঠাৎ এক মোচড়ে পিছন ফিরেই খুব জোরে ধমকে উঠলাম তাকে। বললাম, বড় বাড় বেড়েছে তোর, ঘিয়ে-ভাজা জানোয়ার! পালা! এক্ষুনি পালা। নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে।

সেরেঙ্গেটির এই সিংহরাজ তার বাবার জন্মেও হয়ত এরকম ব্যবহার কখনও পায়নি। কোনো নিরস্ত্র দুপেয়ে জানোয়ার যে তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে, তা তার ধারণারও অতীত ছিল। আমার দশহাতের মধ্যে এসে পড়েও সে ধমক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর দাঁড়িয়ে পড়া মাত্রই আমি বুঝতে পারলাম যে ওষুধে কাজ হয়েছে। এখন শুধু ডোজটা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ওরা যেমন দড়াম্‌ করে বোমা ফাটার মত ডাকে, আমিও তেমন বোমার মতই ফেটে পড়লাম ওর চোখে চোখ রেখে, ওর দিকে আঙুল তুলে। বললাম, ভাগ্‌। ভেগে পড়্‌।

পশুরাজ অমনি ককার-স্প্যানিয়েল কুকুরের মত সুড়সুড় করে পিছন ফিরে লেজ গুটিয়ে চলে গেল।

যদিও পুলকিত, বিস্মিত; তবুও কিলালা গাড়ি থেকে মোটেই নামল না। কিন্তু আমি

www.BanglaBook.org

গাড়িতে গিয়ে উঠতেই আমরা কোলে ওর মাথা আর দুহাত জড়ো করে বলল, বানা টিলো, টিলো বানা। তুমি ভগবান। তুমি মানুষ নও। উন্‌কুলুঙ্কুলু!

ডাচরা তো ছবিতেই সব ব্যাপারটা তুলে রাখল। মুভি ক্যামেরা কির্‌কির্ করে চলছিল। স্টীলও।

কিলালা গাড়ি ঘোরাল ক্যাম্পের দিকে। ওরাও ঘোরাল। ক্যাম্পে ফিরতেই রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। হিরো বনে গেলাম। কিন্তু সিংহটাকে দৌড়তে দেখে বুকের রক্ত জল হয়ে গেছিল।

আমাদের দেশে বন-পাহাড়ের লোকমাত্রই জানেন যে, বাঘ যদি মানুষখেকো না হয় যদি স্বাভাবিক অবস্থার সাধারণ বাঘ হয়, এবং নিছক কৌতূহলের বশেই মানুষকে দেখে, তবে তার চোখে চোখ রেখে ধমক দিলে বাঘও অমনি করে। সিংহদের বেলাও যে সে নিয়ম খাটে, জেনে ভালো লাগল।

যদি কোনো পাঠকের এই প্রেসক্রিপশানে কোনোরকম সন্দেহ থাকে, তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে বলতে পারি। বেঁচে ফিরে এলে আমাকে তেল-কই অথবা চিতলের পেটি খাওয়াবেন।

আর না ফিরে এলে... প্রেসক্রিপশান পাল্টে দেব।

আমরা সকলে লাঞ্চে বসেছিলাম। লেক অবধি আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে যে অতখানি সময় লেগেছিল তা বুঝতেই পারিনি। বনের পথে আত্মমগ্ন হয়ে হাঁটলে সময় কি করে যে চলে যায় তা বোঝাই যায় না।

কিলালা পাশের টেবলে বসে খাচ্ছিল। ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই ও হাসল। রীতিমত এ্যাডমিরেশানের হাসি। ওর সংস্কারাবদ্ধ মন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, আমি দৈবশক্তির অধিকারী। অথচ আশ্চর্য! ও মাসাইদেরই জ্ঞাতি। যে লাল পোশাক-পরা মাসাইদের দূর থেকে দেখে সিংহ অন্য পথে হাঁটা লাগায় অনেক সময়ই।

কী মানুষ, কী পশু, সকলেই অথরিটিকে ভয় পায়, এবং মানে। আমাদের সকলের মধ্যেই মাথা নীচু করার, চোখ-রাঙানী মেনে নেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। যদিও সেটা লজ্জাকর। এই বাবদে মানুষ, পশুর সঙ্গে একাসনে বসে এসেছে চিরকাল। সৃষ্টির গোড়া থেকে। ব্যতিক্রমই হয়ত থাকে।

কিন্তু ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মকে প্রমাণিত করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়লাম আবার। আমি আর কিলালা। অনেকখানি পথ যেতে হবে আজ। ওলডুভাই গর্জ দেখে, গোরোংগোরো ক্র্যাটার লজ-এ লাঞ্চ করে লেক মানীয়ারাতে পৌঁছব। লেক মানীয়ারার অতি মনোরম এ্যামেরিকান-মনোলোভী প্রাসাদোপম লজ-এ থাকব।

সেইখানেই আমার আপত্তি। এই জাতের গুণ হয়ত অনেক আছে কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে সাধারণ পয়সাওয়ালা এ্যামেরিকান বড় আরাম ও বিলাসে বিশ্বাসী করে তুলেছে। এদের এই কুঅভ্যাসের প্রভাব সর্বত্র পড়েছে। একসময় হিন্দুদের এঁটো-কাঁটার বিচার, জল-চল-এর বিচার নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে ন্যায্যতঃ, কিন্তু একজন সাধারণ নব্য-এ্যামেরিকান তার আরাম ও খাদ্য পানীয় সম্বন্ধে এত খুঁতখুঁতে যে, প্রাচীন হিন্দু-বিধবারাও বোধহয় এতখানি ছিলেন না। এই আরামপ্রিয়তা ও বিলাসপ্রিয়তাই একদিন এই জাতের কাল হবে যে, সে বিষয়ে অনেকেরই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গাড়ি চলেছে। পিছনে কালচে—ছাই ধুলো উড়ছে। ডানদিকে পথের প্রায় সমান্তরাল এক নীলচে পাহাড়শ্রেণী—অনেক দূরে। নীয়ারাবোরো ও ম্যাপটা খুলে দেখতে হবে।

কিলালা কথা বলছে না। এখন আমার সঙ্গে ওর একটা নীরব, গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন হয়। এই সখ্যতা বনে-জঙ্গলে যতটা গাঢ় ও সমঝোতার হয়; শহরে বোধহয় কখনই তো হয় না।

পুব-আফ্রিকার বন-জঙ্গলের ডাইরী লিখছি এসে অবধি। যতদিন এখানে থাকি, লিখবও। কিন্তু ডাইরীর সব পাতাই অন্যের জন্যে নয়। ডাইরী যে বড়ই ব্যক্তিগত; দশজনের চোখের সামনে তাকে আনলে, যে তা লেখে এবং যাদের কথা সে লেখে। তাদের সকলকেই অপমানিত এবং বে-আব্রু করা হয়।

অনেক কথা, যার তাৎপর্য খুব গভীর, যে লেখে তার কাছে; প্রায়শঃই মূল্যহীন হয় অন্যের কাছে। অনেক কথাই বলা যায় না অন্যকে, যা ডাইরীতে লেখা যায় এবং অনেক কথাই মনের মধ্যে গভীর হয়ে থাকে; যার শুধু আভাসমাত্রই থাকে ডাইরীতে। যে লেখে সে অবসরে, নির্জনে, তার স্মৃতির ময়ূরের পাখনা মেলে একা একাই তার অলেখা লেখাকে মেঘলা দুপুরে দেখে।

পথটা চলে গেছে সোজা। এখনও সেৎসী মাছির উৎপাত আছে। গোরোংগোরোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে, ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ওরা আর বিরক্ত করবে না।

পথটা একটা মোড় নিল। বাঁদিকে। উঁচুতে উঠছি। ওলডুভাই-এর দিকে যাচ্ছি আমরা। চারজন মাসাই পথের পাশে দাঁড়িয়ে বর্শা হাতে, বর্শার উপর অদ্ভুত কায়দায় এক পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে থুথু ফেলল। তিন হাত ছিটকে পড়ল দূরে সেই থুথু। ঘেন্নায় ফেলেনি ওরা। ওরা ওরকমই।

আমি জানি, ওলডুভাই-এর মিউজিয়ামে কি দেখব। মিউজিয়ামে যা যা দেখা যায়। বুঝি না-বুঝি, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাক আর নাই-ই থাক, ক্যামেরা হাতে সংস্কারাবদ্ধ ট্যুওরিস্টদের সর্ব দর্শনীয় জায়গায় আসতেই হয়, না এলে, লোকে

www.BanglaBook.org

খারাপ বলে; যেমন সংস্কারাবদ্ধ তীর্থযাত্রিণীর গুণ্ডাসদৃশ পাণ্ডার হাত ধরে অলিগলির সমস্ত মন্দিরের অন্ধকারে ভগবানকে খুঁজতেই হয়। ভগবান সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা থাকুক আর নাই-ই থাকুক। সংস্কার একটা জানোয়ার। মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট চোখ-বাঁধা জানোয়ারের মত ঘুরিয়ে মারে!

সামনেই বাঁদিকে ওলডুভাই গর্জের রাস্তা চলে গেছে। কিলালা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। এবার মোড় নেবে।

আমি বললাম, না।

কিলালা অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, গাড়ি ঘোরাও। চলো, আমরা ঐ যে ঝাঁকড়া এ্যাকাসিয়া গাছটা আছে ওর নীচে কিছুক্ষণ বসি। ওখান থেকে সেরেঙ্গেটির পুরোটা দেখা যাবে।

কিলালা বলল, ওলডুভাই-এর এত কাছে এসেও যাবে না? ফিরে গিয়ে লোককে বলতে পারবে? যে দেখোনি?

আমি বললাম, ঘোরাও।

কিলালা কিছু বলল না।

এ্যাকাসিয়া গাছটার নীচে গাড়ি থেকে নামলাম। কিলালা কাঁচ বন্ধ করে গাড়িতে বসেই একটা সিগারেট ধরাল।

ও নামবে না, জানতাম।

গাড়ির পাশে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যে পথ, যে প্রান্তর, যে বন, যে মনকে ফেলে এলাম পিছনে, সেদিকে তাকালাম। ধু-ধু করছিল হলুদ সোনালী সেরেঙ্গেটি—যতদূর চোখ যায়, যতদূর কল্পনা যায়, যতদূর মন যায়, ততদূর।

পাইপটা ভরছিলাম, পাউচ থেকে তামাক বের করে। আমার মাথায় মুখে রোদ এসে পড়েছিল। মনটা হঠাৎ ভারী খারাপ লাগল। আনন্দ ও দুঃখর এক আশ্চর্য মিশ্র অনুভূতি।

হঠাৎ কিলালা দরজা খুলে নেমে এল। টুপিটা এগিয়ে দিল আমাকে। তারপর ওর দেশলাই দিয়ে পাইপটা ধরিয়ে দিল।

ওর মুখে মুখ তুলে বললাম, আশান্টে!

কিলালার কুচকুচে কালো ভোঁতা মুখের মধ্যে দুটি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জলজ্বল করে উঠল। তারপরই চোয়াল-জোড়া হাসি ছড়িয়ে গেল কিলালার মুখে, প্রীতিতে, সমঝোতাতে; সখ্যতাতে ভরপুর।

আমিও হাসলাম।

তারপরই অনুভব করলাম যে, আমার আর কিলালার হাসি হাওয়ায় বয়ে গড়িয়ে গেল মাইলের পর মাইল ঘাসবনে—সেই হাসিতে হেসে উঠল আদিগন্ত আকাশ, প্রাণবাহী বাতাস, ঘন ঘাস, নরম ঘাস-ফুল, মিষ্টিগন্ধের মুঠি-ভরা শরীরের নরম ঘাস-ইঁদুর। পৃথিবীর ছোট ছোট প্রাণ, ছোট ছোট প্রাণী, ছোট ছোট সুখ, আশা; সব। যা নিয়ে আমি ও কিলালা এবং অন্য সকলে বাঁচি, যাদের নিয়ে বাঁচি; তারা প্রত্যেকে; যারা নীরব এবং বাঙ্ময়।

দূর থেকে যেন হাওয়ায় বয়ে ভেসে এল দুটি অস্ফুট কথা : হাবারি সানা?

উত্তরে অস্ফুট উত্তর ভাসিয়ে দিলাম আমি, সেই সকালের খোলা হাওয়ায়—নুজুরি সানা।

ভালো আছি; ভালো আছি, ভালো আছি।

---

www.BanglaBook.org

ইলমোরাণ্‌দের দেশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাবৎ পৃথিবীতে যত আদিবাসী উপজাতি আছে তাদের মধ্যে চেহারায়, জীবনযাত্রায়, শৌর্যে-বীর্যে, মাসাইরাই বোধহয় সবচেয়ে বেশী বিস্ময়কর। এদের সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার ঔৎসুক্য আছে গভীর, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানার সুযোগ আদৌ হয়ে ওঠেনি তাঁদের।

নাইরোবি, আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, কেনিয়ার রাজধানী। "নাইরোবি" একটি মাসাই শব্দ। শব্দটির মানে হচ্ছে "খুব ঠাণ্ডা"।

পুব আফ্রিকার কেনিয়া ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশ। এখনও ব্রিটিশ জীবনযাত্রার ছাপ এবং ব্রিটিশ প্রভাব নাইরোবিতে স্পষ্টই আছে। আর জার্মানদের আধিপত্য ছিল তান্‌জানীয়াতে। কেনিয়ার নাম, ব্রিটিশ আধিপত্যের কারণেই আগেই ছিল ব্রিটিশ-ইস্ট-আফ্রিকা। আর তান্‌জানীয়ার নাম ছিল জার্মান-ইস্ট-আফ্রিকা।

কেনিয়ার উত্তরে সুদান আর ইথিওপিয়া। পুবে সোমালিয়া। পশ্চিমে, লেক ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম কোল ঘেঁসে উগাণ্ডা। সত্তর দশকের শেষ পর্যন্ত এই উগাণ্ডার মালিক ছিলেন পৃথিবীর কুখ্যাত "ড্যাডা ইডি আমিন ড্যাডা"। যে ভদ্রলোক, জানিনা তাকে আদৌ ভদ্রলোক বলে চলে কি না; কুমির-ভরা জলায় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কুমির দিয়ে তাঁর অমনোনীত মানুষদের খাওয়াতেন। সাদা চামড়ার মানুষদের তো বটেই, ভারতীয়দের উপরেও অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন তিনি একসময়। ইডি আমিনের ব্যক্তিগত জীবন, তার নানাবিধ অত্যাচারের রকম এবং অভাবনীয়তা নিয়েই একটি আলাদা বই লেখা যেতে পারতো স্বচ্ছন্দে। কিন্তু মাসাইদের কথা বলতে বসে এমন একজন বাজে মানুষকে নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করার মানে হয় না কোনো।

উনিশশো উনআশিতে তান্‌জানীয়ার সঙ্গে যুদ্ধে হেরেই তিনি হাল ছাড়েন উগাণ্ডার। উনআশির জুলাই মাসে যখন তান্‌জানীয়ার সেরেঙ্গেটি প্লেইন্‌সে গেছিলাম আমি তখন ড্যাডা আমিনের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে তান্‌জানীয়ার সৈন্যদের উগাণ্ডা থেকে সেরেঙ্গেটির আদিগন্ত সাভান্না তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে ফিরতে দেখেছিলাম সারিবদ্ধ জীপে।

উগাণ্ডা, তান্‌জানীয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। আর ঠিক পশ্চিমে আছে "জায়রে"। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তামার খনি যে দেশে। কঙ্গো নদী বয়ে গেছে তার মধ্যে দিয়ে। গভীর ট্রপিকাল জঙ্গলের রাজ্য এই জায়রে। গেরিলার দেশ।

www.BanglaBook.org

উগাণ্ডার ঠিক পায়ের কাছে এবং তান্‌জানীয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে পড়ে জাম্বিয়া। তার পাশে এবং তান্‌জানীয়ার দক্ষিণে "মোজাম্বিক্‌"।

মাসাইদের নাম মাসাই হয়েছে কারণ তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষার নাম হচ্ছে "মা আ"। "মা আ" থেকেই "মাসাই"। বিস্তৃত সাভান্নাহ্‌ তৃণভূমি আর সুউচ্চ পর্বতাঞ্চল নিয়েই এই "মাসাইল্যাণ্ড"।

পূর্ব-আফ্রিকার গ্রেট-রিস্ট ভ্যালী, যেখানে জার্মান অধ্যাপক লিকী পৃথিবীর আদিমতম মানুষের 'ফসিল' আবিষ্কার করেছিলেন, তারই খাঁজে খাঁজে আদিগন্ত তৃণভূমি আর মাথা-উঁচু বন-বেষ্টিত পাহাড়ের মধ্যে মধ্যেই এই মাসাই উপজাতিদের বর্তমান বাসভূমি।

কেনিয়া তান্‌জানীয়ার সীমান্ত এলাকাতেই আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত, মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারো। কিলিম্যান্‌জারোর চূড়াই আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ, যেমন 'মঁ-ব্লাঁ' হচ্ছে ইয়োরোপীয়ান আল্পস-এর।

আমেরিকান, নোবেল-বিজয়ী লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস "দ্যা স্নোজ অফ কিলিম্যান্‌জারোর" কথা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন। এই উপন্যাসটি মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোকে বিখ্যাত করেছে। অনেকে উপন্যাসটি পড়েও থাকবেন। এবং অনেকে ঐ উপন্যাস নির্ভর বিখ্যাত চলচ্চিত্র "দ্যা স্নোজ অফ কিলিম্যান্‌জারো" দেখেও থাকবেন হয়তো।

তান্‌জানীয়-কেনিয়ার সীমান্তরেখার কাছেই আছে আর এক পাহাড়। তার নাম 'দেবতাদের পাহাড়'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসও নিশ্চয়ই অনেকেই পড়েছেন। আফ্রিকার রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জ-এ কিন্তু সত্যিই একটি পাহাড় আছে যার নাম 'মাউন্টেইন অফ দ্যা মুন'। সেই রকমই আর এক পাহাড় এই 'দেবতার পাহাড়'। 'ওলডোইনিও লে এন্‌গাই' বা 'মাউন্টেইন অফ দ্যা গড'।

BanglaBook.org

মাসাইদের রূপকথাতে আছে যে এন্‌গাই এর তিন ছেলে ছিল। সেই তিনজনকে এন্‌গাই তিনটি উপহার দিয়েছিলেন।

প্রথম ছেলে পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে তীরধনুক। যাতে সে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। দ্বিতীয় ছেলেকে এন্‌গাই দিয়েছিলেন একটি শাবল, যাতে চাষাবাদ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সে। আর তৃতীয়জনকে তিনি দিয়েছিলেন একটি চারণ-লাঠি যাতে সে পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

এন্‌গাই-এর এই তৃতীয় ছেলেটির নাম ছিল "নাটেরো কপ্‌"। ওই "নাটেরো কপ্‌"ই হচ্ছে মাসাইদের প্রথম পূর্বপুরুষ। নাটেরো কপ্‌ যেদিন দেবতা এন্‌গাই-এর হাত থেকে চারণ-লাঠি উপহার পেয়েছিলেন সেইদিন থেকেই মাসাইরা তাদের পশুচারণ বৃত্তি নিয়ে এক আশ্চর্য স্বাধীন, প্রায়-যাযাবর, গর্বিত জীবনযাপন করে আসছে।

দেবতার পাহাড়, মাউন্ট এন্‌গাই-এর ছায়াতে দাঁড়িয়ে মাসাইরা যুগযুগান্ত ধরে বিশ্বচরাচর রক্তিম-করা সূর্যোদয় আর আদিগন্ত আগুন-ছড়ানো সূর্যাস্ত দেখেছে অবাক বিস্ময়ে। পশুচারণ করেছে দেবতার পাহাড়ের আশীর্বাদধন্য সোনালী সাভান্নাহর রাজ্যে।

www.BanglaBook.org

সারস পাখির মতো অদ্ভুত ভঙ্গিমায়, তাদের চারণ-লাঠির উপর ভর দিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকেছে আদিগন্তকাল ধরে সূর্যাস্তবেলার সোনারঙে-রাঙা আকাশের পটভূমিতে, তাদের দীর্ঘ ঋজু কালো শরীরের 'শিল্যুয়েট' ; কালো পাথরে খোদা ঋজু মূর্তির মতো।

ওরা বিশ্বাস করে মাটি হচ্ছে মা। অন্যান্য অনেক আদিবাসীদের কাছে অরণ্য যেমন অন্য মা, এদের কাছে মাটি। মায়ের গায়ে হলকর্ষণ করে বা তাঁর গায়ে খোন্তা বা শাবল বা কোদাল দিয়ে আঘাত করলে মায়ের লাগে। তাই পশুচারণ করেই তারা বেঁচে থেকেছে। পশুর রক্ত আর দুধ খেয়েই থেকেছে। পশুচারণই তাদের একমাত্র বৃত্তি বলে, ঘাস আর জলের খোঁজে দূর দুরান্ত চরে বেড়ানো জল-চাতক বুনো জানোয়ারেরই মতো তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে দূরের ঘাসবনে নতুন করে ঘর বানিয়ে নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করতে হয়েছে তাদের বারবার। তাই মূলত যাযাবর না হলেও প্রায়-যাযাবরই হয়ে উঠতে হয়েছে মাসাইদের।

যাযাবরেরাই হয়েতো একমাত্র জানে তাদের স্থিতিহীন আনন্দের কথা। ঘর-ছাড়াদের আমরা বলি উদ্বাস্তু। ঘর ছাড়ার ভাবনাই আমাদের পীড়িত এবং শঙ্কিত করে। কিন্তু বিনাবাক্যে, পেছনে একবারও না চেয়ে; তাদের গবাদি-পশুর 'ওঁয়াও, বোঁয়াও' শব্দ আর অসংখ্য খুরে-খুরে-ওড়া আগ্নেয়গিরির শত সহস্র বছর আগের অগ্ন্যুৎপাতের লাভামিশ্রিত লাল-রঙা ভারী আকরিক-ধুলোর গন্ধে নাক ভারী নিয়ে তারা পাড়ি দিয়েছে তাদের প্রিয় গবাদি-পশুদের পিছু পিছু; এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ে; হাতি, বুনো মোষ, গণ্ডার সিংহ, চিতা, লেপার্ড, হায়না সকলকেই থোড়াই-কেয়ার করে।

যারা এই পৃথিবীর কোনো না কোনো কোণের স্থায়ী বাসিন্দা তারা তাই চিরদিনই মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে এই মাসাইদের দিকে। পেছন ফিরে তাকাতে, ঘর ছেড়ে যেতে আমাদের চোখ জলে ভরে আসে। বুক টনটন করে। আর পথহীন ধু-ধু প্রান্তরে এবং সুউচ্চ জঙ্গলাবৃত পাহাড়ে পাহাড়ে, পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে পথ চলতেই ওদের আনন্দ। পেছনের সব টানকেই ওরা অবহেলায় জয় করেছে। এ বড় সহজ কথা নয়। তিথু-সুখে ওরা কোন দিনও বিশ্বাস করেনি। তলানি পড়তে দেয়নি এক মুহূর্তের জন্যেও জীবনের টগ্‌বগানো তরলিমা ভরা পাত্রে। স্মৃতি-মেদুর অতীতকে বর্জন করে বর্তমানকে হেলাফেলায় অতীতে পর্যবসিত করে দিয়ে ওরা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে বিস্ময়কর প্রাণবন্ত বর্তমানে পর্যবসিত করেছে।

এই মাসাইদের দেশে আজকে সম্ভবত সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার লাখ মাসাই আছে। সংখ্যাতে তারা মোটেই অগণ্য নয়। পশ্চিমের অনেকেই উন্নত, প্রচণ্ড অগ্রসর দেশ যেমন প্রমাণ করেছে যে জনসংখ্যাই কোনো দেশের শৌর্য-বীর্য-মেধার একমাত্র প্রতিভূ নয়, বরং উল্টোটাই সত্যি; মাসাইরাও তাদের জীবনযাত্রার ঐশ্বর্য ও অসাধারণত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছে যে কোনো জাতেরই সম্মান তার সংখ্যার অনন্যতায় প্রমাণিত হয় না।

নর্ম্যান লের্স্, ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে সম্ভবত অগ্রগণ্য যিনি প্রথমে মাসাইদের দেশে গিয়ে পৌঁছোন। সেও এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়। উনি 'কেনিয়া' শীর্ষক একটি

www.BanglaBook.org

বই লিখেছিলেন উনিশশো পঁচিশে। তাতে লিখেছিলেন ঃ "শারীরিক দিক দিয়ে মাসাইরা মানবজাতির মধ্যে সুন্দরতম জাত। তাদের ছিপছিপে গড়ন, তাদের ছিপছিপে হাড়, সুঠাম মেদহীন পশ্চাৎদেশ এবং কাঁধ এবং সুগোল, সুডোল মাংসপেশী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো তুলনাই চলে না।"

আমি মাসাইদের খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং স্বল্প দিন হলেও তাদের সঙ্গে থেকেছি বলেই লের্স্ সাহেবের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলব, "তুলনা সত্যিই চলে না"।

মাসাইদের যে সংখ্যার কথা বললাম তা সঠিক কি না তা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি না। তাদের গণনাও নেহাৎ সোজা কর্ম নয়। তারা নিজেরা গবাদি-পশু গোনে বলে তাদের নিজেদের কেউ আদৌ গুনুক তা তারা মোটেই পছন্দ করে না। গুনতে গেলেই পালিয়ে যায়। অথবা ইচ্ছা করেই যা-তা তথ্য দিয়ে দেয় পরিবারের জনসংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করলেই। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই একের বেশী বৌ থাকে। ছেলে মেয়ে তো অবশ্যই। কোন্ ভদ্রলোকই বা এসব গোপন পারিবারিক তথ্য হাটে এসে ঘোষণা করতে চান? অবশ্য শুধু মাসাইদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। পূর্ব আফ্রিকায় সোয়াহিলি ভাষা যারা বলে তাদের গোনা আরোই মুশকিল, অন্য একটি কারণে। মাসাইরা যেমন ভালোবাসে বাসস্থান বদলাতে সোয়াহিলি ভাষীরা আবার নাম বদলাতে খুব ভালোবাসে। বাবা-মায়ের দেওয়া নামটা একটু ধূলিমলিন হয়ে উঠলেই নিজেরা খেয়াল খুশি মতো নাম বদলে দেয় নিজেই। এ গ্রামের খুনী কুবোধ খুন করে অন্য গ্রামে গিয়ে সুবোধ নাম নিয়ে অবলীলায় বসবাস করতে থাকে।

BanglaBook.org

সংখ্যাতে মাসাইরাও বাড়ছে, অন্য সব জাতেরই মতো কিন্তু অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার অনেকই কম। এক গর্বিত উপজাতি হিসেবে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জনসংখ্যার ভারে পীড়িত করেনি নিজেদের, আত্মঘাতী পরিমণামের কথা ভেবেই।

কী করে এই উপজাতির উৎপত্তি হল, এবং তাদের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস ধোঁয়াশাতেই আছে এখনও। স্পষ্ট বা নিশ্চিত সত্য এখনও জানা যায়নি। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা যে মাসাইরা "নিলোটস্" এবং "হামিটস্" দের বর্ণসঙ্কর উপজাতি। "নিলোটস্" অর্থাৎ নাইল নদীর অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল আর 'হামিটস্' হচ্ছেন তারা যাদের পূর্বসূরীরা উত্তর আফ্রিকারই মুল বাসিন্দা। কিন্তু মাসাইদের পোশাক মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রোম্যানদের প্রাচীন বেশভূষা যেমন ছিল, জুলিয়াস সীজার বা মার্ক অ্যান্টনী যেমন পোশাক পরতেন মাসাইদের পোশাকও প্রায় সেইরকমই। মাসাইরা এখনও যে তরবারি ব্যবহার করে তার সঙ্গে রোম্যানদের ব্যবহৃত তরবারিরও খুবই সাদৃশ্য আছে। সোজা চওড়া তরবারি ইয়োরোপের অন্যত্র এবং মধ্যপ্রাচ্যে বা ভারতে ব্যবহৃত তরবারির মতো বাঁকা তা আদৌ নয়। মাসাই যোদ্ধাদের চুল ছাঁটার কায়দাও এমনই যে মনে হয় যেন রোম্যান ধাঁচের শিরস্ত্রাণ পরে রয়েছে তারা। তাদের "টোগী" এবং পায়ের গবাদি-পশুর চামড়া দিয়ে বানানো চপ্পলও একেবারে রোম্যানদেরই মতো। তাদের সাড়ে ছ'ফিট

www.BanglaBook.org

সাত ফিট দৈর্ঘ্য, খড়্গাকৃতি নাক, প্রশস্ত কপাল, দীঘল চোখ, কাটা-কাটা ফিচার্সও কিন্তু হুবহু রোম্যানদেরই মতো। গায়ের রঙটাই শুধু রোম্যানদের মতো নয়। মিশকালো!

অনেক "নিলোটিক" উপজাতিদের মধ্যেই দেখা যায় থুথু ছিটিয়ে এবং থুথু দিয়ে অন্যকে আশীর্বাদ করার এবং শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ। মাসাইদের মধ্যেও তা পুরোমাত্রাতেই আছে। মেয়েদের মাথা-মুড়োনো, সারসের মতো এক-ঠ্যাঙে চারণ-লাঠি ভর দিয়ে এক পায়ের হাঁটুর উপরে অন্য পায়ের পাতা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস, চোয়ালের নিচের পাটির ঠিক মধ্যিখানের দু'খানি দাঁত হাপিস্ করে দেওয়ার রীতি যেমন নিলোটিক্দের মধ্যে দেখা যায় মাসাইদের মধ্যেও তা হুবহু আছে। আবার "হাম্টিক" উপজাতিদের মতোই মাসাইদের মধ্যেও ছেলে এবং মেয়েদেরও ছুন্নৎ, যৌবন রাজ্যে অভিষেক, যোদ্ধাদের বিভিন্ন স্তর এবং বিভাগ আছে। যাবতীয় মাছ এবং পৃথিবীর তাবৎ কামারদের প্রতি গভীর বিরূপতাও মাসাইদের মধ্যে দেখা যায় যা "হাম্টিক"দের মধ্যে লক্ষ করার। সুদানের হাম্টিক উপজাতি 'নুয়ের'দেরই মতো মাসাইরাও বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার তাবৎ গবাদি পশুর হাল-হকিকৎ, খাল-খরিয়াৎ, রাহান্-সাহানএর একমাত্র সমঝদার ও জিম্মাদার শুধুমাত্র তারাই। এই মহান কর্তব্যে আর কারোরই কোনো অধিকার নেই।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা যে আজকের মাসাই-রাজ্যের মাসাইরা মূলত উত্তর আফ্রিকা থেকেই আসে। নীল নদ বরাবর নেমে এসে কেনিয়ার তুরকানা হ্রদের (উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্রিটিশরা যে হ্রদের নাম রেখেছিল এক সাহেবের নামে "লেক রুডল্ফ") তার পাশে এসে পনেরো'শ শতাব্দী নাগাদ তারা আস্তানা গাড়ে। তাদের সেই দীর্ঘ ও কষ্টকর যাত্রা-পথের ইতিহাস পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে শোনা কাহিনীর মাধ্যমে আজও মগজ-বন্ধ আছে। উপজাতি হিসেবে তাদের সেই বিবর্তনের কাহিনী রীতিমত রোমহর্ষক।

BanglaBook.org

অনেক অনেকদিন আগে মাসাইদের পূর্বপুরুষেরা নাকি আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখের মতো চারধারে সুউচ্চ পাহাড়-বেষ্টিত একটি গর্তের মতো জায়গাতে বাস করত। জায়গাটির নাম ছিল "এন্ডিকির একিরিও"। "এন্ডিকির একিরিও" ছিল কেরিও নদীর উপত্যকাতে। আর কেরিও উপত্যকা ছিল যে দেশে, তার নাম ছিল "কালেন্‌জিন্"।

"এন্ডিকির একিরিও"তে একবার একাদিক্রমে অনেকদিন ধরে প্রচন্ড খরা চলতে থাকে। খরা থেকে দুর্ভিক্ষ। গবাদি-পশুর খাওয়ার ঘাস ছিল না তখন এক মুঠোও। পানীয় জল ছিল না মানুষের অথবা পশুদের। বড়ই দুর্দশাতে পড়ে তখন মাসাইরা। দিনে দিনে তাদের অবস্থা জলকষ্টে রীতিমত দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে। এমন সময় একদিন মাসাই-বুড়োরা হঠাৎই লক্ষ করে যে পাখিরা সবুজ ঘাস নিয়ে আসছে ঠোঁটে করে কোথা থেকে যেন। এনে, তাদের বাসা বানাচ্ছে।

বুড়োরা তখন মিটিং করে তাদের মধ্যে। তারা অনুমান করে যে পাখিরা চারিদিকের প্রহরা-পাহাড়ের ওপাশ থেকেই নিশ্চয় টাটকা ঘাস আনছে। আর ঘাস যখন টাটকা তখন জলও নিশ্চয়ই আছে সেখানে। বুড়োরা তখন এই সিদ্ধান্ত নেয় যে ব্যাপারটা কী তা জানার জন্যে খোঁজদারদের পাঠানো হবে। যে অঞ্চল থেকে পাখিরা ঘাস আনছে সেখানে বৃষ্টি

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না হলে সবুজ ঘাস গজালোই বা কি করে? অথচ "এন্ডিকির একিরিও"তে তো এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। মাটি ফেটে ফুটি-ফাটা। সবুজের চিহ্ন নেই একটুও কোথাও। জলকষ্টে মানুষ এবং পশু দুইই মরতে বসেছে।

মাসাই বুড়োদের পাঠানো খোঁজদারেরা তো বহুকষ্টে হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গলদঘর্ম হয়ে, কোনোরকমে দীর্ঘ ও অক্লান্ত চেষ্টাতে প্রহরা-পাহাড়ের মাথায় এসে একদিন পৌঁছোল অবশেষে। পৌঁছেই দেখল, তাইতো! ঐ দেওয়ালের পাশেই তো এক ফুল-ফলন্ত, জল-জ্বলন্ত বিস্তৃত উপত্যকা। তার গাছে গাছে ফল, ঝোপে ঝোপে ফুল, নদীতে-ঝোরাতে জল চলেছে তরতরিয়ে, সবুজ নরম চাপ চাপ ঘাসের মধ্যে দিয়ে সোনা-রোদে ঝিলিক মেরে, গলা রূপোরই মতো। সব দেখে-টেখে ছুঁয়েছেয়ে তারা তো মহানন্দে ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে সাবুদ হিসাবে সেই সব সঙ্গে নিয়ে আবার মহাকষ্টে 'এন্ডিকির একিরিও'র জ্বালা-মুখের মতো গর্তে নেমে এল কোনোক্রমে।

তারা ফিরে এলে তখন আবারও বুড়োরা মীটিং বসালো। বুড়োরা মীটিং করে সাব্যস্ত করল যে এই পাহাড়ের দেওয়ালে চড়ার জন্যে মস্ত উঁচু একটা মই বানাতে হবে। যথা ভাবনা তথা কাজ। বানানো হল মই। তারপর তো মই বেয়ে মেয়ে-মদ্দ, কচি-কাঁচা, গাই-বাছুর সকলেই সেই ফুল-ফলন্ত, জল-জ্বলন্ত উপত্যকার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে 'ইসপার উসপার" প্রতিজ্ঞা করে, দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগল। সেই খাড়া কুদরতি-আড়-এর পাড় বেয়ে। আধা-আধি বাধা অতিকষ্টে পেরিয়েছে, ঠিক তখনই সেই অত্যাচারিত মই, গেল মটাং করে ভেঙে। এ ওর ঘাড়ে পড়ল। কিছু মরল চাপাও পড়ে। কিছুর হাত পা মাথা ভাঙল। গাই বলদের হাম্বা-আআ। মেয়ে-মদ্দের ব্যাবাগো! ম্যাগো! কচি-কাঁচার ওঁয়াও ওঁয়াওতে 'এন্ডিকির একিরিও' গর্ত একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু বেশী-ভোজের স্বপ্ন দেখার কারণে বিফল-স্বপ্ন কিছু মানুষ এবং গবাদি-পশুকে সেই গর্তেই ফেলে রেখে স্বপ্ন-সার্থক করা কিছু মানুষ তো বৈতরণী পার হল। পার হয়ে নতুন করে বসতি গড়ল, চারণ-ভূমির পত্তন করল সেই নতুন উর্বর জায়গাতে।

অনেক অনেকই বছর পরে গর্তর মধ্যে যারা রয়ে গিয়েছিল তারা আবার নিজ চেষ্টায় অধঃপতিত অবস্থা থেকে নিজেদের উত্থিত করে আগেই গর্ত ছেড়ে-আসা ভাই-বিরাদরদের সঙ্গে এসে মিলিত হল। কিন্তু ততদিনে 'এন্ডিকির একিরিও'তে বসবাসকারী মাসাইদের সঙ্গে যারা আগেই উপত্যকায় পৌঁছেছিল তাদের মধ্যে অনেকই ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে।

পরিবেশই সব মানুষের জীবনযাত্রা বদলিয়ে দেয় অভাবনীয়ভাবে। যারা চলে যেতে পেরেছিল তারা খাঁটি মাসাইই ছিল আর যারা পরে গেল তারা চেহারাতে একই রকম হলেও কী হয় অন্যরকম হয়ে গেছিল উপজাতি হিসাবে। যারা রয়ে গেছিল তারাই হল "রেন্ডিল" বা "পোকোট্" এবং অন্যান্য উপজাতি যারা আজও শুধুমাত্র কেনিয়ার উত্তর ভাগেই বাস করে।

যারা প্রথমে 'এন্ডিকির একিরিও' ছেড়ে উঠে আসে তারা ক্রমশই দক্ষিণে এগোতে থাকে। যাত্রা-পথে নানা উপজাতিদের যুদ্ধে হারাতে হারাতে। দুর্ধর্ষ মাসাইরা যাদের হারাতে

www.BanglaBook.org

হারাতে এল তাদের মধ্যে অনেক যোদ্ধা উপজাতিরাও ছিল। যেমন "গাল্লা', "ডোরোবো-শিকারি" এবং 'ইলাটুয়া"। ইলাটুয়াদের কুয়োগুলির দখল নিল সেই মাসাইরা। শক্তিশালী 'সিরিকয়া' উপজাতিদেরও মাসাইরা হারিয়ে দিয়ে নিজেদেরই একাংশ করে নিয়েছিল পরে। "কিকুয়ু', যারা আপেক্ষিক সাম্প্রতিক অতীতে "মাউ-মাউ" আন্দোলন ঘটিয়েছিল কেনিয়াতে এবং "চাগা", এই দুই বান্টু প্রজাতির অন্তর্গত মানুষদেরও মাসাইরা সহজেই হারিয়ে দেয় তাদের যাত্রাপথের যুদ্ধে। মাসাইদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবার পরে ঐ উপজাতীয়রা মাউন্ট কেনিয়া এবং মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোর ঢাল-এ নতুন করে বসতি গড়ে বসবাস শুরু করে। তখন থেকেই অন্য উপজাতিদের চেয়ে অনেকই বেশী শক্তিশালী দুর্ধর্ষ এবং সঙ্ঘবদ্ধ বলে মাসাইদের সকলেই ভয়ভক্তি করতে শুরু করে। সমস্ত পুব-আফ্রিকাতেই আজ থেকে একশ বছর আগেও যোদ্ধা হিসেবে মাসাইদের এতই নাম ছিল যে পুব-আফ্রিকার বান্টুরা এবং ইয়োরোপের নানা দেশের উপনিবেশিকরাও তাদের সভয়ে এড়িয়ে গেছে।

আঠারশো শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আধুনিক, অসম শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ ও জার্মানদের উপনিবেশিকতার কারণে এবং কিছুটা ঐ অঞ্চলে আরবদের ক্রীতদাস-ব্যবসার পতন হওয়ার কারণেও ধীরে ধীরে মাসাইদের মূল বাসভূমির এলাকা ছোট হয়ে আসতে থাকে। উনিশশো শতাব্দীর শেষের দিকে, উত্তর কেনিয়ার মার্সাবিট্‌ থেকে আজকের তান্‌জানীয়ার মাসাই "steppe" পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণের অনেকখানি এলাকাই তাদের বাসভূমি বলে চিহ্নিত হতো। কিন্তু পুব-আফ্রিকার কৃষিজীবীরাও ক্রমান্বয়ে মাসাইদের চারণ-ভূমি গ্রাস করে নিতে থাকে। সেই কারণে বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে মাসাইদের যে অঞ্চলে বাস সেই এলাকা আরোই ছোট হয়ে এসেছে।

ইয়োরোপের শিক্ষিত, অগ্রসর বিখ্যাত সব জাতিরা যে মাসাইদের মতো সরল সোজা ও সাহসী কিন্তু "অনগ্রসর" এক উপজাতির সঙ্গে কী রকম তঞ্চকতা করেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মাসাইদের জমি কেড়ে নেবার জন্যে, তাদের উদ্বাস্তু করার জন্যে তাঁরা না করেছে এমন হীন কাজ নেই। মাসাইদের ভাইয়ে ভাইয়ের ঝগড়াতে ইন্ধন জুগিয়েছে তারা। পায়ে হেঁটে বল্লম দিয়ে গণ্ডার হাতি এবং সিংহ শিকার করা এই অসম-সাহসী মানুষদের আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যেভাবে গুলি করে মেরেছে সেইসব সাদা চামড়ার 'শিক্ষিত' জাতিরা তা জানলে তাদের শিক্ষা এবং অগ্রগতির প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিই গভীর সন্দেহ জাগে। কারা যে প্রকৃত শিক্ষিত সে সম্বন্ধে জ্বলন্ত প্রশ্ন জাগে মনে।

যতদূর জানা গেয়ে তাতে ইয়োরোপীয়ানরা প্রথম মাসাইদের সংস্পর্শে আসে আঠারশো চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। লান্‌ডানের চার্চ মিশনারী সোসাইটির দু'জন জার্মান সদস্য এসে পৌঁছান মাসাইদের দেশে। তাঁরাই সম্ভবত মাসাই রাজ্যের সর্বপ্রথম সাদা-চামড়া আগন্তুক। তারা দু'জনে অবশ্য কেনিয়ার মাসাইদেরই সংস্পর্শে আসেন। এই দু'জন জার্মানদের নাম হলো ডঃ লুড্‌উইগ্‌ ক্র্যাপফ্‌ এবং রেভারেণ্ড জন রেব্‌ম্যান।

ফিরে গিয়ে ডঃ ক্র্যাপফ্‌ আঠারশো ষাট খ্রীষ্টাব্দে একটি বই লেখেন। বইটির নাম

www.BanglaBook.org

"ট্র্যাভেলস্, রিসার্চেস্ অ্যাণ্ড মিশনারী লেবারস্"। ঐ বইয়ে মাসাইদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া আছে সম্ভবত সেটিই মাসাইদের প্রথম লিপিবদ্ধ বর্ণনা।

ডঃ ক্র্যাপফ্ লিখেছিলেন ঃ "মাসাইরা দুধ, মাখন, মধু খায়। কালো গরুর, ছাগলের এবং ভেড়ার মাংসও খায়। তাদরে সবরকম কৃষিকর্মের প্রতিই গভীর অসূয়া আছে। তারা বিশ্বাস করে যে প্রাণধারণের জন্য খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করলে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। ঐরকম খাদ্যের অভ্যাস শুধুমাত্র দুর্বল পাহাড়ী উপজাতিদের পক্ষেই সম্ভব। ঐসব উপজাতিদের তারা অত্যন্ত হেয় বলেই মনে করে।

যখন তাদের নিজেদের গবাদিপশু কমে যায় কিংবা তার উপর নির্ভর করে তাদের আর চলে না, যেমন খরার সময়, তখন তারা অন্য উপজাতিদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের গবাদি-পশু অবলীলায় গায়ের জোরে কেড়ে নিয়ে আসে। মাসাইদের মতে তাদের দেবতা "এন্‌গাই" পৃথিবীর তাবৎ গবাদি-পশুর উপরে একছত্র অধিকার শুধুমাত্র তাদেরই দিয়ে রেখেছেন। তাদের বিশ্বাস এই যে আফ্রিকার অন্য কোনো উপজাতিরই গবাদি-পশু রাখার অধিকার নেই।

যোদ্ধা হিসেবে মাসাইদের সকলেই তখন ভয় করত। প্রতিপক্ষের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং প্রতিপক্ষদেরও তরবারির কোপ আর তাদের লাগানো আগুনের প্রকোপে ছারখার করে দিত মাসাইরা যাতে দুর্বল উপজাতিরা আদিগন্ত উন্মুক্ত, খোলা চারণ-ভূমিতে ঢুকতে সাহসই না পায়। যদি বা তাদের সঙ্গে মাসাইদের দেখা হতোও তবে অন্যরা অবিলম্বে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হত।"

ডঃ ক্র্যাপফ্ অথবা রেভারেণ্ড জন রেব্‌ম্যানও কিন্তু মাসাই রাজ্যের বিশেষ অভ্যন্তরে ঢুকতে পারেননি। তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল ভাসা-ভাসা। মাসাইদের দেশের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সবচেয়ে প্রথমে যেতে পারেন ব্রিটিশ রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য যোশেফ্ থম্‌সন্। আঠারশো তিরাশি-চুরাশিতে। উনিও একটি বই লেখেন আঠারশো পঁচাশিতে। বইটির নাম "থ্রু মাসাইল্যাণ্ড"।

থম্‌সন্ সাহেবও তাঁর বইয়ে মাসাইরা যে সাংঘাতিক এবং ভয়াবহ এক উপজাতি সেকথা বিশদভাবে বলেছেন। এবং একবার যে তাঁর নিজের পৈতৃক প্রাণটিও একটুর জন্যে চলে যেতে বসেছিল মাসাইদের কল্যাণে সেই ঘটনার কথাও সেই বইএ বিস্তারিত উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই থম্‌সন্ সাহেব মাসাইদের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেছেন। এক জায়গায় উনি লিখেছেন ঃ

"আম্বোসেলি ছিল মাসাইদের দেশ। বীর যোদ্ধাদের দেশ। অভিজাতদের দেশ। তারা পশুরক্ত এবং দুগ্ধপায়ী। তাদের হাতে থাকে লম্বা লম্বা বল্লম। গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে আমি চেয়ে থাকতাম এই মরুভূমির সন্তানদের দিকে যখন স্বাভাবিক স্বচ্ছতোয়া ভাষায় এবং ভঙ্গিমাতে তারা কথা বলত ঋজু-শরীরে আমার সামনে সটান দাঁড়িয়ে। তাদের আচরণে একধরনের গাম্ভীর্য এবং সম্ভ্রান্ততাও মাখামাখি হয়ে থাকত যা অত্যন্তই প্রশংসার্হ।"

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রসঙ্গত বলে নিই যে এই অ্যাম্বোসেলিতেই "অ্যাম্বোসেলি" নামে একটি বিখ্যাত ন্যাশানাল পার্ক হয়েছে। অনেকই এবং অনেকরকম বন্য-পশু আছে সেখানে।

থম্‌সন্‌ সাহেব এসে চলে যাওয়ার পর আরও কয়েকজন অভিযাত্রী মাসাইদের দেশে ঘুরে গেছিলেন। তাঁরা বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতার কথা জানাননি। তবে সেইসব অভিযাত্রীদের প্রত্যেকেরই অভিযানের রকম ছিল বিভিন্ন।

কার্ল পিটারস্‌ বলে এক গোঁয়ার-গোবিন্দ মাথা-মোটা জার্মান এসেছিলেন। তিনি চলার পথের সব কিছুকেই তাঁর আধুনিক অস্ত্রর গুলিতে গুঁড়িয়ে দিতে দিতে এগিয়েছিলেন। অথচ আর একজনও জার্মান এসেছিলেন, যার নাম ছিল কাউন্ট স্যামুয়েল টেলেকি ভন্‌ জেক। তাঁকে আজও মাসাইরা মানবিকতা আর নম্রতার প্রতিমূর্তি বলেই জানে।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ থাকেই। যাঁরা ভালো তাঁরা বিদেশীদের চোখে নিজের দেশকে চিরদিনই বড় করে তুলতে পারেন। তাঁরাই তাঁদের স্বদেশের প্রকৃত রাষ্ট্রদূত। আর যাঁরা খারাপ তাঁরা স্বদেশকে ছোট করেন বিদেশীদের চোখে।

ইয়োরোপীয়ানরা যখন সসৈন্য এসে উপস্থিত হয়েছিল মাসাইদের দেশে আঠারশো আশি থেকে নব্বুই-এর প্রথম ভাগে, তখন থেকেই মাসাইদের নানারকম দুর্দশার শুরু। প্রচণ্ড খরা চলছিল তখন। ইয়োরোপীয়ানদের আনা বসন্ত রোগ মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল মাসাই-ল্যাণ্ডের কোণায় কোণায়। তার আগে ঐ রোগের কথা জানত পর্যন্ত না। ঠিক সেই সময়ই গবাদি-পশুদের বিশেষ মারীর (যার ইংরাজি নাম রাইন্ডারপেস্ট) মড়কেও মাসাইদের গবাদি-পশুও প্রায় শেষই হতে বসেছিল। ঐ সময় মাসাইদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা জেনে, দেখে এবং মওকা বুঝে পুব-আফ্রিকায় তাদের প্রতিবেশী একাধিক উপজাতিরা যেমন "কিকুয়ু", "কাম্বা" এবং "কালেন্‌জিন্‌রা" মাসাইদের চারণভূমি আর গবাদি-পশু ছিনিয়ে নেবার জন্যে তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তার আরও পরে অধুনা কেনিয়াতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের এবং অধুনা তান্‌জানীয়াতে জার্মান ঔপনিবেশিকদের বসতি গড়ার পর মাসাইদের গতিবিধির উপর প্রচণ্ড বাধা নিষেধ আরোপিত হয়। মাসাইদের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে বিচ্ছিন্নও করে রাখা হয়। অন্য কোনো উপজাতিদের মাসাইদের এলাকায় ঢুকতে হলে ব্রিটিশ অথবা জার্মান ঔপনিবেশিকদের ছাড়পত্রের প্রয়োজন হত।

অবশ্য অন্য সমস্ত উপজাতিদের উপরেও অন্য কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। যে উপজাতির দখলে যতটুকু জমি ছিল তার বাইরে পা-ফেলাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ইয়োরোপীয়রা সকলের ক্ষেত্রেই।

সবচেয়ে বড় দুর্যোগ অবশ্য নেমে এসেছিল মাসাইদের জীবনে তাদের নিজেদেরই কারণে।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উপজাতির মধ্যেই দেখা যায় যে একজন কুলগুরু বা ধর্মীয় প্রধান তাদের সমাজের এক প্রধান মুখপাত্র। যাঁর প্রভাব সেই বিশেষ উপজাতির উপরে যতটা রাজনৈতিক নয় তার চেয়ে অনেকই বেশী ধর্মগত। মাসাইদের তেমন ধর্মীয় কুলপুরোহিত

www.BanglaBook.org

যিনি ছিলেন সেই সময়ে, তাঁর নাম ছিল "বাটিআনি"। বাটিআনি ছিলেন একচক্ষু। শোনা যায় তিনি জন্মেইছিলেন একটিমাত্র চোখ নিয়ে । সাধারণত মাসাইদের কুলপুরোহিতদের 'মাআ' ভাষায় বলা হত "লাইবন"। আমাদের দেশের "ওঁরাও" উপজাতিদের কুলপুরোহিতদের নাম যেমন "পাহান", সুন্দরবনের জেলেমৌলে-বাউলেদের যেমন "দেয়াসী", তেমনই আর কী!

ধর্মগুরু হিসেবে লাইবনের প্রভাব মাসাই সমাজের উপরে ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। শুধু ধর্মমতই নয়, তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভালমন্দ সম্বন্ধেও "লাইবন"-দের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা।

মাসাইদের সেই "লাইবন" বা ধর্মগুরু "বাটিআনির" দুই স্ত্রীরই একটি করে ছেলে ছিল। বড় ছেলের নাম ছিল "সেনেটু" এবং ছোট ছেলের নাম ছিল "লেনেনা"। প্রথমজন সুয়োরানীর ছেলে। দ্বিতীয়জন দুয়োরানীর। 'বাটিআনির' মৃত্যুর পর 'সেনেটু' আর 'লেনেনা'র মধ্যে মতান্তর ঘটে যাওয়াতে মাসাইরা দু'ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে উঠল। আর সেই যুদ্ধের সুযোগ পুরোপুরিই নিল শেয়ালের মতো ধূর্ত ব্রিটিশরা। তারা 'লেনেনার' প্রতি দরদের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তার পক্ষ নিল। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' এই ছিল তাদের সর্বাত্মক নীতি। মাসাই উপজাতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে চূড়ায় তুলে এই ডামাডোলের মধ্যে "লেনেনাকে' সর্দার খাড়া করে দিয়ে ব্রিটিশরা লেনেনার শাসনক্ষমতাও নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে একটি এলাকাতেই তাকে বন্ধ করে রাখলো। সেই এলাকাটির নাম ছিল "এন্‌গংগ"।

আসলে, ব্রিটিশরা থোড়াই মাসাইদের হিত চেয়েছিল। চেয়েছিল, তাদের চারণভূমির দখল নিয়ে তাদের পদানত করে রাখিতে। কিন্তু মাসাইরা যখন বুঝতে পারল যে আসলে ব্রিটিশরা মাসাইদের শাসন করতেই শুধু চায় না, চায় মাসাইদের বাসভূমি গ্রেট রিস্ট্ ভ্যালীর "নাকুরু" এবং "লাইকয়া" মালভূমির সমস্ত জমিই দখল করে নিতে তখন দেরী হলেও তাদের টনক নড়ল। সমস্ত মাসাইরা তখনই দেরীতে হলেও একত্রিত হল এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সেনেটু এবং লেনেনার দল একত্রিত হয়েই যুদ্ধ করল। কিন্তু সেই যুদ্ধে অসংখ্য মাসাই-এর প্রাণতো গেলই, তারা তাদের অগণ্য গবাদি-পশুও হারাল। লেনেনার মৃত্যুর পর লেনেনার সব জমির দখল নিয়ে নিল তঞ্চক ব্রিটিশরা। বলল, যে লেনেনার শেষ ইচ্ছানুযায়ীই তারা তা নিয়েছে।

ব্রিটিশের নগ্ন নির্লজ্জ ঔপনিবেশিকতার কারণে মাসাইদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সেই ক্ষতি তাদরে শিকড় ধরে টান দিল।

উনিশশো চার, উনিশশো এগারো এবং উনিশশো বারো খ্রীষ্টাব্দের অসুদ্দেশ্য-প্রণোদিত যে-সব চুক্তি সরল-সোজা মাসাইদের সঙ্গে ব্রিটিশরা করেছিল সেগুলির লজ্জাকর ইতিহাস ব্রিটিশদের জাত হিসেবে বড় বলে প্রমাণ করে না। চুক্তি অনুসারে তারা মাসাইদের বিস্তৃত ভূখণ্ডের অনেকখানিই কেড়ে নিল। এই স্বাধীনচেতা গর্বিত বীর যোদ্ধা উপজাতিকে বাগ মানাতে না পেরে তারা মাসাইদের উপর এমনই সব বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল এবং

www.BanglaBook.org

পুব-আফ্রিকার জনসাধারণের মূল-স্রোত থেকে, পুব-আফ্রিকার অন্য সব উপজাতি থেকে তাদের এমন ভাবেই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যে, অনেকেরই ধারণা; যে প্রধানত সেই কারণেই আজও কেনিয়া এবং তান্‌জানীয়ার মাসাইরা অন্যান্য উপজাতিদের থেকে অনেক বেশি পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসর হয়ে রয়েছে।

অবস্য অনগ্রসর শব্দটিকে এখানে চলিতার্থেই ব্যবহার করলাম। এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। পরে তা করা যাবে।

আফ্রিকার পৃথিবী বিখ্যাত "দ্যা গ্রেট রিফ্ট" আরম্ভ হয়েছে ডেড-সী থেকে। ডেড-সী'র পুব-দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার বুকের গভীরে নেমে এসে পুব-আফ্রিকার একটি বড় অংশকে দু'ভাগ করে এই রিফ্‌ট্ চলে গেছে পুবে। তারপর ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তান্‌জানীয়াকে চিরে দিয়ে নেমে গেছে ভারত মহাসাগরে। গাল্ফ্ অফ্ এডেন থেকে কঙ্গো নদীর উপত্যকা পর্যন্ত চলে গেছে এই 'রিফ্‌ট্' খোয়াই ভাঙতে ভাঙতে। কোথাও কোথাও এই বিভাজন রেখা প্রায় চল্লিশ মাইল মতো চওড়া।

বহু বহু হাজার বছর আগে পৃথিবীর একাংশ, দুটি সমান্তরাল ভাঙনের মধ্যে বসে-যাওয়ার কারণে তারই মধ্যে এই উপত্যকার সৃষ্টি হয়। এই উপত্যকাতেই মাথা উঁচু সব পাহাড় আর সুন্দর বিস্তৃত সব হ্রদের সৃষ্টি হয়। মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারো, মাউন্ট কেনিয়া, মাউন্ট মেরু, আফ্রিকার সর্বোচ্চ সব চুড়ো নিয়ে মাথা উঁচু করে তারা এই অঞ্চলেই অতন্দ্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে। একদা-সক্রিয় বহু আগ্নেয়গিরিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই রিফ্‌ট্‌ভ্যালীতেই। এখন অবশ্য তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সবাই নয়। যেমন মাউন্ট লেঙ্গাই জীবন্ত আছে এখনও। কখন যে সে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবে তা সেই জানে।

মৃত আগ্নেয়গিরিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি 'গোরোংগোরোও' আছে এখানেই। সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর দিগন্তলীন সাভান্নাহ্ তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলে বহুদূরের মেঘ-জড়ানো সুউচ্চ নীল গোরোংগোরোকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বপ্নময় সবুজ অন্ধকারের স্তূপ বলে মনে হয়। এই মৃত আগ্নেয়গিরির গহ্বরেই গড়ে উঠেছে এখন তান্‌জানীয়ার বিখ্যাত গোরোংগোরো ন্যাশনাল পার্ক। সেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের গহ্বরে বহু প্রাচীন সব বাওবাব গাছ, সবুজ ঘাসে-ছাওয়া উপত্যকা এবং সুন্দরী ইয়ালো অ্যাকাসিয়া গাছেরা ভীড় করে আছে। পাহাড়, হ্রদ, জলের পাশের বন; যেখানে দুই-খড়্গা গণ্ডার, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী জন্তু আফ্রিকান চিতা, সিংহ, বুনো মোষ ইত্যাদি অবাধে বিচরণ করে, দীর্ঘ-গ্রীবা এবং দীর্ঘ-পায়ের গোলাপি ফ্লেমিংগোদের ছায়ায় গোলাপি হয়ে থাকে যেখানকার হ্রদের জল। একসময় যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে জ্বলন্ত লাভা উৎক্ষিপ্ত হত এখন সেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া মিশ্র আকরিক ছাইয়ের পাহাড়কেই বরফে ঢাকা দেখা যায়। বরফাবৃত মৃত আগ্নেয়গিরিগুলিকে ভারী সুন্দর দেখায়। প্রকৃতির যে কত লীলা!

www.BanglaBook.org

"এমারোটা"

মাসাই পুরুষদের জীবনের তিনটি প্রধান ভাগ আছে।

প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় যোদ্ধাবস্থা; তৃতীয় বৃদ্ধাবস্থা।

গড়ে প্রতি পনেরো বছর অন্তর যোদ্ধাদের এক নতুন প্রজন্ম এসে যোগ দেয় অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের দলে। পুরোনোরা তারুণ্যের তক্‌মা খুলে সরে দাঁড়ায় নতুন প্রজন্মের হাতে তা তুলে দিয়ে।

যোদ্ধাদের প্রত্যেকটি প্রজন্মকেই আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করা হয়। তাদের তিনটি ভাগ। অল্পবয়স্ক যোদ্ধা, বয়স্ক যোদ্ধা এবং প্রাচীন যোদ্ধা। প্রাচীনেরা সমাজের হাল প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তরুণতরদের হাতে ছেড়ে দেয়। আশিবছর বয়সে পৌঁছেও প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ তাদের কাছে স্বাভাবিক নয়। ঐ চারটি অবস্থা বিশেষ উৎসবের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়।

মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারো, মাউন্ট মেরু, আর মাউন্ট লেঙ্গাই প্রহরীর মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাসে-ছাওয়া হাজারে হাজার মাইল সাভান্নাহ্‌ ঘাসের আর অ্যাকাসিয়া গাছেদের রাজ্যে। যেখানে জল আছে সেখানে হলুদ-রঙা অ্যাকাসিয়াও হয়। তাদের বলে, ইয়ালো-ফিভার অ্যাকাসিয়া। সেৎসী মাছিরা বড় বড় পাখায় গুঞ্জন করে ফেরে। তাদের ন'টি জীবন। মারলেও মরে না। তাদরে কামড়ে পশু কি মানুষ সকলেরই অবস্থা সঙ্গীন হয়। ইয়ালো-ফিভার জ্বরে মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে পড়ে। ঘুমুতে ঘুমুতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তারা।

বিষুবরেখার এই অঞ্চলের তীব্র আলো, তীব্র গরম, তীব্র শীতের হিমেল হাওয়ায় ঝক্‌মক্‌ করে আদিগন্ত ঘাসভূমি। 'লেলেশাওয়া' পাতারা খস্‌খস্‌ করে ওঠে সেই হাওয়ায়। হাজার হাজার জেব্রা, ওয়াইল্ড বিস্ট, থমসনস্‌ আর গ্রান্টস গ্যাজেলস্‌, ইম্পালা, এল্যাণ্ড ঘুরে বেড়ায় সেই তৃণভূমিতে। দাঁতাল হাতির সঙ্গে অন্য হাতির লড়াই-এর শব্দে চমকিত হয়ে ওঠে ঘাসের বনের ধু-ধু হাওয়ার একঘেয়ে ফিসফিসানি আর মর্মরধ্বনি। সিংহর দল আর লম্ফমান চিতারা দৌড়ে দৌড়ে শিকার করে। শকুন এসে বসে অ্যাকাসিয়া গাছের ডালে ধৈর্যভরা প্রতীক্ষায়। গাব্বুন ভাইপার সাপ তার তীব্র বিষ নিয়ে লেজের উপর দাঁড়িয়ে বাঁশির আওয়াজের মতো আওয়াজ করে। সেই আওয়াজ কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে যায় হাওয়া। আর এই বিচিত্র, আশ্চর্য পটভূমিতে লাল-কালো রোম্যান পোশাকের সুন্দর শরীরের দীর্ঘ-দেহী মাসাইরা প্রান্তর থেকে প্রান্তরে এগিয়ে চলে নতুন নতুন ঘাসভূমি আর জলের গন্ধ

www.BanglaBook.org

নাকে নিয়ে। যাযাবর তো তারা নিশ্চয়ই। কিন্তু আশ্চর্য এক যাযাবর। তারা যাযাবর হয়েও যেখানেই থাকে কিছুদিন, সেখানেই ঘর বাঁধে। তাই যাযাবর হয়েও তারা গৃহী।

গোবর-লেপা প্রায় নিশ্ছিদ্র ঘরের চারপাশে বেড়া তোলে তাদের 'ক্রাল'-এর চারদিকে। প্রধান ফটকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তাদের গবাদিপশু, একাধিক স্ত্রী এবং অগণ্য শিশু নিয়ে সেই বেড়ার প্রহরার ভিতরে বাস করে। মাঝে মাঝেই দু-খড়্গা গণ্ডার, বুনো মোষ অথবা হাতি এসে সেই বেড়া ভেঙে দেয়। কখনও তাদেরই পালিত বলিষ্ঠ বলদদের লড়াইতে ভাঙে 'ক্রাল'-এর বেড়া। সিংহের দল, ক্রাল-এর চারপাশে গর্জন করে ফেরে অন্ধকার রাতে।

তাদেরই অবাসস্থলের একাংশ "ওলডুভাই গিরিখাত'-এ পৃথিবীর আদিমতম মানুষেরা বাস করত এক সময়। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের শিবালিক পর্বতমালাতেই আদিমতম মানুষের বাস ছিল। লেক ভিক্টোরিয়া, লেক ট্যাঙ্গানিকা, লেক ইয়াসি কত সব আশ্চর্য বিশাল হ্রদের সঙ্গে হৃদ্যতা এই মাসাইদের। নানারকম ভয় আর অনিশ্চয়তাতে ঘেরা এক স্বপ্নরাজ্য পুব-আফ্রিকার এই বিশেষ অঞ্চল। সেই স্বপ্নরাজ্যের বাসিন্দা এই মাসাইরাও স্বপ্নে-দেখা কোনো উপজাতিরই মতো রহস্যময়।

আমাদের মায়েরা আমাদের শিশুকালে গাইতেন "ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে'। জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে ভীত করতেন আমাদের। নানারকম কাল্পনিক ও সত্যি ভয় এবং ভূত-পেত্নীর অস্তিত্বের কথা আমাদের অবচেতনে শিশুকাল থেকেই শিকড় গেড়ে যেত, হয়তো এখনও যায়, কোনো কোনো অঞ্চলে; কোনো কোনো পরিবারে।

মাসাই মায়েরা কিন্তু তাদের শিশুদের কখনই ভয় না দেখিয়ে পরম বীরের মতোই বড় করে তোলে, বীরত্ব আর অসীম সাহসের গল্প বলে। মায়েরা গায় ঃ

"এনগোনীয়াকোনীয়া
ইয়াআ ইন্‌গিক্ আড়্‌লো
টাবানা কোসেরেক্
টাবানা ওল্‌ডোওনিও কেরি,
টাবানা ওলডোওনিও ওইবর্,
টানাপা মিনীই এন্‌গুটুনি।"

গানটির মানে হল ঃ
শিশু আমার!
বড় হয়ে ওঠো!
বড় হয়ে ওঠো, আমার সোনা।
পর্বতের মতো বেড়ে ওঠো তুমি,
মাউন্ট মেরুর মতো, মাউন্ট কেনিয়ার মতো বড়ো হও।
বড় হও মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারোর মতো।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় হয়ে মা-বাবাকে সাহায্য করো, বল-ভরসা হও তাদের।

সেই শিশুরা হাঁটতে শিখলেই মাসাই মায়েরা, তাদের 'ক্রাল'-এর সামনে শিশুর দুহাত নিজের দুহাতে আদরে উপরে তুলে তাদের হাতে হাত ধরে হাঁটা শেখায়, গান গায় ঃ

'টাডোটু ডোটু এনগীনিয়াই আয়াআই
টাডোটু ডোটু এন্‌গীনিয়াই আয়াইনি আয়াইনি
মাপীপে টেটেআই মাপীপে টেটেআই।''

এই গানের মানে হল, হাঁটোতো! হাঁটো! হাঁটো! আমার ছোট্ট খোকন হাঁটো। চলো, হাঁটি আমরা। আস্তে, আস্তে হাঁটি, আস্তে আস্তে।

মাসাইদের সমাজে আজকালকার আধুনিক বাবা-মায়েদের মতো ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র বাবা-মায়ের উপরেই থাকে না, থাকে সমস্ত সমাজের উপরে। 'ক্রাল'-এর যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই 'ক্রাল'-এর শিশুরা দুষ্টুমি করলে তাকে বকতে বা মারতে পারে। এবং বকেন আর মারেনও। তাতে কেউই কিছুমাত্র মনে করেন না।

তাদের বাবার বয়সী সকলকেই শিশুরা বাবা বলেই ডাকে, এবং মায়ের বয়সীদেরও মাই বলে। তবে এই সম্বোধনের কারণে মাঝেমধ্যে একটু গোলমাল যে হয় না তাও নয়। অবশ্য কেউই বলে না 'তোর কটা বাবারে?' তবে কোনো শিশু এসে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জটলার মধ্যে থেকে তার বাবাকে ডাকলে সেই ভিড় থেকে অনেকসময়ই কারো না কারো বলে উঠতেই হয় 'কোন বাবাকে খুঁজছিস রে'?

ছোটবেলায় ছাগল-ভেড়া চরানো দিয়ে শিশুদের শিক্ষানবিশী শুরু হয়। একটু বড় হলেই ছেলেরা চারণ-লাঠি হাতে গরু চরাতে যায় বড়দের সঙ্গে। গবাদি-পশুদের সবরকম সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধেই ওদের অবহিত করে বড়রা। সিংহ, চিতা, লেপার্ড, হায়না, শেয়াল ইত্যাদি শ্বাপদদের পায়ের চিহ্ন চিনিয়ে দেওয়া হয় তখনই তাদের। আকাশের রঙের মেঘপুঞ্জের আকৃতির রহস্যও শেখানো হয়। শেখানো হয় প্রখর ধূলিধূসরিত গ্রীষ্মে কী করে গন্তব্য বা বস্তুর দূরত্ব অনুমান করতে হয়। কোন ভাবে সে রক্ষা করবে পশুদের কোন জানোয়ারদের হাত থেকে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়। বলে দেওয়া হয়, যদি বড় কোনো হিংস্র জানোয়ার আসে তবে নিজে তার মোকাবিলা না করে সে যেন দৌড়ে আসে নিজেদের 'ক্রাল'-এ অথবা যদি দূরে থাকে, অন্যদের 'ক্রাল'-এ এবং সেখানকার বড়দের সঙ্গে সঙ্গে পশুদের বিপদের কথা বলতে।

চার-পাঁচ বছর বয়স হতেই কোনো বর্ষীয়সী মহিলা শিশুদের চোয়ালের নিচের পাটির ঠিক মধ্যের দু'খানি দাঁত (INCISORS) উপড়ে দেয়, দুধের দাঁত। পরে আসল দাঁত উঠলেও তাই-ই করা হয়। সাত আট বছর বয়স হলেই তাদের সকলেরই, ছেলেমেয়ে, নির্বিশেষে ডান কানের উপরিভাগের ফুটো করে দেওয়া হয়। সে ঘা শুকোলে বাঁ কানের একই জায়গাতে আবার ফুটো করা হয়। আর বছরখানেক বছর দুয়েকের মধ্যে ডান কানের লতিতে মস্ত বড় একটা ফুটো করা হয়। তারপর সেই ঘা শুকিয়ে গেলে বাঁ কানের লতিতে

www.BanglaBook.org

তেমনই বড় ফুটো।

কানের লতির ফুটো যার যত বড় হয় সে তত সুন্দর বলে বিবেচিত হয় মাসাইদের সমাজে। অনেকের বেলায় বুকে বা পেটে আগুনে পুড়িয়ে বা ছুরি দিয়ে ফুটো করে নানারকম অঙ্গ-সজ্জাও করে দেওয়া হয়। যাদের মা-বাবা তা করাতে চায়।

মেয়েরা ঋতুমতী হলেই অন্য মেয়েদের বা ঐ বয়সী ছেলেদের সঙ্গে না মিশে তরুণ যোদ্ধাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। পশুর নরম চামড়ার পোশাকে সেজে নানারকম পুঁতির গয়না এবং পেতলের গয়নাতেও সেজে সুন্দরী হয়ে তরুশ যোদ্ধাদের মনোহরণ করতে সচেষ্ট হয় তারা।

তখন কিন্তু বিয়ে হয় না তাদের। ছেলেদেরও নয়। যোদ্ধারা যতদিন প্রাথমিক স্তরে থাকে (তরুণ যোদ্ধা) ততদিন তাদের বিয়ে করা মানা। কিন্তু বাধাবন্ধনহীন যৌন জীবনে অধিকার থাকে তাদের প্রত্যেকের। ছেলে বা মেয়ে কারোই সঙ্গমে মানা নেই। তরুণ যোদ্ধারা তাদের প্রজন্মের অন্য যোদ্ধাদের মায়ের সঙ্গেও শুতে পারে। পুত্রবৎ যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গম করে মায়ের বয়সীরাও তৃপ্ত করে নিজেদের।

যদি ইচ্ছে করে মেয়েরা গিয়ে তরুণ যোদ্ধাদের বাসস্থান মানীয়াট্টাতে রাত কাটায়। সেই যোদ্ধার মা নিজে গিয়ে ছেলের জন্যে আদর করার বিছানা করে দেয়। নিজেও সেখানেই শোয়। সঙ্গম ব্যাপারটার মধ্যে কোনোই অন্যায় বা পাপ-বোধ নেই মাসাই সমাজে। তরুণ যোদ্ধাদের তো তাতে অবাধ অধিকার। প্রকৃতির এই পুত্র-কন্যারা আমাদের দেশের নানা উপজাতির 'ঘোটুলের'ই মতো মানীয়াট্টাতে অবাধ শারীরিক সুখের বাধাবন্ধনহীন জীবন যাপন করে।

যোদ্ধা হবার আগে প্রত্যেক ছেলেকে ছুন্নৎ করতে হয়, এবং বিয়ের আগে মেয়েদেরও অবশ্যই। মেয়েদের ছুন্নৎ কথাটা শুনতে একটু অবাক লাগলেও কথাটা সত্যি। এই মেয়েলি ছুন্নৎ-এর ইংরিজি নাম 'ক্লিটোরিডেক্টোমী'। আমাদের দেশে মুসলমান পুরুষেরাই শুধু ছুন্নৎ করান। মেয়েরা তো করেন না। করলে, লালন ফকিরের গানের তো মানেই থাকতো না কোনো। —"যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান নারীর তবে কি হয় বিধান?"

এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাসাইদের মধ্যে নারীরও বিধান আছে।

মেয়েদের ছুন্নৎ কেন হয় জানি না তবে শুনেছি ছুন্নৎ করলে সঙ্গমে তৃপ্ত হতে দীর্ঘতর সময় লাগে। এবং সে কারণে দু'পক্ষই সমানভাবে এবং দীর্ঘসময় ধরে সঙ্গম উপভোগ করতে পারে। ধীর এই অসীম সাহসী বীরের জাতের নারীরাই বা ক্ষণিক চড়াই-পাখির সুখে বিশ্বাসী বা সন্তুষ্ট থাকবে কেন?

এই ছুন্নৎ অনুষ্ঠান মাসাই ছেলে ও মেয়েদের জীবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ছেলেদের প্রত্যেককে ছুন্নৎ-এর আগে বন জঙ্গল খুঁজে খুঁজে মধু জোগাড় করে আনতে হয়। আর উটপাখির (অস্ট্রিচের) কালো পালক। এই দু'টি জিনিস জোগাড় করতে না পারলে তার ছুন্নৎ হবেই না। আরো আনতে হয় বন-টুঁড়ে মোম। মধু জোগাড় করতে গিয়ে মৌমাছির কামড়ে অনেকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিও ঘটে।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুন্নৎ-এর "মা-আ" প্রতিশব্দ হচ্ছে "এমোরাটা"। সেই বিশেষ উৎসবের জন্যে প্রত্যেক পরিবারেই একটি বিশেষ বলদের বন্দোবস্ত করতে হয়। জোর ভোজ হয় সেদিন। ছুন্নৎ-এর পরে পশুর রক্তর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একরকম বিশেষ পানীয় তৈরী করে রক্তক্ষয় পূরণ করার জন্যে ছেলে বা মেয়েকে দেওয়া হয়। সেই বিশেষ পানীয়র নাম "আসারোই"।

ছুন্নৎ-এর সময় যে ছেলে উঃ-আঃ করে তাকে সমস্ত সমাজ ভীরু কাপুরুষ বলে ঘেন্নার চোখে দেখে। বিশেষ করে সমবয়সী তরুণ যোদ্ধারা তো বটেই। মাসাই সমাজে কাপুরুষ বলে বিবেচিত হওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না।

মেয়েদের বেলা অবশ্য যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করলেও তা দোষের বলে মনে করা হয় না। মেয়েরা তো ছেলেদের চেয়ে নরম হবেই। তবু মেয়েরাও বীর হবার চেষ্টা করে, প্রাণপণে ঐ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে।

কোনো মেয়ে একেবারেই নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করলে তখন তার সখীরা ঠাট্টা করে বলে; একবার অন্তত 'উই' করে ওঠ। নইলে, ছেলেদের সমান বীরত্ব দেখানো হয়ে যাবে যে রে। কেউ কেউ ঠোঁট চেপে থাকে। একবারও 'উই-আই' করে না। তবে কেউ কেউ আবার হাউ-মাউ করে কাঁদেও। কিন্তু মেয়েদের বেলা সেটা দোষ বলে গণ্য নয়। নীরবে নিঃশব্দে ছুন্নৎ-এর অসীম শারীরিক কষ্ট সহ্য করার মধ্যে দিয়েই তরুণ মাসাই যোদ্ধার শারীরিক বীরত্বর সূচনা হয়।

ছেলেরাই শুধু ছেলেদের ছুন্নৎ-এর সময়ে উপস্থিত থাকতে পারে। আর শুধু মেয়েরাই মেয়েদের ছুন্নৎ-এর সময়ে। যখন ছুন্নৎ হয় তখন দিনক্ষণ দেখে পূর্ব-নির্ধারিত দিনে অনেক ছেলেরই একসঙ্গে ছুন্নৎ হয়। এটি শুধু পারিবারিক উৎসব নয়, এটি একটি বিশেষ সামাজিক উৎসবও।

ছুন্নৎ-এর পরেই ছেলে ও মেয়েরা সত্যিকারের বড় হয়ে উঠেছে বলে মেনে নেওয়া হয়। ছুন্নৎ-এর আগেও মেয়েরা সঙ্গম করে। তাতে সমাজ কোনো দোষ দেখে না। কিন্তু ছুন্নৎ করার আগেই যদি কেউ গর্ভবতী হয় তাহলে পুরো পরিবারের পক্ষেই তা বড় লজ্জা এবং অস্বস্তির কারণ হয়।

ছেলেদের ছুন্নৎটা এক বিশেষ সাহসের পরীক্ষা তাদের কাছে। ছুন্নৎ-এর সময় যদি কেউ কেঁদে ফেলে বা শব্দ করে (ওদের ভাষায় "ছুরি সহ্য করতে না পারে"), তাহলে সারাটা জীবনই তার কপালে ভারী দুর্ভোগ ঘটে।

উটপাখির কালো পালক দিয়ে মস্ত শিরস্ত্রাণের মতো বানায় ওরা। সেই শিরস্ত্রাণ প্রত্যেক যোদ্ধারই পোশাকের এবং সাজের অতি-অবশ্য অঙ্গ।

ছুন্নৎ-এর আগের দিন রাতে ভোজ হয়। ছেলেটির বন্ধুরা এবং বিশেষ করে যাদের ছুন্নৎ হয়ে গেছে তারা নানা রকম রঙ্গ তামাশা করে তার সঙ্গে। কেউ কেউ বলে "না, না ও যা কুৎসিত! ও ভয় পেতেই পারে না।" এই মন্তব্যর অন্তর্নিহিত রসিকতাটা হচ্ছে, ঈশ্বর কখনই নির্দয় হতে পারেন না। যাকে কুৎসিত করে গড়েছেন

www.BanglaBook.org

তাকে কি ভীতুও করতে পারেন তিনি?

ঠিকমত ছুন্নৎ হয়ে গেলেই তারা আবার বলে, "আরে! জানতাম! যে ও ঠিকই সইতে পারবে। ও তো আর ভীতু নয়।"

যোদ্ধার জাতের জীবনে এও এক যুদ্ধ। হয়তো প্রথম যুদ্ধ। সহ্যশক্তির প্রথম পরীক্ষা, তার নিজের জীবনে, তার সমাজের কাছে।

যার ছুন্নৎ হবে তার সঙ্গে আগের দিন রাতে নানা রঙ্গ-রসিকতা করে বন্ধুরা। তাকে খেপায়, রাগায়, যাতে সে কোনক্রমেই পরদিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে না পড়ে।

একটি গান গায় কেউ, কেউ ঃ "ওরে ভীরু! তোর জন্য থাকবে ধূসর রঙহীন সব পাখিরা। আর যে সাহসী তার জন্য থাকবে লাল ডানা ট্যুরাকো পাখি আর সবুজ লাভ-বার্ডস্‌রা।"

ছুন্নৎ-এর পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই একদল ছুন্নৎ হওয়া ছেলে কালো চামড়ার পোশাক পরে এক ক্রাল্‌ থেকে অন্য ক্রাল-এ, এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তরুণ যোদ্ধাদের জীবনে অভিভাবকবর্জিত অবাধ স্বাধীনতার সেই প্রথম স্বাদ। নানা রকম পাখি, লাল ডানা ট্যুরাকো, সবুজ লাভ্‌-বার্ডস্‌ শিকার করে তারা তখন সাজাবে নিজেদের, পাখিদের পালকে। এই দু তিন মাস, যতদিন না ক্ষত পুরোপুরি শুকোচ্ছে; ততদিন যেখানেই তারা যাবে সেখানে তাদের ভালো ভালো খাবার দেওয়া হবে। রক্তক্ষয় পূরণ করার জন্যে। কারণ যোদ্ধারাই যে মাসাইদের রক্ষাকর্তা গৌরব।

খাসীর মাংস, বলদের মাংস, ওকাপি বা কুদু, গ্যাজেলস্‌ বা ইম্পালার মাংসও খাবে ওরা। রক্তের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হবে তখন তাদের। কারণ তারাই যে ভাবী কালের যোদ্ধা; ইল্‌মোরাণ।

মেয়েরা অবশ্য বাড়িতেই থাকে। তবে তাদেরও যত্ন-আত্তি কম করা হয় না কিছু। তারা সকলেই তখন ভি.ভি.আই.পি.।

ছুন্নৎ-এর অব্যবহিত পরেই ছেলেকে দুধ দিয়ে চান করিয়ে বড়রা বলবেন ঃ "জেগে ওঠো! তুমি এখন একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হলে। জেগে ওঠো।"

www.BanglaBook.org

আমাদের দেশে ঋতুর সংখ্যা ছ'টি। যদিও মানুষের অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে, খুদাহ্‌র উপর খুদকারীর দোষে সেই, সুন্দর ঋতু-বৈচিত্র্য আমাদের দেশে প্রায় লোপই পেতে বসেছে। যা-কিছুই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, সুন্দর, 'কুদরতি' ; তার সব কিছুই লোপ পেতে বসেছে এই পৃথিবী থেকেই জনসংখ্যার চাপে এবং মানুষের নানাবিধ লোভে। এখন হেমন্তকে তো শরৎ থেকে আর বিযুক্ত করা যায় না। কখন যে বসন্ত এসে মনের কোণে মুহূর্তে ছোঁয়া দিয়েই চলে যায় সে বোঝা পর্যন্ত যায় না। প্রেমেরই মতো নিঃশব্দ চরণেই বুঝি বসন্ত আসে এখন। যখন চলে যায় তখন গেয়ে উঠি আমরা "কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান"।

পুব-আফ্রিকার ঠিক যে অঞ্চলে মাসাইদের বাস সেখানে মুখ্য ঋতু দুটি। মাসাইদের দুটি ঋতু তো বলেইছি। ওদের এই দুটি মুখ্য ঋতুর নাম হচ্ছে "আলারি" ও "আলামেই"। আলারি হল বর্ষা। আর আলামেই হচ্ছে শুখা বা খরা।

বর্ষাকালটা শুরু হয় নভেম্বর মাস নাগাদ। পশলা-পশলা বৃষ্টি দিয়েই শুরু হয়।

আমরা বাংলাতে অতি হালকা ছোট দানার বৃষ্টিকে বলি 'ইলশে-গুঁড়ি'। বলি 'ইলশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিম।" বৃষ্টি তো নানারকম হয়। যেমন পিটপিটে বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, শ্রাবণের বৃষ্টি, রাতভরে বৃষ্টি, পশলা পশলা বৃষ্টি। মাসাইরা এই বর্ষারম্ভের পশলা পশলা বৃষ্টিকে বলে—'ইলকিসিরাট'।

বর্ষাকাল নভেম্বরে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে যায় মে মাসে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আবহাওয়া শুকনোই থাকে। তার মধ্যে শীতও এসে চলে যায়। জুলাই আর আগস্ট মাস হচ্ছে ওদের শীতকাল।

মেঘ-গর্জনের গুরু-গুরু মাদলের ধ্বনি আর কালো মেঘের মধ্যে মধ্যে যখন বিদ্যুৎ ঝলকাতে থাকে, ঘাসভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন মাসাই মেয়েরা দূরের পাহাড়ের দিকে অথবা দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে অনাগত বৃষ্টির গন্ধ পায় তাদের তীক্ষ্ণ নাকে, তখন দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় তারা। উত্তেজনায়। গোবর দিয়ে তাদের 'ইগলুর' মতো ঘরে মোটা করে গোবর-লেপা, ঘর-দোরের ফুটো-ফাটা ঢাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। বর্ষাবরণের প্রতীক্ষায় প্রসন্নতার সঙ্গে তৈরী হয়। তারপই বর্ষা এসে যায় 'ইলকিসিরাটের' হাত ধরে।

গো-চারণে জীবিকা নির্বাহী এই উপজাতি, মাসাইদের জীবনে বর্ষার ভূমিকা

www.BanglaBook.org

কৃষিজীবীদেরই মতো। গুরুত্ব একটুও কম নয় বরং বেশী।

প্রান্তরে, প্রান্তরে পাহড়ের গায়ে, দোলাতে—খোয়াইয়ে লাল এবং খয়েরী ভারী আকরিক মাটি ঢেকে যায় তখন চাপ চাপ গাঢ় সবুজ ঘাসে। মাসাইরা খুশিতে ডগমগ হয়। তাদের গবাদি-পশুর নাক সুড়-সুড় করে ওঠে অনাগত ঘাসের গন্ধে, জিভে জল আসে। সুন্দর স্বচ্ছ জলের গন্ধভরা সুনির্মল দিন এসে দখল নেয় তখন শুখা-সময়ের অস্পষ্ট অস্বচ্ছ দিনগুলির রাতগুলির উপরে। হাজার হাজার বুনো ওয়াইল্ড-বিস্ট (অথবা ন্যু) এবং বিভিন্ন জাতের অ্যান্টেলোপস্ আর গ্যাজেলস্ কালো কালো বিন্দুর মতো ছেয়ে যায় তখন আদিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি আর উপত্যকাতে। কিলিম্যান্জারো, মাউন্ট কেনিয়া এবং মাউন্ট মেরুর পটভূমিতে মেঘের ছায়া পড়া তৃণভূমির চেহারাই তখন অন্যরকম হয়ে যায়। সেই হাজার হাজার মিশ্র বন্য পশুর মাথার উপরে শকুন ওড়ে চক্রাকারে মৃত এবং মৃতপ্রায় অথবা অশক্ত বা দুর্বলদের খোঁজে। শিকারী বাজ ওড়ে সদ্যোজাত পশুশাবক বা সাপকে এক 'ছোঁ'তে মুখে তুলে নেবে বলে। হ্রদে, হ্রদের বক, সারস আর ফ্লেমিংগোদের মেলা বসে যায়। প্রায় যাযাবর মাসাইরা বাতাসে নাক তুলে গন্ধ নিয়েই বুঝতে পারে যে এবার তাদের পবিত্র গবাদি-পশুগুলি নিয়ে নতুন ঘাসের রাজ্যে বেরিয়ে পড়ার সময় এসেছে। সবুজ প্রান্তরের দিকে এবং জল-ভরা নদী, ঝোরা আর লেগুনগুলির দিকে চেয়ে আনন্দে ঝল্মল্ করে ওঠে ওদের সরল নিষ্পাপ মুখ-চোখ। বিভিন্ন রকম ব্যাঙ আর ঝিঁঝির ডাকে, মুখর রাত্তে কাঁথা গায়ে দিয়ে আরামে পাশ ফিরে শোয়। জোনাকি জ্বলে হাজার বর্গ মাইল জুড়ে, কাছে-দূরে। বর্ষাকালটা মাসাইরা নেচে গেয়ে ভোজ খেয়ে ও খাইয়েই পালন করে। বর্ষাকে ওরা এক লাগাতার উৎসবেরই মতো জানে। কাজ তো থাকে না তখন তেমন; গণ্ডারে ও হাতিতে বা ওদের নিজেদের লড়াই করা পালিত বলবান বলদে ভেঙে দিয়ে যাওয়া 'ক্রাল'-এর ভাঙা-বেড়া মেরামতি ইত্যাদি করা ছাড়া।

বর্ষা-সুখ অবশ্য বেশীদিন উপভোগ করতে পারে না ওরা। আবারও শুখাদিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে পা-পা করে। প্রখর তপন-তাপে মাঠ-প্রান্তর শুকিয়ে ওঠে। ঘাসেরা সব নেতিয়ে শুকিয়ে লাল হয়ে ওঠে। তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ফুটি-ফাটা লাল বা খয়েরী মাটির উপরে বা ফাঁক-ফোকরে। তখন প্রকৃতির দিকে চাইলে বর্ষার দিনগুলিকে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। কার মন্ত্রবলে যে ভোজবাজীর মতো সেই শ্যামলিমাকে তাড়িয়ে দিয়ে এই রুক্ষতা জবরদখল নেয় তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে।

প্রকৃতির চেয়ে বড় যাদুকর আর কেই বা আছেন? যাঁরই চোখ আছে তিনিই সে কথা জানেন।

খরার সময় যতদূর চোখ যায় প্রকৃতিতে; প্রকৃতি যেন ঠিকরানো রক্তিম চোখে চেয়ে মাসাইদের ধমকান তখন। গবাদি-পশুর পায়ে চলা পথ ক্রমশ ধূলি-ধূসরিত থেকে ধূসরতর হয়ে উঠতে থাকে। ন্যাড়া-রুক্ষ পাথর দাঁত বের করে তাকিয়ে থাকে। মন খারাপ লাগে তখন মাসাইদের। এই নির্দয় শুখা-সময় মাসাইদের বুকে হতাশা আনে। আনে খরা,

www.BanglaBook.org

জলাভাবে আর খাদ্যাভাবে গবাদি-পশুদের মৃত্যুও ডেকে আনে। এই সময়ে তাদের গবাদি-পশুদের বাঁচিয়ে রাখাই প্রধান চিন্তা এবং সমস্যা হয়ে ওঠে ওদের।

পশুরা আর তাদের নিজেদের জীবনও তো সমার্থকই। সর্বনাশ এড়াবার জন্যে মাসাইরা তখন উঁচু পাহাড়ের গায়ে চলে যায় পশুদের নিয়ে। পাহাড়ে সবসময়ই শ্যামলিমা থাকে। জল এবং ঘাসের অভাবও হয় না কখনও সেখানে। বর্ষা আসলে ওরা আবার নেমে আসে ঐ সব অঞ্চল থেকে। ঐ সময় পুব-আফ্রিকাতে গেলে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে (যেমন গোরোংগোরোর লাল ধূলি-ধূসরিত পথে) হঠাৎ জীপ-এর স্টীয়ারিং ঘোরালেই দেখা যায় লাল-কালো রোম্যান পোশাক পরে সাড়ে ছ'ফিট সাত-ফিট লম্বা মাসাই যুবক এক ঠ্যাঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে হাতে বল্লম ধরে কুয়াশা, রূপকথা এবং আদিম পৃথিবীর নিশ্চল কালো পাথরে কোঁদা কোনো প্রতিমূর্তিরই মতো। দেখে, চমকে উঠে নিজের পায়ে নিজেই চিম্‌টি কেটে জানতে হয় স্বপ্নই দেখছি না কি জেগে আছি। মাসাইরা সত্যি এক রূপকথা। আজও। সে রূপকথা দৈবক্রমেই যেন বেঁচে গেছে এই অতি বাস্তব, রূঢ়, তথাকথিত আধুনিক, ভোগ্য-পণ্য নির্ভর রঙিন চটুল বিজ্ঞাপনে-বিজ্ঞাপনে সম্পূর্ণ দিকভ্রষ্ট এই নষ্ট-পৃথিবীতে।

মাসাইরা আজও আমাদের দেশের গভীর জঙ্গল-নিবাসী কিছু কিছু গর্বিত আদিবাসীদেরই মতো প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সঙ্গে, ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে স্বেচ্ছাতেই বেঁধে রেখেছে। আমরা বলি তারা 'অনগ্রসর', তারা 'পশ্চাৎপদ'। কিন্তু তাদেরই চোখ দিয়ে তারা আমাদের মতো নগরবাসীদের দেখে কী যে বলে বা ভাবে তা জানতে বড় ইচ্ছা করে। যে অগ্রগতিতে আমরা গর্বিত, ঋদ্ধ, যে অগ্রগতি মানুষকে অমানুষ করে তোলে, তার চোখের ঘুম, তার অন্তরের সহজ সুখ, মনের শান্তি, শুভাশুভবোধ এবং ভগবৎ-বোধও কেড়ে নেয়, সে অগ্রগতি আদৌ অগ্রগতি কী না জানতে বড় ইচ্ছা করে। জানতে ইচ্ছা করে এই তথাকথিত অগ্রগতির প্রকৃত স্বরূপ।

মাসাইরা যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করে তার পেছনে তাদের গভীর ভগবৎ-বিশ্বাস প্রচণ্ডভাবে কাজ করে। যদিও ওদের আমাদের মতো তেত্রিশ কোটি দেবতা নেই। এক দেবতারই উপাসক ওরা।

আগেই বলেছি যে, ওদের দেবতার নাম 'এন্‌গাই'। এন্‌গাই মর্ত্যেও আছেন, এবং স্বর্গেও আছেন বলেই ওদের বিশ্বাস। এন্‌গাই-ই পরম প্রভু। প্রিয় প্রভু। অন্য কাউকেই ঐ নামে ডাকা সম্ভব নয় মাসাইদের পক্ষে।

এন্‌গাই-এর আবার দুই রূপ। কালো এন্‌গাই আর লাল এন্‌গাই। কালো রঙটা মাসাইদের কাছে প্রতীকী। যা-কিছুই কালো তাই-ই শুভ সূচিত করে। কালো গরুর দুধ খায়, মাংসও সচরাচর। কালো 'এন্‌গাই' ওদের ভালো করেন। লাল রঙটাও প্রতীকী। কিন্তু লাল 'এন্‌গাই' হচ্ছেন দেবতার কোপের প্রতীক। কালো 'এন্‌গাই'-এর ব্যাপ্ত প্রকাশ মেঘের গুরু গুরু ধ্বনিতে আর বৃষ্টিতে। আর লাল 'এন্‌গাই'-এর প্রকাশ প্রচণ্ড বজ্রপাত আর খরাতে। মাসাইরা বিশ্বাস করে যে কালো এবং লাল 'এন্‌গাই'-এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের

www.BanglaBook.org

জীবন এবং মৃত্যু দুইয়েরই দ্যোতক।

দলবদ্ধভাবে মাসাইরা ঈশ্বরের উপাসনা করে বড় বড় বাৎসরিক উপলক্ষ ও উৎসবের সময়ে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনেও ঈশ্বরের যে এক ব্যাপক ভূমিকা আছে তা কথায় কথায় উচ্চারিত ওদের নানা প্রবচনের মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি 'এন্‌গাই তাজাপাকি টুইনাইপুকো ইননো।"

মানে হচ্ছে, হে ঈশ্বর! তোমার পাখা দুটি দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখো।

অথবা "এন্‌গাই আকে নাইইওলো।"

মানে, ঈশ্বরই জানেন।

যে মাসাই মনে করে যে সে প্রবঞ্চিত হয়েছে ভাগ্যের হাতে, সে বলে "তাপালা আসু এত্তি আকে এন্‌গাই।"

অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেই। ঈশ্বর তো আছেন।

মাসাইদের কিছু কিছু কল্পনা ঈশ্বরকে পুরুষ হিসেবে কল্পনা করে। কিছু আবার নারী হিসেবে। তাই তাদের ঈশ্বর অর্ধনারীশ্বর।

একটি প্রার্থনায় তারা বলে "নাআমনি আইই আই" অর্থাৎ, সেই নারী, যার কাছে আমার প্রার্থনা। আবার অন্য প্রার্থনাতে বলে "ওলাসেরা ইন্‌গুমোর"। মানে, সেই পুরুষ, যিনি বহুবর্ণ।

মাসাইদের সর্বক্ষণের প্রার্থনা হচ্ছে সন্তান আর গবাদি পশুর জন্যে। যখনই দুজনের দেখা হয় তখনই এই কুশল প্রশ্ন বিনিময় করে তারা ঃ "কেসেরিয়ান্ ইনগেন্? কেসেরিয়ান্ ইন্‌গিশু?"

মানে, ওহে! ছেলেপুলেরা কেমন আছে? গবাদি-পশুরা ভালো আছে তো?

অবশ্য এই রীতি বোধহয় পূর্ব-আফ্রিকার সব ভাষা-ভাষীরাই কম বেশী মানে। যেমন যখনই সোয়াহিলি ভাষা-ভাষী দুজন মানুষের দেখা হয়, সে তারা কিকুয়ুই হোক কি অন্য কিছুই হোক, পথে ঘাটে হাটে বাজরে, বারংবার পথের একেবারে মধ্যিখানে বে-আক্কেলের মতো গাড়ি থামিয়ে তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে "হাবারি সানা?" মানে, তুমি কেমন আছ?

তারই সঙ্গে প্রশ্নের বান-ডাকিয়ে তারা একে অন্যকে ক্রমাগতই শুধোয়, বলে, তোমার কুকুর কেমন আছে? বিড়াল কেমন আছে? টিয়া পাখিটা? ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত কানে এমন অদ্ভুত কুশলবার্তা শুনে চমক লাগে কিন্তু ধীরে ধীরে কান অভ্যস্ত হয়ে যায়। থুথু ছিটোনো ও থুথু থেবড়ে দেওয়া মুখে কপালে ভালোবেসে, এও অভ্যাস হয়ে যায়।

মাসাইরা গবাদি-পশুর কুশল একে অন্যকে শুধোয়, ঈশ্বরের কাছে গবাদি-পশুর প্রার্থনা করে কারণ গবাদি-পশুই তাদের জীবন। তাদের সুখ-দুঃখের কারণ। তাদের সম্পত্তি। অর্থনাশের বীজ।

যে মাসাই-এর সামান্য অবস্থা তারও গোটা পঞ্চাশেক গবাদি-পশু থাকেই। থাকা উচিত

www.BanglaBook.org

অন্তত। এই সংখ্যাকে ওরা বলে "ইন্‌গুলু নাদারি।" মানে, ভালোভাবে চরাবরা করার পক্ষে মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো সংখ্যা। সে রাজ্যে যার যত বড় গবাদি-পশুর দল সে তত বড়লোক।

কিন্তু শুধুমাত্র অগণ্য গবাদি-পশু থাকলেই মাসাইরা কাউকেই বড়লোক বলে মানতে রাজি হয় না। বড়লোককে তাদের "মাআ" ভাষায় তারা বলে : "আরকাসিস।" যদি যথেষ্ট গবাদি-পশুর সঙ্গে তার ছেলে-মেয়েও থাকে অনেক, তবেই শুধু একজন "আরকাসিস" হয়ে উঠতে পারে। যার পঞ্চাশটির কম পশু সে গরীব। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য বলে বিবেচিত হয় না কেউই, যদি না তার সন্তান-সন্ততি এবং যথেষ্ট সংখ্যক গবাদি-পশুও না থাকে।

মাসাইরা যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত তারও মূলে হচ্ছে এই গবাদি-পশুর মালিকানা। দুটি প্রধান গোষ্ঠী আছে মাসাই সমাজে। "ওডো মঙ্গি" আর "ওরক্ কিটেঙ্গ।" মানে হল লাল গরু আর কালো গরু। এদের মধ্যেও আবার পাঁচটা ভাগ আছে।

প্রবচন আছে আদ্যিকালে "নাটেরো কপ্" দুটি বিয়ে করেছিলেন। এক বউকে অনেকগুলো লাল গরু দিয়ে তাঁর 'ক্রাল'-এর দরজার ডানপাশের ঘরে তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন। আর অনেকগুলো কালো গরু দিয়েছিলেন "নাটেরো কপ্" তাঁর দ্বিতীয় বউকে। তাঁকে থাকতে দিয়েছিলেন 'ক্রাল'-এর দরজার বাঁদিকের ঘরে। প্রথম বউ-এর যাঁর নাম ছিল "নাডো সঙ্গি" (লাল গরু) তিনটি শিশু ছিল। লেলিয়ান, লেকোসেন এবং লোসেরো। এরা তিনজন যথাক্রমে "ইল্‌মোলেলিয়ান্," "ইল্‌মাকাসেন্" এবং "ইল্‌টারোসেরো" এই তিন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এই তিন গোষ্ঠী হল ডানদিকের বা লাল গরুর গোষ্ঠী।

দ্বিতীয় বউ, "নারেক্ কিটেঙ্গ" (কালো গরু), দুটি শিশু প্রসব করেছিলেন। তাদের নাম ছিল "নাইসের" আর "লুকুম"।

'নাইসের' "ইলাইসের" গোষ্ঠী এবং 'লুকুম' "ইলুকুৎস্যা" গোষ্ঠীর পত্তন করে। এই দুই গোষ্ঠী হচ্ছে কালো গরুর গোষ্ঠী। ক্রাল-এর বাঁ দিকের।

মাসাইদের মধ্যে 'ইল্‌মোলেলিয়ান" (লাল গরু) আর "ইলাইসের" (কালো গরু) গোষ্ঠীই হচ্ছে সবচেয়ে প্রণিধান এবং প্রতিপত্তিশালী। বড় ছেলেরাই যে গোষ্ঠী দুটি প্রতিষ্ঠা করেছিল এমন বিশ্বাস করে মাসাইরা।

মাসাইদের এই গোষ্ঠীর মধ্যে কাদের সঙ্গে কাদের বিয়ে হতে পারে আর পারে না তা প্রত্যেক মাসাইই জানে। লাল গরুর গোষ্ঠীর সঙ্গে কালো গরুর বিয়েই শাস্ত্রসম্মত। স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়ে হওয়া অভিপ্রেত নয়। তবে তা একেবারেই যে হয় না এমনও নয়। তবে বিয়ে হলে হবু বর হবু স্ত্রীর অভিভাবকদের মার্জনা-পণ দিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়। তবে সেই দম্পতির যে ছেলেমেয়ে হয় তারা তার বাবার গোষ্ঠীভুক্ত হয়। তা সে লাল গরু বা কালো গরু যে-গোষ্ঠীর মায়েরই গর্ভে তারা হোক না কেন।

ওদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর গবাদি-পশুগুলিকেও বিশেষ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়

www.BanglaBook.org

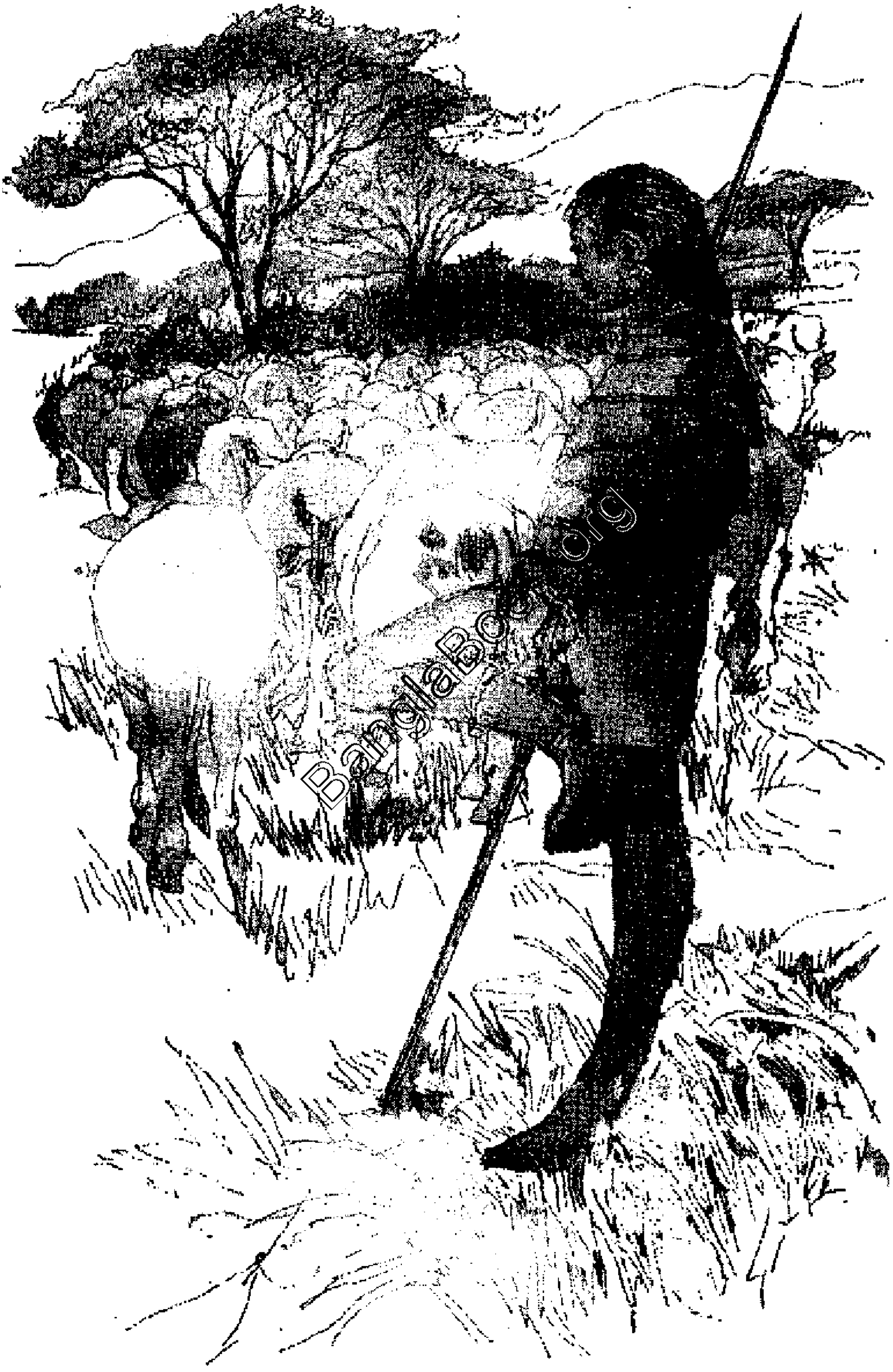

www.BanglaBook.org

তা কোন্ গোষ্ঠীর তা জানবার জন্য। এক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর জন্যেও আবার বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। গরু দেখেই মালিক চেনা যায়। "গোঁফের আমি গোঁফের তুমি" নয় "গরুর আমি গরুর তুমির" মতোই বন্দোবস্ত সেখানে।

গরুদের পেছনের থাই-এর কাছে লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হয় গোষ্ঠীর। একটি কান বিশেষভাবে ফুটো করে জানান দেওয়া হয় সেই গরু বা বলদ বা ষাঁড় কোন্ গোষ্ঠীর এবং অন্য কানটিও বিশেষভাবে ফুটো করে জানান দেওয়া হয় সে কোন্ উপগোষ্ঠীর। গবাদি-পশুর এক কানের উপরিভাগের ও অন্য কানের নিম্নভাগের ফুটোর আকৃতি দেখেই বুঝে নিতে হয় পশুর মালিকের গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠী কি? গাধা এবং ভেড়াদের কান অবশ্য মালিকেরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতোই ফুটো করে। গাধারা কোনো উচ্চবাচ্য করে না।

হারানো গরুদের শনাক্তকরণ করতে অবশ্যই কোনো অসুবিধা হয় না কারণ গরু দেখেই সহজেই বোঝা যায় তার মালিকের সঠিক কুলপঞ্জী। মাসাইদের দেশের সর্বত্রই চরে-বেড়ানো গাই-বলদ দেখে অক্লেশে বলে দেওয়া যায়, লাল গরু অথবা কালো গরু কোন্ গোষ্ঠীর এলাকাতে এসে পৌঁছেছি। এমনকি কোন্ উপগোষ্ঠীর এলাকাতে তাও। মাসাইরা নিজেরাও অচিন প্রান্তরের গরু দেখেই বুঝতে পারে গরুর মালিক তার খুড়ো, মাসতুতো ভাই, শালা না যম।

প্রত্যেক দলেই স্বাভাবিক নিয়মে অসংখ্য গরুর সঙ্গে কিছু বলদও থাকে। ষাঁড়ও থাকে কিছু। সাধারণত গোটা পঞ্চাশেক গরুর জন্য গোটা তিনেক বলদ থাকে। সাধারণত তিন-বয়সী বলদ রাখে মাসাইরা প্রত্যেকেই, যাতে বলদে বলদে যুবতী-গরুর মালিকানা নিয়ে মারামারি না হয়। আমার তো শুধুই এই কারণেই মনে হয় পৃথিবীর সর্বত্রই নারী নিয়ে যে পুরুষ অন্যের সঙ্গে মারামারি করে তাকে বলদই বলা উচিত।

নানাবিধ সুলক্ষণ দেখেই প্রজননের জন্যে বলদ-নির্বাচন করা হয়। বলদদের আমরা তাচ্ছিল্য করলেও আসলে তারা ভারী সেয়ানা, সুপার-সুপার ইন্টেলিজেন্ট। তাদের মতো আই-কিউ কোনো জাতের পুরুষেরই নেই। ফ্রি খাওয়া-দাওয়া, নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো, পরম আলস্যে জাবর কাটা এবং কর্তব্য-ডিউটি বলতে একমাত্র কাজ নধর গাইদের সঙ্গে জব্বর সঙ্গম করা।

ফাস্‌কেলাস সিস্টেম। মানুষদের মধ্যেও এই ফাস্‌কেলাস সিস্টেম চালু থাকলে অনেক পুরুষই পরম সুখে জীবন কাটাতে পারতেন ইনটেলিজেন্ট বলদদেরই মতো!

মাসাইদের "ক্রাল"-এর প্রত্যেক বলদের কৈশোরাবস্থাতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। যে মুষ্টিমেয়রা ভাগ্যবান তাদের প্রজনন-কর্মের জন্যে বলদই রেখে দিয়ে বাকিদের "ক্যাস্‌ট্রেট্" করে ষাঁড় বানিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাদের মেরে রক্ত মাংস খাওয়াও হয়। অবশ্য শুধু ষাঁড় নয় বলদদেরও কেটে খাওয়া হয় বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। তাদের চামড়া দিয়ে জুতো এবং দড়ি বানানো হয় এবং ডুগডুগিও। ডুগডুগি ঠিক নয়, বুক্-ছম্ ছম্ আওয়াজ করা নানা আকৃতির সব বাদ্যযন্ত্র। দুর পাহাড় বা আদিগন্ত কুয়াশা ঘেরা সেৎসী-

www.BanglaBook.org

মাছিওড়া ঘাসবনের মধ্যে হাতি, সিংহ এবং গণ্ডারদের বিচরণভূমি থেকে মাসাইদের মাদলের দূরাগত আওয়াজ শুনলে সত্যিই গা-ছম্ ছম্ করে ওঠে।

সব ষাঁড়কে যে মাসাইরা নিজেরাই খায় এমন নয়। টাকার বিনিময়ে বিক্রিও করে দেয় অনেক সময়, বদলও করে গরু বা বলদের সঙ্গে। যে বলদদের প্রজননের জন্য রাখা হয় তাদের বাছাই করা হয় এমনভাবে যাতে মা এবং বাবার সব গুণাগুণই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় থাকে। সেইসব বলদের মা-বাবার গায়ের রঙ, দুধ দেওয়ার ক্ষমতা, শরীরের আয়তন ইত্যাদির কথা মনে রাখা হয় সেই সময়। এছাড়া অন্যান্য গুণও বিচার করা হয়। যেমন লাইবন পরিবার (মাসাইদের কুলপুরোহিতদের পরিবার) বলদ নির্বাচন করে তার শিং-এর আয়তন দেখে। যাতে তাদের ক্রাল-এর সব গরু-বলদের শিং খুব বড়ো বড়ো হয়।

প্রত্যেক পরিবারের গবাদি-পশুর প্রত্যেক পশুকে সেই পরিবারের এবং 'ক্রাল' এর সকলেই ব্যক্তিগতভাবে চেনে। নিজের ছেলেমেয়েদের মতোই ভালোবাসে গবাদি-পশুদের ওরা।

প্রত্যেক পশুর মেজাজ এমনকি গলার স্বরও তারা চেনে। মাসাই শিশুদের শৈশবাবস্থাতেই শেখানো হয় কী করে গরু-বলদদের গান শোনাতে হয়। তাদের শিং-এর গড়নের বৈচিত্র্য চেনানো হয়। জানানো হয় তাদের লক্ষণ। পিঠে কুঁজ এবং রঙের সম্বন্ধেও শৈশবাবস্থাতেই পণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা হয়।

সত্যি! কী সুখ মাসাই ছেলে-মেয়েদের, এবং তাদের মা-বাবাদেরও। মন্টিসরী অথবা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়ে, দুর্বিনীত, ইঁচড়েপাকা, উদ্ধত-বলদ হবার সাধনাতে বাবা-মা এবং একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ব্রতী হতে হয় না, বাবা-মা এবং শিশুদেরও অসংখ্য বিনিদ্র রাত্রির সাধনায়। মাসাইদের পালিত বলদরা নিজ-চেষ্টা-রহিত সহজ, সাধারণ জন্ম-বলদ। বাবা-মার কষ্টার্জিত অর্থব্যয়ের পর নিজেদের শৈশব এবং কৈশোরকে গলাটিপে মেরে অত্যন্ত বক্র-প্রক্রিয়ায় তাদের মডেল-স্কুলের বলদ হয়ে উঠতে হবে না যে এইটেই মস্ত বাঁচোয়া।

মাসাইদের জীবনে গবাদি-পশুর স্থান যে কত উঁচু জায়গায় তা এতক্ষণেও প্রাঞ্জল না হয়ে থাকলে একটি গানের বাণী উল্লেখ করি। একজন মাসাই সুন্দরী তার যুবক, সুপুরুষ, সুন্দর মুখের, দীর্ঘাঙ্গ যোদ্ধা-প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে এই গানটি গেয়েছিল। গানটি হলো ঃ

"মী ওসিংগালিও কিসিয়াজে নেমী এঙ্গোপিরো নাত্রি এল্পাটিট, কিসিয়াজে ইল্যুইটং ওসেরু লাআল্যারাম্ ওনারি ইরেপেটা।"

মানে হল, "নাগর হে! তোমার নাচ দেখেও ভুলিনি, তোমার ঝাঁকড়া কালো চুলে গোঁজা উটপাখির কালো পালকের উড়ান্-নাড়ান্ দেখেও নয়; ভুলেছিলাম তোমার গবাদি-পশুর বিরাট দলটি দেখেই, যে-দল বন বাদাড় ভেঙ্গে দূর্বা মাড়িয়ে দুর্বার গতিতে পথ চলে, যারা অরণ্য গভীরের বন-পথকে পরিচ্ছন্ন করে রাখে। আমার আসল প্রশংসা তাদেরই জন্যে।"

মাতৃস্তনের পরই শিশুকাল থেকে মাসাইদের প্রধানতম খাদ্য পানীয়ই হচ্ছে গবাদি-পশুর দুধ। ঘিও খায় তারা। দুধ কিন্তু কখনই ফুটিয়ে খায় না। ঠাণ্ডা দুধ খায়: অথবা

www.BanglaBook.org

বেশীক্ষণ রেখে টক হয়ে গেলে। সচরাচর, বধ করেও কোনো গবাদি-পশু তারা খায় না। বিশেষ বিশেষ পরবের সময় বা পারিবারিক উৎসবের সময় ছাড়া। পশুর রক্তও খায়। কিন্তু মৃত পশুর রক্ত খায় কিছু উৎসবেরই সময়। নইলে জ্যান্ত গরু-বলদেরই রক্ত খায়। একটা বিশেষ কায়দা করে পশুদের কাঁধের একটা মোটা শিরাতে তীর ঢোকায় আলতো করে। টাটকা কাঁচা রক্ত যেই ফিনকি দিয়ে ছোটে অমনি পশুটির গলাতে "টার্নিকেট্" করে দেয়। দিয়ে "কালাবাশ"-এ রক্ত জমিয়ে রেখে চোঁ-চুমুক দিয়ে খেয়ে নেয়। কেউ কেউ বা রক্তর ফোয়ারতেই মুখ পেতে রেখে রক্ত খায় তাদের কুচকুচে কোয়ার্টজাইট পাথরের মতো কালো বুকে টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়ে মুখ থেকে।

জানোয়ার বলি হয় তখনই যখন বাড়িতে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, কারো বিয়ে হয়, যোদ্ধারা বল-সঞ্চয় করতে অরণ্য-গভীরের নির্জন বাসে যখন যায়; অথবা পরিবারের কেউ যদি অত্যন্ত অসুস্থ হয়। পরব ও উৎসবের সময়ে গবাদি-পশুর মাংস খাওয়ার কথা তো আগেই বলেছি।

মাংস আর দুধ কিন্তু একই সঙ্গে মাসাইরা কখনওই খায় না। ওদের ধারণা মাংস আর দুধ একই সঙ্গে খেলে "টেপ্ওয়ার্ম" হয় পেটে। গাই-বলদের পেট-ফোলা রোগ হয়, অভিশপ্ত হয় তারা। ওরা মনে করে যে জীবন্ত অবস্থায় যে গরুর দুধ তারা খেয়েছে মৃত অবস্থায় তার মাংস খাওয়া নেহাৎই বেইমানি। নিতান্তই ছোটলোকের মতো কাজ। তাই তারা ঠিক করে নেয় কোন্ গরুর দুধ বা রক্ত খাবে আর কোন্ গরুর মাংস। পশুর রক্ত বর্ষাকালে খায় না ওরা। শুখা-সময়ে যখন গরুদের বাঁটে দুধ থাকে না তখনই ঐভাবে গরুকে না-মেরে তার রক্ত খেয়ে পুষ্টি জোগায়।

যখন ছেলে বা মেয়ের ছুন্নৎ হয়, যখন মেয়েরা প্রসব করে, অথবা যখন কোনো যোদ্ধা আহত হয় অথবা বুনো পশুর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত; তখনও হৃত-রক্ত পূরণের জন্যে তারা রক্ত খায়। ইদানীং অবশ্য রক্তের বদলে ভুট্টা এবং জল দিয়ে একধরনের ক্বাথ্ তৈরী করে তাদের খাওয়ানো হয় দেখেছি।

গবাদি-পশু-নির্ভর জীবন বলেই মাসাইদের জীবনে ঘাস-এর ভূমিকা অত্যন্ত বড়।

প্রচণ্ড খরার সময়ে মেয়েরা তাদের পোশাকে ঘাস বেঁধে শোভাযাত্রা করে যায় ঈশ্বরের প্রতিভূর কাছে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানাতে। যদি কোনো মাসাই যোদ্ধা (এই যোদ্ধাদের কথা পরে বিশদভাবে বলছি, এদের বলে 'মাআ' ভাষায় "ইল্মোরাণ্"।) কোনো বালককে মারধোর করে গোচারণ ভূমির মধ্যে (এবং তাদের বল ক্ষমতা দেখাতে যা তারা প্রায়ই করে থাকে) তখন যদি সেই বালক এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে এই বলে সে "সবুজ ঘাস! সবুজ ঘাস! আমাকে বাঁচাও!" এবং যোদ্ধা যদি দেখতে পায় যে ছেলেটির হাতে ঘাস সত্যিই রয়েছে তবে সে সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়।

মাসাইদের এক গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ যখন হয়; যুদ্ধের সময়ও, অন্যত্র যেমন সাদা পতাকা উড়িয়ে শান্তি কামনা করা করা হয়, বোঝানো হয় "TRUCE", মাসাইদের দেশেও যুদ্ধের মধ্যে যদি কোনো পক্ষ শান্তি স্থাপন করতে চায় তাহলে তাদের দলের কোনো

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যোদ্ধা হাতে এক-গোছা ঘাস নিয়ে শত্রুপক্ষকে দেখিয়ে হাত তুলে উঠে দাঁড়ায়। শত্রুপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে দেয় সেই সবুজ ঘাসের প্রতীকী শান্তি প্রস্তাবে।

যদি কোনোও মাসাই অন্য মাসাই-এর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলেও হাতে ঘাস নিয়ে হাত তোলে সে। যদি কেউ তা সত্ত্বেও ক্ষমা না করে, তবে সেই দু'জনকে মাসাইরা বলে "এন্‌ডোরোবো"।

"এন্‌ডোরোবো" কথাটার মানে অবশ্য অন্য। যে-সব উপজাতিদের গবাদি-পশু নেই অথবা যাদের জীবিকা কৃষি বা অন্য কিছু, তাদেরই মাসাইরা 'অমানুষ' হিসেবে গণ্য করে বলে "এন্‌ডোরোবো"। "এন্‌ডোরোবোই" হচ্ছে ঘৃণার অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা। সেই অভিব্যক্তিতেই ভূষিত করে তারা সেই দুর্জনকে।

ঘাসের ভূমিকা, মাসাইদের জীবনে সত্যিই খুব বড়ো। তাদের প্রার্থনাতে তারা বলে : "এন্‌গাই। তোমার কাছে শুধু এইটুকুই প্রার্থনা। আমাদের গবাদি-পশু আর ঘাস দাও। ঘাস যদি না থাকে তাহলে তো গবাদি-পশুও থাকবে না। আর তারা না থাকলে, থাকবো না তো আমরাও। তাই আমাদের ঘাস আর গবাদি-পশু দাও।"

পুব-আফ্রিকার বিস্ময় জাগানো "মাআ" ভাষাভাষী মাসাই পুরুষদের এবং মেয়েদেরও জীবন খুবই বৈচিত্র্যময়। ওদের পৌরুষময় জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের শহুরে পুরুষদের জীবনকে বড়ই জোলো জোলো লাগে। নারী-স্বাধীনতাও ওদের সমাজের এক এমন স্বীকৃতি পেয়েছে যে মাতৃস্থানীয়রা পুত্রের বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গম করলেও তা অমার্জনীয় বলে গণ্য করা হয় না। ব্যাপারটা ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নে না গিয়ে বলব যে এমন ঘটনা যে ঘটে সে সম্বন্ধে ওদের সমাজ উদার ভাবে সচেতন। শহুরে আমাদের মতো ভন্ডামিকে ওরা জীবনের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখেনি। ওরা যা, ওরা তা। তাই মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে পুব-আফ্রিকাতে মাসাইদের দেশে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে, কেন যে ছাই আমাদের কলকাতা শহরে জন্মাতে গেলাম।

ওদের পুরুষদের জীবনে চারটি প্রধান উৎসব বা অনুষ্ঠান। প্রথম হচ্ছে "আলামাল্ লেঙ্গিপাআটা"। ছুন্নৎ করার কিছুদিন আগে ঐ অনুষ্ঠান হয়। তারপর "এমোরাটা" ঃ অর্থাৎ আসল ছুন্নৎ-অনুষ্ঠান, যা পুরুষদের যোদ্ধার জীবনে অভিষিক্ত করে।

'এমোরাটার' পর পুরুষেরা "ইল্‌মোরাণ্" বা তরুণ যোদ্ধা হয়ে ওঠে কিছু সময়ের মধ্যেই। মাসাইদের জীবনে এই "ইল্‌মোরাণ্‌রা" এক আশ্চর্য আসন দখল করে থাকে। পুরুষের জীবনের এই ফালিটুকু অবিসংবাদী ভাবে শ্রেষ্ঠতম সময়। তাই ইল্‌মোরাণ্ অবস্থা থেকে তাদের যখন অবসর নিয়ে বয়স্ক যোদ্ধাদের দলে ভীড়তে হয় সেই পর্বর "ইউনাটো" উৎসবের সময়ে অনেক অসমসাহসী বীরও হাউ-হাউ করে কাঁদে কারণ সাহসিকতা উদ্যমে বাঁধ ভাঙা স্বাধীনতা, অবাধ নারী সম্ভোগ এবং সকলের গর্বর কারণ থাকে তারা 'ইল্‌মোরাণ্" থাকার সময়ে।

এমারোটার পর আসে ইউনাটো ঃ তরুণ যোদ্ধার জীবনের পর বয়স্ক যোদ্ধার জীবন।

তারও পরে "ওল্‌গেনশেরর্", সমাজে পুরোপুরি বৃদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎসব। ওল্গেনশেরর্-এর পরেই সেই বৃদ্ধরা সমাজের বাহু থেকে মস্তিষ্কে উন্নত হয়। পরামর্শদাতা, সাদা-চুলের কুঞ্চিত চামড়ার; ধীর-স্থির সার সার প্রায় স্থবির বৃদ্ধ।

এই চারটি অনুষ্ঠানেই কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। যা ব্যতিক্রমী নয়। যেমন ন্যাড়া হওয়া। থুথু-ছেটানো এবং থুথু দেওয়া আশীর্বাদের বন্যাবওয়ানো, পশুবলি, আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ এবং শরীর-রঞ্জন, গান নাচ এবং ভোজ। এইসব আচার অনুষ্ঠানেরও আবার অনেক ভাগ আছে। ভাগে ভাগেই তা অনুষ্ঠিত হয়।

যাঁরা মাসাইদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এমন একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি যে—"কেন হিন্দুদের বর্ণাক্রমেরই মতো বিভিন্ন ভাগ দেখা যায় ওদের মধ্যে?" তাঁরা বলেন যে, মাসাইরা নিজেরাও বলতে পারে না কেন এইসব অনুষ্ঠান ঐরকম ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে' কেন হয়'? এই প্রশ্নটাই বোকামির নামান্তর।

এইসব উৎসব আবার বিশেষ বিশেষ পূর্ব নির্ধারিত 'ক্রমে' অনুষ্ঠিত হয়। যেমন 'ওল্গেনশরর্' উৎসব সবচেয়ে প্রথমে 'ইল্কিসোঙ্গোদের' হবে তারপরই হবে অন্য সকলের। আবার 'আলামাল্ লেঙ্গিপাআটা' উৎসবের সময় সবচেয়ে আগে ইল্রীইকোনীয়কি দের তারপর অন্য সব উপগোষ্ঠীদের।

মাসাইরা কিন্তু খুবই দৃঢ় সংস্কারবদ্ধ, নিজস্ব ধর্ম ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে গোঁড়া; এবং অত্যন্ত গর্বিত উপজাতি। তবে আমাদের দেশের অনেক আদিবাসীদের সমাজেও ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে যা ঘটেছে এবং ঘটছে। লাল ট্রাউজার, নীল ফুল-সার্ট এবং হলুদ প্লাসটিকের চিরুনী, ট্রানজিস্টার, পলিয়েস্টারের পোশাক, মূল্যবোধহীনতা, ভোগ্যপণ্যের লোভ আমাদের দেশের সাধারণ সরল সুখী মানুষদের যেমন করে আচ্ছন্ন করে তাদের আত্মিক সর্বনাশ করছে মাসাইল্যাণ্ডেও তাই-ই ঘটেছে। এই অপ্রতিরোধ্য, নগ্ন, লোভী, আগ্রাসী, হিতাহিতজ্ঞানহীন তথাকথিত আধুনিকতা এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিজ্ঞান-মনস্কতা ভারতীয়দের মতো মাসাইদেরও ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। তবে মাসাইরাও, আমাদের গোঁন্দ, খন্দ, মুণ্ডা, বীরহোর, গুর্জর, ওঁরাও, কোল, ভীল, সাঁওতাল কোলহোদেরই মতো তাদের স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে এই সভ্য গৃধ্নু সমাজের চাপে পড়ে বিসর্জন দেবে কি দেবে না তা এখুনি বলা যাবে না। তবে আমার মনে হয় মাথা উঁচু, ঋজু মাউন্ট মেরু বা গোলমাথা অতিকায় শিবলিঙ্গর মতো মাউন্ট কিলিম্যান্জারো বা মাউন্টেইন অফ দ্যা ম্যান, বা মাউন্টেইন অফ দ্যা গড্, চাঁদের পাহাড় বা দেবতার পাহাড়; এসবই হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মৃত আগ্নেয়গিরি গোরোংগোরোর গায়ে, বর্ষার বা শীতের বিকেলে, জাপটে থাকা মেঘের অথবা কুয়াশাইরই মতো শুধু ফেলে আসা স্মৃতির ম্লান চিহ্ন হয়েই থেকে যাবে। এটা ভাবলেও কষ্ট হয়। এই আধুনিক সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে এই যে আমরা যেটাকে ঠিক বলে জানি সেটাই যে একমাত্র ঠিক এই বিশ্বাসে ভর করেই বেঁচে থাকি। আমার ব্লাড-সুগার বা ব্লাড-ক্লোরোস্ট্রেরলই অন্য সকলের সুস্থতা বা অসুস্থতার মানদণ্ড। আমাদের ভালোটাই পৃথিবীর সব মানুষের পক্ষে অবশ্যই ভালো। সে সম্বন্ধে আমাদের কোনোই দ্বিমত নেই। এটাও দুঃখের।

www.BanglaBook.org

আধুনিক, বিজ্ঞান-মনস্ক কমপ্যুটার গর্বিত পৃথিবীর একজন প্রাচীন, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসী হিসাবে আমার চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, এ ঠিক নয়! এ ঠিক নয়! প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ, প্রত্যেক গোষ্ঠী বা জাতই তাদের নিজের বা নিজেদের মনই ঠিক করবে কিসে তার সুখ, কিসে তার আনন্দ। এটা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই অভিপ্রেত নয় যে টিভি বা ইডিয়েট বক্স-এর বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো দেশের ভালো-মন্দর শুভ-অশুভর সংজ্ঞাই তার নিজের মস্তিষ্কেরই বিকল্প হয়ে উঠুক।

কিন্তু আমার এইসব কথা শুনছে কে? আমি জানি আমার বাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালী, আমার ভারতের কোল, ভীল, খন্দ, মুণ্ডা, মারিয়া, ওঁরাও, খড়িয়ার, সাঁওতাল, বীরহোর, গুর্জর, শবর, কোল্‌হো এবং অগণ্য অন্য আদিবাসীরা যেমন করে তথাকথিত ইংরিজি-শিক্ষিত উচ্চম্মন্য, মেরুদণ্ড এবং সততাহীন, সীমাহীন লোভ এবং অদূর-দৃষ্টিতে সম্পূর্ণই ভ্রষ্ট মুষ্টিমেয় শহরবাসীর মিথ্যাচারে তাদের সবকিছু ভালোত্ব, তাদের বুকের শান্তি, মনের সারল্য, চাহিদাহীন জীবনের নির্মোক ছিঁড়ে এই শহুরে লোভের জীবনের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজেদের অতীত এবং বর্তমানকে পুরোপুরিই নষ্ট করতে বসেছে, অনেকে করেছে হয়তো নিরুপায় হয়েই।

যা কিছু সরল, স্বাভাবিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত, যা-কিছুই প্রকৃতিসম্পর্কিত তার সব কিছুই নিঃশেষে নষ্ট করে দেবে বলে এক সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে আজকের পৃথিবীর সর্বজ্ঞ আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্করা। তাঁরা জানেন না যে নিজেদের এবং তার সঙ্গে আমাদেরও প্রত্যেকের কবরই খুঁড়ছেন তাঁরা। অক্লান্ত পরিশ্রমে। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যি তা সাম্প্রতিক-ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবেই। তবে তখন অনেকই দেরী হয়ে যাবে হয়তো। করার কিছুই আর থাকবে না।

মাসাইরা ছিল 'এন্‌গাই'-এর স্নেহধন্য। মাউন্ট 'লেন্‌গাই'-এর ছায়াধন্য। তারা ছিল স্বরাট, স্বমহিম। তারাও আমাদের এই মহান দেশের সরল, চাহিদাহীন, সুখী ঘাম ঝরানো মেহনতের রুজিতে এবং নাচে-গানে মুখর অনেকানেক আদিবাসীদেরই মতো পথভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের নষ্ট করতে বসেছে। তারাও নিরুপায়। নষ্ট করছে এবং আমাদের মতো জ্ঞানপাপী নিরুপায় সাক্ষীদেরই চোখের সামনে।

আজ থেকে কুড়ি বছর পরে পুব-আফ্রিকাতে গেলে হয়তো মাসাই নামের এক সুন্দরতম শরীরের গর্বিত বিশিষ্ট উপজাতির প্রতিভূকে দেখতে হবে তান্‌জানীয়ার রাজধানী ডার-এস্‌-সালাম বা কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবির কোন পাঁচতারা হোটেলে স্যুটেড-বুটেড রক্ষী বা পরিচারক বা অন্য সওদাগরী অফিসের টেবলের সামনে-বসা অন্যের কাঁড়িকাঁড়ি টাকার হিসেব সামলানো ন্যুব্জ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে।

প্রত্যেক বন ও পাহাড়বাসী সুখী প্রজাতি এবং উপজাতিকে নষ্ট করেছে তাদেরই মুষ্টিমেয় স্বজনেরা। মীরজাফর আর জয়চাঁদেরা শুধু যে ভারতেই জন্মেছে এমন নয়। ইতিহাস তাই-ই বলে।

www.BanglaBook.org

"ইল্‌মোরাণ্‌" বা মাসাই যোদ্ধারা

পুরুষদের স্বপ্নের যুগ।

ছুন্নৎ হবার কিছুদিন পরেই মাসাই তরুণরা যোদ্ধার জীবনে প্রবেশ করে। সে এক স্বপ্নের যুগ। তাদের আগের প্রজন্মে যে-তরুণরা যোদ্ধা হয়েছিল এবারে তারা পূর্ণযৌবনের শেষভাগে এসে বয়োজ্যেষ্ঠ যোদ্ধা হবে। বিয়ে করারও সময় হয়েছে এবারে তাদের। এই নতুন তরুণ যোদ্ধারা এবারে কর্তৃত্ব পাবে সমাজের। এবং নিজেদের বীরত্ব প্রমাণ করার সুযোগও। মাসাই সমাজের পুরুষদের জীবনের সবচেয়ে ভালো এবং প্রার্থিত সময়ই হচ্ছে এই প্রথম দলের টগবগে-যৌবনের যোদ্ধা হওয়া। যাদের বলে "ইল্‌মোরাণ্‌"।

কোনো মাসাই-ই যোদ্ধার জীবন থেকে অবসর নিতে চায় না। কারণ তারা বীরের জাত। চরৈবেতিতেও বিশ্বাস করে তারা। যাযাবরের রক্ত তাদের ধমনীতে বইছে। বিয়ে করাটা তো একধরনের থিতু হওয়ারই ব্যাপার। মাসাই-এর রক্তেই যাযাবর বৃত্তির উন্মাদনা। আর তরুণ যোদ্ধারা তো নবযৌবনেরই দল। রক্তে তাদের খ্যাপামি। আদৌ 'ভালোমানুষ'ও নয় তারা রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীর অর্থে। তাই হা-হুতাশে ভরে দেয় মানীয়াট্টার আকাশ বাতাস যখন তরুণতরদের হাতে মূল যোদ্ধাদের দলের সম্মান ও শিরোপা তুলে দিয়ে যৌবনের পেছনের সারিতে সরে আসতে হয় তাদের। আগের প্রজন্মের "ইল্‌মোরাণ্‌রা" ইউনাটো হয়ে যায় আর ইল্‌মোরাণ্‌দের নতুন দল এসে তুলে নেয় ভার তাদের হাত থেকে। "ইল্‌মোরাণ্‌রা" এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকে পুরো মাসাই-সমাজে। কোনো কঠিন কাজ করার থাকলে, সে কোনো জবরদস্ত বলদ বা ষাঁড়কে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্নিত করার জন্যে ধরাশায়ী করবার সময়েই হোক, কী গণ্ডারে "ক্রাল"-এর বেড়া ভেঙে দিলে তা মেরামত করার জন্যেই হোক অথবা সিংহের মুখ থেকে গবাদি-পশুকে রক্ষা বা অন্য গোষ্ঠীর পশু-চোরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেই হোক, ইল্‌মোরাণ্‌দেরই ডাক পড়ে। কোনো কঠিন কাজ বা বিপদ ঘটলেই মাসাইরা বলে, ধারে কাছে "ইল্‌মোরাণ্‌" নেই নাকি আজকে একজনও?

ইল্‌মোরাণ্‌রাই পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক এবং প্রাচীন মানুষদের তারুণ্যের আদর্শ। তারুণ্য এমন জয়মাল্য আর কোথাওই পায়না, হয়তো স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে।

অসমসাহসিক সব কাজ সমাধা করার পর কেউ কোনো "ইল্‌মোরাণ্‌"কে প্রশংসা করলে চোখ নিচু করে লাজুক মুখে, সেই সুন্দর, সবল যোদ্ধা বলে, "এই তো

www.BanglaBook.org

ইল্মোরাণ্দের কাজ।"

ঈশ্বর ছাড়া ইল্মোরাণ্রা আর কাউকেই ভয় পায় না। ইল্মোরাণ্ হবার পরই সেই নবীন যুবকদের যৌবন, আত্মবিশ্বাস যেন এক অন্য পূর্ণ মাত্রা পায়। ওদের মন বলে সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বিপদ আপদ দূরিত হবে যতক্ষণ আমরা এখানে আছি।

'ইল্মোরণ্রা ভাবে যে, ওদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা এইটুকুই যে "আমরা সাহসী হব, বুদ্ধিমান হব, দুর্দান্ত প্রেমিক হব, চমৎকার বুঝদার মেয়েদের কাছে পরম রমণীয় কিন্তু অসীম শক্তিশালী হবে আমাদের শরীর। আমরা হব রাগী উদ্ধত কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না কখনই। সমাজ যখন আমাদের উপর পুরোপুরিই বিশ্বাস করেছে, আমাদের দিয়েছে মান, সম্মান, তার সর্বোত্তম নারীদের ভোগ করার অবাধ অধিকার, তখন সেই পূর্ণনির্ভরতার প্রতিদানে, তার নিরাপত্তার কারণে, আমরা এই নশ্বর প্রাণ দেবই না বা কেন?"

বহুবর্ণ-এন্গাই এর আশীর্বাদ এবং ওদের সমাজের আশীর্বাদধন্য ওদের অফুরন্ত যৌবনের মিশেলে ওরা মানসিকভাবে সমস্ত অসাধ্যই সাধনের জন্যে পণ করে। আর মানুষ যদি কিছু পেতে চায়, তবে দেবতা বা দৈত্য কেউই সেই প্রাপ্তির পথে বাধা হতে পারে না। "ইল্মোরাণ্রাই" সমস্ত পৃথিবীর তরুণদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমি নিজে "ইল্মোরাণ্" হতে পারলে জানতাম যে এই জীবন সার্থক হয়েছে।

রাতের বেলা, 'ইল্মোরাণ্'দের মানীয়াটার কাছে অথবা 'ক্রাল'-এর কাছে যখন সিংহ প্রচণ্ড আস্ফালনে ডেকে ফেরে তখন ইল্মোরাণ্রা দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, "রাতটা পোহাক্। ভোরের আলো ফুটলেই তোমাকে খুঁজে বের করে শেষ করব আমরা। এবং এই আস্পর্ধার যোগ্য শিক্ষা দেব। আমরা হচ্ছি তরুণ যোদ্ধা। এখানে আমরাই হচ্ছি সবচেয়ে বড়। দন্তমুন্ডের কর্তা সিংহরাজ তোমার রাজ্যপাট অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও হে সিংহ মশাই।"

নিজেদের মধ্যে 'ইল্মোরাণ্রা" বলাবলি করে, "যতদিন না সিংহ তার নিজের মাংসের রোস্ট খেতে পাচ্ছে, কাঁচা মাংস খাওয়া বন্ধ না করছে, ততদিন আমাদের সঙ্গে লড়ে তার জেতার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।"

তারা এ কথাও বলে যে, "সিংহ আমাদের চেয়ে বেশি জোরে দৌড়াতে হয়তো পারে, কিন্তু আমরা যতক্ষণ এবং যতদূর পর্যন্ত দৌড়তে পারি, ততদূর পর্যন্ত তো সে কখনই দৌড়াতে পারবে না!"

মাসাই যোদ্ধা, এই তরুণ অকুতোভয় 'ইল্মোরাণ্দের" বীরত্বর কত গল্পই না ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ইয়োরোপীয়ানদের লেখা বইতে, তার ইয়ত্তা নেই। মাসাইদের রূপকথাও ভরে আছে "ইল্মোরাণ্দের" বীর-গাথাতে।

জার্মান লেখক কার্ল পিটারস্ লিখেছিলেন,

—'ইল্মোরাণ্রা" তাদের সমান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যারা যুদ্ধ করে সেইসব মানুষকে এবং হাতি গণ্ডার বা সিংহের মতো ভয়াবহ পশুদেরও কাউকেই বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ওরা

www.BanglaBook.org

ভয় করে, শুধু তাদের হাতিয়ারের তুলনায় অসম এবং অশেষ শক্তিধারী আধুনিক রাইফেলের বুলেটকে। যে-বুলেট সমতা এবং বীরত্বের চিরায়ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী এই মানুষদের বুক লক্ষ করে ছোঁড়ে বিদেশীরা চরম ভীরুরই মতো। বিদেশীদেরও তারা একটুও ভয় পায় না। ভয় পায় না স্যুটেড-ব্যুটেড কোনো মানুষকেই।

আমি নিজে দেখেছি যে, এন্‌গোরোংগোরোর মাসাইদের ফোটো তুলতে যেতেই আমার জীপের ড্রাইভার হাঁ! হাঁ করে উঠেছে। বলেছে, কক্ষনো ওরকম করবেন না। বিনা বাক্যব্যায়ে ওরা তীর বা বল্লম ছুঁড়ে আপনাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। ওরা তো আর জন্তু নয় যে ওদের ফোটো তুলবেন আপনি!

মৃত এন্‌গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের গহ্বরে নামার সময়ে আমার জীপের কিকুয়ু ড্রাইভার কুয়াশাঘেরা প্রদোষে পাহাড়ী পথের ভয়াবহতায় জীপ চালাতে যতখানি না ভীত ছিল তার চেয়ে অনেকই বেশি ভীত ছিল এই ভয়ে যে, পাছে আধো-অন্ধকারে পথের কোন বাঁকে মাসাইদের কোনো গরুর গায়ে তার জীপ ধাক্কা মারে।

গন্ডার বা সিংহকে ধাক্কা দিলেও যদি বা রক্ষা থাকে মাসাইদের গরুর গায়ে ধাক্কা দিলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা প্রায় দুঃসাধ্যই।''

বিদেশীদের মাসাইরা ঘৃণার সঙ্গে বলে 'ইল্‌মিক্'। "মাআ" ভাষায় শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিদেশী। আরও একটি হাস্যকর অভিব্যক্তি আছে ওদের বিদেশীদের জন্যে। তা হল, "ইলোরিডাআ এনজেক্যাট্"। অর্থাৎ, যারা তাদের পোশাকের মধ্যে শরীরের সব দুর্গন্ধই জমিয়ে রাখে। যাদের পোশাকে অবস্থিত গন্ধ বেরোনোর জন্য কোনো ফাঁক-ফোকরই থাকে না, তেমন বিদেশীদেরই ওরা বলে, "ইলোরিডাআ এনজেক্যাট্"। যেমন ব্রিটিশ বা জার্মানরা। তাদের ট্রাউজারে তো ফাঁক-ফোঁকর থাকে না মাসাইদের টোগার মতো। মাসাইদের ঢিলে-ঢালা রোমানদের মতো পোশাক 'টোগাতে' অবস্থিত গন্ধ বেরিয়ে যাবার কোনোরকম অসুবিধেই নেই।

তরুণ মাসাই যোদ্ধা বা 'ইল্‌মোরাণ্‌রা'' বয়স্কদের সম্মান করে অবশ্যই কিন্তু বুড়োরা অন্যায় কিছু বললে তারা তা মেনে নিতে আদৌ রাজি থাকে না। গণতান্ত্রিক দেশের লোকসভার সদস্যরাও অনেক "প্রেরোগেটিভ"-এর অধিকারী। 'ইল্‌মোরাণ্‌রাও তাই''। তবে ভারতীয় গণতন্ত্রের লোকসভার সদস্যদের সঙ্গে তফাৎ এইই যে, 'ইল্‌মোরাণ্‌রা'' সেইসব সুযোগ-সুবিধার বদলে সমাজকে যা দেয় তাতে সেই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারীদের কোনোরকম তাচ্ছিল্য বা অসম্মান করার ইচ্ছা বা মানসিকতাও থাকে না মাসাইদের কারোরই।

একজন বয়স্ক মাসাই একবার এক যোদ্ধাকে বলেছিল "যা বলি তা শোনো", "লেন্ড মী ইউর ইয়ারস্" অথবা 'ইন্‌জোকি ইনাগিইয়া ইনী"। এই কথা বলামাত্রই সেই তরুণ যোদ্ধা তার নিজের কানের লতিটিই কেটে সেই হতভম্ব বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছিলো। "ডোন্ট কেয়ার করে"।

এই তরুণ যোদ্ধারা এমনই গর্বিত ও উদ্ধত যে প্রাণের দাম তাদের মান বা ইজ্জতের

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে কিছুমাত্রই নয়।

একবার মাসাইদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জোর লড়াই চলেছিল। সেই সময় তান্‌জানীয়ার একজন ইল্‌কিসেঙ্গে যোদ্ধা একটা সিংহকে মেরে রণক্লান্ত হয়ে গাছতলায় সেই সিংহের পেটকে বালিশ করে তাতে মাথা রেখে দুপুরবেলায় আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। এমন সময় শত্রুগোষ্ঠীর একদল যোদ্ধা তাকে শায়িত অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে একাধিক যোদ্ধা তাকে মেরে ফেলার জন্যে চুপি-চুপি এগিয়ে যায়। প্রেমে আর যুদ্ধে তো ন্যায়ের বালাই নেই কোনো! হঠাৎ সেই ইল্‌কিসেঙ্গে যোদ্ধাটির ঘুম ভেঙে যায়। হয়তো ষষ্ঠ বোধেই। কিন্তু অনেকই দেরী হয়ে গেছিলো ততক্ষণে। সে উঠে পড়ে হাতে অস্ত্র নেবার আগেই তাকে বল্লমের এক আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। ঠিক সেই সময়ে শত্রুপক্ষ যে নেতা, সে তার দলের অন্য যোদ্ধাদের নিরস্ত্র শায়িত সেই অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষকে নিধন করতে বারণ করে। ইল্‌কিসেঙ্গে যোদ্ধাটির ভয়শূন্য, ডোন্ট-কেয়ার, দুঃসাহসী ভাবে শ্রদ্ধাবান হয়ে। কিন্তু ইল্‌কিসেঙ্গে যোদ্ধাটি উঠে বসেই তার পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে দেবার জন্যে শত্রুপক্ষের নেতাকে ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা উল্টে গালাগালিই করতে থাকে তাকে। সে রেগে গিয়ে বলে, কে তোমার দয়া চায় হে? ওরা আমাকে মারছিল তো মারতে দিলেই পারতে! আমি কি তোমার শালা না ভগ্নীপতি? ফালতু লোকের দয়া-ক্ষমায় আমার থোড়াই দরকার।

সাহস ছাড়াও "ইল্‌মোরাণ্‌"দের আরো অনেকই গুণ থাকে। তাদের "কমরেড্‌শিপ্‌" দৃষ্টান্তস্বরূপ। খাদ্য থেকে নারী সব কিছুই তারা সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ইল্‌মোরাণ্‌রা কখনও একা একা খায় না। যদি একা কোনো ইল্‌মোরাণ্‌কে কেউ খেতে দেখে তাহলে তার চেয়ে বেশি লজ্জাকর আর কিছুই নেই তার পক্ষে। এক একজন অবিবাহিতা মেয়ের তিনজন করে যোদ্ধা প্রেমিক থাকে। প্রথম জন মানীয়াট্টায় থাকলে সেই মেয়ে প্রথম জনের সঙ্গেই সঙ্গম করে। সে না থাকলে তবেই দ্বিতীয় জনের সঙ্গে। দ্বিতীয় জন না থাকলে তৃতীয় জনের সঙ্গে, চতুর্থ বা পঞ্চম বা আরো অনেকের সঙ্গেই সে সঙ্গম করতে পারে, কিন্তু ঐ তিনজনের একজনও উপস্থিত থাকতে অন্য কেউই তার সঙ্গে সঙ্গম করবে না। সেও রাজী হবে না। অবশ্য এই তিন প্রেমিক নির্বাচন করে সেই মেয়েই। বলা বাহুল্য, 'ইল্‌মোরাণ্‌'দের অনুমতি নিয়েই। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিয়ের আগেই সব মাসাই মেয়েই দ্রৌপদী।

ইল্‌মোরাণ্‌রা একা একা খাবে না এই নিয়ম করেছে তাদের সমাজ এইজন্যে যাতে যে যোদ্ধা গরীব ঘর থেকে এসেছে সেও তার বড়লোক সহযোদ্ধার সঙ্গে একই রকম খাবার ভাগ করে খেতে পারে। নিয়মানুবর্তিতা এবং সমতা সহযোদ্ধাদের মধ্যে দৃঢ় করতেই এই নিয়ম করা হয়েছে।

যোদ্ধারা শুধু যোদ্ধাই। তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই। নেতৃত্বও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। যোদ্ধাদের মধ্যে থেকে সহযোদ্ধারা নিজেরাই একজনকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। এই নেতৃত্ব বিশেষ গুণনির্ভর। সাহসিকতা তো বটেই, সাহস ছাড়াও

www.BanglaBook.org

বাগ্মিতা, বুদ্ধি এইসব গুণও নেতা-নির্বাচনের সময় বিবেচ্য হয়।

একা একা খাওয়া তো বারণই এমনকি নিজের গরুর দুধ বা রক্ত খাওয়াও কোনো কোনো গোষ্ঠীর যোদ্ধাদের বারণ, যাতে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার বা লোভ বা অহং না জাগতে পারে সেই কারণে। যোদ্ধাদের সততাও কিংবদন্তী হয়ে থাকে সব গোষ্ঠীর মধ্যেই।

উনিশশো চুয়ান্নতে অ্যামেরিকান ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি থেকে একদল অভিযাত্রীদের পাঠানো হয়েছিল মাসাইদের উপরে কাজ করার জন্যে। ওঁদেরই মধ্যে একজন এড্‌গার এম কুইনী, ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক জার্নালে, মাসাইদের এবং বিশেষ করে যোদ্ধাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অনেক কিছু লিখেছিলেন। উনি লিখেছিলেন যে ইল্‌মোরাণ্‌দের সাহস এবং উৎকর্ষের মাত্রাই হের-ফের হয় শুধু একে-অন্যের মধ্যে। নইলে সকলেই উৎকৃষ্ট। আমাদের কী প্রয়োজন না প্রয়োজন তা তারা মুখে বলার অনেক আগেই বুঝে নিত। এবং তাদের ভব্যতা এবং স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি এমনই যে তাতে আমাদের সমাজে 'ভদ্রলোকের-গুণ' বলতে আমরা যা কিছুই বুঝি তারই সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ বলে মানতে হয়।

সিড়নী হণ্ডি নামে একজন ব্রিটিশ, যিনিই সম্ভবত প্রথম ইয়োরোপীয়ান যিনি মাসাই যোদ্ধাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন, উনিশশো দশ খ্রীষ্টাব্দে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম : 'দ্যা লাস্ট অফ মাসাই'। হয়তো অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মোহিকানস্ উপজাতিদের নিয়ে লেখা, জেমস্ ফেনিমোর কুপার্স-এর লেখা পৃথিবী বিখ্যাত বই ''লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্''-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, মাসাইরা খুবই বুদ্ধিমান। সব কিছুই তারা খুব সহজে শিখে নেয়। জাতি হিসেবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাসাই কখনও মিথ্যা কথা বলে না বা চুরিও করে না। তারা হয়তো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হয় না কখনও কখনও কিন্তু তারা মুখ ফুটে যদি একবার কিছু বলে তবে তাদের সেই কথার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস এবং নির্ভর অবশ্যই করা যায়।

মিথ্যাচার, খলবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি এবং তঞ্চকতা বোধহয় তথাকথিত আধুনিক উচ্চশিক্ষিত জাতিগুলিরই একচেটিয়া অধিকার। সারল্য তো আজকাল গুণ হিসেবে পুরোপুরি বাতিলই হয়ে গেছে সেইসব ঘৃণ্য উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে অনেকদিন আগেই।

যোদ্ধারা তাদের ক্রাল্-এ রোমান্স, উত্তেজনা এবং দুঃসাহসিক অভিযানের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এই আবহাওয়াতে আবালবৃদ্ধবণিতা প্রভাবিত হয়। নেচে গেয়ে তাদের মতো অন্য-গোষ্ঠীর ওপর হাম্‌লে পড়ে তাদের গরু কাড়ার যুদ্ধগুলির কাহিনীকে রূপকথার পর্যায়েই উন্নীত করে তোলে। সিংহর কেশর, উটপাখির চকচকে কালো পালক এবং তাদের গয়না-গাঁটি পরে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শেষ-বিকেলের অথবা প্রথম সকালের আলোতে তারা যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তাদের ব্রোঞ্জে-গড়া সার সার মূর্তিরই মতো মনে হয়। তাদের যাঁরা আগে চোখে কখনও দেখেননি, এবং তাঁদের সম্বন্ধে রক্তহিম করা গল্পই শুনেছিলেন শুধু, দুঃস্বপ্নেই দেখেছিলেন বারবার; তাঁরাও প্রথমবার 'ইল্‌মোরাণ্‌'দের চাক্ষুষ দেখে ভাবেন ''কী আশ্চর্য সুন্দর।''

www.BanglaBook.org

উনিশশো চুয়াত্তরে পিটার ম্যাথিসেন্ একটি বই লিখেছিলেন মাসাইদের সম্বন্ধে। বইটির মান "দ্যা ট্রী হোয়্যার ম্যান ওজ্ বর্ণ"। তাতে তিনি তার এক শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী মিস্টার মাইলস-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। লিখেছিলেন, "মাইলস যিনি পুব-আফ্রিকাতেই জন্মেছিলেন এবং বড়ও হয়েছিলেন, সব সময়ই বলতেন যে ভারী দুঃখ হয় সেইসব পুরোনো দিনের কথা ভেবে যখন আমার প্রায়ই দেখতে পেতাম তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ একক সারিতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গ মাসাই যোদ্ধারা সিংহর কেশর আর উটপাখির কালো পালকে সেজে শোভাযাত্রা করে চলেছে একবারও ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে। আর তাদের বল্লমের ফলাগুলি রোদে ঝিকমিক করে উঠছে।"

আজকে মাসাইদের শিকার করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তান্জানীয়ায় এবং কেনিয়ায়ও। শিকারই যে জাতির প্রাণ, তাদের আনন্দ, তাদের অস্তিত্বর সুস্থতম প্রকাশ তাই এখন দন্ডনীয় অপরাধ। যোদ্ধাদের শরীরগুলিকে বুনো মোষের চামড়া আর সিংহের কেশরে সাজানোও তাই তাদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়েছে।

মাসাইদের দেশে আজও গেলে যোদ্ধাদের বল্লমের ফলার ঝিকিমিকি চোখে পড়ে অনেকই দূর থেকে, আদিগন্ত আকাশের পটভূমিতে তাদের দীর্ঘ শরীরগুলি চোখে পড়ার অনেকই আগে। প্রথম প্রথম জনশূন্য দিগন্তে ঐ ঝিকিমিকি আলো অনভ্যস্তর চোখে সামান্য ভ্রান্তি ভয় এবং অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। যতক্ষণ ঐ বল্লম তাদের হাতে থাকে ততক্ষণ রণে ভঙ্গ দেওয়া বা হার স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করার কথা কোনো মাসাই যোদ্ধা ইল্মোরাণ্ ভাবতে পর্যন্ত পারে না। তার হাতের বল্লমটি তার সর্বক্ষণেরই সঙ্গী। একমাত্র শোয়ার, খাওয়ার বা মেয়েদের আদর করার সময় ছাড়া তাদের হাতের বল্লম এক মুহূর্তের জন্যেও হস্তচ্যুত হয় না। যদি কোথাও বসে থাকে তবে তাদের পাশেই বল্লমটিকে মাটিতে পুঁতে রাখে। ফলাটি থাকে আকাশ-মুখো হয়ে। কেউ যদি তার বল্লমের ফলার দিকটা ভুল করেও মাটিতে পুঁতে দেয় বা তা দিয়ে মাটি স্পর্শ করে তবে মাসাইরা প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে। রাতেরবেলাও মানীয়াট্টার মধ্যে বল্লমকে সে আদরে শুইয়ে রাখে তার নর্মসহচরীরই পাশে। এই বল্লম শুধু যুদ্ধ করার জন্যেই নয়। কখনও বা এই বল্লমের ফলাকে পুঁতি ও রঙিন পাথরের মালা আর কুচকুচে কালো উটপাখির পালকে সাজিয়ে একটি গোল মুকুটের মতো করে রাখে ওরা শান্তির সময়ে। বল্লম ইল্মোরাণ্দের গয়নাও বটে।

মাঝে মাঝেই যোদ্ধারা নির্জন বাসে যায়। তাদের ক্রাল এবং মানীয়াট্টা এবং প্রেমিকাদের ছেড়ে। পাহাড়ের গায়ে কোনো গুহা বা নদী বা ঝোরার পাশে কোনো মনোমতো জায়গা বেছে নিয়ে তারা নারী-বিবর্জিত হয়ে শক্তি ও মনঃসংযোগের জন্যে একসঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকে। সেখানে তারা শিকার করে। যুদ্ধের নানা কলাকৌশল রপ্ত করে। মহড়া দেয়। কখনও বা অন্য গোষ্ঠীর গরু-বলদ কেড়ে আনতে যায়। "মেন উইদাউট উইমেন"-এর একেবারে পরাকাষ্ঠা।

আগেই বোধহয় বলেছি যে তাদের মানীয়াট্টা সচরাচর যোদ্ধাদের মায়েরা নিজে হাতেই

www.BanglaBook.org

বানায়। প্রত্যেক যোদ্ধার মা একটি করে ঘর বানায়। প্রথানুসারে মানীয়াট্টাতে উনপঞ্চাশটি ঘর থাকে। উনপঞ্চাশ, সংখ্যা হিসেবে মাসাইদের কাছে 'লাকী' নাম্বার।

ঘরগুলি মায়েরা যদিও বানিয়ে দেয় কিন্তু সেই নতুন মানীয়াট্টার বেড়া যোদ্ধারা বানায় নিজে হাতেই। আগেই বলেছি যে, যোদ্ধাদের মায়েরাও প্রথমে কিছুদিন মানীয়াট্টায় থাকে। নিজের বিছানা পেতে তারপর ছেলে এবং তার নর্মসহচরীর বিছানা নিজে হাতেই পেতে দেয়। যে কুমারীর ছুন্নৎ হয়ে গেছে তার কিন্তু মানীয়াট্টাতে যাওয়া একেবারেই মানা। যে-সব যোদ্ধাদের বাবাদের মাত্র একটি করে বউ তাদের ছেলেদের নিজেদের মা জোটে না মানীয়াট্টাতে থাকার জন্যে। কারণ নিজের বাড়ির কাজকর্ম ফেলে অনেক সময়ই তার একার পক্ষে ছেলের মানীয়াট্টাতে এসে তার সঙ্গে থাকা সম্ভব হয় না।

মানীয়াট্টা বানানো হয়ে গেলে যোদ্ধারা আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা করে তাদের মায়েদের এবং বান্ধবীদের নিয়ে নিজেদের ক্রাল ছেড়ে মানীয়াট্টায় আসে থাকবার জন্যে। একই মানীয়াট্টা বানাবার সময়তেও আবার লাল গরু আর কালো গরুর গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণের বন্দোবস্ত করা হয়। এক মানীয়াট্টার যোদ্ধাদের সঙ্গে অন্য মানীয়াট্টার যোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্যর প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা থাকে। এনগোরোংগোরোর উঁচু পাহাড়ী এলাকায় দুটি স্থায়ী মানীয়াট্টা ছিল উনিশশো চুয়ান্ন থেকে উনিশশো পঁচাত্তর খ্রীষ্টাব্দ অবধি। একাদিক্রমে প্রায় তিরিশ বছর। সমস্ত মাসাইল্যাণ্ডেই ঐ দুটি মানীয়াট্টার নাম "এমানীয়াট্টা ও কিরটালো" এবং "এমানীয়াট্টা ওলোরিয়েন্" স্মরণীয় হয়ে আছে।

ইয়োরোপীয়ানরা তো করেইছিলেন, এখনকার "এনডোরোবো" নিয়ন্ত্রিত তান্‌জানীয়ান ও কেনিয়ান সরকারও কড়া আইন করে সিংহ শিকার আর অন্য গোষ্ঠীর গবাদি-পশু কাড়া-কাড়ি বন্ধ করে দিলেও এখনও মাসাইরা তা করেই থাকে। যদিও আগের থেকে অনেক কম। এবং লুকিয়ে চুরিয়ে, অরণ্য এবং তৃণভূমির গভীরতম প্রদেশে।

একটি উদ্দাম, স্বাভাবিক বন্য বীরোচিত উপজাতিকে শহরের তথাকথিত মূল্যমানে এবং সভ্যতাতে ঘিরে ফেলে সেই ঘেরাটোপের মধ্যে সামিল করে সভ্য করার চেষ্টা চলেছে। বর্তমান তান্‌জানীয়ান সরকার রাশিয়াভুক্ত। কেনিয়াতে তো এখনও ইংরাজদের প্রতিপত্তি আছে। তান্‌জানীয়াতে পুব-ইয়োরোপের লোকেরাই বেশী আসে ভ্রমণকারী হিসেবে অন্যান্য দেশের মানুষদের তুলনাতে। ভারতীয়রাও অনেকে আছে তান্‌জানীয়া এবং কেনিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের বেশীরভাগই ব্রিটিশ-পাসপোর্ট হোল্ডার এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের প্রায় নেই বললেই চলে, এক ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া। পুব-আফ্রিকার সাধারণ গরীব মানুষদের এবং মাসাইদেরও কম শোষণ করে না এই ভারতীয় ব্যবসাদারেরা যেমন তারা নিজের দেশের মানুষদের শোষণ করে। অন্যের ক্ষতি না করলে নিজের লাভ বাড়ে না এমন দুর্মর বিশ্বাসে ভর করেই তাদের সমুদয় ক্রিয়া-কাণ্ড। এই অন্যায় অত্যাচারের মূল্য একদিন অবশ্যই দিতে হবে এই অসৎ ব্যবসাদারদের, যেমন উগাণ্ডাতে দিতে হয়েছিল। অন্যায়, সে যে ধরনের অন্যায়ই হোক না কেন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে তার নিজেরই অন্তর্লীন অদৃশ্য কোষের মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দে একসময়

www.BanglaBook.org

বিপ্লব ঘটে যায়। অন্যায়, অন্যায়ের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ারই মধ্যে সেই অন্যায়ের প্রতিকারের, তাকে ধ্বংস করার অমোঘ বীজ, নিঃশব্দে, অদৃশ্যভাবে উৎপন্ন করেই। এতে কোনো ভুল নেই। হয়তো সময় লাগে; এইই যা। প্রত্যেকটি অন্যায়ের মধ্যে ন্যায়ের বীজ সুপ্ত থাকেই। কখন যে তা শিমুলের বীজের মতোই নিঃশব্দে ফেটে গিয়ে সমস্ত আকাশকে পেঁজা তুলোয় ভরিয়ে দেবে তা কেউই বলতে পারে না।

মাসাইদের দেশের সীমানা এবং এরকম দুর্গম, এমন হিংস্র পশু এবং সেৎসী মাছি অধ্যুষিত যে, কেনিয়া এবং তান্‌জানীয়ান সরকারের পক্ষে এইসব আইন বলবৎ করাও আদৌ সহজ নয়! সেটাই কিছুটা বাঁচোয়া।

আফ্রিকার তান্‌জানীয়া এক বিরাট দেশ। আরুশার পাহাড়ী শহরের এলাকা পেরোলেই দ্রুতগামী জীপ অথবা ভোকস্‌ওয়াগেন-কম্বি গাড়িতে যেতে যেতেও এমন বিপুল পরিমাণ দিগন্তলীন নির্জন অনাবাদী প্রান্তর পড়ে থাকতে দেখা যায় যে তা দেখে, অবাকই হয়ে যেতে হয়। অথচ এই দুই দেশই বেশ গরীব। তান্‌জানীয়া তো বটেই। টুথ-ব্রাশটুকুও তৈরী হয় না সে দেশে। ভারত থেকে আমদানী করে। এবং শিল্প-ক্ষেত্রের এই অনুন্নত অবস্থার সুযোগ নেয় ওখানাকার ভারতীয় ব্যবসাদারেরা। মাসাইদের ভাগ্য ভালো যে তাদের আমদানী করা চাল খেতে হয় না বা টুথ-ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার কু-অভ্যাসও তাদের নেই।

আফ্রিকার অনেকই দেশে এখনও অনেক জায়গা পড়ে আছে ফাঁকা, আফ্রিকা তো বটেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্যে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ঐ দেশের নেতারা যদি আমাদের জানা অনেক দেশের নেতাদেরই মতো শুধুমাত্র নিজেদের পকেট ভরানো এবং গদি-আঁকানোর সাধনাতেই নিজেদের সন্তুষ্ট না রেখে দেশের ও দশের প্রকৃত হিতসাধনে বদ্ধপরিকর হন তবে এইসব দেশও একদিন পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশ হয়ে উঠতে পারে। এক চিলতে মরুভূমির মধ্যে যদি ইজরায়েলের মতো কোনো সদ্যোজাত ছোট্ট দেশ নব্য ইজরায়েল গড়ে তুলতে পেরে থাকে তাহলে অন্যরাই বা পারবে না কেন? ইজরায়েলের তেল-আভিভ্ বিমানবন্দরে নামলেই মনে হয় যে কোথায় এলাম! মরুভূমিতে সোনা ফলিয়েছে ইজরায়েলীরা। তাদের ধার্মিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ আমাদের পছন্দ হোক আর নাই-ই হোক, যোগ্যতার কারণেই ন্যায্য কৃতিত্ব তাদের না দিয়ে উপায় নেই। কোনো দেশের মাপ শুধু সেই দেশের আয়তন দিয়েই তো হয় না, শুধু দেশের মানুষ দিয়েই হয়। মানুষের সংখ্যা দিয়েও নয় মানুষের মতো মানুষ দিয়ে।

মাসাইদের কথা বলতে বসে বোধহয় অন্য প্রসঙ্গে চলে এলাম। যদিও একে অবান্তর বলব না। সভ্যতা এবং রাজনীতির সমকালীন প্রেক্ষিতে মাসাইরা সভ্য শিক্ষিত এবং আধুনিক হয়ে ওঠার জন্যে মূল ও আদিম চারিত্রিক, ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে অন্যদের সঙ্গে টেরিকট-এর ট্রাউজার এবং হাওয়াইয়ান শার্ট পরে, নিজেদের সত্তা ও গর্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের মতো শিক্ষিতদের দলে সামিল হবে কি হবে না এইটেই মাসাইদের সামনে এখন মস্ত বড় প্রশ্ন।

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার আলোচনাতে একেবারে শেষে আসছি।

সিংহ শিকার এবং গবাদি-পশু লুঠ করা অবশ্য উনিশ শতকের গোড়াতে ইয়োরোপীয়ান উপনিবেশিকরাও বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তখনও যেমন এখনও তা। তারা ইয়োরোপীয়ানই হোক বা অ-মাসাই আফ্রিকাবাসীই হোক যারাই মাসাইদের জমি কেড়ে নিতে এসেছে, তাদের গবাদি-পশুর অস্তিত্ব যাদের দ্বারাই বিপন্ন হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই মাসাইরা যুদ্ধ করবে এবং করেছে এবং শেষ পর্যন্ত। হয়তো ভবিষ্যতেও করবে। মৃত্যুকে মাসাইরা কোনদিনও ভয় পায়নি। বরং যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে মৃত্যু আসে সেই মৃত্যু তাদের কাছে পরম বরণীয়।

যখন ইল্‌মোরাণ্‌দের খুশির কারণ ঘটে বা কাজ কম থাকে, যেমন বর্ষাকালে; তখন নিজেদের সাহস ও শারীরিক বলের পরীক্ষার জন্য সিংহ শিকারে বেরোয় ওরা। ভালো কেশরওয়ালা সিংহর খোঁজ-খবর নিয়ে, তার পায়ের দাগ ও অন্য চিহ্নর হদিস করে তার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় তারা, সঙ্গীদের নিয়ে। তারপর ওদেরই মধ্যেই বেশী সাহসী একজন বল্লম ছুঁড়ে মারে তাকে। সিংহ অথবা বাঘ অথবা বেশীরভাগ হিংস্র প্রাণী এবং সরীসৃপই আক্রমণকারীকে যদি দেখতে পেয়ে যায় তবে তাকেই সবচেয়ে আগে প্রতি-আক্রমণ করে। এই হচ্ছে পাশবিক নিয়ম। মানুষের মতো অন্য নিরীহ নিরপরাধীকে মেরে তারা কাপুরুষের মতো বদলা নেয় না সচরাচর। একথা শিকারীমাত্রই জানে। অনেক পাশবিক আইনই মানবিক আইন-কানুনের চেয়ে শ্রেয়।

মাসাইরা এই আইনের কথা ভালোমতোই জানে। তাই বল্লম যে যোদ্ধা প্রথমে ছোঁড়ে, সে তা ছুঁড়ে দিয়েই শিকারীদের বৃত্তর বাইরে দৌড়ে চলে যায়। চলে গিয়ে তরোয়াল হাতে পরবর্তী ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আগেই বলেছি কোথায় সিংহর সঙ্গে মোলাকাত হবে সে জায়গার খোঁজ নিয়ে ঠিক জায়গাটা ওরা খুঁজে বের করে। সিংহের পায়ের দাগ ও অন্যান্য চিহ্ন দেখে, কতগুলো সিংহ আছে, এবং গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করে নেয়। একবারে একটি সিংহই মারে এবং সে একা থাকলে শিকার করা আরো সুবিধের হয়।

একটি লম্বা আলগা সারিতে 'ইল্‌মোরাণ্‌''রা সিংহর দিকে এগোতে থাকে। ''মাআ'' ভাষায় সিংহকে বলে 'ঈলে''। সোয়াহিলিতে যেমন বলে 'সিম্বা'। সিংহকে যে 'ইল্‌মোরাণ্‌' প্রথমে দেখে সে চিৎকার করে অন্যদের সজাগ করে দেয় 'ঈলে' বলে। সকলেই তখন পুকার দিয়ে ওঠে ''ঈলে! ঈলে!'' বলে। তারপর সিংহর কাছাকাছি গিয়েই বৃত্তাকারে সিংহকে ঘিরে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে বল্লম উঁচিয়ে। ঐ সময় সমবেত গলায় শিকারীরা গান গাইতে থাকে সিংহকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে। সেই গমগমে পুরুষালি গান মন্ত্রের মতো শোনায় অরণ্য এবং তৃণভূমিতে। মাসাইরা যেখানে থাকে সেখানকার পশুরাজেরা মাসাইদের ভালোমতোই চেনে। দূর থেকেই ''ইল্‌মোরাণ্‌''দের দেখে অনেক কুলাঙ্গার সিংহ ভোঁ দৌড় লাগায়। ''ইল্‌মোরাণ্‌''দের চেহারা চেনে না এমন সিংহ আফ্রিকাতে জন্মায়নি। সিংহমশাই-এর পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ এবং তস্য পিতামহও মাসাইরা যে কী ভয়ানক

www.BanglaBook.org

তা জেনেই নিজেরা মরার আগে ছেলে এবং নাতিপুতিদের সাবধান করে দিয়ে যায়। তাছাড়া পশুরাজেরা কিন্তু আমাদের দেশের বাঘের মতো অতটা সাহসীও নয়। স্ত্রীর রোজগারে যে পুরুষ বসেই প্রায় খায় তাকে বীর বলে উচিত মেনে নেওয়া উচিতও নয়। তাদের প্রায়ই প্রাণভয়ে তাড়াখাওয়া কুকুরেরই মতো পালাতে দেখা যায়, যদিও শরীরে বল তাদের অসীম।

ওদের দেখেই সিংহ দৌড়তে থাকে কিন্তু আগের রাতে যে সিংহ ভালো করে ভুরিভোজ করেছে সে বিশেষ দৌড়তে পারে না। ভারী হয়ে থাকে শরীর। সে তখন একটু দৌড়োয় আর একটু করে দাঁড়ায়। পেটের খাবার বমি করে উগরে দিয়ে আবারও দৌড়ায়। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে উগরে দেয় খাবার নিজেকে হালকা করার জন্যে। তাতে শিকারীর সুবিধাই হয় তার কাছে পৌঁছতে। তবে নির্বন্ধ যখন ঘটে তখন মোলাকাৎ হয়েই যায়। গর্বিত এবং সাহসী, সিংহদের মধ্যেও অনেকে থাকে। সকলেই ভীরু নয়। কিছুটা দৌড়ে পালিয়ে গেলেও সে ফিরে দাঁড়ায় এবং আক্রমণ করে অতজন শিকারী থাকা সত্ত্বেও।

প্রথমে যে সিংহর দিকে মাটিতে দাঁড়িয়ে বল্লম ছোঁড়ে, সে অসম সাহসী। মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়েই সে ছোঁড়ে তা। বল্লম ছুঁড়েই সে বৃত্তর বাইরে চলে যাওয়াতে সিংহ কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। মাত্র কয়েক মুহূর্তই। এবং সেই অবকাশে অন্য শিকারীরা সিংহর পথরোধ করে, প্রথম জনের দিকে তাকে যেতে না দিয়ে, বল্লম ছোঁড়ে তার দিকে। বাঁ হাতে ঢাল ধরে। প্রথম শিকারীর দিকে যেতে পারার আগেই তারা বল্লমের আঘাতে আঘাতে সিংহকে ধরাশায়ী করে ফেলে। তবে কখনও সিংহ মাসাই শিকারীদের চেয়েও বেশী সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখায়। সে সবাই-এর মাথা টপকে বা পাশ দিয়ে লাফ মেরে গিয়ে প্রথম শিকারীকে ধরে ফেলে। তখন যমে মানুষে টানাটানি চলে। অনেক সময়েই শিকারী মারা যায়। কারণ, মাটিতে দাঁড়িয়ে তরোয়াল দিয়ে সিংহর সঙ্গে যুদ্ধ করলে মরা-বাঁচার সম্ভাবনা সমান সমানই থাকে। শিকারীর মোষের চামড়া দিয়ে বানানো চিত্র-বিচিত্র ঢালটি মানুষের হাতের অস্ত্রর পক্ষে যোগ্য সুরক্ষা হলেও সিংহর বিরাশি-সিক্কার থাবার পক্ষে আদৌ নয়। অনেক সময়ই সিংহর হাতে একাধিক শিকারী আহত এবং নিহতও হয়।

যে শিকারী সবচেয়ে আগে সিংহকে বল্লমে বিদ্ধ করে সে সঙ্গে সঙ্গে উঁচুগলায় তার নাম, তার গোষ্ঠীর নাম চিৎকার করে বলে। অন্যরাও সেই শিকারীর নাম ও গোষ্ঠী বারবার পুনরাবৃত্তি করে। এমন করা হয় সেইজন্যেই যে, শিকারের নিয়মানুসারে সবচেয়ে আগে যে বধ্য পশুর শরীর থেকে রক্তপাত ঘটায় সেই তাকে শিকার করেছে এমনই মেনে নেওয়া হবে। এই নিয়ম বোধহয় হিংস্র জানোয়ারের বেলায় পৃথিবীর সর্বত্রই শিকারীদের মধ্যে চালু আছে।

সে যাত্রা প্রথমে বল্লমে-ছোঁড়া শিকারী যদি সিংহর হাতে নিহত না হয়, সিংহই যদি মারা পড়ে তখন সে শিকারী প্রথমে গিয়ে সিংহর কেশর এবং লেজটা তরোয়াল দিয়ে কেটে নেয়। ঐ দুটো তার। যে শিকারী প্রথমজনের পরে সিংহকে আঘাত করে, সে নেয় সিংহর দুটো সামনের থাবা।

www.BanglaBook.org

সিংহ শিকার হলেই শিকারীদের মধ্যে একজনকে পাঠানো হয় দৌড়ে গিয়ে 'ক্রাল'-এ খবর দিতে। এটা করা হয় এইজন্যে পাছে যে যোদ্ধারা সঙ্গে আসেনি তারা হঠাৎই এ খবর পেয়ে ঈর্ষাকাতর হয়।

খবরটা পেয়েই 'ক্রাল'-এ হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বাচ্চারা ছুটোছুটি করে সবাইকে বলে 'ইল্‌মোরাণ্‌রা সিংহ শিকার করেছে।' 'সিংহ শিকার করেছে', মেয়েদের মধ্যে সাজবার ধুম পড়ে যায় সিংহশিকারীদের নজর কাড়ার জন্যে। কারণ প্রথানুযায়ী সবচেয়ে সুন্দরী বলে বিবেচিত দুজন মেয়েই সুযোগ পাবে সেদিন প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া যোদ্ধা-শিকারীদের সঙ্গে নাচবার।

এদিকে যোদ্ধারা তাদের কেশর আর উটপাখির কালো পালকে সাজানো শিরস্ত্রাণ পরে, তাদের উরুর সঙ্গে বাঁধা ঘন্টাগুলি সুঠাম পায়ের ছন্দে দুলিয়ে বাজাতে বাজাতে তারা বীরদর্পে শোভাযাত্রা করে 'ক্রাল'-এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। 'ক্রাল'-র মুখে অন্য যোদ্ধারা সিংহশিকারীদের স্বাগতম্‌ জানায় সাদরে। বয়স্করা এবং মেয়েরা 'ক্রাল'-এর প্রধান ফটকের কাছে 'কালীবাশ'-এ করে দুধ নিয়ে যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানায়। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর সকলে মিলে গান গায় এবং দুধ খায়। যদি সিংহী মারা পড়ে থাকে তবে চারটি 'ক্রাল'-এ যোদ্ধারা গিয়ে উৎসব করে। আর যদি সিংহ মারা পড়ে থাকে তবে আটটি 'ক্রাল'-এ গিয়ে।

মাসাই যোদ্ধারা যে অসম সাহসী এবং বীর তাতে কোনোই সন্দেহ নেই যদিও যোদ্ধামাত্রই জানে যে যুদ্ধে হার-জিত থাকেই। শিকারীকেও শিকার হতে হয় অনেক সময়। ওরা তাই সবসময়ই বলে, "যুদ্ধে শুধুমাত্র এক তরফের জিত হতে পারে। হয় শত্রুর, নয় আমাদের।"

বড় সিংহকে ওরা শিকার করে বটে কিন্তু নির্জনবাসী অসীম বিক্রমশালী ঐ প্রতিপক্ষকে ওরা বিশেষ সম্মানও করে। ঐ সিংহদেরই মতো মাঝে মাঝে তারা নির্জনবাসে যায় তাই। সেই নির্জনবাস-এর কথা আগেই বলেছি। অমন নির্জনবাসকে মাসাই ভাষায় বলে "ওল্‌পুল"।

মাসাই যোদ্ধাদের এই গানটি গাইতে শোনা যায় অনেকই সময় ঃ

"ঈশ্বর! তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছি।

ওহে শিকারী পাখি; মাংসাশী; তুমিও সঙ্গে চলো। এইজন্যেই তোমাকে সঙ্গে যেতে বলছি কারণ আমি যুদ্ধে মরলে তুমি আমাকে খেতে পারবে। আর আমি যদি বেঁচে যাই তবেও যার সঙ্গে আমার যুদ্ধ সে তো মরবেই। একজন না একজন মরবেই। আমাদের মধ্যে একজন তো তোমার খাদ্য হবেই। চলো, শিকারী পাখি, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, তুমিও সঙ্গে চলো আমার।"

যোদ্ধারা যখন 'ওল্‌পুল'-এ থাকে তখন নানারকম প্রার্থনা ও গান করে ওরা। একজন একজন করে ওরা 'ওল্‌পুলের' আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হাতে একটি ছোট্ট লাঠি নিয়ে, যা চারণজীবীদের প্রতীক। ঊষার প্রথম আভাসে যখন আদিম আফ্রিকার ঘন রহস্যময় পাহাড়, বন, তৃণভূমি, হ্রদ অপূর্ব এক ছবি হয়ে ওঠে, নানা পাখির কলকাকলিতে মুখর, নানা পশুর স্বরে বাঙ্ময়, সে তখন স্বগতোক্তির মতো বলে, একা একা উত্থিত প্রায় সূর্যকে সাক্ষী করে, নিজের সাহস শৌর্যকে সব গর্বকে ধুলোয় লুটিয়ে, নতজানু না হয়েও অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নতজানু হয়ে বলে ঃ

"আমার শুভেচ্ছা নাও, অভিবাদন; ওগো উজ্জ্বল উষা!

স্বর্গীয় উষাকাল!

বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত, আলোকিত করা হে সূর্য! তুমি আমাদের কাছে আসো লাল আর সাদা পোশাকে সেজে। আমাদের মেয়েরা তোমাকে অভিনন্দিত করে! ঠেলাঠেলি করে তারা নিজেদের মধ্যে কে আগে পাঠাবে তোমাকে ঐ অভিনন্দন।

আমি এসেছি এখানে, কৃতার্থ আমি, তোমার আশীর্বাদধন্য, দাঁড়িয়ে আছি একা, তরুমূলে; নিশ্চল, স্থির।

তোমার কাছে এই প্রার্থনা আমার, যেন কোনো শকুন আর মাংসাশী পাখি আমাদের; এই তরুণ যোদ্ধাদের না ঠুকরে খায়। কোনো দু-খড়্গ গণ্ডারের খড়্গ অথবা শত্রুর বল্লমের ফলাও যেন আমাদের সহযোদ্ধাদের এই ওল্‌পুল-এর সখ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে।

তোমার কাছে আমি স্বচ্ছলতা প্রার্থনা জানাই ওগো উজ্জ্বল উষা। সেই স্বচ্ছলতা যেন ধীরে ধীরে আসে আমাদের জীবনে, চড়াই বেয়ে, ধীরে ধীরে ওঠা পথিকেরই মতো। এসো, তা যেন স্থায়ী হয়।

বন্য পশুরা আর শকুনেরা, তোরা চুপ কর্‌। তোদের আশা পূরণ হয়নি। আমরা দারুণভাবে বেঁচে আছি। দারুণভাবে।

হে উষাকাল! আমাদের তুমি সন্তান দাও, দাও গবাদি-পশু। আমাদের সন্তান আর গবাদি-পশু দাও পাহাড়ের ঢালে বা সমতলে বা পাহাড়ের চূড়োয়; যেখানেই আমরা থাকি না কেন! আমরা চাই আর নাই-ই চাই। তুমি দাও।

আমাদের স্বচ্ছলতা দাও, অপ্রত্যাশিতভাবে; ঝড়ের ফুলের মতো।

আমাদের রক্ষা করো, তোমার কোলে রাখো; আমাদের গালের চামড়া যখন কুঁচকে যাবে, বার্ধক্যে বলিরেখায় যখন ঢেকে যাবে সমস্ত কপাল, তখনও।

বিদায়! বরণীয় উষা! উষাকাল! আগামীকালের এই মুহূর্ততে আবারও দেখা হবে আমাদের। তোমার সঙ্গে আমার। ততক্ষণের জন্যে বিদায়। আগামীকাল আবারও তোমার শান্তিভরা সোনা-আলোয়, দেখা হবে আমাদের।

বিদায়!"

একজন করে প্রার্থনা শেষে 'ওল্‌পুল'-এ ফিরে গেলে অন্য একজন যায় প্রার্থনা জানাতে। নানাজনের প্রার্থনা নানারকম হয়। প্রার্থনামাত্রই তো ব্যক্তিগত তাই এক প্রার্থনা আর অন্যাতে তফাৎ থাকে।

রাতেরবেলা। 'ওল্‌পুল'-এ খাওয়া দাওয়ার শেষে, কেটে-আনা কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রেখে শেষ সমবেত প্রার্থনা জানায় ওরা। একজন যোদ্ধারা প্রথমে তা উচ্চারণ করে। অন্যরা তারপরে তা আবৃত্তি করে। প্রার্থনা শেষে 'ওল্‌পুলের' মুখ্য প্রবেশপথের তা সে গুহামুখই হোক বা 'ক্রাল'-এর মতো বাসস্থানের ফটকই হোক; কাঁটাঝোপ ফেলে দিয়ে 'ইল্‌মোরাণ্‌'রা রাতের মতো শুয়ে পড়ে। আবার উষাকালে জেগে উঠবে বলে।

যোদ্ধাদেরও বয়স হয়। সময়ের অদৃশ্য বাজপাখি যোদ্ধাদের সকলেরই মাথার উপর উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেককেই অনুসরণ করে মৃত্যুর দরজা অবধি পৌঁছে দেয়। তা তারা চাক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর নাই-ই চাক। সে পাখিকে সঙ্গে যেতে ডাকুক আর নাই-ই ডাকুক। 'ইল্‌মোরাণ্‌'রাও দেখতে দেখতে জীবনের সুঁড়িপথে কিছুটা এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে তরুণতর প্রজন্ম সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাদের রক্তের অশ্রুত দামামা উদ্বেল হয়ে ওঠে। আগের প্রজন্মের 'ইল্‌মোরাণ্‌'দের সম্মানের, শ্রদ্ধার, বীরত্ব তকমা তুলে দিতে হয় পরের প্রজন্মের হাতে। এই সরে আসাকে মাসাইদের 'মাআ' ভাষায় বলে 'ইউনোটো।' ইউনোটো কথাটার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে বপন।

তখন ইল্‌মোরাণ্‌রা ভাবে;

"আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে।

দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে, হুতাশে।"

অনেক 'ইল্‌মোরাণ্‌' এ সময়ে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং হতাশায় পাগলের মতো হয়ে যায়, ছেলেমানুষের মতো কাঁদে। ঐ উদ্দাম, বাধাহীন, উন্মুক্ত, উদার, সূর্যালোকিত, বিপজ্জনক বল্লমের ফলার মতো চকচকে জীবন থেকে, বন্ধনহীন বেহিসাবী যৌন-জীবনের স্বাধীনতা থেকে, তাবৎ গোষ্ঠীর বড় কাছের গরিমাময় আসন থেকে বিদায় নেবার সময় হয়েছে তাদের এবার। এবার বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে হবে। অনেক বছর প্রমত্ততার পর থিতু হবার সময় এল।

যারাই জীবনে অল্পদিনের জন্যে হলেও উদ্দাম স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে তারাই জানে সেই স্বাধীনতা বন্ধক দেওয়াটা কী কষ্টের। যৌবরাজ্যের শিখর থেকে গড়িয়ে পড়ে ভ্যাদভ্যাদে সংসারী হতে কারই বা ভালো লাগে। এই সময়কে এই 'ইউনোটো'কে তাই 'ইল্‌মোরাণ্‌' মাত্রই ঘেন্না করে। এতোদিন ধরে সযত্নে-বর্ধিত ঘাড় সমান চুল কেটে ফেলে তাদের ন্যাড়া হতে হয়, যেমন ছুন্নৎ হবার সময় হতে হয়েছিল। আগের বার ন্যাড়া হওয়াটা ছিল আনন্দের, এবারে ন্যাড়া হওয়াটা বড় দুঃখের। মাসাইদের মধ্যে বড় চুল শুধুমাত্র তরুণ যোদ্ধারাই রাখতে পারে।

BanglaBook.org

প্রথাগত ইল্‌মোরাণ্‌দের মায়েরাই ছেলেদের মাথা ন্যাড়া করায়। কিন্তু যদি কারো মা ছেলের প্রজন্মর কোনো যোদ্ধার সঙ্গে সঙ্গম করে থেকে থাকে, তাহলে সেই মা ছেলের মাথা কামাতে পারে না।

যে বিশেষ ঘরে এই ইউনোটো উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা গোলাকৃতি। খড় দিয়ে সেই ঘরের মাথাটি চুড়োর মতো করা হয়। মাসাইদের ঘর সাধারণত যেমন হয় এই ঘর তা থেকে একবারে আলাদা। এই ঘরকে বলা হয় 'ও-সিঙ্গিরা'।

বাবা-মায়েরা এসে ও-সিঙ্গিরার প্রবেশ পথে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখে যে তাদের 'ইল্‌মোরাণ্‌' ছেলে ইউনোটো করতে সত্যিই এল, নাকি মনের দুঃখে পালিয়েই গেল। অনেক যোদ্ধাকেই হাউ-মাউ করে শিশুর মতো কাঁদতে দেখা যায় এই সময়ে। যৌব-রাজ্যের সিংহাসন থেকে নেমে আসার জন্যে যে উৎসব তার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই তাদরে প্রচণ্ড অসূয়া থাকে।

'ইউনোটোর' পরেই যোদ্ধাদের বিয়ে হয়। এবার তাদের বেহিসাবী হৈ-হৈ করা মন-মৌজী জীবনের ছুটি। এবার খোঁয়াড়ের জীবন। যে জীবনের আরেক নাম সংসার।

www.BanglaBook.org

মাসাইদের তো সম্পত্তি বলতেও গবাদি-পশু, পণ বলতেও তাই-ই। তবে পণটা সামাজিক রীতি। কখনোই অত্যাচার হয়ে ওঠে না। এবং পণ না দিলে আমাদের দেশের মতো বউকে পুড়িয়ে মারাও হয় না কোনো ক্ষেত্রে।

সাধারণত পাঁচটা পশু দিতে হয় ছেলেদের, মেয়ের বাড়ি থেকে। তার সঙ্গে আরো তিনটি জিনিস দিতে হয়। দুটো গাভীন না-হওয়া গাই, একটা অল্পবয়সী বলদ, একটি পুরুষ ভেড়া, একটি মেয়ে ভেড়া, তামাক, মধু আর দুটো ভেড়ার চামড়া।

ঐ দুটিকে একটি দ্রব্য বলেই ধরা হয়।

বিয়ের আগে মেয়ের মা-বাবা মেয়েকে বলে দেন স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে। বলেন ঃ তোমার তো এবার নিজের সংসার করার সময় হল। কতদিন আর খেলে বেড়াবে? তোমার দায়িত্ব বাড়লো অনেক।

তোমার স্বামীকে সম্মান করবে। সে যাই বলবে, তাই-ই করবে। আমরা প্রত্যাশা করব যে তুমি যাই পাও না কেন স্বামীর কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশিই তাকে ফেরত দেবে। সবদিক দিয়েই। যদি তা না করো, তবে তোমাকে আমরা পিট্টি দেব। শোনো মেয়ে স্বামীর সঙ্গে অবনিবনা হলেই যেন বাপের বাড়িতে দৌড়ে এসো না। যদি তেমন সিরিয়াস কিছু না ঘটে তবে স্বামীকে ছেড়ে এলে আমরা কিন্তু জামাইয়ের কাছে তোমাকে জোর করে পাঠিয়ে দেব।

মেয়েকে এইসব বলে, আবার জামাইকেও শাশুড়ি আড়ালে ডেকে বলে দেন মেয়েটির মতিগতি মেজাজ-টেজাজ কেমন। তাকে কীভাবে বুঝতে হবে। কিসে সে তুষ্ট থাকে।

শাশুড়ি বলে দেন, আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছো, তাকে ভালোভাবে রেখো। সে যেন তোমার সম্বন্ধে কোনো অনুযোগ নিয়ে এ বাড়িতে ফিরে না আসে। সত্যিই ফিরে যদি আসে তবে কিন্তু তাকে ফিরে পাওয়া তোমার পক্ষে মুশকিল হবে।

তরুণ যোদ্ধারা 'ইউনোটোর' পরই বিয়ে করে। ততদিন তারা যে বয়েসে পৌঁছোয় তার চেয়ে তার নববিবাহিতা স্ত্রীর বয়স অনেকই কম থাকে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের বেশ তফাৎ থাকে।

সব বিয়ের মতোই মাসাইদের বিয়েতেও নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়। সাজগোজ, বলদের মাংস, গরুর দুধ মিশিয়ে খাওয়া বলদের রক্তের সঙ্গে। বউ খুব ঘটা করে সাজে। সেই

www.BanglaBook.org

সাজকে বলে "ইসেন্দকেনেক ওলকিটেঙ্গ।"

আসল বিয়ে ব্যাপারটা অবশ্য অতি সরল-সাদা। কনের মাথাটি ন্যাড়া করে তাতে জম্পেস্ করে ভেড়ার চর্বি মাখানো হয়। তারপরে মাথায় নানারকম পুঁতি আর রঙিন পাথরের মালা পরানো হয়। বর-বউকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে আশীর্বাদ করে বর্ষীয়ান-বর্ষীয়সীরা পরম আদরে। তারপর দুজনকেই দুধ দিয়ে খুব ভালো করে চান করানো হয়।

প্রথম বিয়ের পর, প্রথম বউকে বরের 'ক্রাল'-এর ড্যানদিকের জায়গায় বাড়ি করে দেওয়া হয়। পরের বউ এলে সে বাঁদিকে থাকবে। প্রথম বউ সবসময়ই 'সিনিয়ার' বলে গণ্য হয় 'ক্রাল'-এর সমুদয় ব্যাপার-স্যাপারে। কিন্তু স্বামীর ভালোবাসা সে যে বেশী পাবেই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। সুয়োরানী-দুয়োরানীর ব্যাপারের মতোই ব্যাপার এখানে এখনও আছে।

ঈর্ষা, পৃথিবীর সব মেয়েদের মতো, মাসাই মেয়েদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু স্বামীদের এটা দেখা কর্তব্য বলে মনে করে ওরা যে, কোনো স্ত্রীর ভাগে কিছুই কম যাতে না পড়ে। ভালোবাসাটা তো সবসময়ই প্রমাণসাপেক্ষ নয়! তা দেওয়া-নেওয়া হয় মনে মনেই। মন খুলে তা কাউকে দেখাবার দায়ও থাকে না। দেখাতে চাইলে দেখাতে পারাও যায় না। এই যা বাঁচোয়া।

একজন মাসাই পুরুষ যতজন খুশি স্ত্রী রাখতে পারে, যদি তার খাওয়াবার ক্ষমতা থাকে। এই স্বাধীনতা এক তরফের নয়। বরং স্ত্রীদেরই বেশী। কারণ বিয়ে না করেই, দায়-দায়িত্ব না-নিয়েই সমাজ, পরকীয়ার স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে। তাই স্ত্রীদেরও স্বামী ছাড়া অন্য প্রেমিকও থাকতে পারে। সেইসব প্রেমিকের ঔরসে তাদের গর্ভে সন্তান এলেও তা দূষণীয় হয় না। কিন্তু সেই সন্তানের মালিকানা কিন্তু তার প্রেমিকেরই হয়। অন্যের ঔরসজাত সন্তান স্বামীর ঘরে আনা মানা।

মাসাই সমাজে স্বামীর মতো হুবহু দেখতে সন্তান থাকাটা খুবই গর্বের ব্যাপার। সুতরাং স্ত্রীরা সবসময়ই সচেতন থাকে যাতে প্রতিমাসের উর্বরতার দিনগুলিতে শুধু তাদের স্বামীদের সঙ্গেই তারা সঙ্গমে লিপ্ত হয়, যাতে প্রেমিকদের সন্তান তাদের গর্ভে না আসে। স্বামী যদি স্ত্রীকে খেতে পরতে না দেয়, অথবা তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে রাজি না থাকে, অথবা বেশী মারধোর করে তবে সে স্বামীর স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে বাবা-মায়ের কাছে চলে গেলে কারোরই কিছু বলার থাকে না।

মাসাইদের দেশে ডিভোর্স ব্যাপারটা প্রায় অজানাই। বিয়ের বন্ধনকে মাসাইরা খুবই সম্মান করে এবং এতো স্বাধীনতা দু'পক্ষেই আছে বলেই ডিভোর্স-এর ঘটনা খুবই বিরল। তবে তেমন তেমন ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মধ্যে যে দোষী তাকে 'ক্রাল'-এর বয়োজ্যেষ্ঠরা শাসন করে। স্ত্রী যদি দোষী হয় তবে তাকে বকুনি অথবা মার লাগানো হয়। স্বামী দোষী হলে তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়।

তাতে যদি মনান্তর না মেটে তাহলে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে অবশ্য স্বামী বিয়ের সময় স্ত্রীর পরিবারকে যে পণ দিয়েছিল তা মেয়েপক্ষকে ফেরত দিয়ে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে হয় স্বামীকে। কিন্তু স্বামীর ঔরসে এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভে যদি ছেলেমেয়ে হয়ে থাকে তবে সেই পণ আর ফেরত দিতে হয় না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা স্বামীরই সম্পত্তি হয়ে যায়। ছেলেমেয়ের উপরে অধিকার থাকে না মায়ের, গবাদি-পশুরই মতো সন্তানও অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি ওদের কাছে।

এইসব সিদ্ধান্ত যে-সব বয়োজ্যেষ্ঠরা নেয় তাদের তা নেবার যোগ্যতা আসে তখনই যখন তাদের 'ওলিংগেশেরর' পর্যায়ে অথবা বয়োজেষ্ঠ্য-বয়স্কদের পর্যায়ে উন্নীত করে সমাজে।

এক একটা প্রজন্মের বয়োজ্যেষ্ঠদের চিহ্নিত করা হয় বিভিন্ন নামে। এই নাম নানারকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি প্রজন্মর ওলিংগেশরের নাম হচ্ছে 'ইল্‌মেশুকি' অর্থাৎ যারা কখনও যুদ্ধে হারেনি।

বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের পরই শুধুমাত্র তারা বয়স্ক-বয়োজ্যেষ্ঠদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। একটি নিষ্কলঙ্ক বলদকে একটি বিশেষভাবে ঘেরা জায়গার মধ্যে মেরে তার শরীরকে চিরে সেই চেরা জায়গাতে দুধ ঢেলে সেই চিরে-দেওয়া জায়গা থেকেই চুমুক দিয়ে দিয়ে দুধ মেশানো রক্ত খায়, যারা "ওলিংগেশেরর্" হতে চলেছে তারা। তাদের প্রত্যেকের কপালে বলদের বুকের মাংস ঘষে দেওয়া হয় আশীর্বাদ হিসেবে। ঐ বিশেষ জায়গাটাকে ঘিরতেও হয় গবাদি-পশুর চামড়া দিয়ে। যারা "ওলিংগেশেরর্" হবে তাদেরই স্ত্রীদের ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যেই কাটাতে হয় তাদের কয়েকটা দিন। ঐ বিশেষ বলদটিও ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যেই থাকে মৃত্যুর পরও। রক্ত ছাড়াও ঐ বলদটির মাংসও রোস্ট করে খায় তারা।

বলদ মারার দিনের পরদিন সকালে তাদের প্রত্যেকের গায়ে টক দুধ ঢেলে দেওয়া হয় পরিষ্কার পাত্র থেকে। বুড়োরা এসে চারণ-লাঠি দিয়ে নতুন "ওলিংগেশেরর্"দের আশীর্বাদ করে। গবাদি-পশুদের যে লোহার শিক দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে মার্কা মারা হয় তাই গরম করে গবাদি-পশুদের হিসি দিয়ে ভরানো একটি ছোট্ট গর্তে সেই গরম লোহাকে ডুবিয়ে নেয় বৃদ্ধরা। গরম করা শিক হিসির মধ্যে ডুবোতেই বাষ্প ওঠে। সেই বাষ্প আর ধোঁয়ার মধ্যে বুড়োরা লোহার শিকগুলোকে নাড়াতে থাকে। ঐ হলো প্রাচীন বৃদ্ধদের "ওলিংগেশেরর্"দের প্রতি আশীর্বাদ।

'ওলিংগেশেরর্' উৎসব শেষ হয় সেই নিহত বলদের চামড়াটাকে টেনে মাটিতে মেলে দিয়ে এবং একজন সম্মানিত বুড়ো বয়োজ্যেষ্ঠকে দিয়ে একটি করে সবুজ চারাগাছ মানীয়াট্টার প্রত্যেক প্রবেশ পথে পুঁতিয়ে।

অবশ্য এটা হল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বেও অন্য একটি অনুষ্ঠান হয় তার নাম "ওলকিটেঙ্গ লোররা।" একঘেয়ে মনে হতে পারে আপনাদের তাই তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া থেকে নিরস্ত হলাম।

মাসাই বৃদ্ধ এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের বাগ্মিতা আর সত্যের প্রতি আনুগত্যের এবং ভালোবাসার জন্যে পৃথিবী বিখ্যাত। যেহেতু ভালো বক্তৃতা করতে পারাটা মাসাইদের কাছে

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব বড় গুণ বলে বিবেচিত হয়, তাই বোধহয় বৃদ্ধরা কথায় কথায় প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করে। কেউ কোনো প্রবাদ উল্লেখ না করে তো একটি সম্পূর্ণ বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। এই প্রবাদগুলিও খুবই মনোগ্রাহী।

যেমন, "মেটিগিরান্ এন্‌গেঙ্ক মেটেই এমোরোলু।" এর আক্ষরিক অর্থ হল, পা কি আর পেশী ছাড়া লাফাতে পারে? আর নিহিতার্থ হল, সমস্যার সমাধান আদৌ করা যায় না যোগ্যতা ছাড়া।

অথবা, "এপোলোস্ এনগিওক্ এনাইমিন্"—এর আক্ষরিক অর্থ হল কান অন্ধকারকে ভেদ করতে পারে, চোখ পারে না। নিহিতার্থ হল, অন্ধকারেও কান শুনতে পায়।

এইরকমই বহু প্রবাদের বন্যা বয় বৃদ্ধ এবং বয়স্কদের কথা-বার্তায়।

মাসাইদের দেশের মেয়েরাও সব দেশের মেয়েদের মতো ছেলেদের চেয়ে বেশী প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে। যেহেতু মাসাইদের কাছে ছেলেমেয়ে খুবই দামী, সন্তানহীনা রমণীদের দুঃখ খুবই বেশী। নিম্নোক্ত এই করুণ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে একজন বন্ধ্যা রমণীর আর্তি ফুটে উঠেছে। সে বলছে ঃ "আমি আদিগন্ত সাভান্নাহ্ তৃণভূমির মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াই সঙ্গীহীন। সিংহ আমাকে দেখে গর্জন করে ওঠে। কালো কেশরের সিংহ গর্জন করে। কেশর-হীন সিংহও গর্জন করে। জেব্রাদের পাশ থেকে কালো-কেশরের সিংহটাও গর্জন করে।

আমি সেই বহুবর্ণার কাছে প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর! আমাকে একটি সন্তান দাও তাহলে অন্যদের মতো আমিও ঘরে থাকতে পারি নারীর মতো নারী হয়ে। তাহলে আমাকে আর এমন করে একা একা আদিগন্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হয় না।"

এই প্রার্থনা থেকে বোঝা যায় সন্তানহীনা একজন মাসাই নারী কী অসহনীয়ভাবে একা! কতখানি দুঃখী সে।

মাসাইরা এমনই এক বীর-যোদ্ধা, গবাদি-পশু নির্ভর, সম্ভ্রান্ত, আশ্চর্য উপজাতি যে এদের কথা সব বলতে গেলে এই বই-এর পাতা শুধু বাড়তেই থাকবে।

এদের নিজেদের বাসস্থানে মাউন্ট কেনিয়া থেকে মাউন্ট মেরুর, মাউন্ট কিলিম্যানজারো থেকে মাউন্ট লেঙ্গাই-এর মধ্যবর্তী তৃণভূমি এবং সুউচ্চ পর্বতময় ঘন অরণ্যাবৃত অঞ্চলে এদের লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছিল বলেই আমি এই সরল গর্বিত উপজাতিকে দেখে যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলাম ঠিক ততখানিই দুঃখিত হয়েছিলাম এদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এদের জন্যে এক গভীর দুঃখ সঙ্গে করে ফিরে এসেছিলাম যখন দেশে ফিরি। মাসাইদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল এই দুঃখ। এই বইটি সেই মমত্ববোধেরই প্রকাশ। তাদের কথা আমার দেশের মানুষদের জানাতে ইচ্ছা করেছিল খুবই।

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যৎ

মাসাইদের ভবিষ্যৎ কি?

একথা মাসাইরা নিজেরা যেমন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিনিদ্র রজনীতে ভাবে, তেমনই ভাবেন ওদের মধ্যে যারা ইংরিজি বা জার্মান ভাষায় শিক্ষিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তারাও।

তেমনই একজন মানুষ হলেন টেপিটিট্ ওলে সাইটোটি। উনি একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে মিলে মাসাইদের উপরে চমৎকার বইও লিখেছেন। বইটির নাম "মাসাই"।

সাইটোটির মতে যাঁরা এক রোম্যান্টিক ধারনার বশবর্তী হয়ে বলেন যে মাসাইদের নিজেদের মতন বাঁচতে দেওয়া উচিত, তারা আদৌ ঠিক নন। ঠিক নন এইজন্যেই যে পারিপার্শ্বিক বদলে গেছে। প্রেক্ষিত বদলে গেছে। কারণ, এই পৃথিবীই বদলে গেছে, যাচ্ছে অবিরত।

আধুনিক সভ্যতা, শিক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বিজলী আলো, টি.ভি., কম্প্যুটার মানুষের জীবনে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। আজকের এই পৃথিবীতে বহুবর্ণা এন্‌গাই-এর দয়াতে মাটিতে দাঁড়িয়ে বল্লম দিয়ে সিংহ-শিকার করে বীর বলে বিবেচিত হওয়াটা মুর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষিজগতে বিপ্লব এসেছে। এসেছে পশুপালনের জগতেও। এমন যুগে এই সময়ে, পুরোনো বিশ্বাস এবং রীতিনীতি এবং ঐ অন্ধকার জীবন আঁকড়ে থাকলে মাসাই উপজাতি একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যে তাতে ওঁর কোনোই সন্দেহ নেই।

সাইটোটি সাহেবের কথা খুবই যুক্তিপূর্ণ। আমিও জানি যে আমাদের দেশের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জারোয়াদের সম্বন্ধে হয়তো এই একই কথা বলা যায়। কিন্তু আমি বুঝি না একটি গর্বিত উপজাতি যদি তাদের নিজেদের স্বাধীন জীবনযাত্রা আঁকড়ে থেকে এত দীর্ঘসময়, হাজার হাজার বছরই খুশি থাকতে পেরেছে তাহলে তাদের জোর করে এই নব্য-পৃথিবীর অর্থ-সর্বস্ব, প্রতিযোগিতা-সর্বস্ব, যতিহীন দৌড়ে সামিল কেন করতেই হবে?

সাইটোটি সাহেবের মতকেই সমর্থন করবেন বেশীরভাগ মানুষ তা জানি। জেনেও, আমি ব্যতিক্রমী হতে চাই।

আমরা এই আধুনিক মানুষেরা বিজ্ঞান-মনস্করা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে আমরা সত্যিই উন্নত হয়েছি? বেশী সুখে আছি? এই তথাকথিত জীবনযুদ্ধে আমরা কি প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত ছিন্নভিন্ন নই?

যা আমরা পেয়েছি, আমাদের সভ্যতার, আধুনিকতার পরিবর্তে শুধুমাত্র এই কি প্রার্থিত

www.BanglaBook.org

ছিল? যে গন্তব্যে আমরা এসে পৌঁছেছি এবং অদূর ভবিষ্যতে পৌঁছব তাই কি আমাদের প্রার্থিত ছিল? মানুষ হিসেবে, মনুষ্যত্ব বিচারে, ভালোত্বর বিচারে, আমরা কি অনেকই ছোট, লোভী, স্বার্থপর, বিবেকরহিত, অপরিণামদর্শী হয়ে যাইনি?

ঈশ্বর আমাদের কাছে উপহাসের বস্তু। কেন? তা তলিয়ে ভাবার সময়, অবকাশ এবং গভীরতা আমাদের বেশীরভাগেরই নেই। ঈশ্বরবোধ যে আমাদের ভেতরের শুভ, সত্য এবং শাশ্বত বোধগুলিকে জাগরূকই করে, আমাদের পাশববৃত্তিগুলিকে শাসন করতে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের এক সুন্দর প্রার্থিত নিষ্কলুষ জীবনের দিকে ধাবিত করায়, তা কি আমরা মনে রেখেছি?

অর্থ, আরাম ছোট ছোট পরিবারের দেওয়াল-ঘেরা প্রায় সবরকম নৈতিক বোধহীন আত্মসর্বস্ব জীবনই পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে, আধুনিক আমরা যে "জীবনযুদ্ধ" "জীবনযুদ্ধ" বলে চেঁচাই আসলে তা একটি বানানো কথা। আমরা আসলে ব্যস্ত আছি প্রতিবেশীকে ছাড়িয়ে যাওয়ারই সাধনাতে। এই সাধনা যখন ওয়র-ফুটিং-এ কেউ করা শুরু করে তখনই তা যুদ্ধের সমান প্রাধান্য পায়। এই আমাদের যুদ্ধ "We do not struggle for existence. We struggle to outshine our neighbours."

বার্ট্রান্ড রাসেলের উক্তি প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তি এবং জাতি সম্বন্ধে আজ সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমরা যাকে প্রগতি, উন্নতি বলে জেনেছি তা কি সত্যিই প্রগতি? সত্যিই কি উন্নতি? মানুষের কাছে যা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সেই মন, সে কি শান্তি পেয়েছে? সুখ পেয়েছে? আমরা তো প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত এক লেলিহান সর্বগ্রাসী লোভের আগুনে ঝলসেই মরছি। সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল"-এর "খুড়োর কল"-এর মতো আমাদের কামনার মাংসখন্ড (তাকে মানুষের পরম প্রার্থনার প্রতীক হিসেবে তুলনা যদি করি) আর আমাদের সুখের (আমাদের প্রাপ্তির প্রতীক হিসেবে যদি সুখকে ধরি) মধ্যের দূরত্বটুকুতো এতো হাজার বছরেও বিন্দুমাত্রও কমেনি। আমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সুপার কম্প্যুটার-প্রযুক্তি, পারমাণবিক বোমা নিয়ে, সুখের, শান্তির, সারল্যর জীবন তো আমরা পাইনি, উল্টে এই সুন্দর পৃথিবীতে, যে আবাসে আমাদের সুখে থাকার সমস্ত উপাদানই মজুত ছিল তা নিজেদের হাতেই প্রতিনিয়ত ধ্বংস করেই চলেছি। এই প্রেক্ষিতে মনে হয়; আধুনিক শিক্ষিত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী মানুষেরা যা-কিছুই তাঁদের নিজেদের জন্যে ভালো বলে মনে করেন তার সবকিছুই গায়ের জোরে অল্পে সুখী, ঈশ্বরে-বিশ্বাসী নিজস্বতার গর্বে-গর্বিত একটি আশ্চর্য উপজাতির ঘাড়ে চাপাতে চাইবেনই বা কেন? এই মনোবৃত্তি তো ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির চেয়েও খারাপ। সে তো আধুনিকতম এক সাম্রাজ্যবাদই। আমার তো মনে হয় মাসাইরা এখনও আমাদের দেশের গভীর অরণ্য-পর্বত নিবাসী অনেকানেক আদিবাসীদেরই মতো বেশ সুখেই তো আছে! তাদের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আত্মিক এবং শারীরিক বিভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে। আমরা যাকে ভালো

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে জেনেছি তাই যে সকলের পক্ষেই একমাত্র ভালো সে কথা জোর দিয়ে বলার মতো প্রত্যয় আমাদের সত্যিই আছে? এবং যুক্তি? আমাদের সর্বজ্ঞতা যে কতখানি যুক্তি-নির্ভর তার পরীক্ষা তো এখনও পুরোপুরি হয়নি!

প্রথম দিন থেকে পুব-আফ্রিকার ব্রিটিশরা মাসাইদের সন্দেহ ও বিরূপতার চোখে দেখে এসেছে। ঊনবিংশ-শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই ওই মনোভাব চলে আসছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে উনিশশো এক খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পুব-আফ্রিকার উপনিবেশের গভর্ণর স্যার চার্লস এলিয়ট লিখে গেছিলেন "মাসাইদেরই আমি পুব-আফ্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং প্রধান উপজাতি বলে মনে করি। এবং এদের বাগে রাখবার জন্যেই আমাদের যথেষ্ট শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী রাখতেই হবে, যে-অঞ্চলে যেখানে তাদের বাস সেই অঞ্চলে।"

চার্লস এলিয়টই উনিশশো দশ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মাসাইদের তাদের সবচেয়ে উর্বর চারণ-ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকের আপত্তি ও সুচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের "লাইকিপিআ" পর্বতাঞ্চল থেকে নেমে যেতেই হয়েছিল।

পুব-আফ্রিকা থেকে ব্রিটিশরা চলে যাবার পরও মাসাইদের সঙ্গে স্বাধীন কেনিয়ান সরকার আদৌ ভালো ব্যবহার করেনি। তান্‌জানীয়ান সরকারও নয়। উনিশশো তেষট্টিতে কেনিয়া স্বাধীন হয়েই মাসাইদের সব জমি, জমির ব্যবসাদারদের এবং অন্যান্যদেরও কিনে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। মাসাইরা ভাবতো জমি, সে তো "এন্‌গাই"-এর সম্পত্তি। তার মালিকানা যে কেউ অর্থের বিনিময়ে পেতে পারে একথা বিশ্বাস করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। জমির মালিক ছিলো পুরো মাসাইগোষ্ঠী। অথবা এক একটি উপগোষ্ঠী। কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা কোনো চিহ্নিত জমির উপর মালিকানা মাসাই সমাজে কারো ছিল না। তাতেই জমির ব্যবসায়ীদের আরোই সুবিধে হল সরল মাসাইদের জমি কব্জা করার। একজন দু'জনকে বুঝিয়ে বা অন্যভাবে হাত করে যে জমির উপরে সকলেরই সমান অধিকার তাই তারা ক্রমশ বেহাত করে নিল। সরল আদিবাসীদের ঠকানো সব দেশেই সোজা। মাসাইদের ঠকানো আরো সোজা ছিলো কারণ সভ্যতার সঙ্গে সবরকম সংস্পর্শই তারা চিরদিন সযতনে এড়িয়ে চলত। কিছু না-বুঝেই মাসাইরা টিপসই দিয়ে দিত ধূর্ত ও লোভী জমি-গ্রাসকারীদের। কাউকে ঘুষ দিয়ে, কারো কাছে দলিল জাল করে ঐ তড়িঘড়িতে বড়লোক বনে যাবার সাধনায় সিদ্ধ মানুষেরা জমির মালিক হয়ে উঠতে লাগল। ওদের জমি তো আর দাখিলাভুক্ত বা নথীকৃত ছিল না তাই ওদের জমি বেদখল করে নেওয়া ধূর্ত শহুরেদের পক্ষে খুবই সোজা ছিল। এমনি করেই মাসাইদের বহু জমি বেহাত হয়ে গেল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে যেতে লাগল তারা।

তান্‌জানীয়াতে অবস্থাটা ছিল সামান্য অন্যরকম। আগেই বলেছি, তান্‌জানীয়াতে মূলত জার্মানরাই কর্তৃত্ব করত তাই জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা বলেই পরিচিত ছিল তান্‌জানীয়া। কিন্তু জার্মানরা ঐ অঞ্চলে ইংরেজদের মতো উপনিবেশ স্থাপন করতে উৎসাহী ছিল না। নিজেদের শাসন বিস্তার করেই খুশি ছিল তারা।

www.BanglaBook.org

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা হেরে যেতেই ইংরেজরা তান্‌জানীয়াতেও ক্ষমতাতে এল। কিন্তু ক্ষমতাসীন হয়েও উপনিবেশ না করে তারা "লীগ অফ নেশনস্"-এর অধীন একটি অছি-পরিষদ-এর মাধ্যমে তান্‌জানীয়ার শাসনভার তুলে নিল।

মাউন্ট কিলিম্যান্‌জারো থেকে মাউন্ট মেরু পর্যন্ত এলাকাকে বলা হত "এন্‌গারেনানীউকি"। সেই অঞ্চলের দখল নেওয়ার জন্যে ব্রিটিশরা বসতিস্থাপন করার জন্যে কিছু লোককে বসিয়েও দিল। সেই নবাগন্তুকদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘাত ঘটতে লাগল। অবশেষে এই বিরোধের ফয়সালার জন্যে ইউ. এন. ও. তে নালিশ জানালেন স্থানীয় অধিবাসীরা। ইউ. এন. ও. থেকে একটি ডেলিগেশনও পাঠানো হল। তাঁরা এসে সব দেখেশুনে বলে গেলেন যে স্থানীয় মানুষের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থাকবে। কিন্তু জমির মালিকানার ব্যাপারে কোনোই ফয়সলা হল না।

তান্‌জানীয়া যখন স্বাধীন হল তখনও মাসাইদের যে জমি জবরদস্তি করে অন্যরা নিয়ে নিয়েছিল তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল না। শুধু তাই নয়, তান্‌জানীয়ার নতুন রাষ্ট্রর যারা শাসনভার পেলেন তাদের মধ্যে পশুচারণ করে জীবিকা-নির্বাহকরা মাসাইদের একজনও ছিল না বলতে গেলে। ফলে তাদের হয়ে বলবারও কেউ রইল না। আরুশা" (কৃষিজীবী মাসাই), "ওয়া-মেরু" আর "ওয়া-চাগা" এই তিন দল সুযে তাদের ভূমি-পিপাসা, চারণজীবী মাসাইদের জমি যথেচ্ছভাবে কেড়ে নিয়ে ে তান্‌জানীয়ান সরকারের হাতে তান্‌জানীয়ান সমস্ত জমির মালিকানা বর্তাল। সম্পত্তি: তান্‌জানীয়াতে আজ কারোই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, শুধু নিজেদের মাথা গোঁজ জায়গাটুকুই বাদ দিয়ে সব সম্পত্তিই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। গৃহভৃত্যদের মাস মাইনে ধা হয়েছে, হয়েছে ছুটির দিন। কাগজে কলমেই সোস্যালিজম এসেছে, কিন্তু অত্যাচার অনাচার যেমন ছিল তেমনিই আছে। গরীব আরও গরীব হয়েছে। কিছু ভুঁইফোঁড় রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী এবং মস্ত ব্যবসায়ীদের মোচ্ছব সেখানে, ভারতীয়দেরই মতো। ঘুষখোর আমলা এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা মিলে দেশের সাধারণ মানুষদের চুষে খাচ্ছে। মানুষের অবস্থা কিছুমাত্রই ফেরেনি। নেতারা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন গরম গরম। সাধারণ দেশবাসী যে তিমিরে সেই তিমিরে। তার মধ্যে মাসাইদের কথা নিয়ে কেইবা বলে বা লড়ে?

অনগ্রসর দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি ইত্যাদি রাতারাতি রাষ্ট্রায়ত্ত করে সাধারণ মানুষের চোখ ঝলসে দিয়ে কিছুদিন হয়তো ভোট পাওয়া যায় কিন্তু সেই দেশের মানুষেদের মধ্যেই যদি ঘুন-ধরে গিয়ে থাকে তো সেই দেশের বাঁচার আশা কম। গণতন্ত্র থাকলে তাও কয়েক বছর বাদে বাদে জনগণের মতামত প্রতিফলিত হতে পারে, আংশিকভাবে। হলেও কিন্তু ক্ষমতার লোভ আর গদির লোভ এমনই লোভ যে যাঁরা ক্ষমতাতে আসীন থাকেন তাঁদের পক্ষে গণতন্ত্রকে হটিয়ে দিয়ে স্বৈরতন্ত্র বা টোটাল-কম্যুনিজম নিয়ে এসে, সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একার হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা দেখা যায়।

এত কথা হয়তো মাসাইদের কথা বলতে বসে বলাটা অবান্তর হল, কিন্তু তান্‌জানীয়াতে গিয়ে যা দেখেছি, সে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যে অতীব খারাপ তাতে

www.BanglaBook.org

কোনো সন্দেহ থাকেনি।

অবশ্য আমাদের দেশের অবস্থাও কিছু ভালো নয়। বরং দিন কে দিন খারাপই হচ্ছে। তবে গণতন্ত্র যতদিন আছে তাও আশা করা যায় যে দেশের লোক নিজেদের সিদ্ধান্ত একবার ভুল হলে পরের বার তা শুধরে নেবে ভোটেরই মাধ্যমে। অবশ্য গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও সংকটময় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। টাকা কাগজ হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যাও বাড়ছে বন্যার জলেরই মতো। কোনো মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা মানুষের মতো মানুষের বড়ই আকাল পড়েছে।

পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই গেছি, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক বলতেও বলেছি অন্য দেশেরই কথা। কিন্তু নিজের দেশকে ভালোবাসি বলেই অন্যদেশ-এর প্রসঙ্গ উঠতেই স্বদেশের কথা চলে আসে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা আশাকরি আমার এই অন্যত্র বিচরণ নিজগুণে মার্জনা করে দেবেন।

তান্‌জানীয়ান সরকার নানা সরকারী পার্ক স্থাপন করেও মাসাইদের মূল বাসস্থানের অনেকখানিই নিয়ে নিয়েছেন। উদ্দেশ্য সাধু। প্রচুর আয় হচ্ছে।

মাসাইদের গবাদি-পশু আর অগণ্য, অসংখ্য প্রজাতির বন্য-পশুরা সহাবস্থানে অভ্যস্থ ছিল। মুখ্যত দুটি অজুহাত দেখিয়ে এইসব সাফারী পার্ক এলাকা থেকে মাসাইদের বিতাড়িত করা হয়েছে। গায়ের জোরেই। প্রথম অজুহাত হল যে তাদের গবাদি-পশুদের থেকে বন্য-পশুদের "রাইন্ডারপেস্ট" রোগ হতে পারে। দ্বিতীয় অজুহাত হল যে মাসাইরা বন্য-পশু শিকার করে।

প্রথম অজুহাতটি হাস্যকর। দ্বিতীয় অজুহাতটি লজ্জাহীনতার নামান্তর। মাসাইরা তীর-ধনুক আর বল্লম দিয়ে কিছু পশু চিরদিনই মারতো মাংস খাবার জন্যে এবং কিছু পশু পাখি, নিজেদের পোশাকের জন্যেও। কিন্তু তার মোট সংখ্যা বছরে কত হতে পারতো? এদিকে ন্যাশানাল সাফারি পার্কগুলি বা সরকারী-পার্কগুলির মধ্যেই যে সঙ্ঘবদ্ধ চোরা-শিকার হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এবং হাতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ, জেব্রা, ওকাপি, কুদু, ইম্পালা এবং সিংহ, চিতা ও লেপার্ড-এর চামড়া, হাতির দাঁত, যে হেলিকপ্টার, প্লেন এবং জাহাজে করে ভিন্‌দেশে চালান হয়ে যাচ্ছে তার বেলা?

তান্‌জানীয়ারই মতো কেনিয়াতেও মাসাইদের উপজাতি হিসেবে প্রায় লুপ্ত করারই ষড়যন্ত্র প্রকট হয়েছে।

জমি থেকে প্রায় বিনা-মেহনতের মুনাফা নির্বিঘ্নে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের করতলগত যাতে হয় সেজন্যে "রেঞ্জ-স্কীম"-এর প্রবর্তন করেছে কেনিয়ান সরকার। অ-মাসাইরা যেভাবে তান্‌জানীয়ার মাসাইদের জমি ঠকিয়ে নিচ্ছে সেভাবেই করায়ত্ত করেছে তাদের বিস্তৃত চারণভূমি। গমোৎপাদন এমনকি পশুপালনের জন্যেও এই রেঞ্জাররা সমানে মাসাইদের কোণঠাসা করে চলেছে। অনেক মাসাইরা তাই বাধ্য হয়ে তাদের পিতৃভূমি ছেড়ে কেনিয়ার নাইরোবি এবং অন্যান্য শহরে চাকরির খোঁজে ভীড় করছে এখন। অন্য কোনো কাজই তো তারা জানে না তাই তাদের কাজ জুটছে শুধু নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে। নাইরোবির

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শহরের কাছেই "মাসাই-মারা" বা "সাভো" ন্যাশানাল পার্ক-এ যে সব সরকারি লজ আছে বা তাঁবুর হোটেল, সেখানে তারা রক্ষীর কাজে বহাল হচ্ছে অতি সামান্য মাইনেতে।

উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ মাসাইদের কাছে একটি মসীলিপ্ত বছর হয়ে রয়েছে। তারা ঐ বছরকে নাম দিয়েছে "ওলারি ওটারিয়োকি ওল্‌মুৎসুন্‌গৎই"। মানে "যে বছর একজন ইয়োরোপীয়ানকে মারা হয়েছিল"।

ঐ ঘটনা মাসাইদের কাছে রূপকথা হয়ে গেছে। সে বছর মাসাইদের অবসান ও নিগৃহীত করার জন্যে তাদের গবাদি-পশুকে ধরে নিয়ে ইংরেজরা খোঁয়াড়ে পুরেছিল। মাসাইরা নিজেরা জেলে যাওয়ার চেয়েও অনেকই বেশী অপমানিত বোধ করে তাদের গবাদি-পশুকে ধরে নিয়ে গেলে, এই কথা ভালোভাবে জানতেন বলেই।

মাসাইরা প্রতিবাদ করেছিল, ফলে বহু লোককে জেলে পুরেছিল ইংরেজরা। আফ্রিকান হাতি যেমন পোষ মানে না, তাদের ধরলে তারা উপবাসী থেকেই মারা যায়, মাসাইরা তেমনই অপমানের অন্য প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে উপবাসে মরেছিল জেলের ভিতরে। শয়ে, শয়ে। যেমন করে একসময় উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রিয় গর্বিত অনেক রেড-ইন্ডিয়ানরাও মরেছিল।

ঐ সময়কার একটা ঘটনাই উনিশশো ছেচল্লিশকে অমর করে রেখেছে মাসাইদের কাছে। ইন্‌গিডোঙ্গি উপগোষ্ঠীর একজন যোদ্ধা অন্য গোষ্ঠীর গবাদি-পশু লুট করার জন্যে যখন গেছিল তখন ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে জরিমানা করে ব্রিটিশরা।

একদিন সে খবর পেল যে জরিমানা হিসেবে তার ন'টি গবাদি-পশু বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ কথা জানতে পেরে সে জেলাশাসককে খবর পাঠাল যে তিনি তার জরিমানা দিতে পারেন, এমনকি ইচ্ছে করলে তার গবাদি-পশুর পুরো দলটিকেও কিন্তু শুধু একটি বলদ ছাড়া। সেই বলদটিকে সে বড় ভালোবাসতো।

কমিশনার সেই ইন্‌গিডোঙ্গি যোদ্ধাকে অপমান করার জন্যেই এবং তার ঔদ্ধত্যেরও সমুচিত জবাব দেবার জন্যে এবং এও দেখাবার জন্যে যে জেদে তিনিও মাসাই যোদ্ধার চেয়ে কিছু কম যান না; ন'টি পশুতো নিলেন এবং ইচ্ছে করেই সেই বিশেষ বলদটিকেও নিলেন সেই জরিমানার ন'টির মধ্যে।

জরিমানার গবাদি-পশু নিয়ে গেলো ব্রিটিশ-এর পেয়াদারা সেই যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে। ফিরে সে এই খবর পাওয়ার পরই কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দূরের পথ একা একা হেঁটে সে কেনিয়ার "লেইতা" হাটে পৌঁছোল শেষে। সেই হাটে গবাদি-পশু কেনা-বেচা হচ্ছিল। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার স্বয়ং জরিমানা-স্বরূপ বাজেয়াপ্ত করা গবাদি-পশুগুলি বিক্রীর তদারকি করছিলেন। অনেক লোকই এসেছিল সেই হাটে গরু বলদ কিনতে। খুরে খুরে ধুলো উড়ছিল। গাই বলদের বোঁয়াও ওঁয়াও ডাকে সরগরম হয়ে ছিল হাট। সেই যোদ্ধা দূর থেকেই তার অত্যন্ত প্রিয় বলদটিকে চিনতে পেরেছিল। এবং তার প্রিয় অন্যান্য গরু ও বলদগুলিকেও।

তার বলদটি খোঁয়াড়ে মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল কিন্তু

www.BanglaBook.org

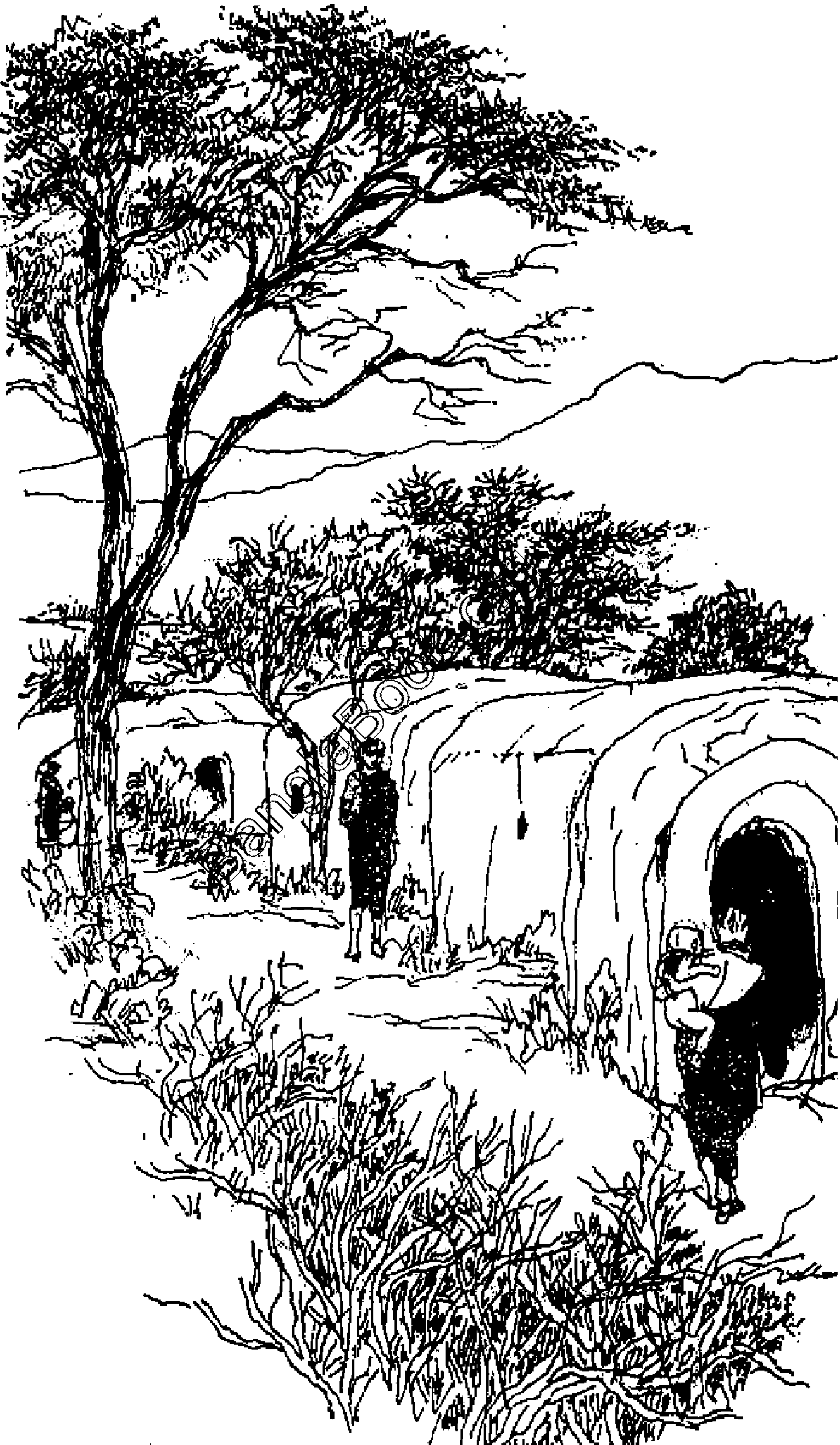

www.BanglaBook.org

কোথাওই কোনো ফাঁক না থাকায় বেরোতে পারছিল না। যোদ্ধার প্রিয় পশুও তো যোদ্ধাই হয়। তার প্রাণাধিক বলদের অমন অবস্থা দেখে সেই মাসাই যোদ্ধা একটিও কথা না বলে সোজা ডিস্ট্রিক্ট-গভর্ণরের কাছে হেঁটে গেল। ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর মুখ তুলে তাকাল, উদ্ধত দুর্বিনীত জেদী মাসাইকে জব্দ অপমানিত এবং শায়েস্তা করতে পেরেছে এ কথা ভেবে তার মুখে গর্বের ছোঁয়া লাগল। মাসাই যোদ্ধা কোনো কথা না বলে তার বল্লমটি তুলে নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-গভর্ণরকে হাটের মাঝখানেই বল্লমের একটি আঘাতে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তারপর এক হ্যাঁচ্‌কা টানে বল্লমটি সেই ব্রিটিশের বুক থেকে টেনে বের করে ঘৃণা ভরে বাঁ-হাত দিয়ে তার মাথার সোনালী চুল উঁচু করে তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে বল্লমের লেগে থাকা টাটকা রক্ত মুছে নিল।

মুহূর্তের মধ্যে গরু-বলদের হাট মরুভূমি হয়ে গেল। কী ব্রিটিশ, কী আফ্রিকান কেউই আর ত্রিসীমানাতে রইল না। পড়ি-কি মরি করে সবাই ভয়ে নীল হয়ে সে জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল। শুধু সেই মাসাই যোদ্ধা একা বল্লমটি সামনে ধরে তার উরু থেকে ঝোলানো ঘণ্টাগুলি বাজাতে বাজাতে পায়ের পর পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল বল্লম বাগিয়ে তৈরী হয়ে, একটু বাধা পেলেই সামনে যে পড়বে খতম করে দেবার জন্যে।

এমন সময় তার ছোট ভাই সেই শূন্য হাটের মধ্যে থেকে ভৌতিক গলায় ডেকে উঠল ঃ "দাদা"

যোদ্ধা ঘুরে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছো?

কোথায় যাবো, তাই ভাবছি। হর্তা-কর্তারা তো ধারে-কাছে একজনও নেই দেখছি। আমার কাজ শেষ করেছি। কোনো দুঃখ নেই আর।

আমার সঙ্গে এসো।

ভাই বলল।

বলে, ছোট ভাই এগিয়ে চলল। আর বড় ভাই তার পেছন পেছন বিনা প্রতিবাদে হাঁটতে লাগল।

ব্রিটিশ কর্তাদের কাছে পৌঁছনোর পর নিজেই গিয়ে ধরা দিল সে। তারা ফাঁসীতে ঝোলালো সেই যোদ্ধাকে। আমাদের ক্ষুদিরাম বোসের মতোই সেও হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি পরলো গলাতে। তার সবক'টি গবাদি-পশুকেও বাজেয়াপ্ত করেছিল ব্রিটিশেরা সেই যোদ্ধা আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

মাসাই যোদ্ধারা পুরুষের জাত। তাদের মানের দাম, এমনকি তাদের আদরের ভালোবাসার গাই-বলদের দামও তাদের নিজেদের প্রাণের দামের চেয়ে অনেকই বেশী। নিছক মাথা-নীচু করে, নিঃশ্বাস ফেলে আর প্রশ্বাস নিয়ে প্রাণধারণ করা আর মানুষের মতো বাঁচার মধ্যে যে অনেকই তফাৎ তা মাসাইরা মর্মে-মর্মে জানে। মানুষ যদি বেঁচেই থাকে, থাকতে চায়; তবে বাঁচার মতোই বাঁচা উচিত। যে কথা আমরা অনেকেই জানি না, জানিই বা যদি তো মানি না; মাসাইরা তা জানে এবং মানে।

মাসাইদের বিতাড়ন করার পেছনে, তাদের মতো এক আশ্চর্য রূপকথার উপজাতিকে

www.BanglaBook.org

নিশ্চিহ্ন করার পেছনে কোনো যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না।

ইংরিজি এবং ফরাসী-শিক্ষিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত অনেকানেক মাসাইরাও আজকাল বলেন যে মাসাইদের সময় পেরিয়ে গেছে। বাঁচতে যদি তাদের হয়ই তবে দেশের অন্যদের সঙ্গে, মূলস্রোতের সঙ্গে মিলে গিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। "আধুনিক," "শিক্ষিত" এবং বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে তাদের। নইলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বহুবর্ণা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই আশ্চর্য উপজাতিরা যদি আমাদের এই বিপুলা পৃথিবীর একটি কোণে যদি নিজেদের, নিজস্বতা নিয়ে বাঁচতে চায়ই এবং হাজার হাজার বছর বেঁচেও এসে থাকে প্রাকৃতিক এবং তথাকথিত "শিক্ষিত," "অনগ্রসর" সব মানুষের তৈরী করা অশেষ ঝড়-ঝঞ্ঝাকেও উপেক্ষা করে; তবে আজকে তাদের কালো উটপাখির পালকে আর সিংহের কেশরে-সাজা দর্পিত বীরেরা কেন শহরের অন্ধকার ঘরের টেবিলে বসে আমাদেরই মতো সাদা-কলারের কেরানী বা বড়বাবু ছোটবাবু হতে যাবে?

জীবন তো মাত্র একটাই! ওরা বাঁচুকই না ওদের ইচ্ছেমতো!

আসলে, আমরা নিজেরা তো কেউই পারিনি বাঁচতে নিজেদের ইচ্ছানুসারে! আমরা, এই তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য শহরের কীটেরা! তাই বোধহয় আমাদের এতো রাগ ওদের উপর।

মাসাইদের মূল বাসভূমি এমনি করেই ধীরে ধীরে জমির ফাট্‌কাবাজ, কৃষিজীবী, নিজ দেশের সরকার সকলে মিলে ক্রমশই দখল করে নিচ্ছে তাই মাসাইরা নেহাৎই বাধ্য হয়ে ক্রমশ তাদের উর্বর চারণভূমি ছেড়ে আধা-ঊষর ভূমিতে সরে যাচ্ছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্মান এবং আব্রু নিয়ে।

কে জানে? যারা ঘাস আর বৃষ্টিরই পূজারী, সন্তান আর গবাদি-পশুই যাদের একমাত্র প্রার্থনা "এন্‌গাই"-এর কাছে, তাদের মাথার উপরে মাংসাশী পাখি উড়ে উড়ে তাদের পথে ছায়া ফেলে অনুসরণ করছে কি না? যে-যোদ্ধারা যুদ্ধের মরণকে চিরদিনই বীরত্বের নিদর্শন হিসেবেই জেনেছে, মৃত্যুকে কোনোদিনও ভয় করেনি; তারা হয়তো যে শত্রুকে তারা জানে না, বোঝে না, দেখতে পায় না, সেই "আধুনিকতা" আর সর্বগ্রাসী লোভের হাতে বিনা যুদ্ধেই কোনো ঊষর রৌদ্রদগ্ধ দিনে কোনো অ্যাকাশিয়া গাছের ঝরে-পড়া কাঁটার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবে। শিকারী, মাংস-লোলুপ পাখিটি, সে নিজেও স্বাধীন, আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী বলেই মৃত-যোদ্ধাদের মাথার উপরে বার কয়েক পাক দিয়ে হয়তো তাদের স্পর্শও না করে জ্বালাধরা চোখে উড়ে যাবে চোখ-জ্বলা দিগন্তের দিকে। দ্বিধাহীন সূর্যর দিগন্তব্যাপী মরীচিকার মধ্যে মরীচিকার কুচি হয়ে যাবে।

চাতক পাখি ডাকবে শেষ বিকেলে মৃতদের মাথার উপরে, ঘুরে ঘুরে, উড়ে উড়ে; ফটিক জল! ফটিক জল।

একটু জল, একটু ঘাস, একটি শিশু, শুধু এইটুকুই যে গর্বিত, সরল সহজ আদিবাসীদের পরম প্রার্থনা তাদেরও নিজেদের খুশিমতো বাঁচতে দেওয়ায় এত লোকের এতোরকম আপত্তি যে কেন তা — বোঝা সত্যিই ভারী মুশকিল।

BanglaBook.org